আল্লাহর সৈনিক
ড. মিসকীন হেজাযী

আ গে প ড় ন

স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের জন্য এক নিঃসীম প্রেরণার আধার, এক অবিনাশী শক্তি ইমাম শামিল (রহ.)। তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি, ক্ষমতালোলুপ আগ্রাসী রুশ জারের আধুনিক সমরায়োজনের মোকাবেলায় প্রায় অর্ধশত বছরব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন তিনি। দীর্ঘ সময়ের এই শত-শত যুদ্ধের একটিতেও জয়ী হতে পারেননি ক্ষমতাদর্পী রুশ জার।

কিন্তু শেষযুদ্ধে স্বাধীনতা হারায় কাফকাজ। কেন? কিসের অভাব ছিল ইমাম শামিলের? ইমাম শামিলের পক্ষে জারের পতন ঘটানো সম্ভব ছিল। কিন্তু ফলাফল উলটো হল কেন? সেই রক্তাক্ত ইতিহাস নিয়ে রচিত হল অনবদ্য উপন্যাস 'আল্লাহর সৈনিক'।

বইটির কোথাও কল্পনার আশ্রয় নেই। নেই অঙ্গ-ঔজ্জ্বল্যে শব্দপ্রসাধনির রঙের বাহার। এতে আছে উনিশ শতকের ষোলো সাল থেকে ঊনষাট সাল পর্যন্ত ককেশাশের প্রান্তরে-কন্দরে, পাহাড়ের শীর্ষে-পাদদেশে, ঘন জঙ্গলের আড়ালে, পর্বতমালার বাঁকে-বাঁকে এক আপসহীন লড়াকু বীর যোদ্ধার সুউচ্চ হিম্মতের স্বর্ণালি ইতিহাস, যে ইতিহাস পাঠে আজও শিহরিত হয় মুমিনের তনুমন, উথলে ওঠে ঈমানের জোশ। আছে উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ, ইতিহাসের উপাদান এবং উজ্জীবিত মুমিনের জেগে ওঠার আহ্বান।

পড়ুন

আল্লাহর সৈনিক

আল্লাহর সৈনিক

রচনা

ড. মিসকীন হেজাযী

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

দোকান নং-৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

পৃষ্ঠা	৩২০, ফর্মা ২০
পরশমণি প্রকাশনা	১৬
©	সংরক্ষিত
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
দ্বিতীয় প্রকাশ প্রথম প্রকাশ	আগস্ট ২০০৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
বর্ণ বিন্যাস	মুজাহিদ বিন গওহার জি গ্রাফ কম্পিউটার, মালিটোলা, ঢাকা
মুদ্রণ	কালার সিটি ১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা
ডিজাইন	নাজমুল হায়দার দি লাইট, ৭২, পুরানা পল্টন, ঢাকা

ISBN-984-8754-03-2

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

এক.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আড়াই দশক সমাপ্তির পথে। অথচ, আধুনিকতার কোন ছোঁয়া এখানে চোখে পড়ে না। এ যেনো আদি পৃথিবীর অবিকৃত এক জনপদ। তবে এখানকার মানুষের মন ও মানসের সাথে আরবীয় প্রকৃতির অবিশ্বাস্য রকম সাযুজ্য লক্ষ্যণীয় বটে। যেমন, একজন খুনীও যদি নিরাপত্তা কামনা করে নিহত ব্যক্তির পিতার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করে, তবে তাকে জামাই-আদরে আপ্যায়িত করা হয়, তার যথাসাধ্য আদর-যত্ন করা হয়। তাদের পরিভাষায় একে 'কানাক্' বলা হয়। নিহত ব্যক্তির পিতা ততোক্ষণ পর্যন্ত ঘাতকের নিরাপত্তা ও খাতির-যত্নে একপা খাড়া থাকে, যতোক্ষণ না সে স্বেচ্ছায় বিদায় নেয়। আশ্রিত ঘাতক যেখানে যেতে চায়, নিহতের আত্মীয়-স্বজন তাকে সেখানে পৌছিয়ে দেয় । কিন্তু যদি তারা কখনো কোনো হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হয়, তবে পাহাড়ের অগম্য চূড়া, গহীন জঙ্গল ও সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে ঠাঁই নিলেও তার রক্ষা নেই। চরিত্রে জেদী ও প্রতিশোধপরায়ণ এই মানুষগুলো গর্বের সাথে বলে, 'অথৈ সমুদ্রের পাহাড় সমান ঊর্মিমালাও যদি ঘাতককে তার মায়ার চাদরে লুকিয়ে রাখে, তবুও তাকে খুঁজে বের করতে আমরা সক্ষম। ঘাতক যদি হিংস্র ব্যাঘ্রের উদরেও আশ্রয় নেয়, সেখান থেকেও তাকে ছিনিয়ে আনতে আমরা অকুতোভয়।'

পৃথিবীর সবচে' সুশ্রী ও সুঠাম মানুষদের অধিবাস এই পাহাড়-উপত্যকা। এ হলো আমাদের স্বপ্নের, রূপকথার, গল্প, সাহিত্য ও গীতিকথার সেই কোকাব শহর। কোকাব শহরের পরীদের কথা আরবী, উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। আসলে কোকাবের বাসিন্দারা জিন-পরী নয়। তবে সেখানের নারীরা পরীর চেয়েও রূপসী। তারা পরীর মতো মুক্ত বিহঙ্গে ডানা মেলে উড়ে না বটে, তবে পরীরাও তাদের রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে পড়ে। এ কারণে কোকাবের নারীদেরকে অপূর্ব সুন্দরী পরীদের সাথে তুলনা করা হয়।

এরা সেই মানবপরী, যাদের সুপুষ্ট মসৃণ অবয়ব, টানা টানা মায়াবী চোখ, ঘনকালো প্রলম্বিত চুল, দীর্ঘ গ্রীবা, সরু কটি এবং তাদের গায়ের রং এতোই উজ্জ্বল যে, পানিটুকু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করার সময় স্পষ্ট দেখা যায়।

এই অঞ্চলটির সঠিক নাম কোকাব নয়– কাফকাজ। ইংরেজিতে ককেশাশ।

কেউ বলে কোহেকাফ। আল্লাহর এক অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই কাফকাজ। পৃথিবীর এক প্রাচীনতম জনপদ। ইরান থেকে এই দেশটি বেশি দূরে নয় বলেই বোধ হয় ইরানের বিশ্বখ্যাত কবিরা ফারসী কাব্যের অসংখ্য উপমা গ্রহণ করেছে স্বপ্নের এই পরীর দেশ থেকে।

কাস্পিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই কাফকাজ পর্বতমালা। দৈর্ঘ নয় শত মাইল, প্রস্থ কোথাও পঞ্চাশ মাইল, কোথাও একশত পঞ্চাশ মাইল। পর্বতমালার এই নিশ্ছিদ্র ধারাকে 'সেকান্দরী প্রাচীর' বলা হয়। সেকান্দর আজমের সসৈন্য প্রলয় তাণ্ডব রুখে দিয়েছিলো এই কুদরতী প্রাচীর। অনেকে বলে, এই সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর, যা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ আটকে রেখেছে।

এই ভূখণ্ডের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে ঐতিহাসিক জুদী পাহাড়ের (কোহে আররাত) অবস্থান। মহাপ্লাবনের সময় হযরত নূহ (আ.)-এর কিশতী এই জুদী পর্বতের চূড়ায় এসে ঠেকেছিলো। আর উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে উনিশ হাজার ফিট উঁচু আল-বুরূয পর্বত, যা 'জিন বাদশাহ' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন গ্রীকদের বিশ্বাস, আদিকালে এই আল-বুরূয পর্বতের চূড়ায় দেব-দেবীদের মাঝে পরস্পরে অসংখ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। প্রাচীন সাহিত্য ও গীতিকথায় লিখিত হয়েছে, এই পাহাড়ের চূড়ায় সী-মোরগ বাস করে। সী-মোরগ তার দু' চোখের একটি দিয়ে নাকি অতীত এবং অপরটি দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করে। যখন সে উড়ে, তখন পৃথিবী কাঁপতে থাকে, যাকে ভূমিকম্প বলা হয়। এই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত রয়েছে 'কোহে কাযবুক', যার উচ্চতা ষোল হাজার ফুট।

গোটা এলাকা সৃষ্টির এক আজব চিড়িয়াখানা। প্রায় প্রতিটি পাহাড় বরফের শ্বেত চাদরে ঢাকা। কখনো এই পাহাড় এতো বিশাল বিশাল শীলাখণ্ড মাটিতে গড়িয়ে ফেলেছে, যার তাণ্ডবে বহু জনপদ বিরান হয়ে গেছে। সে যুগের লোকেরা একে দেবতার অসন্তুষ্টি বা সী-মোরগের পক্ষতাড়নার প্রতিক্রিয়া বলে বিশ্বাস করতো।

এই পর্বত শ্রেণীর চূড়া থেকে কয়েক মাইল নীচে ছোট ছোট বহু জনবসবতি রয়েছে। সেখান থেকে এসব বসতির কোনোটি সরু গলি পথের মতো, কোনোটি গোল থালার মতো, কোনোটি সমান্তরাল, কোনোটি গোল বৃত্তের মতো অনুমিত হয়। এই পর্বতশ্রেণী থেকে সৃষ্টি হয়েছে সাগর, নদ-নদী ও প্রণালীসহ বিশটি প্রবাহমান পানির আধার। কোনো নদী সুড়ঙ্গের মতো পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে অবিরাম। কোনো কূপের পানি ঠাণ্ডা, কোনোটির উষ্ণ, গরম। একই পানি একই পাহাড়, কিন্তু এর কোনোটির পাথর গলিয়ে নির্গত হয় গরম পানি, অপরটি দিয়ে শীতল। এ এক কুদরতের অপার লীলা।

পাহাড়গুলো এতো উঁচু যে, রাতের বেলা মনে হয়, আকাশের তারকাগুলো

বুঝি পাহাড়ের দেশে নেমে এসেছে। আলোরা নাচছে। এখানে বুঝি তারকার মেলা বসেছে। সে এক বিমুগ্ধকর অপরূপ দৃশ্য। দিনের বেলা সূর্যের আলো বরফাচ্ছাদিত শুভ্র পাহাড়-চূড়ায় যখন প্রতিফলিত হয়, তখন দেখা যায় কতো আদিমুদ্রায় কিরণমালারা খেলছে, নাচছে। সে বিমুগ্ধ দৃষ্টি ফেরানোই তো দায়।

রঙের এ খেলা দ্রুত বয়ে চলে উপর থেকে নীচে– অনেক নীচে। বাতাসের ঝাপটা-খাওয়া মেঘমালা সাদা কালো বা সুরমা রঙের চাদর মুড়ি দিয়ে মুক্ত বিহঙ্গে ক্লান্তিহীনভাবে আকাশ-পরীদের মতো উড়ছে। পাহাড় চুড়ায় উঠে নীচে চেয়ে দেখলে বিশাল নদীগুলোকে সরু রেখার মতো মনে হবে। পাহাড়ের পাদদেশে নেমে তাকালে নীচে– আরো নীচে চোখে পড়বে ঘন অন্ধকারে ঠাসা ভয়াবহ অসংখ্য গহীন শুষ্ক কূপ। তাতে পাথর নিক্ষেপ করলে দীর্ঘক্ষণ পর তার পতনের শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তাঁর কুদরতের শৈল্পিক হাতে অতি যত্নের সাথে কারুকাজের পর্বতশ্রেণীর কাঠামো, শীর্ষচূড়া ও পাদদেশ বিচিত্র রং ও উপকরণ দিয়ে এতো নিপুণভাবে সাজিয়েছেন, যা সত্যই বিস্ময়কর। কোথাও রয়েছে কয়েক মাইল উঁচুতে শক্ত পাথরের সমান মাঠ, যা অতি দক্ষ কারিগরের হাতে প্রস্তুত সুপ্রশস্ত দেয়াল বলে মনে হয়। কোথাও গোল, সমান্তরাল, কোথাও চতুর্ভুজ ও ত্রিভুজ কাঠামোর উপত্যকা রয়েছে, যা দেখলে মনে হবে, পাথর কেটে যত্নের সাথে এই উপত্যকাসমূহ মানব বসতির উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে দক্ষ প্রকৌশলীর নকশা অনুসারে।

প্রকৃতির এ অপরূপ পরিকল্পনা ও সাজসজ্জা হৃদয়বান প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই অভিভূত করে ফেলে। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র রয়েছে। তাহলো কুদরতের তৈরি পাথরের বাঁশরী। তীব্র বায়ুর পরশে এই লক্ষ বাঁশরীর সুর লহরী উঁচু ও নিম্নতালে মাতিয়ে তুলেছে এই উপত্যকার প্রাণগুলোকে। মাঝে মাঝে এমন দেয়াল চোখে পড়ে, যা দু' টি পাহাড়কে আলাদা করে বহু দূর চলে গেছে। এই দেয়ালের সঙ্গে হাওয়া আঘাত খেয়ে শিশ বাজিয়ে প্রতিনিয়ত এক বিচিত্র সুরের ঝংকার তুলছে।

এক এলাকায় রয়েছে বিপুল পরিমাণ চেলগুজা, শাহবলুত ও সফেদা বৃক্ষ। অপর এলাকা আখরোট, বেত ও নাসপতিসহ হাজার ধরনের বৃক্ষে ভরপুর। কোথাও দেখা যাবে পালে পালে হরিণ ও বকরী চড়ে বেড়াচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে। কোথাও খরগোশরা লাফাচ্ছে। আবার দেখা যাবে বন্য গরু ও মহিষের যুদ্ধ চলছে। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিংস্র চিতা ও ব্যাঘ্র। আর তারই পাশে ছুটে বেড়াচ্ছে হনুমান, বানর ও বনবিড়াল।

এসব পাহাড়ি এলাকায় যারা বাস করে, তাদের অতি প্রিয় সম্পদ দু'টি- ঘোড়া

ও খঞ্জর। নানা প্রকার, নানা জাত ও নানা রঙের ঘোড়া। তাজী সর্বোন্নত জাতের ঘোড়া। স্থানীয় লোকেরা এই তাজী ঘোড়াকে দ্রুতবেগে চলার কারণে 'বাতাসের সন্তান' বলে অভিহিত করে। 'আবলক' ঘোড়ার জন্য তারা জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে।

একবার এক গোত্রপতির যুবক পুত্রের শত্রুপক্ষীয় অপর এক গোত্র নেতার একটি 'আবলক' ঘোড়া পছন্দ হয়ে যায়। অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যুবক তার কাছে গিয়ে বলে, 'বলো, তোমার এই ঘোড়ার দাম কতো?' বিচক্ষণ মালিক বুঝে ফেললো, এই যুবক আমার ঘোড়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাই উত্তরে বললো, 'তোমার মতো বীর যুবককে এই ঘোড়াটি উপহারস্বরূপ দিতে পারলেই আমি আনন্দ পাবো। কিন্তু তোমার পিতা এই শুভেচ্ছা উপহারকে আমার দুর্বলতা মনে করবে। তাছাড়া যেহেতু তোমার পিতা আমার শত্রু, তাই তোমার থেকে মূল্যও নেয়া সম্ভব নয়। আমাদের সমাজে শত্রুর সাথে এ ধরনের লেনদেনের নিয়ম নেই। সত্যিই যদি তুমি আমার 'আবলক' ঘোড়াটি নিতে চাও, তাহলে বিনিময়ে তোমার যুবতী বোনকে আমার হাতে তুলে দাও'।

যুবক আর দাঁড়ালো না। সোজা ঘরে চলে গেলো। তার পিতা তখন ঘরে ছিলো না। এই সুযোগে সে নিজের ষোড়শী সহোদরাকে রশি দিয়ে বেঁধে জোরপূর্বক ধরে এনে শত্রু সরদারের হাতে তুলে দিয়ে ঘোড়া নিয়ে বাড়ি ফেরে। ঘটনা জানতে পেরে যুবকের পিতা ছেলের এই আগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করে। কিন্তু শত্রু-নেতার এই আচরণকে অপমানজনক সাব্যস্ত করে দলবল নিয়ে তার উপর আক্রমণ করে।

এই পাহাড়ি লোকদের সমাজে মানুষের ন্যায় ঘোড়ারও বিভিন্ন বংশ আছে। বংশ অনুপাতে ঘোড়ার মর্যাদাগত তারতম্যও রয়েছে।

এখানকার লোকদের কাছে খঞ্জর ঘোড়া অপেক্ষা অধিক মূল্যবান, অধিক গৌরব ও ঈর্ষার বস্তু। বিভিন্ন প্রকারের খঞ্জর ঘোড়ার ন্যায় পৃথক পৃথক মর্যাদায় অভিষিক্ত। দাশ্‌না কাটারী, খঞ্জর আবদার, হেলালী খঞ্জর, মাহী, আহেন, আফআ, হাদীদ, দোধারী , তেগা, জুম্তা ও কঞ্জল ইত্যাদি।

কঞ্জল সব খঞ্জরের সেরা। কঞ্জল চালনার জন্য অত্যন্ত দক্ষতা ও শক্তির প্রয়োজন। যে কেউ কঞ্জল ব্যবহার করতে পারে না। কঞ্জল চালনার দক্ষতা যার আছে, তাকে অজেয় মনে করা হয়। কঞ্জলের ফলা যাকে স্পর্শ করে, এতো দ্রুত সে মৃত্যুবরণ করে যে, দু' ফোঁটা পানি মুখে নেয়ারও সময় পায় না। মানুষের পেটে তা এমনভাবে বিদ্ধ হয়, যেমন ধারালো ছুরি আলতো আঘাতে তরমুজের ভেতরে ঢুকে পড়ে। পেটের ভেতরে ঢুকিয়ে যখন বিশেষ পদ্ধতিতে সেটি টেনে বের করা হয়, তখন আক্রান্ত ব্যক্তির নাড়ি-ভুঁড়ি সব টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

এসব পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের জীবন-চরিত্রে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও

নদ-নদীর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সাহস তাদের পাহাড়ের মত উঁচু ও অটল। হৃদয় বনের মতো বিস্তৃত, বিশাল। চেতনা সমুদ্রের মতো গতিশীল ও বিক্ষুব্ধ। তাদের ব্যক্তিসত্ত্বা পাথরের মতো মজবুত। সে এলাকার গোত্র-সমাজ যেন জীবন্ত পর্বত, তাদের ঐক্য যেনো শিকলের এক একটি অবিচ্ছেদ্য কড়া। কিন্তু তারা পাহাড়ের মতো একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

সত্ত্বাগতভাবে প্রতিটি গোত্র এক একটি বিশাল পাহাড়, যাকে আপন স্থান থেকে সরানো অসম্ভব। প্রত্যেক মানুষ যেনো একটি বিশাল পাথর, যাকে নিজ অবস্থান থেকে টলানো সাধ্যাতীত। তাদের জীবন নির্বাহের উপকরণ গাছের ফল, বনের শিকার আর যৎসামান্য কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল। উপত্যকাসমূহের যেখানে সমতল জমি আছে, পানি আছে, সেখানে ফসল উৎপাদন করা হয়। কিন্তু এসব কাজ আঞ্জাম দেয় মহিলারা। পুরুষদের কাজ হলো যুদ্ধ করা। আক্রমণ করা আর আক্রমণ ঠেকানো তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাদের সন্তানরা জন্ম নেয় রণাঙ্গনে। রণাঙ্গনেই তারা লালিত-পালিত হয়, বড় হয়। এক সময় পৈত্রিক পেশা লড়াইয়ে অস্ত্র হাতে নেমে পড়ে। দৌড়-ঝাপ, রণসাজ তাদের জীবনের জন্য বাতাসের মতোই আবশ্যক।

সেই দিবসটি তাদের জন্য উৎসবের দিন বলে গন্য হয়, যেদিন কেউ তাদের উপর আক্রমণ চালায়। কেউ আক্রমণ না করলে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে তারা পরস্পরে যুদ্ধ মহড়ায় অবতীর্ণ হয়। বহুদিন যদি তাদের উপর কেউ হামলা না করে আর তারাও কারও উপর হামলা করার সুযোগ না পায়, তাহলে অগত্যা তারা নিজেরা পরস্পর লড়াই বাধিয়ে দেয়। বীরত্ব, দুরন্তপনা আর কর্মচাঞ্চল্য তারা রক্তের ধারায় লাভ করে। আলস্য ও কাপুরুষতার কোনো প্রশয় নেয় এই সমাজে।

কঞ্জল খঞ্জর তাদের এমনি এক পৈত্রিক সম্পদ, যা বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়। যে গোত্রের মানুষ কিংবা যে বাপের সন্তান কঞ্জলের ছত্রছায়ায় জীবন কাটাতে অক্ষম, সমাজে তাদের বেঁচে থাকা অর্থহীন।

তরবারী চালনায় দক্ষতা পুরুষের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু খঞ্জর ব্যবহারের বিদ্যা নারীরাও অনিবার্যভাবে অর্জন করে থাকে। কারণ, অনেক সময় তাদেরও যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হয়। তারা যখন ময়দানে নামে, তখন প্রলয় সৃষ্টি করে ছাড়ে।

ইতিহাসে যে ক'জন নামকরা বীরাঙ্গনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা এই পার্বত্য ভূখণ্ডেরই নারী। কখনো কখনো নারীরাই আক্রমণকারীদের মোকাবেলা করতে থাকে। তৈমুর লং দিল্লী জয় করার পর যখন কাফকাজে হামলা চালান, তখন কাফকাজের বীরাঙ্গনা নারীরাই তার সৈন্য বাহিনীকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো।

বহু বহুকাল পূর্বে কোহেকাফকে পৃথিবীর প্রান্ত মনে করা হতো। অবশেষে

যুদ্ধবাজ লোকেরা কোহেকাফের দক্ষিণ প্রান্তরের (বর্তমান বাকুর নিকটবর্তী) সেই পথটি খুঁজে পায়, যা পাহাড় অতিক্রম করে এশিয়ার সাথে মিলিত হয়েছে। আরবরা সেই পথকে 'বাবুল আবওয়াব', ইরানীরা 'দরবন্দ' আর গ্রীকরা 'ওরকলান' বা 'দররা দারিয়াল' বলে।

এই পথের সন্ধান পাওয়ার পর কোহেকাফের উভয় দিকের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়ে যায়। বণিক কাফেলার চলাচল শুরু হয়ে গেলে ডাকাতি আর লুটপাটের প্রবণতাও বেড়ে যায়। রাস্তাটির কল্যাণ-অকল্যাণকে এমন এক নদীর সাথে তুলনা করা চলে, যা কখনো তার দু'কূলের মাটি ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কখনোও বা দু'ধারে উর্বর পলি মাটি জমিয়ে কৃষকের মুখে নির্মল হাসি ফোটায়। আবার কখনোও একই সময়ে উভয় তৎপরতা অব্যাহত রেখে মানুষকে যুগপৎ হাসায় ও কাঁদায়।

শত শত বছরের যোগাযোগ সুবিধায় পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোতে জনবসতির সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। বিশ্ববিখ্যাত বহু সেনাপতি সে সব পার্বত্য বাসিন্দাদেরকে তাদের বৃহৎ রাজ্যের আওতাভুক্ত করার জন্য বহুবার অভিযান চালিয়েছে বটে; কিন্তু এই পার্বত্য বাসিন্দারা পাহাড়ের মতো দৃঢ়তার সাথে মাথা উঁচু করে তাদের মোকাবেলা করেছে। তবুও পরাজয় মানেনি তারা কোনো মহাশক্তির কাছে।

এই পার্বত্য গোত্রগুলো অন্যসব গোত্রের চেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধবাজ ও বহু বৈশিষ্টের জনক। প্রত্যেক এলাকার জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শাসক। শাসকদের কাউকে খান কাউকে বেগ নামে অভিহিত করা হয়। ছোট এলাকার শাসককে বলা হয় বেগ আর বড় এলাকার শাসককে বলা হয় খান। কোন বহি:শক্তি আক্রমণ করলে বেগ-খান একযোগে সর্বশক্তি দিয়ে তাদের প্রতিহত করে। সমস্যা দূর হয়ে গেলে নিজেরা আবার পরস্পরে যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এ হলো তাদের জীবনাচার। বেগ কখনোও এক খানের সঙ্গে কখনোও অন্য খানের সঙ্গে হাত মিলায়। ছোট খান আজ বড় যে খানের মিত্র, কাল তার প্রতিপক্ষের বন্ধু হয়ে যায়। এভাবেই চলে তাদের দিনকাল।

কাফকাজ আটটি বড় অংশে বিভক্ত। এর একেবারে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগরের সঙ্গে মিলিত এলাকাটির নাম দাগেস্তান। এর সমুদ্রোপকূলীয় পাহাড়গুলো শুষ্ক। তবে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে সবুজ-শ্যামল, সতেজ-মনোরম সব উপত্যকা। পাহাড়গুলো দামি গাছগাছালি এবং ছোট-বড় ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা।

দাগেস্তানে বেশ ক'টি নদী প্রবাহমান। দক্ষিণ-পশ্চিমে চেচনিয়া। এখানে চেচেন গোত্রের বাস। পশ্চিমের গোত্রের নাম কারখালেতিয়া। চেচনিয়ার সমস্ত

পাহাড় সবুজ-শ্যামল এবং বিপুল বনবনানীতে ভরপুর। চেচনিয়ার পশ্চিমে অডলেশিয়ার অবস্থান, যা কোহেকাফের পশ্চিমাঞ্চলের অর্ধেক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। তাতে উসিতু গোত্রের বসবাস। চেচনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অডলেশিয়ার দক্ষিণে এবং কারতালেনিয়ার পশ্চিমে কবারদার অবস্থান। কবারদা এ অঞ্চলের সবচে' বড় গোত্র।

এ এলাকার বেশির ভাগ জমি সমতল। কোহেকাফের হৃদপিণ্ড হল কবারদা। দারুণ উর্বরতা ও ভৌগলিক গুরুত্বের জন্য এর মর্যাদাই আলাদা। কবারদার পশ্চিমে এবং কোহেকাফের একেবারে পশ্চিমাঞ্চলের এলাকাটির নাম সার্কাশিয়া। এর সবটুকু ভূমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঢাকা। কোহেকাফের দক্ষিণাংশে ও কারথালেনিয়ার পশ্চিমে মংগ্রেলিয়া, আমরেতিয়া প্রভৃতি অঞ্চল। একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল– যার অধিকাংশই মরুভূমি– জর্জিয়া নামে খ্যাত।

গ্রীক সালতানাত তার উত্থানের যুগে এই ভূখণ্ডকে কব্জা করার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রীকের সৈন্যরা জর্জিয়া, আমরেতিয়া আর মংগ্রেলিয়া অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়। রোমানরাও এক সময় এই অঞ্চলটি দখলে নেয়ার জন্য সেনা অভিযান চালিয়েছিলো। কিন্তু তারাও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ইরানী রাজ-রাজড়াগণ কোহেস্তানীদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বেশ কয়েকবার অভিযান চালান। কিন্তু তারাও উদ্দেশ্য সাধনে বিফল হন।

এর প্রতিটি অভিযানেই উথাল-পাথাল যা হওয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এলাকাতেই হয়েছে। মূল কোহেকাফের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। কোহেকাফ সম্পর্কে একটি প্রবাদ ছিলো, 'যে রাজার মাথায় ঘিলু নেই, সে-ই কেবল কোহেকাফে আক্রমণ করে'।

যে কেউ এই কোহেকাফে হামলা করেছে, অপমানের গ্লানি মাথায় নিয়ে তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। কোহেস্তানীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এই পাহাড় অজেয়। এর চূড়ায় চূড়ায় দেব-দেবীদের আবাস। এই পাহাড়ের বাসিন্দাদেরকে কেউ কখনো পরাজিত করতে পারে না। প্রসিদ্ধি আছে, 'কোহেস্তানীদের জীবনের একমাত্র ব্রত যুদ্ধ। এসব পাহাড়ে লড়াই চলতে থাকবে, রক্তপাত হতেই থাকবে। কোনোদিন যদি বরফের বুকে ঘাস জন্মায়, সেদিন হয়তো এই লড়াই-রক্তপাত বন্ধ হবে। কিন্তু বরফের বুকে কখনো ঘাসও জন্মাবে না, কোহেস্তানীদের লড়াইও কোনো দিন বন্ধ হবে না।'

কোহেস্তানীদের মধ্যে অঞ্চলভেদে ভাষার ভিন্নতাও লক্ষণীয়। কিন্তু প্রত্যেক ভাষায় রচিত হয়েছে তাদের বীরত্বের লোকগাঁথা আর কাব্য কাহিনীর বিরাট ভাণ্ডার। এর কয়েকটি কাব্যপংক্তি সামান্য পরিবর্তিতরূপে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাভাষি মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়– 'যে লোক মরতে জানে না, সে

লড়তেও জানে না। আর যে লড়তে জানে না, সে বেঁচে থাকতে পারে না। লড়তে জানি বলেই আমরা বেঁচে আছি। আমাদের শিশুরা সর্বপ্রথম যে খেলনা নিয়ে খেলা করে, তা হল খঞ্জর।'

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই সব পাহাড়ে এমন কতিপয় বিজেতার আগমন ঘটে, যাদের সাথে সৈন্য ছিলো না, ছিলো না কোনো তরবারী। তাঁরা ছিলেন আর সব বিজেতাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের হৃদয়ে ছিলো না কোহেস্তানীদের ঐশ্বর্যের প্রতি কোনো লোভ, ছিলো না তাদের পরমাসুন্দরী নারীদের প্রতি মোহ। জমি, জনপদ এবং জনতা দখলের পরিবর্তে তারা জয় করতেন মানুষের মন। সংখ্যায় ছিলেন তারা যৎসামান্য– হাতেগোনা কয়েকজন। ছিলেন তারা আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহান শিক্ষার অলংকারে সজ্জিত সোনার মানুষ।

এ সময়ে ইরান ইসলামী সালতানাতের আওতায় এসে গেছে। মুসলমানরা ইরানের সীমান্ত অতিক্রম করে মধ্য এশিয়ায় পৌছে এখানকার ভূখণ্ডে এমন সব বীজ বপন করে, যা অংকুরিত হয়ে বড় হয় এবং যার ডালে ডালে পরবর্তীতে প্রস্ফুটিত হয় ইবনে মূসা আল খাওয়ারেযমী, আন নাস্‌র আল ফারাবী, 'বু আলী সীনা ও আলবেরুনীর মতো অসংখ্য বিশ্ববিমোহিত ফুল। এই সেই ভূখণ্ড, উত্তরকালে যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলো সমরকন্দ, বোখারা, খেওয়া, খোকন্দ ও তুর্কিস্তানের মতো শক্তিশালী ইসলামী রাজ্য। এক সময় ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও দীন চর্চার কেন্দ্র ছিলো এই জনপদ। এর রয়েছে এক গর্বিত ইতিহাস।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে ইবনে মুসলিম খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে সমগ্র মধ্য এশিয়া জয় করে নেন। তিনি অত্র অঞ্চলসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় কতিপয় আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি সর্বত্র ইসলামের পয়গাম পৌছানোর দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে কোহেকাফের দাগেস্তান অঞ্চলে প্রবেশ করেন। দাগিস্তানের যে অধিবাসীদেরকে কোনো প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাহর দুর্ধর্ষ সৈন্যরাও জয় করতে অক্ষম ছিলো, এই গুটিকতক বুযুর্গ অতি অনায়াসে তাদেরকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসেন। ধীরে ধীরে দাগেস্তানের সব ক'টি গোত্র ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। লক্‌নয, কাজী কুমুখ, আন্‌দী ও দীদুসহ অসংখ্য গোত্র এক এক করে মুসলমান হয়ে যায়। এরপর চেচনিয়ায় ইসলাম বিস্তার পেতে শুরু করে। এক সময়ে সকল চেচেনও মুসলমান হয়ে যায়।

অডলেশিয়ার বেশির ভাগ বসতি ছিলো খৃস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলো রাশিয়ার মতো প্রভাবশালী খৃষ্টান রাজ্য। রুশ শাসকরা ইসলামকে খৃষ্টবাদের জন্য হুমকি সাব্যস্ত করে অত্র অঞ্চলসমূহে একের পর এক

সমস্যা সৃষ্টি করে রাখতো। কিন্তু ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকানো তাদের পক্ষে ছিলো অসম্ভব। কবারোয়া ও সারাকাশয়ার অখৃষ্ট সম্প্রদায়সমূহ ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

ইসলাম এই কোহেস্তানী গোত্রগুলোকে জীবনের এক নতুন তাৎপর্যের সাথে পরিচিত করে। ইসলাম তাদেরকে ব্যক্তি ও গোত্রগত স্বার্থের জন্য লড়তে ও মরতে নিষেধ করে এবং আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার পাঠ শিক্ষা দেয়। তবুও তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল সেই গোত্রীয় বিরোধ সমূলে বিলুপ্ত হলো না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা বদ্ধমূল চরিত্রের কিছুটা তখনও অবশিষ্ট থেকে যায়। সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায় যদিও এক আল্লাহ, এক রাসূল (সা.) ও এক কিতাবের অনুসরণ করতো, তবুও তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে পারলো না। কোহেকাফের বিভিন্ন অবয়বের পর্বত আর তার আলাদা বৈশিষ্ট্য তাদের এই ঐক্যের পথে প্রকৃতিগত অন্তরায় প্রমাণিত হয়।

মুসলমানরা যখন তুর্কী ও ইরানী সেজে পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হলো এবং আলিম-ওলামা দীন ও জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করার পরিবর্তে সম্পদের লোভ ও সম্মানের মোহে বুঁদ হয়ে পড়ে রইলেন, তখন আসমানী রীতি অনুযায়ী ইতিহাস তাদের অকর্মণ্যতা ও কপটতার উপযুক্ত সাজা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

পুনরুত্থানের পর ইউরোপ শিল্প বিপ্লবের সুফলে দিন দিন সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। তীরের স্থান দখল করে বুলেট। তরবারীর মোকাবেলায় আসে তোপ।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব এক করুণ অবস্থায় নিপতিত হয়, শিকারীর কবলে আটকেপড়া বন্য হরিণ যেনো এরা সবাই। চতুর্দিক থেকে রণহুংকার ছেড়ে সাম্রাজ্যবাদী দৈত্য তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়। ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজরা ইসলামী রাজ্যগুলোকে টার্গেটে পরিণত করে নেয়। ইসলামী বিশ্ব নীরবে সেই বৃক্ষের উদাহারণ পেশ করছিলো, যার ডালপালা এক এক করে কাটা হচ্ছে; কিন্তু তার কিছুই বলার নেই।

ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজদের বিজয় ইতিহাস সম্পর্কে পাঠক সমাজ অবগত হলেও রাশিয়া মধ্য এশিয়া এবং কোহেকাফে কী প্রলয় ঘটিয়েছিলো, তার বিস্তারিত বিবরণ অনেকেরই অজানা। আলোচ্য উপাখ্যান সেসব ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত।

দাগেস্তান চেচনিয়া ও কবারদার সাথে সম্পৃক্ত। কাহিনীর গতিময়তা কোহেকাফের আকাশচুম্বী পর্বতমালার মতো উন্নত। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোহেকাফের সমতল ভূমির ন্যায় বিধ্বস্ত-শায়িত।

সুযোগে উত্তম নীতিকথা সকলেই বলে, কিন্তু তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক অল্প লোকেরই হয়। কার্যক্ষেত্রে মাত্র এক টিপু প্রমাণ করেছিলেন, "সিংহের একদিনের জীবন শিয়ালের শত বছরের জীবন অপেক্ষা উত্তম।" মীর

জাফর ও মীর সাদেক চরিত্রের লোকের অভাব হয় না। তারা পরিস্থিতির সঙ্গে কেবল আপোসই করে না, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য দেশ, জাতি, রাষ্ট্রকে বিক্রিও করে দেয়। ইতিহাসের পাতায় ঘৃণার পাত্র ছাড়া এদের ঠাঁই নেই।

মহান লক্ষ্য অর্জনে ত্যাগ স্বীকার করা, প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়া মানব চরিত্রের এমনি এক মহত্ত্ব, যা অল্প লোকেরই ভাগ্যে জুটে। তাই রণক্ষেত্রে সবকিছু বৈধ ভাবার পরিবর্তে উন্নত নীতি আকড়ে থাকাই মহত্ত্বের প্রমাণ। সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর ন্যায় ইমাম শামিলও এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যার নীতিপ্রিয়তা, মহানুভবতা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা তার একান্ত দুশমনও স্বীকার করেছে। কিন্তু এই স্বীকৃতিদানকারী দুশমনদের চরিত্র এমন জঘন্য ছিলো, তারা ইমাম শামিলের মাসুম শিশুকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো। ইমাম তার বাহুবলে, শক্তি প্রয়োগে সে শিশুপুত্রকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ততোক্ষণে শিশুর মা তার কলিজার টুকরোর বিরহ ব্যথায় ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। কয়েক বছর পর যখন পুত্র বাড়িতে ফিরে আসে, তখন এখানকার আবহাওয়া তার সহ্য হলো না। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ইমাম শামিলের পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত। শত্রুপক্ষ তার চিকিৎসায় বাঁধ সাধলো, শর্ত আরোপ করলো। কিন্তু পিতা আপোসহীন। নীতির প্রশ্নে পুত্রের মৃত্যু তার নিকট স্বাভাবিক। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের মোকাবেলায় ব্যক্তি স্বার্থের লক্ষ্যে দুশমনের কোনো শর্ত মেনে নেয়া তার পক্ষে কল্পনাতীত বিষয়।

ইমাম শামিল কোহেস্তানী মানুষ। তারাও কোহেস্তানী, যারা শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের মাতৃভূমি, স্বজাতি ও ভাইদের মোকাবেলায় লড়াই করছে। জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজেদের ঈমান-বিশ্বাস ও বোন-কন্যাদের ইজ্জত দুশমনদের হাতে তুলে দিচ্ছে। কোহেস্তানীদের চরিত্রের এই দু'টি প্রান্তধারা আদিকাল থেকে প্রবাহমান। সকলে একই জনপদের বাসিন্দা, একই আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষ। কিন্তু একজনের স্বভাব ঈগলের মতো বলিয়ান ও আপোসহীন, অপরজনের স্বভাব ধূর্ত শিয়ালের অনুরূপ।

দাগেস্তানসহ আশপাশ এলাকার মানুষ জনবসতিকে 'আওল' বলে। এই আওল তথা জনবসিতগুলো পাহাড়ের ঢালে ঢালে গড়ে ওঠে। প্রথমে ঢালের কিছু অংশকে সমান করে সেখানে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত ছোট ছোট ঘর নির্মাণ করা হয়। প্রথম ঘরটি নির্মাণ করা হয় পাহাড়ের একেবারে পাদদেশে। তারপর তার ছাদ বরাবর জমি সমতল করে দ্বিতীয় ঘরটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, প্রথম ঘরের ছাদ দ্বিতীয় ঘরের আঙিনায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় ঘরের ছাদ তৃতীয় ঘরের বারান্দার কাজ দেয়। এভাবে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রতিটি সারিতে পনের-বিশটি করে ঘর নির্মিত হয়। কোন 'আওল' এ ধরনের ঘরের

নয়টি সারি থাকে, কোথাও উনিশটি, কোথাও বা উনত্রিশটি। দূর থেকে দেখলে এগুলোকে বিশাল সোপান মনে হবে। প্রতি দু'সারির মাঝে এমন কিছু জায়গা ফাঁকা রাখা হয়, যা আওলের গলির কাজ দেয়।

এখানকার যুদ্ধ-বিগ্রহে আওল দুর্ভেদ্য দুর্গের ভূমিকা পালন করে। দুশমন যদি কোনো আওলের উপর হামলা করে, তাহলে আওলের বাসিন্দারা উঁচুতে অবস্থান করার সুবাদে অতি অনায়াসে আক্রমণকারীদের বিপুল ক্ষতিসাধনে সক্ষম হয়। প্রতিটি ঘরের ছাদে প্রচুর পরিমাণ পাথর রাখা থাকে। শত্রু পক্ষ নীচ থেকে উপরে উঠার চেষ্টা করলে হামলাকারীদের জন্য এই পাথর ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। পাথরে কাজ না হলে তখন তেগা আর জুত্তা খঞ্জর ব্যবহৃত হয়।

মুসলিম গোত্রগুলোতে বিবাহ-শাদী ইসলামী তরীকায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু কনের পিতা-মাতার বর হিসেবে বীর ছেলে আবশ্যক। কোন কোহেস্তানী নারী কখনোই এ তিরস্কার বরদাশত করবে না, তার স্বামী কাপুরুষ বা রণাঙ্গনের শাহসাওয়ার নয়। এ জনপদে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করার পূর্বে কনের পিতা-মাতা বর হিসেবে এমন দুরন্ত যুবককে বেছে নিতো, যে অন্তত নয়জন দুশমনের কর্তিত হাত দ্বারা মালা গেঁথে ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে অহংকারে হেলেদুলে কনের বাড়ি আসতো। অন্যথায় বিয়ের পূর্বে বর কনের পিতাকে সামর্থ অনুযায়ী [illegible] বা নয়টি বকরী কিংবা নয়টি ঘোড়া অবশ্যই উপহারস্বরূপ প্রদান করতো।

তাদের জীবন 'নয়' অংকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো। প্রতিটি ঘরে নয় প্রকারের খঞ্জর থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই ব্যক্তিকে সবচে' সম্মানিত মনে করা হতো, যার কাছে প্রত্যেক প্রকারের নয়টি করে খঞ্জর এবং নয়টি ঘোড়া থাকতো। কেউ মারা গেলে নয়দিন শোক পালন করা হতো। লড়াইয়ের ময়দানে কেউ কাপুরুষতা দেখালে কপাল থেকে এই কাপুরুষতার কালিমা দূর করার জন্য তাকে নয়দিন সময় দেয়া হতো। শিশুদের জন্য আবশ্যক ছিলো যেনো তারা নয় বছর বয়সে খঞ্জর চালাবার দক্ষতা অর্জন করে। কোনো কোনো গোত্রে বিয়ের সময় কন্যাদেরকে যৌতুক দেয়ার নিয়ম ছিলো। এই যৌতুকে যা কিছু দেয়া হতো, সংখ্যায় তা নয় হওয়া জরুরি ছিলো। যেমন নয় জোড়া কাপড়, নয় জোড়া পাদুকা, নয় জোড়া অলংকার ইত্যাদি। উনিশ কিংবা উনত্রিশ সংখ্যাকেও তারা সৌভাগ্যের প্রতীক ভাবতো। প্রতি নবম সংখ্যাই ছিলো তাদের বিশ্বাসে সৌভাগ্যের বাহক।

জার রুশ সেনাবাহিনীতে নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিলো আট লাখ। অফিসার তেত্রিশ হাজার। চার লাখ সিপাহী আর সাত হাজার অফিসার ছিলো রিজার্ভ কোর্সে। কেবল যুদ্ধের সঙ্গীন সময়ে রিজার্ভ বাহিনীকে ময়দানে হাজির করা হতো। মোট বাহিনীর দশমাংশ তোপখানায় আর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অগ্রগামী ক্ষুদ্র বাহিনীর দায়িত্ব পালন করত।

এর থেকে আড়াই লাখ রুশ সেনা স্বতন্ত্রভাবে সেসব অঞ্চলে অবস্থান করতো, যেসব জায়গায় কোহেস্তানীরা প্রায়ই আঘাত হানতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশ সেনাবাহিনী কোহেকাফে জোরদার আক্রমণ অভিযান শুরু করে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়ায় রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জর্জিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে তার শাসনভার জার-রুশের মনোনীত প্রতিনিধির হাতে সোপর্দ করা হয়। ১৮০৩ সালে মংগ্রেলিয়া এবং ১৮০৪ সালে আমরেতিয়াও রাশিয়ার দখলে আসে। তারপর অন্যান্য কোহেস্তানী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ রাশিয়ার পদানত হতে থাকে। আমরেতিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আসু ও শামুখ ১৮১০ সালে জার-রাশিয়ার দখলে আসে। তাতারীদের ছোট ছোট স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্র গঞ্জ, নোখা এবং শোশাদও ১৮১০ সালে রাশিয়া দখল করে নেয়।

১৮১৩ সাল নাগাদ শেরওয়ান, দরবন্দ এবং বাকুও রাশিয়ার দখলে এসে পড়ে। ফলে জার রুশ-এর প্রত্যয় জন্মে, এবার ইরান এবং উসমানীয় সালতানাত দখলের আশায় হাত বাড়ানো যায়। কিন্তু দাগেস্তান, চেচনিয়া ও কবারদার কিছু অঞ্চল এখনও স্বায়ত্বশাসিত। এসব এলাকা দখল করার জন্য যেসব বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিলো, তারা চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে গেছে। ফলে রুশ রাজা অত্র অঞ্চলসমূহের অবাধ্য লোকদের শায়েস্তা করার জন্য উগ্র সেনাপতি ইয়ারমুলুককে প্রেরণ করেন। সেনাপতি ইয়ারমুলুক প্রচণ্ড হামলা চালায়। ইয়ারমুলুক কাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে বার মাইল দূরে দাগেস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তমীরখানশোরায় সেনা ছাউনী গড়ে তুলে। সেখান থেকে সে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অভিযানে সেনাদল পাঠাতে থাকে।

১৮২০ সালে সেনাপতি ইয়ারমুলুক জার-নেকুলাইকে লিখে জানায়, দাগেস্তানের যে অভিযান দু'বছর পূর্বে শুরু হয়েছিলো, এখন তা সফল হওয়ার পথে। আমি অধিকাংশ বিদ্রোহীকে এমন চরম শিক্ষা দিয়েছি, তারা নিজেরা কেন তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরও তা ভুলবে না। যদিও এই ভূখণ্ডকে অজেয় মনে করা হতো, কিন্তু এখন তা রাজাধিরাজ জার-রুশের সেবকদের পদতলগত।

সেনাপতি ইয়ারমুলুক দাগেস্তানের কিছু অঞ্চল জয় করেছিলো ঠিক, রাজার নিকট যা সে লিখেছিলো, তার ধারণা মতে তা-ও সঠিক। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। দাগেস্তানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঞ্চল এবং চেচনিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড তখনও স্বাধীন। এসব এলাকার মুসলিম গোত্রগুলো আপন আপন কাজে নিমগ্ন ছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, রুশ সৈন্যরা প্রথমবারের মতো এবারও মার খেয়ে পালিয়ে যাবে। যেখানেই গিয়ে তারা আশ্রয় নিক, ওখানকার বাসিন্দারা তাদের নির্মূল করেই ক্ষান্ত হবে। কিন্তু ঘটেছে তার উল্টো।

ইয়ারমুলুকের তীব্র আক্রমণের সময় কোহেস্তানী শার্দূলরা অবচেতনার নিদ্রা থেকে কেবল জাগতে শুরু করেছে। তখন সময় গড়িয়ে পশ্চিমের আকাশে ঢলে পড়েছে। অথচ দাগেস্তানের আধ্যাত্মবিদ্যার প্রাণকেন্দ্র এরাগলে ধ্যানমগ্ন এক দরবেশ বহু পূর্বেই ভয়ঙ্কর শত্রু থেকে সতর্ক হওয়ার কথা বলেছিলেন। দরবেশের কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। তাঁর দূরদৃষ্টি আগেই প্রত্যক্ষ করেছিলো, প্রবল এক ঝঞ্ঝা সমাগত। এই দরবেশ ছিলেন নক্‌শবন্দী সেলসেলার কামেল ঈমানদার মোল্লা মুহাম্মদ।

এরাগল খানকা ছিলো এক প্রস্রবনধারা। পানি শস্যবীজ ও বন-বনানীকে সিঞ্চিত করে তাতে যেমন সুপুষ্টি ও সতেজতা জোগায়, ঠিক তেমনি এরাগল খানকাহ ছিলো জনমানুষের আত্মশক্তি অর্জনের একমাত্র প্রাণকেন্দ্র। এখানে নিয়মিত আত্মশুদ্ধি অর্জনের তালিম ও তরবিয়ত হতো।

এই খানকাকে ঘিরে আত্মশক্তিসম্পন্ন বহু মানুষ গড়ে উঠেছিলো। এর প্রধান পুরুষকে 'মোল্লা' সম্ভাষণে অভিহিত করা হতো। তার হাতে যারা বায়আত গ্রহণ করতো, তাদের বলা হতো 'মুরীদ'। তার শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে যারা সত্য প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতো, তাদেরকে বলা হত 'ইমাম'। প্রতিরক্ষা তৎপরতাকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল করার জন্য নিরাপদ অঞ্চল ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ছিলো। খান ও বেগ-এর মোকাবেলায় ইমাম এসব কাজে দিক-নির্দেশনা দিতেন। মুজাহিদ এবং সাধারণ জনগণ ইমামের হাতে বায়আত গ্রহণ করতো। সব মুজাহিদ যেহেতু ইমামের মুরীদ হতো, তাই তাদের সৈন্যদেরকে 'মুরীদ বাহিনী' নামে অভিহিত করা হতো। তাই এই জিহাদ আন্দোলনকে অনেকে 'মুরীদ আন্দোলন' নামে অভিহিত করে থাকে।

দুই.

উত্তর দাগেস্তানের পাহাড়-পর্বত ঘন সবুজে ঘেরা। কিছু পাহাড়ের চূড়া বরফে ঢাকা। দেখলে মনে হয় যেনো সবুজ চাদর পরিহিতি বিশাল এক আজব প্রাণী মাথায় সাদা পাগড়ি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলা সূর্যের কিরণমালা পাহাড়ের শীর্ষদেশ স্পর্শ করে প্রতিবিম্বিত হলে শূন্যে বাহারী রঙ ও আলোর মেলা বসে। পাহাড়ের পাদদেশগুলোকে বিশাল-বিস্তৃত ঝোপবিশিষ্ট মহিরুহ ঢেকে রেখেছে। এখানকার উপত্যকা, সমতল ও ঢালু অঞ্চল সবই সবুজ-শ্যামল। একটু পর পর কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। হঠাৎ মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। রোদ-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে দিনের সর্বক্ষণ। এই প্রখর রোদ, এই কালো মেঘের ঘন ছায়া। মেঘের ছায়া বৃক্ষরাজির ছায়াকে ঘোর অন্ধকারে পরিণত করে।

দু'টি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত ছোট্ট আরেকটি পাহাড়। এলাকার মানুষের কাছে তা 'তেলেসমাতি পাহাড়' নামে পরিচিত। পাহাড়টি বায়ু ও মেঘ চলার পথে অবস্থিত বলে এখানে সর্বক্ষণ শো শো শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপর দিয়ে কালো-সাদা-সুরমা বর্ণের মেঘমালা এভাবে অতিক্রম করে, যেনো মত্ত হাতি হেলে-দুলে পথ চলছে।

এই তেলেসমাতি পাহাড়ের ঢালুতে একটি আওল গড়ে ওঠেছে। নাম এরাগল। এখানে বাস করে প্রায় দু'শত পরিবার। পশ্চিম দিকে পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে বিশাল এক চত্বর। চত্বরের এক পার্শ্বে মসজিদ। মসজিদের আঙিনাও বেশ প্রশস্ত। আঙিনার উত্তর-দক্ষিণে একটি হুজরা। মসজিদের চারপার্শ্বে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। উত্তরে বরফাবৃত পর্বতচূড়া। দক্ষিণে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রাকৃতিক সবুজ মখমলের চাদর বিছানো। যেদিকে চোখ পড়ে সবুজ আর সবুজ। গাছগাছালি এতো ঘন আর বিশাল বিশাল যে, মাত্র কয়েক পা দূরে অবস্থিত এরাগলের একটি ঘরও দেখা যায় না।

এক আল্লাহতে বিশ্বাসী লোকদের জন্য এখানকার প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি বৃক্ষ ও তৃণলতা যেনো আল্লাহর পরিচয় লাভের এক একটি বাস্তব উদাহরণ। রিয়াজত, চিল্লাকাশি, মুরাকাবা, একাগ্র ইবাদাত ও ধ্যানমগ্নের জন্য জায়গাটি খুবই যুৎসই। এখানকার মারেফত ও সুলুক সাধকদের কাছে বাতাসের শো শো শব্দও আল্লাহু আল্লাহু যিকির বলে মনে হয়। পাখ-পাখালির কিচিরমিচির শব্দকে তারা মহান আল্লাহর গুণকীর্তন বলে অভিহিত করে। কোন দরবেশ আল্লাহু কিংবা ইল্লাল্লাহু বলে চীৎকার করে ওঠলে তা পাহাড় ও বৃক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত গুঞ্জরিত হতে থাকে।

এরাগলের মসজিদের খতীব এবং মাদ্রাসা- মকতবের মুহতামিম ও মুদার্‌রিস 'শায়খে দাগেস্তান' অভিধায় পরিচিত। এটি সমগ্র দাগেস্তানের আধ্যাত্মবিদ্যার প্রাণকেন্দ্র। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আগত সেসব আল্লাহর অলি এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি রেখে যান, যাঁরা এখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন জনবসতিতে ইসলামের প্রদীপ হাতে আগমন করেছিলেন। তাঁরা মানুষকে দুনিয়া ত্যাগের নয়- বিশ্বকে পদানত করার শিক্ষা দিতেন। এক আল্লাহ, এক রাসূল ও এক কিতাবের কথা বলতেন। জুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করতেন, পরস্পর প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-মমতার দীক্ষা দিতেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলীয়দের জুলুম-নির্যাতন, লুটতরাজ জনগণের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। বাস্তব জীবনে অশান্তি ও অস্থিরতার অনুভূতি তাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি সৃষ্টি হয় প্রবল অসন্তোষ। ফলে দীন-দুনিয়ার মহান শিক্ষাদানে রত ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো কথিত খানকায় পরিণত

হয়ে যায়। বিশ্বজয়ের শিক্ষাদানকারী মহান মনীষীদের উত্তরসূরীরা কেবল আত্মশুদ্ধি আর দুনিয়া বর্জনের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। দাগেস্তানের তাসাওউফ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রটির রঙ-রূপও পাল্টে যায়। এখানেও এমন সব শিক্ষাদান শুরু হয়, কোহেস্তানীদের বাস্তব জীবনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এখানকার অধিবাসীদের জীবন ছিলো কষ্ট-সাধনা, ত্যাগ-তিতীক্ষা আর জীবনপণ লড়াইয়ের অপর নাম। এখানে অকর্মণ্যতা ছিলো মৃত্যুর নামান্তর। এখানে সুলুক ও মারেফতের মনযিল অতিক্রমকারীদের সদা তরবারী হাতে চলতে হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার না কোনো শিষ্য তরীকতের তালীমের উপর আপত্তি তুললো, না কোনো ওস্তাদ তার শিষ্যকে তরীকতের দীক্ষা নিতে বারণ করলো। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এরাগলে দারস-তাদরীসের ব্যবস্থাপনা নক্‌শবন্দী তরীকার জনৈক বুযুর্গের হাতে অর্পিত হয়।

১৮২৬ সালের কথা। দাগেস্তানের কয়েকটি এলাকার খানদের নিকট সংবাদ আসে, শায়খে দাগেস্তান মোল্লা মুহাম্মদ তার পীর-মাশায়েখের আদর্শ বর্জন করেছেন। রিয়াজত-মুজাহাদাকে অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দিয়ে এখন তিনি জিহাদের কথা বলছেন। খানরা শলাপরামর্শ করে তিনজন আলিমের একটি প্রতিনিধি দল এরাগল পাঠিয়ে বিষয়টির বাস্তবতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

আলিম প্রতিনিধি দল মাগরিবের নামাযের সময় এরাগল খানকায় এসে উপস্থিত হন। মোল্লা মুহাম্মদ নিজের লোক মারফত আগেই প্রতিনিধি দলের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মেহমানদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বললেন– 'নামাযের পর আপনারা আমাদের সঙ্গে আহারে অংশ নেবেন। ঈশার নামাযের পর আপনাদের সাথে আমার আলাপ হবে'।

শীতের অন্ধকার রাত। মসজিদের বড় কক্ষে টিমটিম করে তেলের প্রদীপ জ্বলছে। মোল্লা মুহাম্মদ হুজরার এক কোণে বসে আছেন। ডানে- বাঁয়ে তাঁর অসংখ্য কিতাবের বিশাল এক স্তূপ। একটি খুঁটির সঙ্গে ঝুলানো তার আবা। গায়ে মোটা পশমী কম্বল, মাথায় চামড়ার উঁচু টুপি। সামনে অর্ধবৃত্তের মতো উপবিষ্ট প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ। মোল্লা মুহাম্মদ মুখ খুললেন।

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ বন্ধুগণ! এবার বলুন, আপনারা কী উদ্দেশ্যে এসেছেন?

প্রথম আলিম ঃ আমরা শুনেছি, আপনি নাকি পূর্বসূরীদের আদর্শ ত্যাগ করেছেন, কথাটি কি সত্যি?

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ ভুল শুনেছেন, এমন গোস্তাখী আমি কীভাবে করতে পারি?

দ্বিতীয় আলিম ঃ আমরা শুনেছি, আপনি নাকি রিয়াজত-মুজাহাদার বিরোধিতা করেন এবং জিহাদের তাবলীগ করে বেড়ান?

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ এখানে যে যা শিক্ষালাভ করতে আসে, তাকে তা-ই শিক্ষা

দেয়া হয়। কিন্তু বলুন, আমি যদি দেখতে পাই যে, আক্রমণোদ্যত একটি ব্যাঘ্র তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছে আর তোমরা সম্পূর্ণ বেখবর, তবে কি আমি সে ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করবো না?

প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ ঃ (সমস্বরে) অবশ্যই করা দরকার।

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ আমি রিয়াজত-মুজাহাদা, চিল্লাকাশী, মুরাকাবা কোনোটির বিরোধিতা করি না, এ ব্যাপারে কাউকে বাঁধাও আমি দেই না। কিন্তু আমি প্রলয়ংকরী এক দুর্বিপাকের আশংকা প্রত্যক্ষ করছি। আমার মন বলছে, অল্প সময়ের মধ্যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এমনি এক বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা সংঘটিত হতে যাচ্ছে, যার তোড়ে এই জনপদ বিরান হয়ে যাবে। 'লাল শয়তানরা' অগ্নিবর্ষণ করবে, রক্তের সমুদ্র প্রবাহিত হবে।

প্রথম আলিম ঃ পীর ও মুরশিদ! আপনার এতো চিন্তিত হওয়ার কারণ তো আমার বুঝে আসছে না। আমরা তো ইতিমধ্যেই কয়েকটি শয়তানকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। আবার কেউ হামলা করলে তখন তাকেও দেখে নেবো।

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ বন্ধুগণ! আমি যে আশংকার কথা বলছি, তা হবে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক, ব্যাপক ও ভয়াবহ। আপনারা হয়তো তা কল্পনাও করতে পারবেন না। ঝড় আসছে। জর্জিয়ার পর এখন মংগ্রেলিয়া, আমরেতিয়া ও কারথালিয়া অমুসলিমদের দখলে। এবার তারা এদিকে ছুটে আসবে− লাখে লাখে আসবে। এসে আর ফেরত যাবে না।

দ্বিতীয় আলিম ঃ (হেসে) আমরা তাদের গায়ের চামড়া তুলে নেবো। তাদের চামড়া দিয়ে আমরা পায়ের জুতা বানাবো। কেনো, তারা কি মস্কোর শয়তানের পরিণতির কথা ভুলে গেছে? শাহজাদা বেকুচভের কথা কি তারা ভুলে গেছে, যার গায়ের চামড়া দিয়ে আমরা ঢোল বানিয়েছিলাম? সেই ঢোল এখনও তো গমরীতে মওজুদ আছে।

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ বন্ধুগণ! সময়ের ধারা দিন দিন বদলে যাচ্ছে। কালের গতি এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করছে। অমুসলিম রাজার বক্তব্য, শিগগিরই পারস্য (ইরান) ও ওসমানিয়া সালতানাতে ক্রুসেডের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। হেলালের নাম-নিশানা সব মুছে যাবে। রুশ খৃষ্টান রাজার ধারণা, সমগ্র কাফকাজ ও মধ্য এশিয়া দখলে না আনা পর্যন্ত পারস্য ও ওসমানিয়া সালতানাতকে পদানত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপাতত সর্বশক্তি সে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যয় করবে। তারপর খোকন্দ, খেওয়া ও বোখারার প্রতি মনোনিবেশ করবে। তারপর সমরকন্দ ও তাশকন্দ এতীম হয়ে যাবে। তুর্কিস্তান পদদলিত হবে। সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে।

তৃতীয় আলিম ঃ আমরা যথাসময়ে তার বিহিত করব। আপনি যা বলছেন,

পূর্বে কোনো বুযুর্গ এমনটি বলেননি। দাগেস্তানের অরবারী কোথাও হয়ে যায়নি। দাগশাহর বিভীষিকাময় কার্যকারিতা একবিন্দুও হ্রাস পায়নি।

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ বন্ধুগণ! আমার বক্তব্য হয়তো আপনাদের বুঝে আসবে না। এ কারণে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আমি যুবকদের সাথে মতবিনিময় করছি। আমি চাই অসংখ্য তাজা যুবকপ্রাণ, টগবগে ঈমানদীপ্ত নওজোয়ান। আপনাদের মতো পরিণত লোকেরা আজীবন এ কথাই বলবে যে, 'এখন ভাববার প্রয়োজন নেই, সময় আসলে তখন দেখবো'। আমি মনে করি, সম্ভাব্য লড়াইয়ে সমগ্র দাগেস্তান বরং কাফকাজকেও ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই কেবল এ সংঘাতে আমাদের বিজয়ী করবে। প্রত্যেক গোত্র আপন আপন ধারায় স্বতন্ত্রভাবে মোকাবেলায় আসলে একে একে সকলেই শেষ হয়ে যাবে।

প্রথম আলিম ঃ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, আমাদের খানরা কোনো একজনকে নিজেদের রাজা নিযুক্ত করে নেবে এবং সকলে এক বাক্যে তার আদেশ-নিষেধ পালন করবে, তা অসম্ভব। এমনটি অতীতেও কখনোও ঘটেনি, ভবিষ্যতেও ঘটার সম্ভাবনা দেখছি না।

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ আপনারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন এবং সচেতন হোন। আমরা সকলেই যখন মুসলমান, সবাই যখন এক আল্লাহতে বিশ্বাসী, তখন আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা কোথায়?

দ্বিতীয় আলিম ঃ আমাদের উদ্দেশ্য তো জিহাদ। জিহাদ ফরজ। তাই কোহেস্তানীদের কারুরই জিহাদ করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এর জন্য এমন ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সকলে একজনের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার প্রশ্ন আবশ্যকতা দেখছি না।

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ ঐক্যের শক্তি অকল্পনীয়। দেখুন, দু'টি এক সংখ্যাকে আলাদাভাবে রাখা হলে তার মান আর কতো হয়? কিন্তু এ দু'টি এক সংখ্যাকে একত্রে পাশাপাশি লিখলে তা হয় এগার। এ হলো ঐক্যের শক্তি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর রশি আঁকড়ে ধরার জন্য আদেশ করেছেন। আপনারা আপনাদের খানদেরকে গিয়ে বলুন, আমি তাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলছি না। আমি শুধু এ কথা বুঝাতে চাই যে, আমি যে শত্রুর আশংকা করছি, তারা তাদেরকে পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত করাবে। এক মাযহাবের অনুসারীদেরকে অপর মাযহাবীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। অবশেষে তারা সকলকে ধ্বংস করবে। সর্বত্র মুসলমানদের সাথে এই আচরণই চলছে।

প্রথম আলিম ঃ পীর ও মুরশিদ! আমরা খানদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করবো। মানা না মানা তাদের ব্যাপার। তাদেরকে আমরা একথা পরিষ্কার করে বলে দেবো, আপনি তরীকতের বিরোধী নন। তাদেরকে আমরা জিহাদের কথাও বলবো। কিন্তু

কোনো খানকে এ কথা বলতে পারবো না যে, তোমরা সকলে একজনের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে কাজ করো। ভালো হবে, যদি আপনিও এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ না করেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে দুর্নাম রটানো শুরু হয়ে যাবে।

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ আমার আমল আমার সঙ্গে যাবে আর আপনাদের আমল আপনাদের সঙ্গে। জনসাধারণের দিক-নির্দেশনা করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আমি মনে করি, ঐক্য এ সময়ের সবচে' বড় প্রয়োজন। জিহাদ শুধু সম্মানজনক জীবনের রাজপথই নয়– আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমও বটে। সত্যের পথে আমি দুর্নাম-সুনামের তোয়াক্কা করি না।

মোল্লা মুহাম্মদ ও প্রতিনিধি দলের মধ্যকার কথোপকথনের সমাপ্তি ঘটে। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ রাত যাপনের পর বিদায় নেন। মোল্লা মুহাম্মদ তার নায়েব মোল্লা সাদেককে বললেন– 'জরুরী এক কাজে আমি গমরী যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে এখানকার দারস-তাদরীসের দায়িত্ব তোমার।'

মোল্লা মুহাম্মদ গমরীর উদ্দেশ্যে রওনা হন।

শায়খে দাগেস্তান মোল্লা মুহাম্মদ তৃতীয় দিন দ্বি-প্রহরের খানিক পূর্বে গমরীর নিকটে পৌঁছে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পান। দু'অশ্বারোহী তরবারী উঁচু করে পরস্পর লড়াই করছে। মোল্লা মুহাম্মদ প্রথমে তাদেরকে লড়াই বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাইলেন। পরে কী যেনো ভেবে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে লড়াই দেখতে শুরু করেন।

'সংবরণ কর যুবক।'

যুবক আত্মসংবরণ করতে মুহূর্ত বিলম্ব করে। 'সংবরণ কর যুবক' বলে আওয়াজ দানকারী বুযুর্গের তরবারী বিদ্যুদ্বেগে যুবকের স্কন্ধের কাছে পৌঁছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ঝুঁকে যুবক আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। সাথে সাথে বুযুর্গের অপর হাতের খঞ্জর যুবকের হৃদপিন্ডের কাছে দু'পাজরের মধ্যবর্তী স্থানে আঘাত হেনে রক্তের রেখা টেনে দেয়। বুযুর্গ ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু বুঝলে শামিল?'

বাবা! কোনো দুশমনের খঞ্জর এতো সদয় হবে না যে, আমার হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে থেমে আমাকে সাবধান করবে। বাস্তবিক এখনও আমাকে অভিজ্ঞ বলা যায় না। রণকৌশল শেখার এখনো আমার অনেক কিছু বাকি।

ইত্যবসরে মোল্লা মুহাম্মদ এগিয়ে এসে বললেন– 'পুত্রের বেশ ভালোই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে বুঝি! কিন্তু ভাই দেঙ্গো! এমনটি বুঝ না যে, শামিল তোমার খঞ্জরের আয়ত্বে ছিলো। তোমার স্থলে যদি অন্য কেউ হতো, তাহলে তোমার তরবারীর আঘাতের আগেই তার বাম হস্ত অঘটন ঘটিয়ে ফেলতো। অন্তত এতোটুকু দক্ষতা শামিলের হয়েছে।

দেঙ্গো পেছনে ফিরে অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠলেন, একি, আমি কী দেখছি! পীর ও মুরশিদ, আপনি! শায়খে দাগেস্তান এখানে? এরাগলের মুরশিদ এই গভীর অরণ্যে?

এ কথা বলে সামনে অগ্রসর হয়ে আবেগাপ্লুত হৃদয়ে দেঙ্গো মোল্লা মুহাম্মদের হাতে চুমু খান। পরে শামিলকে উদ্দেশ করে বললেন, বৎস! ইনি আমাদের আধ্যাত্মিক প্রাণপুরুষ, শায়খে দাগেস্তান মোল্লা মুহাম্মদ। হযরতকে সম্মান করো।

শামিল মোল্লা মুহাম্মদকে সম্মান প্রদর্শন করে। মোল্লা মুহাম্মদ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং কপালে স্নেহের চুমু এঁকে দেন। তারপর শামিলের পিতাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমার আগমনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমি তোমার পুত্রকে দেখতে এসেছিলাম। শিগগিরই তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। তবে এ আমার আদেশ নয়– হৃদয়ের আকাঙ্খা।'

ঃ পীর ও মুরশিদ! গরীবালয়ে চলুন। আপনার আতিথেয়তার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হতে চাই। আমার পরম সৌভাগ্য, এ মাটিতে আপনার পদধূলি পড়েছে। তাছাড়া আগামীকাল এলাকার যুবকরা ঘোড়দৌড় ও নিশানাবাজির প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। আপনার উপস্থিতিতে তারা প্রবল উৎসাহ পাবে।

ঃ ভাই! হাতে আমার প্রচুর কাজ। তোমার পুত্রকে দেখার জন্য এসেছিলাম। আবার আসব। আগামীকালের প্রতিযোগিতায় শামিল-ই জয়লাভ করবে। এবার যাচ্ছি। আস্‌সালামু আলাইকুম।

পিতা-পুত্র মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মোল্লা মুহাম্মদ ঘন বৃক্ষরাজির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যান।

দক্ষিণ দাগেস্তানের উঁচু এক পাহাড়ের ঢালুতে একটি আওলের অবস্থান। নাম তার গমরী। উঁচু পাহাড়টি অর্ধ-বৃত্তাকারে বস্তির পশ্চিমে সুউচ্চ শক্ত দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উত্তর ও দক্ষিণে আছে দীর্ঘ ও গভীর গিরিপথ। এলাকার মানুষের কাছে তা 'অন্ধগলি' নামে পরিচিত। গমরীর বাসিন্দারা তাকে 'অপয়া গলি' বলে। বর্ষাকালে এই গিরিপথ স্রোতস্বিনী নদীর রূপ ধারণ করে। ভারী-পাথরও যদি তাতে পতিত হয়, স্রোত তাকে খড়ের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কোনো মানুষ বা জীবজন্তু তাতে নিক্ষিপ্ত হলে জীবন্ত উঠে আসা তার পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার। গমরীর মহিলারা কাউকে অভিশাপ দিলে শুধু এতোটুকুই বলে, 'তুই অন্ধ গলিতে গিয়ে মর'।

গমরীতে যাওয়ার পথ মাত্র একটি। পূর্বদিকে বস্তিমুখী ছোট্ট একটি সরুপথ। বস্তির একেবারে শেষপ্রান্তে সর্বশেষ গৃহটির খানিক দূরে দু' অন্ধকার গলির মাঝে ছয় ফিট উঁচু একটি প্রাচীর। প্রাচীরের এক স্থানে ছোট্ট একটি দরজা। দরজাটা বন্ধ করে দিলে এই আওল এক নিরাপদ দুর্গের রূপ ধারণ করে।

বস্তির সরদার এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ একটি চবুতরায় উপবিষ্ট। গমরীর যুবকরা ঘোড়দৌড় ও নিশানাবাজির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। সাদা একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার এক নওজোয়ান। তীরবেগে ছুটে আসছে ঘোড়াটি। প্রাচীরের নিকট এসে ঘোড়াটি এতোটুকু ঝুঁকেছে, যাতে আরোহীর পা মাটি স্পর্শ করে। আবার বিদ্যুতের মতো এক লাফে প্রাচীর অতিক্রম করছে। উৎসুক জনতা অপলক নেত্রে ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের কৌশল উপভোগ করছে। বস্তির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এ ঘটনা দেখে নিজেদের অজান্তে ঔৎসুক্যে দাঁড়িয়ে যায়।

কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া আবার পেছনে ফেরে। পুনরায় প্রাচীর অতিক্রম করে। আরোহী ঘোড়ার লাফের সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠে যায়। পিস্তল নিয়ে ঘোড়াকে নিশানা বানায়। নিশানা অব্যর্থ প্রমাণিত হয়। সওয়ার ঘোড়ার গতি হ্রাস করে না। হাতের খঞ্জর নীচে ফেলে দেয়। আবার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে নীচে এসে খঞ্জর তুলে নিয়ে চোখের পলকে বিদ্যুদ্বেগে চলন্ত ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে থাকে সে। কয়েক মুহূর্ত পর ঘোড়ার মুখ প্রাচীরের দিকে ফিরিয়ে দেয়। ঘোড়ার গতি হ্রাস করে প্রাচীরের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নীচে নামে এবং এক লাফে প্রাচীর টপকে ওপারে চলে যায়। আবার আসে আবার যায়।

গমরীর সরদার আনন্দের আতিশয্যে যুবককে বুকে চেপে ধরে বলেন– 'শাবাশ শামিল! শাবাশ! তুমি যথার্থ শাহসওয়ার, তোমার নিশানা অব্যর্থ। তুমি শার্দূল। ছোটবেলায় তোমার মতো এমনি আর এক সুদক্ষ অশ্বারোহীকে আমি দেখেছিলাম। তবে সে ছিলো ডাকাত।

এই প্রতিযোগিতায় শামিল প্রথম এবং গাজী মুহাম্মদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তারা দু'জন স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক বিদ্যা অর্জন করে হাদীস-ফেকাহর উচ্চতর সিলেবাসও সমাপ্ত করেছে। অশ্বচালনা এবং নিশানাবাজিতেও তারা দক্ষ। এবার তাদের সামনে দু'টো পথ। এরাগল খানকায় গিয়ে শায়খে মাশায়েখ মোল্লা মুহাম্মদের কাছে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষাগ্রহণ করা কিংবা শত্রুর মোকাবেলায় লড়াই করে 'বীর' উপাধি লাভ করে বিশেষ সম্মানীয় স্থান দখল করা– বয়ঃপ্রাপ্তির সনদ গ্রহণ করা।

গমরীর নিয়ম ছিলো, দুশমনের মোকাবেলায় লড়াই করে নওজোয়ানরা বীরত্বের পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকে নাবালেগ মনে করা হতো। বালেগের কাতারে শামিল হওয়ার আশায় দুশমনের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে অনেক নওজোয়ান প্রাণও হারাতো। কিন্তু সে মৃত্যুকে মনে করা হতো সম্মানের মৃত্যু। 'ইজ্জতের জীবন কিংবা ইজ্জতের মৃত্যু'র বিকল্প তাদের কাছে ছিলো না।

এরাগল খানকা থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের জন্য শত্রুর মোকাবেলা করা

জরুরি নয়। তাদেরকে বলা হয় 'আলিম'। এই ভূখণ্ডে আলিম আর বীরযোদ্ধাকে আইনত সমান মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু কার্যত বীর যোদ্ধার মর্যাদাই বেশি। শান্ত পরিস্থিতিতে বীর যোদ্ধারাও আলিমদের কাছে এসে মাথা নত করে। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোল বেজে ওঠলে মহিলাদেরও তরবারী হাতে লাব্বাইক বলতে হয়। যে আলিম রণাঙ্গনে বীর যোদ্ধাদের সহযোদ্ধা হতে না পারে, তাকে মর্যাদার আসন থেকে ছিটকে পড়তে হয়। পক্ষান্তরে সম্মুখ সমরে লড়াই করে বীরত্বের পরিচয় দিতে পারলে একজন আলিমের মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যায়।

শামিল ও গাজী মুহাম্মদের পিতাদের কামনা, তারা এরাগল খানকায় বিদ্যা অর্জন করবে। কিন্তু শামিলের ইচ্ছা, আগে সে বাহাদুর হবে, পরে আলিম হবে।

গাজী মুহাম্মদ ও শামিলের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব। গাজী মুহাম্মদের একান্ত কামনা, সে কুরআন-হাদীসে পারদর্শী অভিজ্ঞ আলিম হবে। শামিলকেও সে নিজের সঙ্গে এরাগলে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু শামিল যেতে প্রস্তুত নয়। গাজী মুহাম্মদ শামিলকে বুঝায়– 'দোস্ত! লড়াই করার জন্য সামনে বহু সময় পড়ে আছে। কিন্তু বিদ্যার্জন করে আলিম হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। তাছাড়া এখনো লড়াইয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। মনে হয় আমার সঙ্গে না যাওয়ায় তোমার একটিই কারণ, তুমি ফাতেমাকে ছেড়ে যেতে চাও না। কিন্তু তোমার জানা থাকবে হয়তো, ফাতেমার বংশ আলিমদেরকেই বেশি কদর করে।'

শামিল শুধায়– 'ফাতেমাকে আমি সীমাহীন ভালোবাসি কথাটা আমি কখনো লুকাবার চেষ্টা করিনি। তবে এজন্যই এরাগল যেতে আমার মন চায় না বলেই যাচ্ছি না। অন্য কোনো কারণ নেই। বিলম্ব না করে তুমি চলে যাও। আমি অতি শিগগিরই তোমার সঙ্গে মিলিত হবো।'

গাজী মুহাম্মদ এরাগলে গিয়ে মোল্লা মুহাম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। মোল্লা মুহাম্মদ তাঁর এই নতুন শিষ্যকে জিহাদের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বুঝান আর অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন শামিল কবে আসবে।

তিন.

১৮২৭ সালের বসন্ত শুরু হওয়ামাত্র রাশিয়ার নতুন অধিকৃত অঞ্চল জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসে হঠাৎ পরিবর্তন দেখা দেয়। সরকারি আমলা-কর্মচারিদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। রাজপ্রাসাদসমূহে সাজ-সজ্জার ধুম পড়ে যায়। রাস্তাঘাট মেরামতের কাজ আরম্ভ হয়। গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী, মনোলোভা ফুল ও রেশমী বস্ত্রের অনুসন্ধান চলতে থাকে দিকে দিকে। কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র শহর বাসর-শয্যার ন্যায় সজ্জিত হয়ে যায়। তিবলিস থেকে সেন্টপিটার্সগামী রাজপথে কয়েক মাইল পর্যন্ত অভ্যর্থনামঞ্চ তৈরি হয়। রাজপ্রাসাদ অভিমুখী

সড়কের উভয় পার্শ্বের বাড়ি-ঘরের প্রাচীরে অসংখ্য রেশমি চাদর ঝুলান হয়।

রুশ অধিবাসীদের প্রভু, রাজাধিরাজ, গির্জার পৃষ্ঠপোষক, প্রথম জার রুশ নেকুলাই'র আগমন উপলক্ষে এই আয়োজন। শাহী আমীর-ওমরার খাদেমদের কর্মতৎপরতার অন্ত নেই। উর্ধ্বতন অফিসার-কর্মকর্তাদের বেগমরা নিজ নিজ উন্নত থেকে উন্নততর শাড়ি, গয়না-অলংকার পরিধান করে রূপের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে।

কর্মচঞ্চল ও উদ্যমী সেনাবাহিনী শহরের বাইরের রাজপথে প্রস্তুতি নিয়ে দন্ডায়মান। সেনা অফিসার চোখে দূরবীন দিয়ে বসে আছে। অপেক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সময় যেনো নিশ্চল-থেমে আছে। ঘড়ির কাটা যেনো এক সেকেন্ডও সামনে অগ্রসর হচ্ছে না।

হঠাৎ খানিক দূরে সেনা চৌকিতে স্থাপিত তোপ গর্জে ওঠে। এটি রাজাধিরাজ জার নেকুলাই'র আগমনী ঘোষণা। সড়কের উভয় পার্শ্বে তিন তিন গজ ব্যবধানে সশস্ত্র সৈন্য দন্ডায়মান। তাদের পিছনে করজোড় দাঁড়িয়ে আছে জার নেকুলাই'র দাসানুদাস হাজার হাজার সেবক-জনতা। শাহী সাওয়ারী তিবলিসের নিকটে এসে উপনীত। সেনাব্যান্ড দল স্বাগত ধ্বনি তুলছে। জার নেকুলাই রাজকীয় বাহনে উপবিষ্ট। সম-আকৃতির কৃষ্ণবর্ণের ছয়টি সুদর্শন ঘোড়া বাহনটি টেনে নিয়ে আসছে। ঘোড়সওয়ার রক্ষীবাহিনীর নয়জন সিপাহী রাজকীয় বাহনটির ডান-বাম ও অগ্র-পশ্চাত সর্বদিক বেষ্টন করে রেখেছে।

জার নেকুলাই নিজ আসনে একটি পুটুলির মতো বসে আছেন। গায়ের মোটা পশমী কোট তাকে আকর্ণ ঢেকে রেখেছে। মাথায় পরিহিত মোটা টুপিতে ঢাকা পড়ে আছে শাহেনশাহ'র প্রশস্ত কপাল।

প্রকৃতি শাসক ও শাসিতের মাঝে কোনো তারতম্য করে না। প্রচন্ড হীমশীতল বাতাসের ঝাপটায় জার নেকুলাইর নাসিকা, কর্ণ ও গন্ডদেশ নীলবর্ণ ধারণ করেছে। তার মোটা নাসিকা শৈত্যযন্ত্রণায় আরোও মোটা হয়ে গেছে। আখিযুগল বেয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে। পথে কয়েক স্থানে বিশ্রাম নিলেও শাহেনশাহ'র সফরের ক্লান্তি দূর হয়নি। অতিসত্বর রাজমহলে পৌঁছে তিনি আরাম করবেন। কোচওয়ানকে আদেশ দেন, যেনো শাহী মহল পর্যন্ত পৌঁছুতে অশ্বের গতি হ্রাস না করে।

রাজকীয় বাহন শহরে প্রবেশ করে। কপালে হাত ঠেকিয়ে সৈন্যরা রাজাকে কুর্নিশ জানায়। পেছনে দন্ডায়মান হাজার হাজার সেবক-জনতা শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে। সকলের দৃষ্টি রাজকীয় বাহনের প্রতি নিবদ্ধ। কিন্তু না জারের মুখমন্ডল দেখতে পাওয়া যায়, না হাত নেড়ে তিনি দর্শনাকাংখীদের আবেগের জবাব দেন। সম্পূর্ণ নীরব-নিশ্চল বসে আছেন তিনি। কানে বাজছে শুধু অগ্রসরমান অশ্বখুরের কর্কশ ধ্বনি। তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে রাজবাহন।

রক্ষী বাহিনীর পিছনে আরও চারটি বাহন এগিয়ে চলছে। শাহেনশাহ'র ব্যক্তিগত আমলা-কর্মচারি ও বিশ্বস্ত ভৃত্য তার আরোহী। শাহী মহলের সদর দরজা থেকে শাহেনশাহ'র বিশ্রামাগার পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের সামরিক অফিসার, বিজিত প্রজাতন্ত্রসমূহের রাজপুত্র-রাজকন্যা ও অফিসারদের স্ত্রীগণ মর্যাদাভেদে সারিবদ্ধ দন্ডায়মান। রাজকন্যা ও অফিসার ললনাদের সাজসজ্জা, গয়না-অলংকারে সবাই মুগ্ধ-বিমোহিত।

রাজবাহন শাহী মহলের প্রধান ফটকের কাছে এসে থেমে যায়। জার নেকুলাই কোচওয়ানকে ইংগিতে কী যেনো আদেশ করেন। কোচওয়ান বিশেষ পদ্ধতিতে ঘোড়ার বাগ নাড়া দেয়। প্রশিক্ষিত ঘোড়া সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করে।

রাজবাহন শাহী বিশ্রামাগারের দরজার সামনে এসে থেমে যায়। জর্জিয়ার গভর্নর ও দক্ষিণাঞ্চলের সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ জেনারেল ইয়ারমুলুক দৌড়ে এসে হাত বাড়িয়ে দেন। শাহেনশাহ তার হাত চেপে ধরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। কোচওয়ান দৌড়ে এসে শাহেনশাহ'র অপর হাত আকড়ে ধরে। জার নেকুলাই অফিসার, শাহজাদা, শাহজাদী ও বেগমদের প্রতি খানিকটা আড় চোখে দৃষ্টিপাত করে বললেন- 'আমার বিশ্রাম করতে হবে। কিছু লোকের সঙ্গে আমার আগামীকাল সাক্ষাৎ হবে। বাকিদের সঙ্গে তার পরে।'

শাহেনশাহ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করেন। অফিসার, শাহজাদা, শাহজাদী ও বেগমগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকেন। শাহেনশাহ সাধারণত এমন আচরণ করেন না। সকলেই হতবাক্। কিন্তু কেউ কাউকে কিছুই বলছে না। সুসজ্জিত স্ত্রীগণ ভগ্নহৃদয়ে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করেন।

পরদিন বিশেষ শাহী এজলাস বসে। দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার জেনারেল ইয়ারমুলুক, নায়েব কমান্ডার কাউন্ট পচকিভচ, অপরাপর সেনা অফিসার, সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তা আলেকজান্ডার, কাফকাজের কয়েকজন অনুগত খান, শাহেনশাহ'র দরবারি ঐতিহাসিক করেন্সকী ও ব্যক্তিগত আমলাগণ এজলাসে উপস্থিত।

জার নেকুলাই উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন- 'নাচ-গান ও সুন্দরী নারীর নৃত্য দেখে মন ভোলানোর জন্য আমি এতোদূরে এখানে আসিনি। রাজধানীতে বসেও আমি হুকুম জারি করতে পারতাম। কয়েকটি বিষয় সরেজমিন প্রত্যক্ষ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমার এই আগমন।'

'ইংরেজরা ভারতবর্ষের বিপুল এলাকা দখল করে নিয়েছে। পর্তুগালের বিজয়াভিযানও অব্যাহত রয়েছে। ফরাসী সৈন্যরা অবিরাম সামনে এগিয়ে চলছে। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনী সুদীর্ঘ বিশ বছরেও উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য অর্জন

করতে সক্ষম হয়নি। জর্জিয়া, আজারবাইজান ও মংগ্রেলিয়া আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর আমাদের সৈন্যরা এই ভেবে বসে আছে যে, তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। কাফকাজের যে গোত্রগুলোকে শায়েস্তা করা হয়েছিলো, তারা আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠেছে। ইতিমধ্যে দাগেস্তানের সব খবরাখবর আমি পেয়েছি। সকলের মুখেই এক কথা, অঞ্চলটি দুর্গম পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল ও অসংখ্য নদী-সাগরে ঘেরা। কিন্তু আমার বোধগম্য হচ্ছে না, কয়েকটি অনভিজ্ঞ অসংগঠিত জংলী গোত্র আমাদের সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ সেনাবাহিনীর পথ কীভাবে আটকে রাখলো? এ মুহূর্তে আমি স্পষ্ট ঘোষণা করছি, অনতিবিলম্বে কাফকাজ, খোকন্দ, খেওয়া ও বোখারা জয় করতেই হবে। এসব অঞ্চল দখল করে আমাদের আরও সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমার জীবদ্দশায়ই আমি পারস্য ও ওসমানিয়া সালতানাতে পবিত্র ক্রুসের ঝাণ্ডা উড্ডীন দেখে যেতে চাই। এসব লক্ষ্য অর্জনে কী কী সমস্যা আছে, আপনারা স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করুন। পরে কারো কোনো অজুহাত আমি শুনবো না, কিছুতেই মানবো না। কারো কাছে কোনো প্রস্তাব থাকলে এ মুহূর্তে তা পেশ করুন।'

কাউন্ট পচকিন্ড : মহামান্য রাজাধিরাজ! আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, কাফকাজের বিদ্রোহী সম্প্রদায় নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যদের ন্যায় ময়দানে এসে সম্মুখ-সমরে লড়াই করে না। তারা লুকিয়ে অজ্ঞাত স্থান থেকে অতর্কিতে হামলা চালায় এবং রাজসৈন্যদের বিপুল ক্ষতিসাধান করে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘন বন, পাহাড়ি গুহা এবং নদীনালার বাঁক ও চড়া তাদের আশ্রয়স্থল। তাদের শায়েস্তা করতে দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। আমার ধারণা, বিজিত কোহেস্তানী অঞ্চলসমূহে স্থানে স্থানে সেনা চৌকি স্থাপন করা আবশ্যক, যাতে পুনরায় কেউ বিদ্রোহ করার সাহস না পায়।

জার নেকুলাই : আপনার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত। শীঘ্র আমি অতিরিক্ত সেনাভর্তির আদেশ দিচ্ছি।

কমান্ডার ইয়ারমুলুক : শাহানশাহ'র দরবারে আমি এই আরজি পেশ করা জরুরী মনে করছি যে, দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীতে অধিক অস্ত্র সরবরাহ করাও একান্ত প্রয়োজন। দুশমনের পাহাড়ি আশ্রয়স্থল ধ্বংস করতে কয়েকগুণ অস্ত্র ব্যবহৃত হবে।

জার নেকুলাই : 'ইয়ারমুলুক! কথাটা বলতে তোমার এতোটুকু লজ্জাও করলো না? দু'বছর পর্যন্ত আমি তোমাকে বরদাশত করেছি। তোমাকে আমি সাফল্যজনক কিছু একটা করে দেখাবার সুযোগ দিয়েছিলাম। তোমরা অতিশীঘ্র কাফকাজ, খেওয়া ও বোখারা জয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। তোমাদের সব দাবি-দাওয়া আমি পূরণ করেছি। কিন্তু দু'বছর আগে তোমরা যে অবস্থানে ছিলে, এখন তা থেকেও পিছিয়ে

গেছো। এ তোমার ব্যর্থতা। এ মুহূর্তে আমি তোমাকে বরখাস্ত করলাম।'

শাহেনশাহ নিজ আসন থেকে উঠে এসে ইয়ারমুলুক-এর উর্দি থেকে সামরিক প্রতীক তুলে নেন। ইয়ারমুলুক- এর লজ্জিত মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আসন থেকে উঠে সে কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়।

জার নেকুলাই আসনে বসে পুনরায় বক্তব্য শুরু করেন– 'কাউন্ট পচকিভচ! আজ থেকে– এই মুহূর্ত থেকে তুমি দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ-এর দায়িত্ব পালন করবে।' শাহেনশাহ একটু থেমে বললেন– 'আমি বিশ্বাস করি, ওই ব্যর্থ সেনাপতি ইয়ারমুলুক-এর প্রস্তাব সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। কিন্তু এই প্রস্তাব তার আরও আগেই পেশ করা প্রয়োজন ছিলো। তার প্রস্তাব অনুযায়ী অস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধির আদেশও আমি অতি শীঘ্র জারি করবো।'

কাউন্ট পচকিভচ ঃ (দাঁড়িয়ে) শাহেনশাহ'র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষ করা অধমের পক্ষে সম্ভব নয়। শাহেনশাহ'র দরবারে এ মুহূর্তে আমি অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি, জানবাজি রেখে শাহেনশাহ'র আদেশ পালনে অধম বিন্দুমাত্র কসুর করবে না।

আলেকজাণ্ডার ঃ অধমের এক ভ্রাতা শাহেনশাহ'র অনুগ্রহে লন্ডনের রুশ দূতাবাসে কর্মরত। তার কয়েকটি পত্র মারফত জানতে পারলাম, ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশে যে সাফল্য লাভ করেছিলো, তা ওইসব ভারতীয়দের মাধ্যমেই হয়েছিলো, যাদেরকে ইংরেজরা বশে আনতে সক্ষম হয়েছিলো। শাহেনশাহ নিশ্চয় অবগত আছেন, 'কাঠ যতোক্ষণ না কুঠারের হাতলে পরিণত হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত তা গাছ কাটতে সক্ষম হয় না।' কাফকাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভুখা-নাঙ্গা-অনাথ কোহেস্তানীকে অর্থকড়ি ও সোনা-দানা দিয়ে বশে আনা সম্ভব। আমার অধীন কতিপয় কর্মকর্তা কাফকাজ ভ্রমণ করে এ ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। দাগেস্তান ও চেচনিয়ার মুসলিম গোত্রগুলোর পক্ষ থেকে সংঘাতের আশংকাই বেশি। এর কতিপয় গোত্র সুন্নী, কতিপয় শীয়া। তাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধ থেকে সুযোগ নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ কাজ আমাদের সরাসরি নয়– কৌশলে সম্পাদন করতে হবে। মুসলমানদের আকীদাগত বিরোধকে চাঙ্গা করার জন্য উভয় ফেরকার কিছু লোককে আমাদের দলে ভেড়াতে হবে। সব সময় তাদের সন্তুষ্ট রেখে ইচ্ছামাফিক ব্যবহার করতে হবে। শাহেনশাহ এ কাজের জন্য অর্থ মঞ্জুরী দিলে দ্রুত কাজ শুরু করা যেতে পারে।

জার নেকুলাই ঃ বেশ যুক্তিসংগত প্রস্তাব। আফসোস, আমাদের পূর্বসূরি রাজা-বাদশাহগণ এ বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দেননি। তুমি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলো। আমি প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করছি।

করেঙ্গকী ঃ যৌবনের প্রথম দিকে আমি মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করে সেখানকার

অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। কাফকাজ সম্পর্কে বহু পুস্তক অধ্যয়ন করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমি মনে করি, মাযহাবগত বিরোধের সাথে সাথে তাদের গোত্র ও আঞ্চলিক বিরোধও উস্কে দেয়া প্রয়োজন। কাফকাজের মুসলমানরা অসংখ্য গোত্রে বিভক্ত। প্রতিটি গোত্র আলাদা আলাদা অঞ্চলে বাস করে। পূর্ব থেকেই তাদের মধ্যে গোত্র ও অঞ্চলগত বিরোধ বিরাজ করছে। শাহেনশাহ'র সেবকদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা এই হওয়া প্রয়োজন যে, তারা যেনো কোনোভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। যুদ্ধের ময়দানে যদি কখনো তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আসে, তো প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে পৃথক পৃথক কথা বলে পরস্পর ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করতে হবে। একই ব্যক্তিকে একাধিক গোত্র বা একাধিক অঞ্চলের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যাবে না। সব গোত্রের সঙ্গে সমান আচরণ করার পরিবর্তে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে হবে। একজন দাগেস্তানী ও একজন চেচেনকে একত্রে দেখতে পেলে আলাদা করে তাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক কথা বলে পরস্পর সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে।

জার নেকুলাই ঃ তোমার এ প্রস্তাব বেশ চমৎকার। আরো কোনো প্রস্তাব থাকলে বলো।

রাজনৈতিক উপদেষ্টা গরচাখভ ঃ শাহেনশাহ'র সামান্য রাজনৈতিক উপদেষ্টা হওয়ার সুবাদে অধমের আরজ, কাফকাজে অভিযান পরিচালনার পর যে সব সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে, তার প্রতি এখন থেকেই আমাদের কড়া নজর রাখতে হবে। কাফকাজের একদিকে ইরান ও সালতানাতে ওসমানিয়া। দু'টিই মুসলিম রাজ্য। খোকন্দ, খেওয়া, বোখারাও মুসলিম অঞ্চল। পূর্ব ও দক্ষিণে ভারত উপমহাদেশ, যা এখন ইংরেজের করতলগত। আমাদের অগ্রযাত্রাকে ইংরেজরাও তাদের জন্য আশংকাজনক মনে করবে। ইরান ও তুরস্ক তো কিছুতেই আমাদের এই অভিযানকে মেনে নেবে না।

জার নেকুলাই ঃ ইরান, তুরস্ক ও ইংরেজ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তবে তা আমাদের জন্য শংকার কারণ হতে পারে বটে; কিন্তু এই ঐক্য মোটেই সম্ভব নয়। আমার জানা মতে ইংরেজ ওসমানিয়া সালতানাত টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ফেলেছে। আমাদের দূতদের চূড়ান্ত রিপোর্ট, আমরা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে মধ্য এশিয়ার শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবো। এরপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আমরা ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হবো নাকি তাদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে তুরস্ক ও ইরান অভিমুখে এগিয়ে যাবো। এ সিদ্ধান্ত সময়মত নেয়া হবে।

সকলেই নীরব। কারোও মুখে কথা নেই। জার নেকুলাই ঐতিহাসিক করেন্সকীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, কাফকাজ ও কোহেস্তানের

অঞ্চলসমূহকে দুর্জয়-অজেয় ভাববার ব্যাপারে আরো যেসব উক্তি প্রসিদ্ধ আছে, তার সবই তোমাদের জানা। সঠিকভাবে ও অবিকৃতরূপে তাও আমাকে ব্যক্ত করে শুনাও। সঠিক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার বাস্তবানুগ সমাধান দেয়ার জন্যই আমার এখানে আগমন।

করেঙ্গকী ঃ কাফকাজ সেকান্দরি প্রাচীর নামে খ্যাত। ইরানে প্রবাদ আছে, 'যে রাজার বুদ্ধি-বিবেক নেই, সে-ই কাফকাজে হামলা করে।' কোহেস্তানীদের বিশ্বাস, তাদের খোদার অনুমোদন ব্যতীত কেউ আল-বুরজ পর্বতকে পদানত করতে পারবে না। যুদ্ধ কোহেস্তানীদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তারা বিশ্বাস করে, তাদের লড়াইয়ের এই ধারা সেদিন বন্ধ হবে, যেদিন বরফের গায়ে ঘাস জন্মাবে। তাদের পাহাড়-পর্বতকে তারা অজেয় মনে করে। কোনো সৈন্য বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। কারণ, তারা মনে করে, এতে প্রচুর গনীমত অর্জন করা যাবে।

জার নেকুলাই ঃ আমাদের সেনাবাহিনীর এক এক করে প্রত্যেক অফিসার ও প্রত্যেক সিপাহীকে জানিয়ে দেবে যে, এর সবই অপপ্রচার ও অবাস্তব ধারণা। জগতে কোনো কাজই অসম্ভব নয়। যে কোনো নদী-সমুদ্র পার হওয়া যায়, প্রত্যেক পাহাড় পদানত করা যায়। শীঘ্র— অতি শীঘ্র আমাদের কাফকাজ জয় করতে হবে। অতি তাড়াতাড়ি আমি কোহেস্তানীদেরকে আমাদের পদানত দেখতে চাই। আমাদের না আছে অস্ত্রের অভাব, না জনশক্তির। পিটার আজমের মনোবাঞ্ছা তার জীবদ্দশায় পূরণ হতেই হবে। সেনাপতি পচকিভচ! পিটার আজমের আমলে কাফকাজের হায়েনারা শাহজাদা বেকুভচ-এর গায়ের চামড়া তুলে তা দিয়ে ঢোল বানিয়েছিলো। এবার তাদের এক এক করে প্রত্যেকের গায়ের চামড়া তুলে আনার সময় এসেছে। আমি ওদের শরীর থেকে তুলে আনা হাজার খানা চামড়া দেখতে চাই।

কাউন্ট পচকিভচ ঃ মহান শাহেনশাহ'র আদেশ বাস্তবায়নে আমি বিন্দুমাত্র কসুর করবো না। আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দেবো যে, কাফকাজের মায়েরা ভবিষ্যতে আর শাহেনশাহ'র অবাধ্য সন্তান জন্ম দিতে সাহস পাবে না।

করেঙ্গকী ঃ অভয় পেলে অধম কিছু বলতে চাই।

জার নেকুলাই ঃ আমি আগেই বলেছি, এটি পরামর্শ সভা। নির্ভয়ে যে কোন কথাই তুমি বলতে পারো।

করেঙ্গকী ঃ আমি মনে করি, শাস্তি প্রদান করাকে পদানত করার কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। সেনাপতি ইয়ারমুলুক তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি বটে, তবে তিনি কোহেস্তানী হায়েনাদেরকে চরম শাস্তি দিয়ে গেছেন। অসংখ্য লোকের গায়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেলেছেন, মায়ের সামনে সন্তানকে

খুন করেছেন, স্বামীকে স্ত্রীর সামনে কেটে টুকরো টুকরো করেছেন, তাদের বাগ-বাগিচা আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করেছেন, তছনছ করে দিয়েছেন তাদের আওল-বসতি। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। কোহেস্তানীরা পূর্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজনা ও সাহসিকতার সাথে জোরদার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। অধমের পরামর্শ, শাস্তির সাথে সাথে পুরস্কার এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানকেও কৌশল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের অনুগত গোত্রগুলোকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বাগে রাখতে হবে। অন্যদেরকেও লোভ দেখিয়ে, সুযোগ দিয়ে অনুগত বানাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য যারা রাজসেনাদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হবে, তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। সেনাপতি ইয়ারমুলুক বিজিত অঞ্চলসমূহের সকল নাগরিককে নির্বিচারে কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিলো এবং শত্রু-মিত্রের মাঝে কোনো ভেদাভেদ করেনি।

জার নেকুলাই : তোমার প্রস্তাব মন্দ নয়। তবে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, আমার নির্দেশ পৌঁছুবার পর যেসব গোত্র আমার আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদের ব্যাপারে কোনো রকম সহনশীলতা প্রদর্শন করবে না– উপযুক্ত শাস্তি তাদের পেতেই হবে। তবে সেনাপতি পচকিভচ- এর পরিস্থিতি অনুপাতে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকবে। কিন্তু আমার আনুগত্যের ঘোষণা পাওয়ার পর কোনো গোত্রের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের সংবাদ আমি বরদাশত করবো না। এবার আমি মানচিত্রের সাহায্যে কাফকাজের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হতে চাই।

সামনের দেয়ালে একটি ম্যাপ ঝুলানো। সেনাপতি পচকিভচ একটি ছড়ির সাহায্যে কাফকাজের বিভিন্ন জনবসতি, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও নদ-নদীর পরিচয় প্রদান করে। শাহেনশাহ বিভিন্ন প্রদেশ, অঞ্চল ও তথাকার বাসিন্দাদের অবস্থানের ম্যাপ দেখেন এবং জেনারেল পচকিভচ-এর বিবরণ শুনেন। অতঃপর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। সভার সমাপ্তি ঘটে।

পরদিন শাহেনশাহ সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। তৃতীয় দিবসে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পাহাড়ে গিয়ে কার্যক্ষেত্রে তার সৈন্যরা যেসব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, তা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর একদিন বিজিত প্রদেশগুলোর রাজপুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ দিয়ে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নেন।

বিদায়ের একদিন পূর্বে নবনিযুক্ত গভর্নর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার সেনাপতি পচকিভচ-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিমন্ত্রণে অংশ নেন।

সেনাপতি পচকিভচ- এর পরিকল্পনা মোতাবেক প্রস্তুতি শুরু হয়। জার নেকুলাই সেন্টপিটার্সবার্গ-এ পৌঁছে-ই কাফকাজ ও কোহেস্তানের জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ ও অতিরিক্ত সেনাভর্তির আদেশ জারি করেন। জেনারেল পচকিভচ-এর

পরিকল্পনা হলো, পরিপূর্ণ প্রস্তুতির পর তিনি বিদ্রোহী কোহেস্তানীদের উপর এমন জোরদার আক্রমণ চালাবেন, বিদ্রোহীরা পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। কিন্তু প্রস্তুতির জন্য বিপুল সময়ের প্রয়োজন।

চার.

গাজী মুহাম্মদ-এর এরাগল খানকায় বিদ্যার্জনের সময় এক বছর পূর্ণ হয়েছে। মোল্লা মুহাম্মদ শামিলের জন্য অধীর অপেক্ষমান। দীর্ঘ অপেক্ষার পর একদিন তিনি গাজী মুহাম্মদকে বললেন- 'আমার আকাংখা, তুমি তোমার বন্ধু শামিলকে উৎসাহিত করার জন্য পুনরায় চেষ্টা চালাও। আমার মন বলছে, শামিল আমার আশা-আকাংখাকে বেদনায় পরিণত করবে না। শামিল শুধু দাগেস্তানের-ই নয়- সমগ্র কাফকাজের কর্ণধার হতে পারে।'

গাজী মুহাম্মদ মুরশিদের আদেশে গমরীর পথে পা বাড়ায়।

গমরী পৌঁছেই গাজী মুহাম্মদ শুনতে পায়, আর্বিরিয়ার এক গোত্রের অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন অশ্বারোহী গমরীর সাতটি শিশুকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। শামিল একা- নিতান্তই একা তাদের ধাওয়া করে ফিরছে।

গাজী মুহাম্মদ থমকে দাঁড়ায়। চিন্তার সাগরে ডুবে যায়। মনে তার ভাবনা জাগে, শামিল যদি অপহৃত শিশুদের উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হয় আর সমাজে তার বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, তবে তো ও আর এরাগল যেতে সম্মত হবে না। আবার অপহৃত শিশুদের উদ্ধারে ব্যর্থ হলেও তো বিপদ কম নয়!

অপহৃত শিশুদের মায়েরা সন্তানের শোকে অস্থির, ব্যাকুল। গমরীর যুবকরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ঘোড়ার যিন বেঁধে প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গমরীর সরদারের আদেশের অপেক্ষা মাত্র। আর সরদার অপেক্ষা করছেন শামিলের। গমরীর প্রতিটি প্রাণী প্রতিশোধস্পৃহায় ব্যাকুল, অস্থির।

দীর্ঘক্ষণ পর অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটে। দূর থেকে তীরবেগে ছুটে আসা অশ্বের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। শব্দের উৎসের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। হঠাৎ সমকণ্ঠে রব ওঠে, ঐ ঐতো শামিল এসে গেছে!

শামিল ফিরে এসেছে। অপহৃত শিশুদেরও উদ্ধার করে এনেছে। তিনটি শিশু- যারা বয়সে ছোট- শামিলের ঘোড়ায় বসা। একটি সামনে আর দু'টি পিছনে। অপর চার শিশু- বয়সে যারা খানিকটা বড়- ভিন্ন ঘোড়ায় সওয়ার।

উদ্ধারকৃত শিশুদের নিয়ে শামিল লোকালয়ে উপস্থিত। গমরীর শিশু-কিশোর-নারী ও আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে ছুটে এসে ভিড় জমায়। অপহৃত শিশুদের মায়েরা আপন আপন কলিজার টুকরাকে বুকে তুলে নেয়ার কথা ভুলে গিয়ে শামিলকে মোবারকবাদ জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বস্তির সরদার ছুটে এসে

শামিলকে গলায় জড়িয়ে ধরে এবং আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে– 'শাবাশ! শামিল, শাবাশ! আমার সিংহ! সত্যিই তুমি সিংহ!'

গৌরবে শামিলের পিতার মস্তক উন্নত। পুত্রের কৃতিত্ব দেখে তার আনন্দের সীমা নেই। তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার তপ্ত অশ্রু। বীরপুত্রের ভবিষ্যত কল্পনায় সে আত্মহারা।

গাজী মুহাম্মদ একখণ্ড পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে বিমুগ্ধ নয়নে এসব দৃশ্য অবলোকন করছে। বস্তির সরদার ইংগিতে জনতাকে নীরব করিয়ে বলেন– 'আমাকে তোমরা শামিলের নিকট হতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে দাও।' শামিল সহাস্যে বলে, আমার নিকট থেকে নয় মহামান্য খান সাহেব! এই ঘটনার বিবরণ আপনি উদ্ধারকৃত শিশুদের নিকট থেকেই শুনুন।

অপহরণের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া বাচ্চারা জানায়, আমাদের অপহরণকারী সন্ত্রাসীরা সংখ্যায় ছিলো সাতজন। আমরা প্রাচীরের কাছে খেলা করছিলাম। তারা আমাদের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে এবং একজন একজন করে আমাদের প্রত্যেককে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। নিজ এলাকায় পৌঁছে আমাদেরকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে বসে তারা গল্প করতে শুরু করে। ঘরের চারদিকে ছিলো অনেক উঁচু প্রাচীর। হঠাৎ দেখি শামিল চাচা প্রাচীর টপকে ঘরের আঙ্গিনায় লাফিয়ে পড়েন। অপহরণকারীরা টের পাওয়ার আগেই তিনি মুহূর্ত মধ্যে তাদের প্রত্যেককে খুন করে ফেলেন। তাদেরকে টু শব্দটি পর্যন্ত করার সুযোগ তিনি দেননি। তারপর তাদের আস্তাবল থেকে বেছে বেছে চারটি ঘোড়া নিয়ে আমাদের চারজনকে তাতে বসিয়ে অবশিষ্ট তিনজনকে তার নিজের ঘোড়ায় বসিয়ে নেন।

রওনা দেওয়ার প্রাক্কালে দু'জন লোককে কাছে ডেনে এনে চাচা বললেন– 'তোমরা বস্তিবাসীদেরকে বলে দিও তোমাদের লোকেরা গমরীর কয়েকটি শিশুকে অপহরণ করেছিলো। শামিল তার প্রতিশোধ নিয়েছে। অপহরণকারীদের লাশ এই ঘরে পড়ে আছে।'

এই বলে চাচা ঘোড়া হাঁকাতে শুরু করেন। তিনি আমাদেরকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, পেছন থেকে যদি শত্রুরা ধাওয়া করে, তাহলে তিনিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন, আমরা যেনো সোজা গমরীতে চলে আসি।

গমরীর সকল নারী-পুরুষ শামিলের চারপার্শ্বে সমবেত। গাজী মুহাম্মদ এই দৃশ্য অবলোকন করে নিজ গৃহপানে চলে যায়। ঈশার নামাযের পর শামিলের ঘরে গিয়ে সে শায়খে দাগেস্তানের মনোবাঞ্ছার কথা ব্যক্ত করে। শামিল দ্বিমত করে না; এরাগল যেতে সম্মত হয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় নিয়ম অনুযায়ী শত্রুপক্ষের পাল্টা আক্রমণের অপেক্ষা করতে সে বাধ্য। দুশমন যদি তাদের নিহত লোকদের

প্রতিশোধ নিতে চায়, তাহলে তারা সাত দিনের মধ্যে গমরী আক্রমণ করবে নিশ্চয়। অন্যথায় বুঝতে হবে, নিহত লোকগুলো স্থানীয় লোকদের জন্যও ভয়ংকর এবং প্রতিশোধ নিতে তারা ইচ্ছুক নয়।

গাজী মুহাম্মদও এ রীতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাই সে শামিলকে এরাগল পৌছার তাগিদ দিয়ে ফিরে চলে যায়।

একদিন দু'দিন করে সাতদিন অতিক্রান্ত হয়ে যায়। দুশমনদের কোনো জবাবি হামলা আসে না। শামিল নিশ্চিত হয়, আর হামলার আশংকা নেই। তাই পিতা-মাতা ও বস্তির সরদার থেকে অনুমতি নিয়ে শামিল এরাগলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গমরীর সকল যুবক ঈর্ষান্বিত নয়নে শামিলের ছুটে চলা অশ্বপানে চেয়ে থাকে।

শামিল আধ্যাত্মবিদ্যার প্রাণকেন্দ্র এরাগল খানকায় পৌছে যায়। মোল্লা মুহাম্মদ সীমাহীন আনন্দিত হন। কিন্তু শামিলের কাছে সেই আনন্দের কথা তিনি প্রকাশ করেন না।

মোল্লা মুহাম্মদের নিয়ম, সিলেবাস পড়াবার সময় প্রায়ই প্রসঙ্গক্রমে তিনি সমকালীন পরিস্থিতির উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন এবং অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিতে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিবরণ তুলে ধরেন।

মোল্লা মুহাম্মদের প্রত্যেক শিষ্য স্পষ্টভাবে একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, কাফকাজের সবক'টি মুসলিম গোত্রের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সবক'টি গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করা সহজ কথা নয়। কোহেস্তানী গোত্রসমূহের অঞ্চল ও জাতিগত ভেদাভেদ পাথরের মতো অটল। প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ স্বার্থে, আপন আপন পরিমণ্ডলে প্রাণপাত লড়াই করতে সদাপ্রস্তুত। কিন্তু এক গোত্র অন্য গোত্রের সঙ্গে মিলে লড়াই করা অকল্পনীয় ব্যাপার। প্রত্যেকের পথ ভিন্ন ভিন্ন। মোল্লা মুহাম্মদের বাসনা, যেনো এমন একজন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যিনি এদের সবাইকে এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হবেন; যিনি তাসবীহ'র বিক্ষিপ্ত দানাগুলোকে এক সুতোয় গেঁথে দেবেন; বিচ্ছিন্ন প্রস্তরগুলোকে একত্রিত করে একটি মোর্চায় পরিণত করবেন। কিন্তু কে এই মহান ব্যক্তিত্ব? মোল্লা মুহাম্মদের পক্ষে এই সময়ে পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে জিহাদ ও ঐক্যের দাওয়াত দিয়ে বেড়ানো ঠিক হবে না। নিজেকে বেশি প্রকাশ করে ফেললে এরাগল খানকা শত্রুপক্ষের টার্গেটে পরিণত হবে, শত্রুরা ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে ফেলবে বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী এই খানকাটি। ফলে বন্ধ হয়ে যাবে হেদায়েতের এই উৎসধারা। কাফকাজের মুসলমানরা বঞ্চিত হয়ে পড়বে আধ্যাত্মবিদ্যার সমূহ কল্যাণ থেকে।

✿ ✿ ✿

আল্লাহ শামিলকে বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি দান করেছেন। মেধাশক্তিতেও তার

তুলনা হয় না। কয়েক মাসেই লেখাপড়ায় সে সহপাঠীদের অতিক্রম করে এগিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট সিলেবাসের উপর প্রচুর বুৎপত্তি অর্জন করে ফেলে।

কিন্তু মোল্লা মুহাম্মদ যখন জিহাদের কথা বলেন, তখন সে কোনো কথা বলে না– নীরবে বসে থাকে, যেনো কিছু ভাবছে।

মোল্লা মুহাম্মদের শিষ্যরা শিক্ষা সমাপ্ত করে যোগ্যতার সনদ হাসিল করে নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু তিনি শামিল ও গাজী মুহাম্মদকে নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে যান এবং বলেন–

'আমি বড় আনন্দিত যে, তোমরা দুই বন্ধু একত্রে শিক্ষা সমাপণ করে বিদায় নিচ্ছো। আর শামিল! তোমার প্রতি আমি বিশেষভাবে এ জন্য মুগ্ধ যে, তুমি এসেছো সকলের পরে আর বিদায় নিচ্ছো সকলের সঙ্গে একত্রে। এখন তোমরা কর্মমুখর বাস্তব জীবনে পদার্পণ করবে। দুশমন আমাদেরকে পরাজিত করে রাখার চিন্তায় বিভোর। গাজী মুহাম্মদ তো জিহাদ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে; কিন্তু তুমি এ বিষয়ে একটি শব্দও মুখে আনতে রাজি নও। কারণটা কী শামিল?'

ঃ পীর ও মুরশিদ! আপনি যথার্থ বলেছেন। জিহাদ সম্পর্কে আমার বলবার আর কী আছে? জিহাদ তো আমাদের প্রত্যেকের উপর ফরজ– অপরিহার্য কর্তব্য বিধান। এই ফরজ দায়িত্ব পালনে আপনি আমাকে কখনো কারো পেছনে পাবেন না।

ঃ বুঝলাম, জিহাদ ফরজ। কোনো মুসলমান জিহাদ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু বলো তো, বহুধাবিভক্ত গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় কীভাবে?

ঃ পীর ও মুরশিদ! আপনার মতে এর কৌশল ও পদ্ধতি কী হতে পারে বলুন।

মোল্লা মুহাম্মদ ঃ গোত্র ও অঞ্চলগত ভেদাভেদ সত্ত্বেও কোহেস্তানীরা মুসলমান। তারা বীর-বাহাদুরদের শ্রদ্ধা করে। যুদ্ধ তাদের জীবনের ব্রত। একজন বীর মুজাহিদ যদি প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে তাদেরকে ঐক্যের সবক দান করে, তাহলে নিশ্চয় এর কিছু না কিছু সুফল পাওয়া যাবে। সব এলাকার বাসিন্দারা আরবী বুঝে। ইসলামের পর এই আরবী ভাষা তাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে। তবে শর্ত হল, একজন ব্যক্তিত্বশীল লোককে তাদের সাথে আরবীতে কথা বলতে হবে।

গাজী মুহাম্মদ বললো, পীর ও মুরশিদ! এলাকায় ফিরে গিয়ে আমরা জিহাদ ও ঐক্যের তাবলীগ করবো। আপনি দু'আ করুন, যেনো আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করেন।

ঃ বৎস! তোমরা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কাজ করতে থাকো। আল্লাহ তোমাদের নিরাশ করবেন না। আমার দু'আ তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

মোল্লা মুহাম্মদের শিষ্যদ্বয় গমরী পৌঁছে যায়। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের

সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে কেটে যায় কয়েক দিন। তারপর গাজী মুহাম্মদ জিহাদের তাবলীগের জন্য বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু শামিলের কোনো উদ্যোগ নেই। সম্পূর্ণ নীরবতার সাথে দিন কাটাচ্ছে সে। দাগেস্তানের রহস্যঘেরা প্রকৃতির ন্যায় শামিলের নীরবতাও রহস্যময়। দিনভর তাবলীগি কার্যক্রম শেষ করে বাড়ি ফিরে এসে গাজী মুহাম্মদ শামিলকেও জিহাদের তাবলীগে নেমে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু শামিল 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলে না।

এভাবে কয়েক মাস কেটে যায়। গাজী মুহাম্মদ শায়খে দাগেস্তান মোল্লা মুহাম্মদের খেদমতে হাজির হয়ে শামিলের নামে নালিশ করে, শামিল না জিহাদের তাবলীগে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, না আমার সহায়তা করছে; না ঘর থেকে বের হচ্ছে। পীড়াপীড়ি করলে ক্ষেপে ওঠে। সারাক্ষণ সম্পূর্ণ কর্মহীন ঘরে বসে থাকে।

ঃ তোমার ধারণায় শামিলের এই মানসিকতার কারণ কী?

ঃ পীর ও মুরশিদ! আমি যতোটুকু জানি, এর কারণ ফাতেমা। উঁচু বস্তির ডাক্তার আবদুল আজীজের কন্যা ফাতেমা। শামিল তাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে। এখানে থাকা অবস্থায়ও শামিল আমার সঙ্গে ফাতেমার কথা আলোচনা করতো। এখানে আসার আগেও সে ফাতেমার কল্পনায় ডুবে থাকতো।

ঃ ব্যস! তোমার ধারণা ঠিক। যৌবনকালে অনেকের জীবনেই এমন একটি মুহূর্ত আসে। অনেকের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার স্পৃহা খুব তীব্র হয়ে থাকে। তারা অন্যের হৃদয়পিঞ্জিরায় বন্দি হয়ে যায়। তাদের এই স্পৃহা অবদমিত না করা পর্যন্ত একাগ্রতার সাথে তারা কোনো কাজ করতে পারে না।

ঃ কিন্তু পীর ও মুরশিদ! এখানে তো ও বেশ একাগ্রতার সাথে পড়াশোনা করছিলো!

ঃ তারও বিশেষ কারণ ছিলো। আবদুল আজীজের বংশ আলিমদের বংশ। বোধ হয় ফাতেমা নিজে কিংবা তার বান্ধবীদের কেউ শামিলের কানে দিয়েছে, আগে আলিম হও পরে ফাতেমাকে নিয়ে ভাবো। শামিল এখন আলিম, টগবগে বীর যুবক, সর্বোপরি ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত। আমার ধারণা, আবদুল আজীজ তার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে আপত্তি করবে না।

ঃ পীর ও মুরশিদ! আমার মনে হয়, শামিলকে কেউ তিরস্কার করেছে। শামিলের ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বে অভিভূত হয়ে গমরীর কয়েকটি তরুণী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। শামিলকেও তারা নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা তাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েরা তাকে তিরস্কার করে বলেছে– 'দেখবো, ফাতেমাকে তুমি কীভাবে বিয়ে করো।'

ঃ আচ্ছা, ফাতেমা কী খুবই সুন্দরী মেয়ে?

ঃ জ্বী হযরত। ফাতেমা অত্যান্ত রূপসী মেয়ে। বংশও তার বেশ নামকরা।

শিক্ষা- দীক্ষায়ও অগ্রসর। শুধু নিজ এলাকেতেই নয়- আশেপাশের এলাকায়ও বেশ নাম-যশ তার। এ কারণে ভালো ভালো সম্বন্ধও আসছে।

ঃ শামিলের পিতা কি পয়গাম পাঠায়নি?

ঃ না হযরত! প্রথমত তার ধারণায় শামিল এখনও বিয়ের যোগ্য হয়নি। তাছাড়া দু'বংশের মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণে তিনি প্রস্তাব পাঠাতে সাহস পাচ্ছেন না। আবদুল আজীজের মুখ থেকে 'না' শুনে তিনি অপমানিত হতে চান না। কিন্তু হযরত! আপনি এতো অস্থির হচ্ছেন কেনো? আপনার এই নগণ্য খাদেম তো আপনার যে কোনো আদেশ পালনে জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত।

ঃ বেটা, আমি তোমাকে অন্তর থেকে স্নেহ করি। আমি বিশ্বাস করি, জিহাদ শুরু করার গৌরব তোমারই ভাগ্যে জুটবে। সব মানুষের বাস্তবপ্রিয় হওয়া উচিত। শামিলের ব্যক্তিত্বে অবর্ণনীয় এক আকর্ষণ বিদ্যমান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার আনুগত্য মেনে নিতে কোহেস্তানীরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। আচ্ছা, তুমি গিয়ে তোমার কাজ করতে থাকো আর শামিলকে বুঝাতে থাকো। তুমি অটল থাকলে শামিলও একদিন তোমার সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়বে।

✿ ✿ ✿

গমরী থেকে কয়েক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত উঁচু বসতির সর্বশেষ গৃহটির কয়েক গজ দূরে উৎসারিত একটি ঝরনাধারা। ঝরনাটির অবস্থান সেই সরু গলির উপর, যা গমরী থেকে শুরু হয়ে উঁচু বস্তির কূল ঘেঁষে বৃত্ত রচনা করে পরবর্তী পাহাড়ি জনবসতি অভিমুখে এগিয়ে গেছে। ঝরনার প্রায় একশ গজ ব্যবধানে উঁচু বসতিগামী রাস্তাটি সরু গলি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সরু গলির দু'পার্শ্বে কোথাও বড় বড় পাথর আবার কোথাও ঘন কাঁটার ঝোঁপ-জঙ্গল।

একদিনের সন্ধ্যাবেলা। উঁচু বসতির কয়েকটি কিশোরী কলসী কাঁখে ঝরনার থেকে পানি নিতে আসে। তাদের একজন অতিশয় সুন্দরী। মেয়েটার দীর্ঘ দেহ, গোলাপী রং, দীর্ঘ গ্রীবা, টানাটানা মায়াবী চোখ, টিয়ালু নাক, পরিচ্ছন্ন পোশাক; সর্বোপরি হাঁটা-চলায় রাজকীয় ভাব। তার বান্ধবীরা তাকে 'শাহজাদী' বলে ডাকে। নাম তার ফাতেমা– আবদুল আজীজ তনয়া ফাতেমা। তার পিতা এলাকার নামকরা ডাক্তার।

ফাতেমার জোহরা নাম্নী এক বান্ধবী রসিকতা করে বলে, তোমার বাবা হাজারও মানুষের জখমের চিকিৎসা করেন ঠিক; কিন্তু মেয়ের জখম বুঝি তার চোখে পড়ে না।

অপর বান্ধবী জবাব দেয়, এতে ওর বাবার অপরাধ কী? শাহজাদীর কোনো শাহজাদাকেই যে পছন্দ হয় না! শামিল ছাড়া আর কাউকেই যে ওর মনে ধরে না! কিশোরীরা উঁচু বসতির পথ অতিক্রম করে সরু গলিতে এসে পৌঁছে।

বান্ধবীর রসিকতা ফাতেমার হৃদয়ে তীরের মত বিদ্ধ হয়। লজ্জায়-ক্ষোভে তার গোলাপী মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে যায়। কাঁখের কলসটি মাটিতে রেখে বান্ধবীকে মারবার জন্য দৌড়ে যায়। তার পা একটি লতার সঙ্গে আটকে পড়ে। ঝোঁক সামলাতে না পেরে ফাতেমা গলির উপর পড়ে যায়।

এমন সময় হঠাৎ এক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে গলিতে ঢুকে পড়ে। বাতাসের মতো দ্রুত এগিয়ে আসছে তার ঘোড়া। চোখের পলকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শাহজাদীর নিকটে চলে আসে। গতি তার এতো তীব্র যে, আরোহী ইচ্ছে করলেও থামাতে পারবে না। ফাতেমার মুখ থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসে।

ফাতেমার নিকটে– একেবারে নিকটে এসে ঘোড়াটি হঠাৎ লাফ দিয়ে কয়েক ফুট উঁচুতে উঠে যায় এবং ফাতেমার উপর দিয়ে এমনভাবে অতিক্রম করে, যেনো ঘোড়াটি বাতাসে উড়ছে।

ফাতেমার বান্ধবীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঝোঁপের কাছে দাঁড়িয়ে। ফাতেমার চিৎকার শুনে জোহরা এগিয়ে আসে। কিন্তু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য জোহরাও অকস্মাৎ ঘোড়ার সামনে এসে পড়ে। ঘোড়া আবারও লাফ দিয়ে জোহরাকে অতিক্রম করে।

সম্মুখে খোলা মাঠ। অশ্বারোহী তার ঘোড়া থামায়। ঘোড়া থেকে নেমে সে পেছনে ঘুরে মেয়েদের কাছে আসে এবং বলে– 'রাস্তায় সব পথিকের অধিকার সমান। তোমরা মানুষের চলার পথকে ঘরের আঙিনা মনে করে বসেছো। আমার ঘোড়া যদি পরম প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ না হতো, তাহলে আজকে তোমাদের বস্তির লোকদের বলতে হতো, 'কে এক কাপুরুষ অদক্ষ অশ্বারোহী আমাদের দু'টি মেয়েকে খুন করে গেছে।'

ফাতেমা ঃ বাহ্ জনাব! আপনি বোধ হয় নিজেকে শামিল মনে করছেন? আজ যদি আপনার স্থলে এই ঘোড়ায় আমি সওয়ার হতাম, তাহলে অতি অনায়াসে আমিও দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতাম। আমার দৃষ্টি রাস্তায় নিবদ্ধ থাকতো আর সঠিক সময়ে আমি ঘোড়া থামিয়ে দিতাম কিংবা ঝোঁপের উপর দিয়ে লাফ দিতাম।

অশ্বারোহী ঃ আরে খুকী। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো যে, নিশ্চিত দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছো। তুমি তো দৌড়ে হঠাৎ করে আমার সামনে এসে পড়েছিলে।

জোহরা ঃ বেচারী রক্ষা আর পেলো কোথায়? দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেলেও আপনার বীরত্ব ওকে ঘায়েল করে ফেলেছে। আহ্, আমাদের শাহজাদীর একটা কূল- কিনারা হয়ে যেতো যদি!

অশ্বারোহী ঃ শাহজাদী?

জোহরা ঃ কেনো, বিশ্বাস হচ্ছে না? রাজকন্যাদের মাথায় কি শিং থাকে, নাকি বাহুতে পালক গজায়? কোনো রাজকন্যা আমাদের ফাতেমার চে' রূপসী হতে পারে কি?

ফাতেমা লজ্জা পায় এবং ক্ষুব্ধনয়নে জোহরার প্রতি দৃষ্টিপাত করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

অশ্বারোহী ঃ এই মেয়েটির পরিচয় কী?

জোহরা ঃ মেয়েটিকে আপনার মনে ধরেছে বুঝি? জানেন, ও আপনার চেয়েও বেশী দক্ষ ঘোড়সওয়ার। শামিলের মতো শাহজাদাই একে ভালো মানায়।

অশ্বারোহী ঃ ওর পিতার নাম কী?

জোহরা ঃ প্রখ্যাত ডাক্তার আবদুল আজীজ ওর পিতা। তবে আপনি মিছেমিছি রোগের বাহানা দেখিয়ে তার নিকট যাওয়ার চেষ্টা করবেন না কিন্তু। মনে রাখবেন, ঘোড়সওয়ারী এক জিনিস, বীরত্ব আরেক জিনিস। প্রকৃত বীর তো সেই ব্যক্তি, সর্বত্র সকলের মুখে যার বীরত্বের কথা চর্চা হয়। যেমন শামিলের বীরত্বের কথা সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে।

অশ্বারোহী ঃ না বোন! মিছেমিছি বাহানা দেখিয়ে তোমাদের শাহজাদীর পিতার নিকট যাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। তবে তোমার শাহজাদীকে বলে দিও...। অশ্বারোহী রাস্তার দিকে তার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নেয়।

জোহরা ঃ কী বললেন, শাহজাদীকে কী বলবো?

অশ্বারোহী পায়ের জুতার কাঁটা দ্বারা আঘাত করে ঘোড়াকে উত্তেজিত করতে করতে উচ্চকণ্ঠে বলে- 'বলে দিও, আমিই শামিল- শাহজাদীর যোগ্য পাত্র শামিল।'

অশ্বারোহী আর দাঁড়ায় না। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে তার ঘোড়া। মেয়েরা মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

অবশেষে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কয়েক মুহূর্ত পর একজন বললো, শাহজাদী! আমার বিশ্বাস, লোকটা ঠিকই বলেছে। এতোবড় দক্ষ ঘোড়সওয়ার শামিল ছাড়া আর কে হতে পারে?

জোহরা ঃ শাহজাদী! আল্লাহ তোর হৃদয়ের আকুতি শুনে ফেলেছেন। আমার মন বলছে, শাহজাদার তোকে পছন্দ হয়েছে।

ফাতেমা ঃ তিনি যদি শামিল হয়েও থাকেন, তাতে আমার কি? তাছাড়া এমনও তো হতে পারে, সে আসল শামিল নয়। তুমি শামিলের কথা উল্লেখ করেছিলে বলে হয়তো তোমাকে প্রভাবিত করার জন্য সে নিজেকে শামিল বলে দাবি করেছে। তবে শোনো, ঘরে গিয়ে এ ঘটনার কথা কাউকে বললে কিন্তু আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো না। অন্যথায় বাবা বলবেন, আমি বাইরে গিয়ে পরপুরুষের সাথে কথা বলি।

এক বান্ধবী ঃ আমাদের কী ঠেকা পড়েছে যে, তোমার বাবা-মার কাছে এসব বলতে যাবো? শাহজাদা শাহজাদীকে দেখে গেছে, এখন প্রয়োজন হলে একদিন সে-ই এসে পড়বে!

ফাতেমার মুখমণ্ডল লজ্জায় লাল হয়ে যায়। বান্ধবীদের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করে কলসিতে পানি ভরে ঘরে ফিরে যায়।

অশ্বারোহী আসলেই শামিল ছিলো। উঁচু বস্তির সামনের বস্তিতে অবস্থিত নানা বাড়ি থেকে সে নিজের বাড়ি ফিরছিলো। দু'বছর আগে এই নানা বাড়িতেই সে ডাক্তার আবদুল আজীজের কন্যা ফাতেমার কথা শুনেছিলো। কিন্তু এখন ফাতেমার রূপ-গুণের কথা সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। আরো ক'জন যুবকের মতো সেও ফাতেমার কথা ভাবে। এবার তো সে ফাতেমাকে দেখেই ফেললো।

শামিল তার মাকেও ফাতেমার কথা বলেছিলো। কিন্তু তাদের বংশগত নিয়ম, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, তারপর বিয়ে। ফলে মা পুত্রকে সান্ত্বনা দেন– 'বাবা! ফাতেমা আমার পুত্রবধূ হবে এর চে' আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে! সুযোগ মতো তোমার বাবার সাথে আমি এ নিয়ে কথা বলবো। তবে এখন তুমি কাজ করে যোগ্যতার পরিচয় দাও এবং বাবার মন জয় করার চেষ্টা করো।'

শামিল সাংসারিক কাজকর্মে পিতার সহযোগিতা করতে শুরু করে। গাজী মুহাম্মদ পূর্বাপেক্ষা বেশি উদ্দীপনার সাথে জিহাদের তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে সে বলে– 'বন্ধুগণ! আপনারা গভীরভাবে আমার বক্তব্য শুনুন। সম্ভাব্য সংঘাতের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমাদের স্বাধীনতা চিরদিনের তরে ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এমনটি ধারণা করা ভুল হবে যে, শত্রু এখনও অনেক দূরে। তারা আসছে– দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসছে। আপনারা এখন আগের মতো পৃথক পৃথক গোত্রে লড়াই করে ওদের ঠেকাতে পারবেন না। আল্লাহর দিকে চেয়ে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হোন; এক প্লাটফর্ম থেকে এক নেতার নেতৃত্বে কাজ করুন।'

গাজী মুহাম্মদের তাবলীগ উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে সক্ষম হচ্ছে না। তার অন্যতম কারণ, গোত্রগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এক সেনাপতির কমান্ডে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত নয়। কয়েক শ বছর পর্যন্ত তারা একই নিয়মের অধীনে কাজ করে আসছে। তাহলো, শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পড়লে নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সকলে শত্রুর মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করে। এক গোত্রের সঙ্গে আরেক গোত্রের কোনো যোগাযোগ থাকে না। আরেকটি কারণ, গাজী মুহাম্মদের ব্যক্তিত্বের প্রতি আম-জনতার বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই। আকৃতিতে সে খর্ব, মুখে বসন্তের দাগ, কণ্ঠস্বরও কর্কশ। শিষ্যত্ব গ্রহণে আগ্রহী লোকদের জন্য তার শর্তও বেশ কঠোর। প্রথম শর্ত, তার মুরীদরা বিয়ে করতে পারবে না এবং গোটা জীবনকেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ওয়াক্ফ করে দিতে হবে।

দাগেস্তানের সব গোত্রের মানুষ বীরত্বের অধিকারী। বীরত্ব তাদের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা এক নীতির উপর অটল

থাকতে পারে না। জীবন তাদের সিংহের জীবনের ন্যায়। প্রয়োজন হলে শিকার করে খেলো, অন্যথায় গুহায় গিয়ে ঘুমে অচেতন পড়ে রইলো। কেউ বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে এক লাফে উঠে তার ঘাড়টা মটকে দিলো। এভাবে চলে সিংহের দিন-রাত।

পাঁচ.

দাগেস্তানের পরিবেশ-পরিস্থিতি দিন দিন আরো রহস্যময় হয়ে ওঠে। জনমনে প্রথমে কানাঘোষা এবং পরে খোলামেলা আলোচনা শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক বস্তিতে কালো আবা পরিহিত এক ঘোড়সওয়ার গিয়ে বস্তির লোকদের সমবেত করে বলে–

'আমার ভাইয়েরা! গাজী মুহাম্মদ দাগেস্তানের ইমাম নিযুক্ত হয়েছেন। আপনারা অতি দ্রুত ইমামের হাতে বায়আত গ্রহণ করুন এবং জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিন। ইমাম গাজী মুহাম্মদ অঙ্গীকার করেছেন , দাগেস্তানে যতোক্ষণ পর্যন্ত একজন লুটেরারও অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, ততোক্ষণ তার তরবারী কোষবদ্ধ হবে না। ইমামের পতাকার রং কালো। মুরীদদের জন্য তিনি এমন উর্দি নির্ধারণ করেছেন, যেমনটি আমার পরনে দেখতে পাচ্ছেন।' (অর্থাৎ সেলোয়ার, ঢিলে কোর্তার উপর কালো আবা এবং মাথায় পাগড়ি)।

অধিকাংশ মানুষ এই ঘোষণা শুনে উপহাস করে, হাসে। কিন্তু সচেতন কিছু লোক ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ইমাম গাজী মুহাম্মদ সাক্ষাতের জন্য আসা লোকদের বায়আত করে নেন। প্রথম ইমাম গাজী মুহাম্মদ বায়আতের জন্য কঠোর শর্ত স্থির করে নিয়েছেন। তাঁর মুরীদদের এই বলে শপথ নিতে হয় যে–

'আমি অমুকের পুত্র অমুক অঙ্গীকার করছি, যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি ইমামের আনুগত্য করে চলবো। এমনকি ইমামের আদেশে আমি নিজের জীবনও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবো। আমি ওয়াদা করেছি, দাগেস্তানে যতোক্ষণ পর্যন্ত একজন লাল লুটেরারও অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি জিহাদ অব্যাহত রাখবো। জিহাদের আবশ্যকতা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত আমি বিয়ে করবো না এবং বেহুদা খেলাধুলা, আনন্দ-ফূর্তি ও ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকবো।"

মুরীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ইমাম গাজী মুহাম্মদ পুনরায় বিভিন্ন অঞ্চলে সফর শুরু করেন। এখন তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বীতার সাথে বক্তৃতা করেন। যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই এমন সব হাজার হাজার মুরীদ তাঁর সাহচর্যে এসে সমবেত হচ্ছে, যারা তার আদেশে জীবন দিতে প্রস্তুত।

দাগেস্তানের একটি গ্রামে বিপুল লোকের সমাগম। গাজী মুহাম্মদ একটি

পাথরের চবুতরায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন–

"বন্ধুগণ! লক্ষ্য করে শুনুন, মুক্তির দিন অতি নিকটে। কাফেররা আমাদের যেসব অঞ্চল অধিকার করে বসে আছে, সেখান থেকে শিগগিরই তাদের পিটিয়ে তাড়াতে হবে। এই অভিযানে আমরা জয়লাভ করবো- অবশ্যই জয়লাভ করবো। আপনারা নিজেদের কোমর শক্ত করুন। অস্ত্রে সজ্জিত হোন, অবস্থান মজবুত করুন। শিগগিরই– অতি শিগগিরই দুশমনের বিচ্ছিন্ন মস্তক পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকবে। তাদের রক্তে আমরা নদী-সাগর লাল বানাবো। তবে শর্ত একটাই, আপনারা নিজেদের আমল ঠিক করুন, অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত ঝেড়ে ফেলুন।"

গাজী মুহাম্মদের বক্তৃতা শেষ হওয়ামাত্র তার মুরীদরা নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করে মদের কলসি, মটকা সব বের করে রাস্তায় ছুঁড়ে মারে। ভেঙে চুরমার করে ফেলে মদের সব পাত্র। বৃষ্টির পানি যেমন মুষলধারায় প্রবাহিত হয়, তেমনি গলিতে গলিতে মদের স্রোত বইতে শুরু করে। গাজী মুহাম্মদ মুরীদদের নিয়ে সামনের বস্তির দিকে রওনা হন। হাজার হাজার মুরীদ তার পেছনে পেছনে হাঁটছে আর উচ্চস্বরে বলছে– 'এই দুনিয়া মৃত জীব আর তার পেছনে ধাওয়াকারী মানুষগুলো সব কুকুর।'

বেশ ক'টি বস্তিতে জিহাদের তাবলীগ করে গাজী মুহাম্মদ গমরীতে পৌঁছে সোজা শামিলের নিকট চলে যান। শামিল তখন ঘোড়ায় যিন বাঁধছে। শামিলের নিকটে পৌঁছেই ইমাম গাজী মুহাম্মদ বলে ওঠলেন– 'এমন একটি তাগড়া যুবক আর এমনি এক শক্তিশালী ঘোড়া দিয়ে লাভ কী? সর্বত্র জিহাদের প্রস্তুতি চলছে আর তোমার কিনা তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। যেনো এই মাটি আর মানুষের সাথে তুমি একেবারেই সম্পর্কহীন।'

ঃ দোস্ত! তুমি তো ভালো করেই জানো, আমি কাপুরুষ নই।

ঃ তবে তুমি জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছো না কেনো?

ঃ এখনো সেই সময় আসেনি।

ঃ বেশ চমৎকার বাহানা তো! সময় তাহলে তখন আসবে, যখন কাফেররা আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রম নিয়ে তামাশা করবে?

ঃ (প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) খামুশ! আর একটি শব্দও উচ্চারণ করবে না, অন্যথায়...।

ঃ অন্যথায় তোমার আত্মমর্যাদা জেগে ওঠবে...। তোমার জীবন একজন নারীর প্রেম-ভালোবাসায়ই নিবদ্ধ হয়ে থাকবে, তাই না?

ঃ গাজী মুহাম্মদ! আমি তোমাকে চুপ হতে বলেছিলাম। চলে যাও তুমি এখান থেকে।

ঃ যাচ্ছি। তবে মনে রেখো, যখন এই অঞ্চলের আত্মত্যাগী বীর পুরুষদের বীরত্বের ইতিহাস রচিত হবে, তখন ইতিহাসের পাতায় এ কথাও লিপিবদ্ধ হবে যে, শামিলের মতো তাজাপ্রাণ যুবক এক সুন্দরী নারীর প্রেমে আটকা পড়ার ফলে দেশ ও জাতির জন্য কিছু করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমি তোমার কাছে ইমাম হিসেবে নয়– বন্ধু হিসেবে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে দুঃখ দিলে!

গাজী মুহাম্মদ বিদায় নেন। শামিল ঘোড়ার যিন খুলে ফেলে। তারপর অজু করে নামায পড়ে মোরাকাবায় মগ্ন হয়।

কয়েকদিন পর শামিল নিজে গাজী মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর বলে–

'ইমাম! আমি আপনার দাওয়াতের উপর বেশ চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমার মন বলছে, এখনো জিহাদের সময় আসেনি। প্রথমে সমগ্র কাফকাজকে সজাগ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন জনসাধারণকে সুসংগঠিত করা। জনসাধারণকে জাগ্রত ও সংগঠিত করার ব্যাপারে আপনার কর্মনীতিতে আমিও একমত। কিন্তু আমি মনে করি, এখনই রাশিয়ানদের উপর আক্রমণ শুরু করা ঠিক হবে না; এতে আমাদের ক্ষতি হবে।'

ঃ অপেক্ষার সময়টা কখনো আসে না। রাশিয়ানদের সাথে লড়াই শুরু হলে দেশবাসী এমনিতেই সজাগ ও সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। তারা কাফকাজের কয়েকটি গোত্রকে পক্ষে টেনে নিয়েছে। কয়েকজন খানও রাশিয়ানদের আনুগত্যের কথা ঘোষণা করেছে। যদি এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করা না যায়, তাহলে রাশিয়ানরা অত্র অঞ্চলে আরো শক্তভাবে জেঁকে বসবে। তখন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও দীন-ঈমান রক্ষা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

ঃ আমি একথা বলছি না যে, কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হোক। তাবলীগ-তানযীমের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। আমি তোমাকে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, তাহলো রাশিয়ানদের সাথে সংঘাত এখনও আমাদের এড়িয়ে চলা দরকার।

গাজী মুহাম্মদ শামিলের পরামর্শে কান দেন না। তিনি যথারীতি নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কয়েক সপ্তাহ পর গমরীতে পৌঁছে তিনি শামিলের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। কিন্তু গিয়ে শুনতে পান, শামিল বাড়ি নেই; রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ সে। কোথায় গেছে বস্তির কেউ জানে না। ঘরের লোকেরা এতোটুকু জানে যে, কয়েক সপ্তাহ হলো শামিল উধাও। গাজী মুহাম্মদ তার বিশ্বস্ত সহকর্মীদের বলেন, 'ঘটনা আর কিছু নয়, ফাতেমার প্রেমই শামিলকে অথর্ব করে ফেলেছে। কোথাও গিয়ে হয়তো ও ফাতেমার সন্ধানে ঘুরে মরছে।'

কিন্তু শামিল তখন কাফকাজ থেকে বহুদূরে তারই মতো দীর্ঘকায় শশ্রুমণ্ডিত এক ব্যক্তির সঙ্গে গভীর আলাপচারিতায় মগ্ন।

স্থানটি পবিত্র মক্কা। দুনিয়ার প্রথম গৃহ বাইতুল্লাহর খানিকটা দূরে দু'ব্যক্তি সঙ্গোপনে আলাপে নিমগ্ন। দু'জনই দীর্ঘকায়, সুদর্শন ও টগবগে যুবক। উভয়ের মুখমণ্ডলে মিশমিশে কালো দাড়ি। পৌরুষ তাদের ব্যক্তিত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। দু'জনই কথা বলছে আরবী ভাষায়। তাদের একজন আবদুল কাদের আল জাযায়েরী, অপরজন শামিল। আলোচনার বিষয়বস্তু মুসলমানদের সাম্প্রতিক অধঃপতন। ইংরেজ, ফরাসী, রুশী সকলে মিলে ইসলামী সালতানাতের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলতে তৎপর। আফ্রিকার ইসলামী দেশগুলো ফরাসী সৈন্যদর করতলগত। হিন্দুস্তানে ইংরেজ সরকার নবাব সিরাজুদ্দৌলা ও সুলতান টিপুকে তাদের পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার পর এখন তারা সমগ্র ভারত উপমহাদেশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওসমানিয়া সালতানাতের দৃষ্টান্ত সেই দেহের ন্যায়, যার ভেতরটা খোলসে পরিণত হয়েছে। ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব মুসলমানদের শত্রুদেরকে আগ্নেয়াস্ত্রে সমৃদ্ধ করেছে। খঞ্জর, তরবারী ও বর্শার স্থান বন্দুক আর তোপ দখল করে নিয়েছে। কিন্তু মুসলমান সময়ের দাবি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদের কাছে উপাদানের অভাব নেই। কিন্তু সেইসব উপাদান তারা ব্যবহার করছে খেলাধুলা আর রং তামাশায়। ভয় হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী দৈত্যরা মুসলমানদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে না দেয়।

আবদুল কাদের আল জাযায়েরী ও শামিল দু'জনের কেউ শাসকও নয়, ধনবানও নয়। তবে তাদের হৃদয় ইসলামের প্রেম-ভালবাসায় সমৃদ্ধ। উভয়ে তারা জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তাদের মনের প্রত্যয়, মুসলমানদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে।

দীর্ঘ আলোচনার পর আবদুল কাদের আল জাযায়েরী বলে–

'ভাই শামিল! আর কথা বলে লাভ নেই। সময় নষ্ট না করে এবার আমাদের কাজে নেমে পড়া প্রয়োজন। আপনি আপনার এলাকায় গিয়ে মুসলমানদের সজাগ ও সংগঠিত করুন। আমি আফ্রিকায় ফরাসীদের সাথে বোঝাপড়া করবো। হিন্দুস্তান থেকে আগত মুসলমানদের মধ্যে যদি উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যায়, তাহলে সেই অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবেলা করার দায়িত্ব তার উপর সোপর্দ করা হবে। ভাই শামিল! জীবন বাজি রেখে হলেও এখনই আমাদের আপন আপন দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নষ্ট করার মতো সময় এখন আর আমাদের হাতে নেই।'

দুই বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পরস্পরে বিদায় নেয়। শামিল দাগেস্তান অভিমুখে রওনা হয় আর আবদুল কাদের আল- জাযায়েরী আরো কয়েক দিন মক্কায় অবস্থান করে নিজ মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

শামিল গমরী এসে পৌঁছে। সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান বিপুল সৈন্য তার চোখে পড়ে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারে, ইমাম গাজী মুহাম্মদ আদিরিয়ার প্রাণকেন্দ্র খোনজাক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আট হাজার সৈন্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

শামিলের গমরী ফেরার সংবাদ মুহূর্ত মধ্যে দাবানলের ন্যায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ইমাম গাজী মুহাম্মদও দৌড়ে আসেন। শামিলকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন– 'আল্লাহর শোকর, তুমি এখনো জীবিত আছো। বলো, প্রেমাস্পদের দীদার-মিলন নসীব হয়েছে তো?'

ঃ দীদার-মিলন এখনো কোনটিই কপালে জুটেনি। প্রেমাস্পদের ঘর দেখার সৌভাগ্য হাসিল হয়েছে মাত্র।

ঃ মনের মানুষটির গৃহদর্শনও কম কথা নয়। আসল উদ্দেশ্যও একদিন হাসিল হয়ে যাবে। যাক সে কথা, এসব পরে বলা যাবে। এখন আমার ইচ্ছে, তুমিও জিহাদে অংশগ্রহণ করো, আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

ঃ আপনি ইমাম হিসেবে আদেশ করলে আমি মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পরামর্শের প্রয়োজন হলে আমি বলবো, এখনো আক্রমণাত্মক জিহাদের সময় আসেনি।

ঃ আমি আদিরিয়ার শাসনকর্তী খানমকে শিক্ষা দেয়ার ফয়সালা গ্রহণ করেছি। তার নিকট পয়গাম পাঠানো হয়েছে, তুমি রাশিয়ানদের দাসত্ব বর্জন করো এবং তোমার স্বামী তার প্রজাতন্ত্রকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে, তুমি তার প্রতিবিধান করো। কিন্তু আমার কথা রাখতে সে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে আমি তার উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ইমাম হিসেবে তোমাকে আদেশ করছি, তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

শামিল আর দ্বি-মত করে না। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তুতি নিয়ে ইমাম গাজী মুহাম্মদের সাথে রওনা দেয়।

❖ ❖ ❖

আদিরিয়ার প্রাণকেন্দ্র খোনজাকে সাতশ পরিবারের অধিবাস। পাথর কেটে নির্মাণ করা হয়েছে বসতিটি। এটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে পরিচিত। চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। তাতে সর্বদা সশস্ত্র সৈন্যরা পাহারায় রত থাকে এবং বস্তিমুখী রাস্তাগুলোর নিরাপত্তা বিধান করে।

আদিরিয়ার বেশিরভাগ মানুষ গাজী মুহাম্মদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছে। কিন্তু খানম অবলম্বন করেছেন হঠকারিতার পথ। খোনজাকের মানুষ খানমের অনুগত। খানমের বদৌলতেই তারা রাশিয়ানদের থেকে বিপুল অর্থ লাভ করে থাকে এবং বিলাসী জীবন-যাপন করে। তাদের মধ্যে অনেক লোক এমনও আছে, যারা ইমাম গাজী মুহাম্মদের কঠোর নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে খানমের পক্ষ নিয়েছে।

মে ১৮৩০ সালের এক সকাল। গাজী মুহাম্মদ তাঁর আট হাজার সৈন্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করে খোনজাক অভিমুখে রওনা হন। এক ভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন গাজী মুহাম্মদ নিজে আর অপর ভাগের নেতৃত্বে শামিল। গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে কালো পতাকা উঁচিয়ে গাজী মুহাম্মদের আট হাজার সৈন্য খোনজাকের লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। বস্তির লোকেরা সংঘাতে না এসে অস্ত্রসমর্পণ করতে শুরু করে। সৈন্যরা বস্তির মধ্যখানে পৌঁছে থেমে যায়। গাজী মুহাম্মদ তাঁর নায়েবদেরকে আদেশ করেন– 'তোমরা বস্তির সর্বত্র ঘোষণা করে দাও, অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করলে সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হবে– কারো কোন ক্ষতি করা হবে না।'

গাজী মুহাম্মদের নায়েবগণ ঘোষণা দিতে শুরু করেন। ওদিকে খানম তার হাজার হাজার সিপাহীকে তিরস্কার করে বলতে শুরু করে– 'তোমরা যদি শত্রুর মোকাবেলায় লড়াই করতে ভয় পেয়ে থাকো, তাহলে পুরুষের পোশাক খুলে নারীর পোশাক পরিধান করো আর অস্ত্রগুলো আমাদের হাতে তুলে দাও; আমরা নারীরাই আক্রমণকারীদের প্রতিহত করবো। বিনা লড়াইয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে তোমাদের লজ্জা করা উচিত।'

খানমের এই বিদ্রূপাত্মক ভাষণ তার হীনবল সৈন্যদের প্রভাবিত করে। তাদের মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে খানমের হাজার হাজার সিপাহী পেছন দিক থেকে গাজী মুহাম্মদের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে বসে। গাজী মুহাম্মদের সৈন্যরা এই অতর্কিত আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। আক্রমণকারীদের সংখ্যা কতো, তাও তারা আন্দাজ করে ওঠতে পারেনি। মুহূর্ত মধ্যে গাজী মুহাম্মদের বিজয় শোচনীয় পরাজয়ে পরিণত হয়। শামিল তার পলায়নপর সৈন্যদের ঠেকাতে চেষ্টা করলে সৈন্যরা উল্টো তারই উপর আক্রমণ করে বসে। শামিল বড় কষ্টে নিজের প্রাণ রক্ষা করে। এই লড়াইয়ে গাজী মুহাম্মদের কয়েকশ সৈন্য প্রাণ হারায় আর অবশিষ্টরা খানমের বাহিনীর হাতে বন্দি হয়।

এই লড়াইয়ে ইমাম গাজী মুহাম্মাদের বিপুল ক্ষতি হয়। সর্বত্র খবর পৌঁছে যায়, গাজী মুহাম্মদের সৈন্যবাহিনী এক মহিলার হাতে পরাজয়বরণ করেছে। ফলে এক এক করে বিভিন্ন গোত্র খানমের আনুগত্য মেনে নিতে শুরু করে।

শামিল গাজী মুহাম্মদকে সান্ত্বনা দেয় এবং সাহস বৃদ্ধির জন্য বলে– 'ভাই! এই পরাজয়ে হিম্মত হারাবার কোনো কারণ নেই। নিতান্ত প্রতারণার জালে আটকা পড়ে আমাদের এই পরাজয় বরণ করতে হলো। অন্যথায় বিজয় আমাদের নিশ্চিত ছিলো। তবে আমি এখনো মনে করি, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এখনই জিহাদ শুরু করা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। একজন সাধারণ নারী যদি আমাদের আট হাজার

সৈন্যকে পরাজিত করতে পারে, তো লাখ লাখ প্রশিক্ষিত ও সুসংগঠিত রুশ সৈন্যের মোকাবেলা আমরা কীভাবে করবো? আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আপাতত আমাদের দক্ষ লোক তৈরি করা প্রায়োজন। প্রয়োজন মুসলমানদের সংগঠিত করা এবং তাদের মধ্যে জিহাদের স্পৃহা সৃষ্টি করা।'

ইমাম গাজী মুহাম্মদ বলেন- 'যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। জয়-পরাজয়ের মাঝেই তো মানুষের জীবন। এবার পরাজিত হয়েছি, ভবিষ্যতে জয় আমাদের পদচুম্বন করবেই। আমি অতীব উৎফুল্ল এই জন্য যে, আমি তোমার মত সঙ্গী পেয়ে গেছি। আমি বিশ্বাস করি, হাজারো রুশ সৈন্যের মোকাবেলায় তুমি একাই যথেষ্ট। তোমার যোগ্যতার আন্দাজ হয়তো তুমি নিজেও করতে পারছো না। আর সময় নষ্ট না করে এবার জিহাদের তাবলীগে বেরিয়ে পড়ো। আমার বিশ্বাস, তোমার কথায় জনমনে বেশ প্রভাব পড়বে।'

❁ ❁ ❁

কয়েক মাস পর ইমাম গাজী মুহাম্মদ পুনরায় রুশ বাহিনীর উপর হানা দিতে শুরু করেন। কয়েকটি অভিযানে তিনি বেশ সাফল্যও অর্জন করেন। তাতে তাঁর সবচে' বড় উপকার হয়েছে, এসব অভিযানের ফলে তাঁর নিকট রাশিয়ার সামরিক দুর্বলতাগুলো ধরা পড়ে গেছে।

রুশ সৈন্যরা গতানুগতিক পদ্ধতির যুদ্ধে অভ্যস্ত। তাদেরকে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে লড়াই করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। রুশী তোপখানা প্রথমে প্রতিপক্ষের মোর্চার উপর গোলাবর্ষণ করে। তারপর পদাতিক বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং কমান্ডারের আদেশক্রমে সামনে এগিয়ে আসে। কিন্তু গাজী মুহাম্মদ অবলম্বন করছেন গেরিলা যুদ্ধের পথ। রুশ বাহিনী পাহাড়ে কিংবা জঙ্গলে প্রবেশ করলে গাজী মুহাম্মদের 'মুরীদ বাহিনী' দ্রুত আক্রমণ করে বসে। এতে বহু রুশ সৈন্য আত্মসমর্পণ করার আগেই খাক-খুনের মাঝে ছটফট করে মারা যায়। আক্রমণকারী মুরীদ বাহিনী এলাকার অলিগলি সম্পর্কে সম্যক অবগত, সব তাদের মুখস্ত। পাহাড়ের অন্ধকার গুহা তাদের নিবাস। ঘন বৃক্ষরাজি তাদের মোর্চা। নদী-নালা তাদের আশ্রয়।

গাজী মুহাম্মদ ধীরে ধীরে সেসব এলাকার প্রতিও পা বাড়াতে শুরু করেন, যেখানকার অধিবাসীরা নিরপেক্ষ। কাফকাজের কয়েকটি গোত্র ঘোষণা করেছিলো, তারা কারো পক্ষপাতিত্ব করবে না। তারা রুশ-গাজী মুহাম্মদের লড়াইয়ে নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু এসব যুদ্ধে 'নিরপেক্ষতা' অর্থহীন প্রমাণিত হয়। যে এলাকা রাশিয়ানদের দখলে এসে যায়, সেখানকার অধিবাসীরা অনায়াসে তাদের পক্ষে চলে আসে। আবার গাজী মুহাম্মদ কোনো অঞ্চল দখলে আনলে তথাকার নিরপেক্ষ বাসিন্দারা তার মুরীদ হয়ে যায়।

এবার গাজী মুহাম্মদ তাঁর বক্তব্যের ধারায় পরিবর্তন আনেন। এখন তিনি যেখানেই যাচ্ছেন, তথাকার বাসিন্দাদের সমবেত করে বলছেন–

'বন্ধুগণ! আমি আপনাদের কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। বিশ্বস্ততার সাথে আপনারা তার জবাব দেবেন।'

ঃ বলুন তো, এই ভূখণ্ড আমাদের, না অন্য কারো?

ঃ আমাদের।

ঃ আমাদের স্বাধীন থাকা উচিত, না অন্যের গোলাম হয়ে?

ঃ স্বাধীন– পরিপূর্ণ স্বাধীন।

ঃ আচ্ছা, এমনটি কি সম্ভব যে, কোনো বহিঃশক্তি আমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে আর আমরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করবো?

ঃ না, এমনটি কখনো সম্ভব নয়।

ঃ নিজের মাতৃভূমি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা কি জিহাদ নয়?

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই জিহাদ।

ঃ আপনাদের মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা যদি হুমকির সম্মুখীন হয়, তাহলে কি আপনারা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বেন?

ঃ অবশ্যই, তখন আমরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

প্রশ্নোত্তর শেষ হলে গাজী মুহাম্মদ বলেন, তবে আপনারা গুরুত্বের সাথে আমার বক্তব্য শুনুন। রাশিয়ানরা কাফকাজের কয়েকটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছে। এখন সমস্ত অঞ্চল দখল করে তারা আমাদেরকে গোলাম বানাতে চাচ্ছে। দুশমন আমাদের উপর আঘাত করলো বলে। এখনোও কি আপনারা জাগ্রত হবেন না? আসুন, আমরা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, নিজেদের মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা শত্রুর কবল থেকে মুক্ত রাখি। অধিকৃত অঞ্চলগুলো থেকে শত্রু বাহিনীকে বিতাড়িত করি এবং তাদের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করি।

গাজী মুহাম্মদের দাওয়াতের এই পদ্ধতি জনমনে আশানুরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। অসংখ্য মানুষ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করে।

১৮৩০ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে গাজী মুহাম্মদের বেশ ক'টি অভিযান সফলতা লাভ করে। এতে তাঁর মনোবল বহুগুণ বেড়ে যায়। একই সালের নবেম্বর মাসে তিনি কাজলিয়ায় আক্রমণ করেন, যা ছিলো কাফকাজে রাশিয়ানদের একটি শক্ত ঘাঁটি। গাজী মুহাম্মদের সৈন্যরা কাজলিয়ায় এতো তীব্র আক্রমণ চালায় যে, রুশ সৈন্য ও তাদের স্থানীয় অনুগত বাহিনী তার মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। হাজার হাজার রুশ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বন্দি হয় অসংখ্য।

রুশ সেনাপতিদের একথা জানা ছিলো বটে যে, পাহাড়ে-জঙ্গলে বিদ্রোহীদের

শায়েস্তা করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বিদ্রোহীদের দমন করতে গেলে যে তা এক সুসংগঠিত আন্দোলনের জন্ম দেবে এবং তারা রুশ সৈন্যদের ছাউনিগুলোতেও আক্রমণ শুরু করবে, তাদের একথা জানা ছিলো না।

❁ ❁ ❁

জার নেকুলাই কাফকাজ বিজয়ের সুসংবাদ শোনবার জন্য সীমাহীন উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন। সময় যতো গড়ায়, তার অস্থিরতাও ততো বাড়তে থাকে। তার বিশ্বাস, কমান্ডার ইন চীফ ইতিমধ্যেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এখনো কাফকাজ জয়ের সংবাদ দিতে না পারাই তার অপরাধ।

কাফকাজের দক্ষিণাঞ্চল নাজরানে অবস্থিত রুশ সেনাবাহিনীর প্রসিদ্ধ একটি ছাউনি, যা 'কাফকাজের দ্বার' নামে খ্যাত। সকল রুশ সেনাপতি নাজরানের পথেই কাফকাজ প্রবেশ করে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে থাকে। এই শহরটি ইউরোপ ও এশিয়ার মিলনকেন্দ্র। জর্জিয়া এবং তার আশপাশের প্রজাতন্ত্রগুলোর রয়েছে নাজরানের সাথে ব্যাপক যোগাযোগ। প্রখ্যাত রুশ সেনাপতি ইয়ারমুলুক নাজরানে বিশাল এক ক্রুশ স্থাপন করে সদম্ভে ঘোষণা করেছিলো– 'আমি কাফকাজের দ্বারে ক্রুশ স্থাপন করে দিলাম। এবার কাফকাজের ভেতরও ক্রুশের শাসন চলবে।'

সেনাপতি ইয়ারমুলুক নাজরানকে রুশ সেনা ছাউনিতে পরিণত করার সীমাহীন চেষ্টা করেছিলো। হাজার হাজার শ্রমিক পাথর কাটতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। বহু সৈন্য এখানকার প্রচণ্ড শীতে ঠক্ ঠক্ করতে করতে প্রাণ হারিয়েছে। ইয়ারমুলুক জারকে আশ্বস্ত করেছিলো, নাজরানের সেনা ছাউনি স্থাপনের কাজ শেষ হয়ে গেলেই কাফকাজ জয়ের পথ সুগম হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে নাজরান একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্রের রূপ ধারণ করে। নাজরানের হাট-বাজারে রাশিয়ার পণ্যসামগ্রী ছাড়া কাফকাজের বিভিন্ন এলাকার দুর্লভ হস্তশিল্প সামগ্রীও চোখে পড়তে শুরু করে।

শহরের অদূরে দীর্ঘায়তন একটি পাহাড়ে গভর্নর হাউসের জৌলুসময় এক বিশাল অট্টালিকা। গভর্নর তার বিলাসবহুল কক্ষে দাঁড়িয়ে গভীর দৃষ্টিতে দেয়ালে ঝুলন্ত মানচিত্র দেখছেন। নিকটেই দণ্ডায়মান সেনাপতি রোজন। এক পর্যায়ে সেনাপতি রোজনকে উদ্দেশ করে গভর্নর বললেন–

সেনাপতি! চিন্তা-ভাবনা করে শিগগিরই একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করো। শাহেনশাহ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। ম্যাপ দেখে আমি কোনো দিক-নির্দেশনা পাচ্ছি না। সর্বত্র পাহাড় আর পাহাড়। না জানি এ অঞ্চল কতো উঁচু আর কতো দুর্গম।

ওদিকে হঠাৎ শহরে দু'অশ্বারোহী রুশ সেনা অনুপ্রবেশ করে। নাজরানের সীমান্তবর্তী চৌকি থেকে এসেছে তারা। গভর্নরের জন্য তারা সংবাদ নিয়ে

এসেছে, কাজী মোল্লা (রাশিয়ানরা গাজী মুহাম্মদকে কাজী মোল্লা নামে অভিহিত করে) কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে উত্তরদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পথে রুশ সৈন্যদের কয়েকটি গ্রুপের সঙ্গে তাদের সংঘাত হয়েছে। রুশ সৈন্যরা তাদের গতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রুশ সৈন্যদের হটিয়ে দিয়ে তারা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

গাজী মুহাম্মদের অভিযানের সংবাদ পাওয়ামাত্র গভর্নর হাউসে বড় বড় রুশ অফিসারদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। নগরীর হাট-বাজারের জৌলুস নিষ্প্রভ হয়ে যায়। দোকানীরা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র সরিয়ে দোকান খালি করে ফেলে। নগদ অর্থ-কড়ি, সোনা- দানা গোপন ও নিরাপদ স্থানে লুকাতে শুরু করে।

সমগ্র নগরীতে এক অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একজনের সঙ্গে অপরজনের দেখা হলেই জিজ্ঞেস করছে, কোন সংবাদ পাওয়া গেছে কি? চরম উৎকণ্ঠার মধ্যদিয়ে দিন অতিবাহিত হয়।

আকাশে সন্ধ্যাতারা উদিত হয়েছে। এমন সময়ে দু'টি গাড়ি গভর্নর হাউসে প্রবেশ করে। প্রত্যেক গাড়িতে একজন করে রুশ সৈন্য ও দু'জন স্থানীয় লোক উপবিষ্ট। দু'সৈন্য ও চার স্থানীয় ব্যক্তি গাড়ি থেকে নেমে গভর্নরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গভর্নর তাদের সঙ্গে করমর্দন করে ইঙ্গিতে তাদেরকে সামনের সোফায় বসতে বলে।

চার স্থানীয় ব্যক্তির প্রত্যেকে কাফকাজের সীমান্ত এলাকার গোত্রনেতা। রুশ অফিসাররা অর্থকড়ি দিয়ে তাদের থেকে অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছে যে, তারা গাজী মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কাজ করবে। গভর্নর তাদের চারজনের হাতে চার থলে স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিয়ে বললেন–

'আপনারা যদি কাজী মোল্লার সৈন্যদের পরাস্ত করতে সক্ষম হন, তাহলে আপনাদেরকে আরো পুরস্কার প্রদান করা হবে। আপনারা যা দাবি করবেন তা-ই দেয়া হবে। আপনাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য উপযুক্ত ভাতা মঞ্জুর করা হবে। লড়াইয়ে কামিয়াব না হলেও প্রতিশ্রুত পুরস্কার থেকে আপনারা বঞ্চিত হবেন না। এই লড়াইয়ে আপনাদের কেউ মারা গেলে, তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করা হবে।'

কিছুক্ষণ পর চার গোত্র নেতা আনন্দচিত্তে হাসিমুখে হাউস থেকে বেরিয়ে এলো এবং একটি গাড়িতে করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। তাদের বিদায় দিয়ে রুশ গভর্নর তার সামরিক উপদেষ্টাদের সাথে মতবিনিময়ে রত হন। গভর্নর বললেন–

'বিদ্রোহীদের গোত্রে গোত্রে সংঘাত সৃষ্টি করার মধ্যেই আমাদের সফলতা নিহিত। যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা একে অপরের মুখোমুখি না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত

আমাদের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে। বর্তমানে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, যাতে এই সব ক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যদের যতো কম ব্যবহার করা যায়।'

গভর্নর ও তার সামরিক উপদেষ্টাগণ কয়েকজন সীমান্তবর্তী গোত্র নেতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ায় বেশ উৎফুল্ল। এ জন্য তারা উৎসবেরও আয়োজন করেছে। লাল শরাব আর সুন্দরী নারী নিয়ে মেতে ওঠেছে তারা। রাতভর চলবে তাদের এই আনন্দ-উৎসব।

মধ্যরাত। হঠাৎ আরো একটি গাড়ি গভর্নর হাউসের সদর দ্বারে এসে থেমে যায়। সশস্ত্র দ্বাররক্ষী হাউসে প্রবেশের ছাড়পত্র দেখে দরজা খুলে দেয়। গাড়ি ভেতরে প্রবেশ করে এবং মুহূর্ত মধ্যে এক স্থানীয় ব্যক্তি দ্রুত হাউস থেকে বের হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গাড়িটি প্রবেশ করার পর গোটা গভর্নর হাউসে এক থমথমে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গভর্নরের সব আনন্দ-উল্লাস বেদনায় পরিণত হয়। গভর্নর ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার গাড়ির নিকট দণ্ডায়মান। ভেতরে সেই চার গোত্র নেতার বিচ্ছিন্ন মস্তক, যারা এই কয়েক ঘন্টা পূর্বে থলেভর্তি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার নিয়ে হসিমুখে হাউস থেকে বিদায় নিয়েছিলো।

রুশ গভর্নর ও সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোর সঙ্গে যে মতবিনিময় ও চুক্তি হয়েছিলো, ইমাম গাজী মুহাম্মদের গুপ্তচররা বিস্তারিতভাবে সব জেনে গেছে। গোত্র নেতারা গভর্নর হাউসের দিকে রওনা হওয়ার পর গাজী মুহাম্মদের কয়েকজন জানবাজ সৈন্য পথে ওঁৎ পেতে থাকে। রুশ গভর্নরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্বর্ণভর্তি থলে নিয়ে তারা যখন ফেরত রওনা হয়, তখন গাজী মুহাম্মদের সৈন্যরা তাদের গতিরোধ করে তরবারীর আঘাতে দেহ থেকে তাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারপর এক জানবাজ চারজনের কর্তিত চারটি মাথা এবং একজনের পকেট থেকে গভর্নর হাউসের প্রবেশপত্র নিয়ে গাড়িতে চড়ে গভর্নর হাউসে ঢুকে পড়ে এবং বিশ্বাসঘাতকদের কর্তিত মস্তক উপহার দিয়ে হাউস থেকে বেরিয়ে আসে।

রুশীদের সঙ্গে সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোর দহরম-মহরমের কথা জানতে পেরে গাজী মুহাম্মদ তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। নাজরান আক্রমণের পরিবর্তে তিনি সেই বিশ্বাসঘাতক গোত্রগুলোকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেন। গাজী মুহাম্মদের সৈন্যরা 'গাদ্দার-কাফের' শ্লোগান তুলে বস্তিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্থানীয় রণনীতি মোতাবেক দু'পক্ষে যুদ্ধ হয়। গোত্রগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। গাজী মুহাম্মদকেও বেশ ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

সীমান্তবর্তী বিশ্বাসঘাতক গোত্রগুলোর উপর কার্যকরী অভিযান শেষে গাজী

মুহাম্মদ দাগেস্তান চলে যান। তাঁর আপাতত উদ্দেশ্য, শত্রু বধ করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাওয়া। অগ্রাভিযান বা পিছুটান তার পক্ষে কোনো ব্যাপার নয়। সফল আক্রমণই তার মূল লক্ষ্য।

ছয়.

গাজী মুহাম্মদ ঝড়ের মতো এসে বিদ্যুদ্বেগে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু তার এই আক্রমণ অপরাপর সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোর মধ্যে চরম আতংক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। রুশ গভর্নর এবং সেনাবাহিনীও বিচলিত হয়ে পড়েছে। তারা গোত্রে গোত্রে যে সংঘাত সৃষ্টি করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলো, গাজী মুহাম্মদ তা নস্যাৎ করে দিয়ে প্রমাণ করেন, স্থানীয় যারা তার মোকাবেলায় আসবে, তারাই গাদ্দার বলে অভিহিত হবে– রাশিয়ানদের গোমস্তা বলে আখ্যা পাবে।

জার রুশ কাফকাজ জয়ের সংবাদ শোনার জন্য ব্যাকুল, অস্থির।

দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার ব্যাপক এক আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কয়েক লক্ষ রুশসেনা ভারী তোপ ও গোলাবারূদ নিয়ে পাহাড়-জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। সেনাপতি উইলিয়ামিনভ এই আক্রমণ অভিযানের ইনচার্জ। তার সুস্পষ্ট আদেশ– 'যাত্রাপথে যা কিছু চোখে পড়বে, সব তছনছ করে দেবে। একটি বাসগৃহ, একটি জনবসতি, কোনো শস্যক্ষেত, কোনো বাগানও যেনো অক্ষত না থাকে। বিদ্রোহীদের নারী-শিশু এমনকি পশুপাল পর্যন্ত যা সেখানে পাবে, অক্ষত ও জীবন্ত ছাড়বে না।'

সেনাপতি উইলিয়ামিনভ পঁচিশ হাজার রুশ সেনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে তাদের আদেশ দেন, যেনো তারা বিদ্যুদ্বেগে দাগেস্তান পৌঁছে যায় এবং অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে কাজী মোল্লাকে জীবন্ত কিংবা মৃত ধরে নিয়ে আসে। সেনাপতি সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেন–

'আমাদের প্রধান সেনাপতি দ্রাগোমিরভের একটি মূল্যবান উক্তি স্মরণ রাখবে যে, যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক দায়িত্ব পালন করে থাকে। অস্ত্রের ভূমিকা দ্বিতীয় পর্যায়ের। বিজয় তাদেরই কপালে জোটে, যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে। দুশমনকে সেই সৈন্যই বধ করে, যে জানবাজি রেখে লড়াই করার সাহস রাখে। নিজেকে নিরাপদ রেখে শত্রু হত্যা করার প্রচেষ্টা বোকামীসুলভ কল্পনা মাত্র। যে সৈন্য মৃত্যুকে ভয় করে, সে কাপুরুষ– যুদ্ধের ময়দানে তার থেকে কিছুই আশা করা যায় না। রুশ সেনাবাহিনীর মর্যাদা এখন তোমাদের হাতে। তোমাদের অধিকাংশ সৈন্য যদি রণক্ষেত্রে মারাও যায় আর তার বিনিময়ে কাজী মোল্লা নিহত বা গ্রেফতার হয়, তবে রুশ সৈন্যদের ইজ্জত রক্ষা পাবে। পক্ষান্তরে কাজী মোল্লাকে হত্যা বা গ্রেফতার করতে না পারলে, তোমরা

প্রত্যেকে সহীহ-সালামতে ফিরে আসলেও আমাদের মান বাঁচবে না। শাহেনশাহ উদ্বিগ্নচিত্তে আমাদের পানে তাকিয়ে আছেন।'

গাজী মুহাম্মদের গুপ্তচরগণ রুশ সেনাপতির এই পরিকল্পনার সংবাদ তাঁকে জানিয়ে দেয়। সংবাদ শুনে গাজী মুহাম্মদ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পরামর্শের জন্য শামিলের নিকট ছুটে যান। বিস্তারিত শুনে শামিল বললো, তাহলে শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো, আমি যার আশংকা করেছিলাম। এ কারণেই আমি আপনাকে তাড়াহুড়া করতে বারণ করেছিলাম। এখন কয়েক লাখ রুশ সৈন্য শক্তিশালী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত আর আমরা কিনা এখনও অসংগঠিত, আনাড়ি। আমাদের অস্ত্রের মজুদও অপর্যাপ্ত। এতো ব্যাপক আক্রমণের সংবাদ শুনলে কেউ-ই আমাদের সহযোগিতা করতে রাজি হবে না। এখন আফসোস করলেও লাভ হবে না, বিচলিত হলেও কাজ হবে না। জীবন বাজি রেখে হলেও এই হামলা প্রতিহত করার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। আমার অভিমত, আমাদের পৈত্রিক বসতি গমরীতে মোর্চা স্থাপন করে দুশমনের মোকাবেলা করা ভালো হবে। জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। যা হওয়ার তা-ই হবে। এখন আর আমাদের পিছু হটার কোনো সুযোগ নেই।

ইমাম গাজী মুহাম্মদ তাঁর অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে গমরীতে মোর্চা স্থাপন করেন।

গমরীর পূর্বে চব্বিশ মাইল ব্যবধানে 'তমীরখানশুরা' নামক ছয় বর্গমাইল সমতল জায়গাজুড়ে এক ময়দান। এটিই রুশ সেনাদের সেই কেন্দ্রীয় সেনা ছাউনী, কাফকাজ জয়ের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত। যে উপত্যকার কূল ঘেঁষে গমরীর অবস্থান, গমরী থেকে তা এক মাইল নীচে। গরমীর আশপাশের পাহাড় থেকে কোনো ঈগলের পক্ষেই কেবল উপত্যকায় ছোঁ মেরে মুহূর্ত মধ্যে শিকার করে ফিরে আসা সম্ভব। কিন্তু একজন মানুষকে নীচে যেতে হলে তাকে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করেই তবে উপত্যকায় পৌঁছুতে হবে।

শামিল পরিকল্পনা নেয় , স্বাধীনতাকামী মুজাহিদগণ গমরীর থেকে নীচের উপত্যকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। বড় বড় পাথর ও ঘন ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে বসে যাবে তারা। রুশ সৈন্যরা আক্রমণ করলে মুজাহিদরা অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কচুকাটা করতে থাকবে। রুশ সৈন্যদের গমরী পর্যন্ত যদি পৌঁছতেই হয়, চরম ক্ষতি স্বীকার করার পরেই-তবে পৌঁছবে।

উইলিয়ামিনভ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দুরন্ত সেনাপতি। নিজ হেডকোয়ার্টারে বসে গমরী পর্যন্ত পৌঁছানোর সবক'টি পথের নির্দেশনা নিচ্ছেন তিনি। অধীন অফিসাররা তাকে জানায়, গমরীর পেছনে এমন একটি পাহাড়ের অবস্থান রয়েছে, যা নিতান্তই দুর্গম।

সেনাপতি উইলিয়ামিনভ তার নায়েব কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করেন, ঐ পাহাড়ে কি কুকুর উঠতে পারে?

নায়েব কামান্ডার বললো, কুকুর কোনো রকমে উঠতে পারে বলেই তো জানি।

সেনাপতি উইলিয়ামিনভ বললেন, কুকুরের জন্য যে পথ অগম্য নয়, রুশ সৈন্যদের সে পথে গমন করা সম্ভব। তাছাড়া আমাদের সৈন্যদের এ পথে যাওয়া এ জন্যও আবশ্যক যে, বিদ্রোহীদের বিশ্বাসে আমাদের আঘাত করতে হবে। যে বিষয়টিকে তারা অসম্ভব ভেবে বসে আছে, আমরা তাকে সম্ভব করে দেখাবো। তবেই আমাদের সঙ্গে তাদের সংঘাত সৃষ্টির সাহসে ধস নামবে।

নায়েব কমান্ডার বলে, আমাদের পাহাড়ে ওঠার সময় দুমশন যদি টের পেয়ে যায়, তাহলে তারা আমাদেরকে মুরগীর মতো জবাই করে হত্যা করবে। ওরা কতো বড় দুর্ধর্ষ, আপনি বোধ হয় জানেন না।

সেনাপতি উইলিয়ামিনভ বললেন, তুমি চিন্তা করো না। আমার কিছু সৈন্য এমন রয়েছে, যারা এ কাজে বেশ্ পারদর্শী। রাতের আঁধারেই তারা এ কঠিন কাজ সমাধা করে ফেলবে। দেখানোর জন্য আমরা সাধারণ পথে আক্রমণ চালাবো। তাতে দুশমন মনে করবে, হামলা সামনের দিক থেকেই এসেছে। আমাদের পেছন পথের অভিযানের কথা তারা টেরও পাবে না। এই সুযোগে আমাদের পাহাড়ে অবস্থানকারী সৈন্যরা হঠাৎ গমরীতে ঢুকে এলোপাতাড়ি আক্রমণ শুরু করবে। তাদের আক্রমণের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে বিদ্রোহীরা হয় অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করবে নতুবা পালিয়ে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু পালাবার সব পথ আগেই আমরা বন্ধ করে রাখবো। ফলে তারা আমাদের শিকারে পরিণত হবে।

রুশ সেনাপতি উইলিয়ামিনভ তার ধৈর্য, সহনশীলতা ও বিচক্ষণতার জন্য সকলের কাছে একজন জনপ্রিয় অফিসার হিসেবে খ্যাত। বহুবার বীরত্ব ও পারদর্শিতার পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন। এ জন্য দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার তাকে গমরী আক্রমণের আদেশ দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে লিখে পাঠান–

'কাজী মোল্লাকে শায়েস্তা করার জন্য আমি আমার এক শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে প্রেরণ করেছি। আমার এই সেনাপতি কখনো কোনো অভিযানে পরাজিত হয়নি। এবারও হবে না। আপনি সুসংবাদের অপেক্ষায় থাকুন।'

✿ ✿ ✿

১৮৩২ সালের অক্টোবর মাসের ১২ তারিখ। লড়াই শুরু হয়ে গেছে। সেনাপতি উইলিয়ামিনভের এক একজন সৈন্য প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে। গাজী মুহাম্মদের সৈন্যদের প্রত্যাঘাতে তারা মরছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সম্মুখপানে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। প্রতিপক্ষের তরবারীর আঘাতে একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে আর অন্য সহযোদ্ধারা তার রক্তাক্ত লাশ মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

সেনাপতি উইলিয়ামিনভ গমরী থেকে আধা মাইল নীচে একখণ্ড পাথরের

উপর উপবিষ্ট। মুখে তার সিগারেট, চোখে দূরবীন। আশপাশে তার অধীন অফিসাররা নির্দেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। মুজাহিদরা তাদের বাংকারসমূহ থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এক অফিসারের গায়ে মুজাহিদদের গুলী বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে সেনাপতি উইলিয়ামিনভের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। আহত অফিসারকে হাত দ্বারা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন– 'দয়া করে ওদিকে পড়ো, আমাকে ডিস্টার্ব করো না।'

সন্ধ্যা হওয়া মাত্র যুদ্ধ থেমে যায়। রাতে লড়াই বন্ধ থাকে। পরদিন পুনরায় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়।

১৬ অক্টোবর রাতে সেনাপতি উইলিয়ামিনভ ফিল্ড হেডকোয়ার্টারে অফিসারদের বৈঠক তলব করেন। যথাসময়ে অফিসারগণ বৈঠকে হাজির হয়। সেনাপতি অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–

'গমরীর পেছন দিক থেকে আক্রমণের আয়োজন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমাদের সৈন্যরা আজ রাতে তাদের অভিযান শুরু করবে। আগামীকাল ১৭ অক্টোবর যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। আর অতিদ্রুত ফয়সালা একটা হয়ে যাওয়াই দরকার।'

এক অধীন অফিসার : মাননীয় সেনাপতি! কিন্তু এমনটি কি আশা করা যায় যে, কাজী মোল্লা গমরীর পেছনে পাহারার ব্যবস্থা করেনি?

উইলিয়ামিনভ : (অট্টহাসি হেসে) বোকা কোথাকার! আমি বলছি, সব আয়োজন সম্পন্ন। সমস্যা বলতে কিছু নেই। কাজী মোল্লা পাহারার ব্যবস্থা করেছিলো ঠিক; কিন্তু পাহারাদার হামজা বেগ এখন আর কাজী মোল্লার লোক নয়, এখন সে আমাদের লোক। (নিজের পকেটে হাত রেখে) এখন সে এই এখানে।

১৭ অক্টোবর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রুশ তোপখানা ভারী থেকে ভারী গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। হাজার হাজার রুশ সৈন্য জীবন বাজি রেখে রাতারাতি তোপগুলোকে গমরীর নিকটে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তোপের ভারী গোলা গাজী মুহাম্মদের মোর্চাসমূহে আঘাত হানতে শুরু করলে তাঁর পাথরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলো বালির দেয়াল বলে প্রমাণিত হয়। মুজাহিদরা মাটি খুঁড়ে এমন সব বাংকারও নির্মাণ করে রেখেছিলো, গোলাবর্ষণে যার কোনো ক্ষতি করা যায় না। কিন্তু হঠাৎ গমরীর পেছন থেকে বৃষ্টির মত গুলী আসতে শুরু করলে মুজাহিদরা ঘাবড়ে যায়। খোঁজ নিয়ে গাজী মুহাম্মদ হামজা বেগের কোন সন্ধান পাচ্ছেন না। পাল্টে যায় যুদ্ধের গতি। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, দিশেহারা মুজাহিদরা তাদের শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে সেই শোকগাঁথা আবৃতি করতে শুরু করে, যা স্থানীয় যোদ্ধারা এমনি করুণ মুহূর্তে পাঠ করে থাকে–

'ওরে আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ! তোমরা শুনে রাখো, সাক্ষী থাকো, দুশমনের মোকাবেলায় লড়াইয়ে আমরা বিন্দুমাত্র অবহেলা

করিনি। আমরা যুদ্ধ করেছি, যেভাবে যুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিলো। আমাদের একজন সৈনিকও রণক্ষেত্রে পিছপা হয়নি। কেউ পিঠে আঘাত পায়নি। আমরা প্রত্যেক মুজাহিদ দুশমনকে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি। এমন বীরের মতো মৃত্যুকে সামনে দেখেও আমরা হাসছি। আমাদের মধ্যে একজন মুজাহিদও কেউ এমন খুঁজে পাবে না, মৃত্যুকে যে ভয় করে।'

জানবাজ মুজাহিদগণ আঞ্চলিক নিয়ম মোতাবেক এক সারিতে দাঁড়িয়ে যায়। তারা তাদের কোমর থেকে বেল্ট খুলে পায়ে পায়ে বেঁধে নেয়। যুদ্ধে মৃত্যু অবধারিত প্রমাণিত হলে এমনটি করা ছিলো তাদের আঞ্চলিক রীতি। এভাবে তারা বুঝাতে চেষ্টা করতো যে, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছে, মৃত্যুর ভয়ে কেউ পিছপা হয়নি।

এছাড়া আরো বহু মুজাহিদ বাংকারে অবস্থান করছিলো। রুশ সৈন্যদের সঙ্গে পায়ে পায়ে লড়ে যাচ্ছিলো তারা। গর্ত থেকে বের হয়ে কিংবা পাথরের আড়াল থেকে সরে এসে একজন করে রুশ সৈন্যদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। বন্দুকের ম্যাগজিন শূন্য করে এবার তরবারী চালনা করছে। সবশেষে খঞ্জরের ধার পরীক্ষা করছে। এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের হাত কোনো না কোনো রুশ সৈন্যের বুকের দিকে তাক করে আছে। সর্বত্র লাশ আর লাশ। এই লাশের অধিকাংশই রুশ সৈন্যদের। আহতদের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছে গমরীর আকাশ-বাতাস। রাস্তাঘাটে-নালা-নর্দমায় রক্ত এমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, যেমন মুষলধারা বৃষ্টির পানি ।

গমরীর এক প্রান্তে এক বিস্ময়কর অথচ ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়ে। পঞ্চাশজন রুশ সৈন্য এবং আঠারজন মুজাহিদ পরস্পর মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত। লড়তে লড়তে তারা এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যে, তার সামান্য পরেই কয়েকশ' ফুট গভীর এক গর্ত। এক মুজাহিদ তিন রুশ সৈন্যের কবলে। শেষবারের মতো সে হঠাৎ তার হাতের তরবারীটি ছুঁড়ে ফেলে এক রুশ সৈন্যকে জড়িয়ে ধরে গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই লড়াইয়ে জীবনে রক্ষা পাওয়া এক রুশ সৈন্য পরে জানায়, গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর মৃত্যুর মুখে পতিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মুজাহিদ রুশ সৈন্যটিকে খঞ্জর দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। তার দেখাদেখি অবশিষ্ট সতেরজন মুজাহিদের চৌদ্দজনও একই পন্থা অবলম্বন করে। অবশিষ্ট তিনজন গর্তে ঝাঁপ দেয়ার আগেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত দশ হাজারেও বেশি রুশ সৈন্য চতুর্দিক থেকে ঘেরাও সংকীর্ণ করে বস্তির সেই অংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে এই মাত্র পাঁচশ মুজাহিদ মৃত্যুর সঙ্গে বুঝাপড়া করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তন্মধ্যে সেই জানবাজ মুজাহিদগণও

আছে, যাদের পা পরস্পরে বাঁধা। রুশ সৈন্যরা ক্রমান্বয়ে ঘেরাও ছোট করে মুজাহিদদের নিকট আগ্রসর হচ্ছে। তাদের সঙ্গে মুজাহিদদের তুমুল লড়াই হয়।

মাগিরবের সময় গাজী মুহাম্মদ তাঁর সৈন্যদের সংখ্যা গণনা করেন। তখন জীবিত আছে মাত্র বিশজন মুজাহিদ। শামিল ও গাজী মুহাম্মদ বাদে আঠারজন।

এই বিশ মুজাহিদ তাকবীর ধ্বনি তুলে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাতাড়ি খঞ্জর, তরবারি, পাথর ইত্যাদি যার নিকট যা আছে ছুঁড়তে থাকে। কার গুলি কাকে গিয়ে আঘাত করবে, তা ভাববার ফুরসৎ নেই।

দীর্ঘকায় এক মুজাহিদ ব্যাঘ্রের ন্যায় লড়ে যাচ্ছে। রুশ কমান্ডার তার উপর ফায়ার করার আদেশ দেয়। মুহূর্ত মধ্যে মুজাহিদ বিদ্যুদ্বেগে সরে দাঁড়ায়। বাম হাতের তরবারি দ্বারা আঘাত করে তিন রুশ সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু আরেক সৈন্য অতর্কিতে তার দেহে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে। রুশ সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তারপর নিজের জীবনটা নিয়ে রাতের আঁধারে মিলিয়ে যায়। এ সবকিছু ঘটে মাত্র কয়েক ঘন্টায়।

সেনাপতি উইলিয়ামিনভের আশংকা ছিলো, গাজী মুহাম্মদ জীবিত পালিয়ে যেতে পারে। তাই তার আদেশে সকল রুশ সৈন্য গমরীর চারদিকে সারারাত সতর্ক প্রহরায় দাঁড়িয়ে থাকে।

পরদিন ভোর হওয়ামাত্র গাজী মুহাম্মদের অনুসন্ধান এবং নিহত লোকদের গণনা শুরু হয়। গমরী আক্রমণকারী বিশেষ কোর্সের দশ হাজার সৈন্যের সাড়ে তিন হাজার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আহত হয় প্রায় শোয়া দু'হাজার। গোটা বস্তিতে খুঁজে মুজাহিদদের লাশ পাওয়া গেল মাত্র ৬শ' ৯৮টি। একটি লাশ পাওয়া যায় গমরীর মসজিদের নিকটে। অসংখ্য বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তার সমস্ত দেহ। এটি দাগেস্তানের প্রথম ইমাম গাজী মুহাম্মদের লাশ।

কাজী মোল্লার লাশ প্রাপ্তির খবর শুনে সেনাপতি উইলিয়ামিনভ পাগলের মতো চিৎকার শুরু করে দেন– 'আমি যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। আমি জারকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি, কাফকাজ জয় হয়ে গেছে। বিদ্রোহীদের ইমাম শেষ হয়ে গেছে। সমগ্র কাফকাজে তার লাশ প্রদর্শনীর আয়োজন করো। আমি কাফকাজ বিজেতা আদেশ করছি, এই বিদ্রোহীর লাশ প্রতিটি অঞ্চলের প্রত্যেক মানুষের দেখার ব্যবস্থা করা হোক। আর হ্যাঁ, আমার সৈন্যগণ! তোমরা বিজয়োল্লাস করতে পারো। ব্যাপক আকারে উৎসবের আয়োজন করো। এবার পিটার আজম ও রানী ক্যাথরাইনের আত্মা খুশি হবে। জার নেকুলাই'র আকাঙ্খা তার জীবদ্দশাতেই পূরণ হলো।'

উল্লেখ্য যে, সুলতান টিপু শহীদের লাশ দেখে এক ইংরেজ সৈন্যও এমনিভাবে উল্লাস প্রকাশ করেছিলো।

০০০

সেনাপতি উইলিয়ামিনভ যখন গমরীতে তার সৈন্যদেরকে বিজয় উৎসব পালনের আদেশ দিচ্ছেন, ঠিক সে সময়ে গমরীর কয়েক মাইল দূরে উঁচু বস্তির সন্নিকটে একটি গর্তে পড়ে আছে গুরুতর আহত এক মুজাহিদের অচেতন দেহ। তার ক্ষতস্থান থেকে প্রবাহমান টাটকা লাল রক্ত বৃত্ত রচনা করে গর্তের বাহির পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে জমাট হয়ে আছে। গর্তের নিকটেই একটি ঝরনা। ঝরনায় যেতে হলে এই গর্তের কূল ঘেঁষেই যেতে হয়।

খানিকটা বেলা হলে উঁচু বস্তির কয়েকটি মেয়ে কলসি কাঁখে ঝরনা থেকে পানি নিতে আসে। চলার পথে হঠাৎ নালার জমাটবাঁধা রক্তরেখার উপর এক মেয়ের চোখ পড়ে। থমকে দাঁড়িয়ে রক্তের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। বান্ধবীদের ডেকে বললো, যোহরা, ফাতেমা! দেখো তো এগুলো কী?

তারা নিকটে এসে দেখে বলে, এতো রক্ত! গর্তের ভেতর থেকে প্রবাহিত হয়ে এ পর্যন্ত এসে গেছে!

যোহরা বললো, কোনো জন্তু আহত হয়েছে বোধ হয়।

ফাতেমা বললো, তোমরা কি ভুলে গেছো, গতকাল গমরীতে কি এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়ে গেছে? গমরীর প্রতিটি ইট এখন রক্তরঞ্জিত। গতকালের যুদ্ধে প্রবাহিত রক্তে সব লাল হয়ে গেছে। বিচিত্র কি, গমরীর মুজাহিদদের রক্ত বইতে বইতে এ পর্যন্ত এসেছে! তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি দেখে আসি।

কাঁখের কলসিটি মাটিতে রেখে পাথর বেয়ে ফাতেমা উপরে উঠে যায়। গর্তের প্রতি উঁকি দিয়ে দেখামাত্র ফাতেমার মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে, আরে এক মুরীদ... জখমী... শহীদ!

ফাতেমা লোকটাকে চেনার চেষ্টা করে। আরো নিকটে গিয়ে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেই ফাতেমা চিৎকার করে ওঠে, আরে ইনি যে সেই ঘোড়সওয়ার...। ইনি যে শামিল...। ইয়া আল্লাহ! ইনি যেনো তিনি না হন। ইয়া আল্লাহ! ইনি যদি জীবিত থাকেন, তবে যেনো তিনিই হন!

ফাতেমার চিৎকার শুনে অন্য মেয়েরাও গর্তের কাছে দৌড়ে আসে। দেখে যোহরাও বলে ওঠে, ফাতেমা! সত্যিই ইনি সেই ঘোড়সওয়ার... সেই শামিল! ফাতেমা নীরব। খানিকটা সামনে অগ্রসর হয়ে ফাতেমা নিথর দেহটির মাথায় হাত বুলায়। তারপর শিরায় হাত রেখে আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে– জীবিত। এখনও ইনি জীবিত! কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বেদনাহত কণ্ঠে বলে, তবে শেষ পর্যন্ত জীবনে রক্ষা পাবে কিনা কে জানে!

গর্ত থেকে বের হয়ে মেয়েরা পরামর্শ করে, এখন কী করা যায়। একজন বললো, কিছুই করার প্রয়োজন নেই। ওকে এভাবে রেখেই এসো আমরা চলে যাই। আরেকজন বললো, না একজন তাজাপ্রাণ মুজাহিদকে এভাবে ধুঁকে ধুঁকে

মরতে দেয়া যায় না। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, ফাতেমার বাবা-মাকে ঘটনাটি অবহিত করা হবে। কিন্তু আহত লোকটি কে, তা এলাকার কাউকে জানানো যাবে না। মেয়েদের জানা ছিলো, লোকটি গমরীর লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ বলে রাশিয়ানরা অবশ্যই তাকে খুঁজে ফিরবে।

কলসিতে পানি ভরে মেয়েরা সোজা ডাক্তার আবদুল আজীজের ঘরে চলে যায়। দেখে ফাতেমার মা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার, পানি নিয়ে সবাই আমার ঘরে কেনো, এতো পানির তো আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সকলেই নীরব, কারো মুখে রা নেই।

ফাতেমা কাঁখের কলসিটি মাটিতে রেখে দ্রুত পিতার নিকট গিয়ে বলে, আব্বাজান! ঝরনার কাছে যে একটি গর্ত আছে, তাতে একজন গুরুতর আহত লোক অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। লোকটি মুরীদ। সম্ভবত গতকালের লড়াইয়ে আহত হয়েছে।

ঃ তুমি কি করে জানলে , লোকটি মুরীদ?

ঃ তার দেহ থেকে প্রবাহিত রক্তের রেখা নীচ পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে। রক্তের রেখা দেখে আমরা গর্তের নিকট গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছি। গায়ে তার মুরীদের পোশাক, মুখে দাড়ি। অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত তার দেহ। আমি হাত দিয়ে দেখেছি, এখনও শিরা নড়ছে, আপনি যদি...।

ঃ (মেয়েদের উদ্দেশ করে) তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে, রুশ সৈন্যরা মুরীদদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমাদের দেখে আসা সেই জখমীর চিকিৎসা করে কিংবা তাকে ঘরে তুলে আমি গ্রামের লোকদেরকে বিপদে ফেলতে চাই না। তোমরা নিজ নিজ কাজে চলে যাও। আল্লাহর ইচ্ছা হলে লোকটি এমনিতেই বেঁচে যাবে।

আবদুল আজীজের কথায় অন্যান্য মেয়েরা চলে যায়। কিন্তু ফাতেমা যেনো কিছুই শুনতে রাজি নয়। পিতার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে। একটু সাহস সঞ্চয় করে ফাতেমা বললো, কিন্তু আব্বাজান! উনি যে মুজাহিদ! ওনার জীবন...।

ঃ মা, তুমি চিন্তা করো না। তোমার পিতা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করবে না। কিন্তু তুমি হয়তো জানো যে, শত্রুপক্ষের গুপ্তচররা আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব কাজ আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে আঞ্জাম দিতে হবে। জলদি করে তুমি কিছু গরম দুধ আর সামান্য মধু নিয়ে এসো। এক লোটা গরম পানিরও ব্যবস্থা করো। আমি তোমার মামাকে নিয়ে আসছি। তবে সাবধান! কাউকে কিছু বলবে না কিন্তু।

কিছুক্ষণ পর দু'জন লোক চুপি চুপি গর্তে প্রবেশ করে। একজন ডাক্তার

আবদুল আজীজ, অপরজন তার শ্যালক। গর্তে নেমে প্রথমে তারা গরম দুধ ও মধু জখমীর মুখে দেয়। তারপর ক্ষতস্থানগুলোতে ওষুধ প্রয়োগ করতে শুরু করে। জখমীর দেহে দু'টি গুলী বিদ্ধ হয়ে আছে। ছোরার আঘাতপ্রাপ্ত জখমের সংখ্যা বাইশটি। ফুসফুসে আঘাত লেগেছে। পাজরের তিনটি হাড় কেটে গেছে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে ডাক্তার আবদুল আজীজ তার শ্যালককে বললেন, ভাই! ঘটনাটি সম্পূর্ণ অলৌকিক! এতো মারাত্মক জখম হওয়া সত্ত্বেও লোকটি বেঁচে আছে!

দ্বি-প্রহরের সময় ডাক্তার আবদুল আজীজ ঘরে গিয়ে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং কিছু ঔষধ নিয়ে আসেন। সারাদিন চিকিৎসাকার্য সম্পাদন করে সন্ধ্যাবেলা তারা দু'জন ঘরে ফিরে যান। আবদুল আজীজের শ্যালক তার ভাগিনাকে ডেকে বলে, আহমদ! জলদি যাও, তোমার দু'ভাইকে ডেকে নিয়ে আসো। বলবে, আব্বাজান তোমাদের ডাকছেন।

অল্পক্ষণ পর আহমদ তার দু' মামাতো ভাইকে নিয়ে আসে। এবার তারা পাঁচজন চুপিসারে ঘর থেকে বের হয়ে জখমীর কাছে চলে যায়। ইশার নামাযের সময় থেকে তারা জখমীকে তুলে আবদুল আজীজের ঘরে নিয়ে আসে।

আবদুল আজীজের প্রশস্ত খোলামেলা ঘরের একেবারে পেছনের কক্ষের খাটের উপর জখমীকে শুইয়ে দেয়া হয়। ফাতেমা তার সেবা-শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আহত যুবক শামিল। এই সেই শামিল, ফাতেমাকে ভালোবাসা এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে যাকে অনেক তিরস্কার শুনতে হয়েছিলো। সেই ফাতেমা আজ তার জখমে পট্টি বাঁধছে, তার সেবা করছে। কিন্তু শামিল অচেতন-বেঁহুশ।

অপর কক্ষে আবদুল আজীজ, তার শ্যালক এবং তাদের উভয়ের ছেলেরা ফিসফিস করে কথা বলছে। আহমদ বললো, মামা! ইনি যে শামিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ সতর্ক আলাপচারিতার পর তারা যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দচিত্তে পুনরায় শামিলের কক্ষে প্রবেশ করে। আবদুল আজীজ সকলকে সাবধান করে বলে দেন, এ যে শামিল, ফাতেমা যেনো কিছুতেই বুঝতে না পারে!

দু'দিন পর শামিলের জ্ঞান ফিরে আসে এবং দ্রুত সুস্থতা লাভ করতে থাকে।

দশ-পনেরদিন পর অজ্ঞাত-পরিচয় রহস্যময় এক ব্যক্তি আবদুল আজীজের ঘরের দরজায় করাঘাত করে। আবদুল আজীজের পুত্র আহমদ দরজা খুলে তার পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চায়।

আগন্তুক বললো, তোমার পিতার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত করতে হবে। আহমদ আগন্তুককে ঘরে বসিয়ে পিতাকে সংবাদ দিতে যায়। ডাক্তার আবদুল আজীজ তখন শামিলের জখমে পট্টি বাঁধছেন।

সংবাদ পেয়ে আবদুল আজীজ সালাম দিয়ে আগন্তুকের কক্ষে প্রবেশ করেন। আগন্তুক উঠে তার সঙ্গে মুসাফাহা করে বললো, আমি আপনার জখমী মেহমান সম্পর্কে কিছু কথা বলতে এসেছি।

ঃ জখমী... মেহমান...! না, এখানে কোনো জখমী বা মেহমান নেই! আমি আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না।

ঃ ডাক্তার আবদুল আজীজ! আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি বহুদূর থেকে এসেছি। আপনার জখমী মেহমান কে, তা হয়তো আপনার জানা নেই।

ঃ আমার ঘরে না হলে এ মুহূর্তে আমি আপনাকে মজা দেখিয়ে ছাড়তাম। আপনি আমাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করছেন।

ঃ ডাক্তার আবদুল আজীজ! আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। প্রয়োজনে তল্লাশি করে দেখতে পারেন। আপনি শান্ত হোন। চিনতে পারেননি বলেই আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমাকে জখমীর কাছে নিয়ে চলুন। সে যদি আমাকে চিনতে না পারে, তাহলে আপনি আমাকে খুন করতে পারেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার এখানে আগমনের সংবাদ আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমার ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীও নয়। আমার ব্যাপারে আপনাকে কেউ-ই কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

আবদুল আজীজ মাথা ঝুঁকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। তারপর বললেন, আচ্ছা আসুন। কিন্তু মনে রাখবেন, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে আবদুল আজীজ শামিলের কক্ষে প্রবেশ করেন। মেহমানকে দেখেই শামিল উঠে বসার চেষ্টা করে এবং বলে, পীর ও মুরশিদ, আপনি! কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আমি উঠে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারছি না!

ডাক্তার আবদুল আজীজকে উদ্দেশ করে শামিল বললো, মুহতারাম! ইনি আমার মুরশিদ, দীনের পথের রাহবার, এরাগলের পীর, শায়েখে দাগেস্তান মোল্লা মুহাম্মদ।

আগন্তুকের পরিচয় পেয়ে ডাক্তার আবদুল আজীজ অভিভূত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'হাত চেপে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, মুহতারাম! আমি আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছি, সবই সতর্কতার খাতিরে করেছি। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আশা করি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আবদুল আজীজ ফাতেমাকে ডেকে বললেন, মা, জলদি খাবারের আয়োজন করো। আমাদের ঘরে আজ এক মহান ব্যক্তি মেহমান হয়েছেন।

ঃ আবদুল আজীজ! আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। শামিলের জীবন রক্ষা

করে তুমি সমগ্র কাফকাজের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছো। আমি তোমার নিকট একটি আবেদন নিয়ে এসেছি। আশা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।

ঃ পীর ও মুরশিদ! আদেশ করুন।

ঃ তুমি তো ডাক্তার। তোমার ধারণা কী— শামিল কি সম্পূর্ণ সুস্থ্য হবে?

ঃ ক্ষত অনেকটা শুকিয়ে গেছে। আশংকা কেটে গেছে। আমি আশা করি, শামিল সম্পূর্ণরূপে সুস্থ্য হয়ে যাবে।

ঃ তোমার জানা আছে, শামিলের পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন গমরীর লড়াইয়ে শহীদ হয়েছে। ওর মা এবং বোন কোথাও আত্মগোপন করে আছে। ওর পিতা হয়ে আমি তোমার নিকট এসেছি...।

ঃ আপনার অনুমতি হলে অন্য কক্ষে বসে আমরা এ বিষয়ে আলাপ করি।

ঃ না, ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক— বালেগ। আমি যা করতে চাচ্ছি, তা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ নয়। শামিল ফাতেমার পাণিপ্রার্থী। আর দেশের জন্য শামিলের প্রয়োজন তীব্র। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার পুত্র আহমাদের হাতে আমার মেয়েকে তুলে দেবো। কিন্তু আমার শামিলের জন্য ফাতেমাকে চাই। সময় বড় কঠিন। গান্দার এখন সমাজের নেতা। এই জখমী নওজোয়ানই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। আমার করজোড় আবেদন, শামিল সুস্থ্য হলে ফাতেমাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিও। (পকেট থেকে কিছু অলংকার বের করে) আর শামিলের পিতার পক্ষ থেকে কনের জন্য এই উপহার। অবাঞ্ছিত রেওয়াজ-রসম পরিহার করবে। আমার হয়তো দ্বিতীয়বার আর আসা হবে না। মানুষের জীবন-মৃত্যু সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তোমার কন্যা জীবনে এমন সম্মান লাভ করবে, যার কল্পনাও তোমরা করতে পারছো না।

ঃ আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি গর্বিত এই জন্য যে, মানুষের কাছে আমি বলতে পারবো, শায়খে দাগেস্তান মোল্লা মুহাম্মদ আমার মেয়েকে পুত্রবধূ বানাতে এসেছিলেন।

ঃ 'সময় মতো সকলেই সব জানতে পারবে। (তারপর শামিলকে উদ্দেশ করে) বাবা! তুমি এখন তোমার হবু শ্বশুরের ঘরে আছো। আমি আমার দায়িত্ব পালন করে গেলাম। জালিমরা গাজী মুহাম্মদকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এ দেশের ভবিষ্যৎ এখন তোমার হাতে। বিশ্বাসঘাতক হামযা বেগ ইমাম সেজে বসেছে। তুমি সুস্থ্য হয়ে এবং বিয়ের কাজ সম্পাদন করে মূল দায়িত্বের প্রতি মনোনিবেশ করবে। তবে সবকিছু করবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং সতর্কতার সাথে... আল্লাহ্ হাফেজ।'

শায়খে এরাগল মোল্লা মুহাম্মদ ডাক্তার আবদুল আজীজের ঘর থেকে বের হয়ে অজানার উদ্দেশ্যে হারিয়ে যান।

সাত.

প্রথম জার নেকুলাই সেন্টপিটার্সবার্গে তার শাহী মহলে বসে রাণীর সঙ্গে খোশ-গল্পে মেতে আছেন। এমন সময়ে এক দাসী দৌড়ে এসে মহলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বললো, আলমপনাহ এবং শ্রদ্ধেয়া রাণীর কল্যাণ হোক। মহারাজের খাস খাদেম একটি সুসংবাদ শোনাবার অনুমতি প্রার্থনা করছে।

জার নেকুলাই আনন্দের আতিশয্যে আরাম কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– 'উপস্থিত করো তাকে, জলদি উপস্থিত করো।'

দাসী বাইরে চলে যায়। কয়েক মুহূর্ত পর খাস খাদেম যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করে জানায়, মহান রাজাধিরাজের মর্যাদা বুলন্দ হোক, কাফকাজ জয় হয়েছে। বিদ্রোহীদের নেতা নিহত হয়েছে। কমান্ডারের দূত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনানোর জন্য বাইরে অপেক্ষমান।

জার নিজের গলা থেকে মুক্তার মহামূল্যবান হার খুলে খাদেমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও পুরস্কার– তোমার সুসংবাদের পুরস্কার। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা আমার জীবদ্দশায় পূরণ হয়েছে, এ-ই আমার জীবনের সবচে' বড় পাওয়া। বিস্তারিত বিবরণ দরবারে শুনবো। দরবারের উজীরকে বিজয় উৎসবের ঘোষণা দিতে এবং বিশেষ উৎসবের আয়োজন করতে বলে দাও। (আরেকটি হার খাদেমের হাতে দিয়ে) এটি দূতের জন্য সুসংবাদ বহনের পুরস্কার।

রাশিয়ার রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গে কাফকাজ জয়ের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডারের রিপোর্ট মোতাবেক সেনাপতি উইলিয়ামিনভকে বীরত্বের রাজটিকা পরিয়ে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং তার স্থলে আরেক সেনাপতিকে কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। বিজয় উৎসবের পর সেনা অফিসার তার হেডকোয়ার্টারে পৌছে যায়।

সেনা অফিসার কাফকাজে যুদ্ধ লড়তে বাধ্য। কারণ, এটা জার নেকুলাই'র অলংঘনীয় আদেশ। কিন্তু সেনা অফিসার নিশ্চিত জানে, কাফকাজে যুদ্ধের জন্য হাত বাড়ানো পাগলামী সুলভ পদক্ষেপ বৈ নয়! কিন্তু তার মনের কথাটা তিনি ব্যক্ত করতে পারছেন না। তিনি জানেন, কাফকাজের প্রতিটি মানুষ স্বাধীনচেতা। এই ভূখণ্ডের আকাশছোঁয়া পর্বতরাজি, বিক্ষুব্ধ নদ-নদী ও গহীন অরণ্যে জারের রাজত্ব অচল। কাফকাজের আলাদা বৈশিষ্ট্যের পরিবেশই কাফকাজবাসীদের স্বাধীন চরিত্রের রূপকার। তাদের মনের দৃঢ়তা পাহাড়ের মতো উঁচু, তাদের চেতনা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য এবং জীবন তাদের বনের বৃক্ষরাজির ন্যায় এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত। সুনির্দিষ্ট কোনোও নিয়ম-নীতির আওতায় তাদের আবদ্ধ করা অসম্ভব। সিংহকে খাচায় আবদ্ধ করা সম্ভব; কিন্তু তাদের চরিত্রের পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সিংহকে হত্যা করা যায়, কিন্তু সিংহশাবক বড় হয়ে এক সময়ে সিংহেরই রূপ ধারণ করে, সিংহের পদাংকই অনুসরণ করে চলে।

এই বাস্তবতা জার নেকুলাই'র দৃষ্টির বাইরে। তার কর্ণ 'রাষ্ট্রদ্রোহীতা', 'বিদ্রোহ', 'আদেশ লংঘন' এসব শব্দের সঙ্গে অপরিচিত। কেউ জারের ইচ্ছার বিপরীত চিন্তা করলেও সে সাইবেরিয়ার 'শীতল জাহান্নামে' মৃত্যু অপেক্ষাও কঠিন জীবনযাপনে বাধ্য হয়। এক অঞ্চলে এক বিদ্রোহীকে দমন করলে অপর এলাকায় আরেক বিদ্রোহী যে জন্ম নিতে পারে, তা তার নিকট অবোধগম্য। জারের সোজা বুঝ, বিদ্রোহী শিক্ষামূলক উপযুক্ত সাজা পেলে বিদ্রোহের ধারণাই চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

দাগেস্তানের সর্বত্র শোকের ছায়া বিরাজমান। প্রথম ইমাম গাজী মুহাম্মদ শহীদের সঙ্গীদের মধ্যে শামিল ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। লড়াইয়ে হামযা বেগের গাদ্দারী ভূমিকার কথা শামিল ছাড়া আর কেউ জানে না। হামযা বেগ যদি গমরীর পেছনের পাহাড়ের দিক থেকে রুশ সৈন্যদের আক্রমণ করার সুযোগ না দিতো, তাহলে এই লড়াইয়ের ফলাফল ভিন্ন রকম হতো।

শামিল এখন নিখোঁজ। মানুষের ধারণা, সেও শহীদ হয়েছে। রুশ সেনাপতি হামযা বেগকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, গাজী মুহাম্মদ নিহত হলে রুশ শাহেনশাহ'র পক্ষ থেকে তাকে দাগেস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হবে। রুশ কমান্ডার এবং হামযা বেগের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদনে আসলান বেগ নামক আদিরিয়ার এক গোত্রের খান মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলো। আসলান বেগ এক তীরে দু'টি শিকার করে। এক. রাশিয়ানদের সহানুভূতি লাভ। দুই. কাজী মুহাম্মদের ক্রমবর্ধমান শক্তি খতম।

গমরীর লড়াইয়ের পর হামযা বেগ কিছুদিন তার গভর্নর নিযুক্তির ঘোষণা পাওয়ার অপেক্ষায় দিন কাটায়। কিন্তু যখন রুশ সৈন্যরা কাফকাজের স্থানীয় কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে শুরু করে, তখন হামযা বেগের চোখ খোলে। এবার সে টের পায়, রুশ কমান্ডার তার সাথে প্রতারণা করেছে। হামযা বেগ মধ্যস্থতাকারী গোত্র নেতা আসলান বেগের শরণাপন্ন হয়। আসলান বেগ ইতিমধ্যে হামযা বেগকে তার আরেকটি স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখে। আসলান আদিরিয়ার খানমের কন্যা সুলতানার প্রতি আসক্ত। সুলতানাকে বিয়ে করার জন্য সে অস্থির-বেকারার। কিন্তু খানম তার চারত্রহীনতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই সরাসরি সে আসলানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

গমরীর লড়াইয়ে নিজের অবদানের সূত্র ধরে আসলান রুশ অফিসারদের মনে খানমের প্রতি কু-ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার এই তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এবার সে খানম ও রুশ কমান্ডার উভয় পক্ষকে পেরেশান করার পরিকল্পনা গ্রহণ

করে। সে হামযা বেগকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করে, খানম রাশিয়ানদেরকে এই বলে প্ররোচিত করেছে যে, দাগেস্তানী কোনো গোত্র হামযা বেগের আনুগত্য মেনে নিতে রাজি নয়। হামযা বেগের আনুগত্য মেনে নেয়ার পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করাকে তারা অধিক শ্রেয় মনে করে। খানমের চক্রান্তের ফলেই রাশিয়ানরা তোমাকে গভর্নর নিযুক্তির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে।

আসলান হামযা বেগকে বুঝাতে চেষ্টা করে, গাজী মুহাম্মাদের শাহাদাতের পর ময়দান এখন শূন্য। তুমি এমনিতেই তো গাজী মুহাম্মদের অন্যতম নায়েব ছিলে। এবার তুমি নিজেকে ইমাম বলে ঘোষণা করো। আমার কিছু লোককে আমি তোমার সহযোগিতায় নিয়োজিত করে দেবো। প্রথমে তারা তোমার আনুগত্য মেনে নেবে, তোমার হাতে বায়আত করবে। তাদের দেখাদেখি ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষও তোমার হাতে বায়আত গ্রহণ করতে শুরু করবে। নেপথ্য থেকে আমি তোমার সম্ভাব্য সব সহযোগিতা করে যাবো। রাশিয়ানদের গতিবিধি সম্পর্কে আমিই তোমাকে অবহিত করতে থাকবো। যথাসময়ে আমি প্রকাশ্যে তোমার সঙ্গে যোগ দেবো।

গমরীর রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের কয়েকদিন পর হামযা বেগ গমরীর মসজিদে প্রবেশ করে। সঙ্গে সত্তর-আশিজন লোক। এরা পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক তার হাতে বায়আত করে। তারপর হামযা বেগের ইমাম হওয়ার কথা ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। এরা সকলে আসলানের অনুচর।

হামযা বেগ একজন সুযোগ সন্ধানী, লোলুপ ও স্বার্থপর মানুষ। তার কাছে না আছে দীন-ধর্মের তোয়াক্কা, না আছে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের মূল্য। এই ঈমান বিক্রয়কারীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই কাফকাজের স্বাধীনতাকামী মুরীদদের অবর্ণনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো।

কাফকাজের খানরা অনেক সময় সাধারণ পরিবারের মেয়েদের বিয়ে করতো। তাদের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তানরা সেই উঁচু মর্যাদায় আসীন হতে পারতো না, যা খান ও খানজাদাদের সন্তানরা লাভ করতো। হামযা বেগের পিতা খান ঠিক; কিন্তু তার মা ছিলো একজন সাধারণ মহিলা। সুযোগ বুঝে দোস্ত-দুশমন পরিবর্তন করা ছিলো তার নিত্যদিনের ঘটনা। আরবী-ফার্সী ছাড়া জর্জিয়ান ভাষায়ও তার দখল ছিলো। ছিলো বেশ চাপাবাজ। এ কারণে গাজী মুহাম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর অতি দ্রুত সে তার আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ধীরে ধীরে সমগ্র দাগেস্তানে বরং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহেও হামযা বেগের নাম ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

এদিকে দু'-তিন মাস পর শামিলের ক্ষত সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। শামিল পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভ করে। আবদুল আজীজ ফাতেমার সঙ্গে বিয়ের কার্য সম্পাদন করার

কথা বললে শামিল পনের দিনের সময় প্রার্থনা করে বললো, চাঁদের একুশ তারিখে আমি বারাত নিয়ে আসছি।

আবদুল আজীজ শামিলকে বুঝাতে চেষ্টা করেন, রাশিয়ানরা তোমার মাথার মূল্য ধার্য করে রেখেছে। তারা ঘোষণা করেছে, তোমাকে নিহত কিংবা জীবিত ধরে দিতে পারলে তিনশ রোবল পুরস্কার দেয়া হবে। আমি শায়েখে দাগেস্তান মোল্লা মুহাম্মদের আদেশ মোতাবেক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে চাই। তাছাড়া বারাত আনবে তুমি কোত্থেকে?

শামিল বললো, সে আমার ব্যাপার। আজ পর্যন্ত আমি কখনও কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

রাতের আঁধারে শামিল ডাক্তার আবদুল আজীজের ঘর থেকে বিদায় নিয়ে মা ও বোনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এলাকার লোকেরা শামিলকে তার মা-বোনের সন্ধান দেয়। দু'জন বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে শামিল তার বোনকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। এক বস্তিতে ছোট একটি ঘরের ব্যবস্থা করে মায়ের অনুমতি নিয়ে শামিল বিয়ের আয়োজন শুরু করে দেয়।

● ● ●

এক রাত। তমীরখানশোরার শূন্য আকাশ গুলির শব্দে গর্জে ওঠে। দু' অশ্বারোহী রুশ ফৌজি ক্যাম্পের নিকট পৌঁছে যায়। সশস্ত্র প্রহরীদের আত্মসংবরণ করার সুযোগ না দিয়েই তারা ক্যাম্পে ফায়ার করে বসে। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে চোখের পলকে কিছু গরম পোশাক ও কয়েকটি রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসে এবং মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া হয়ে যায়। ক্যাম্পের রুশ সৈন্যরা পরিস্থিতি টের পেয়ে অন্ধকারে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে। কিন্তু সব ব্যর্থ। শত্রু এখন তাদের নাগালের বাইরে।

এই দু' অশ্বারোহী শামিলের বন্ধু। শামিলের বিয়েতে বর-কনেকে উপহার দেয়ার জন্যই তাদের এই অভিযান। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক চাঁদের একুশ তারিখে শামিল তার মা, সহোদরা এবং কিছু আত্মীয়-বন্ধুসহ আবদুল আজীজের বাড়িতে উপস্থিত হয়। যথাসময়ে শামিল-ফাতেমার বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। শামিলের মা ও বোন বর-কনে উভয়কে সুখী ভবিষ্যতের দু'আ দিয়ে ফিরে যায়।

কয়েক মাসের মধ্যে দাগেস্তানের আকাশ পুনরায় রুশ বিরোধী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। শামিলের গ্রেফতারীর আশংকাও অনেকটা কেটে যায়। কিন্তু শামিল আত্মগোপন করে আছে। গভীরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে সে।

শামিল-ফাতেমা পরস্পর জান-প্রাণ আসক্ত। অনুপম প্রেম-ভালোবাসায় তাদের বাসগৃহ যেনো ক্ষুদ্র একটি জান্নাত। এক বছর পর তাদের হৃদয় বাগিচায় অঙ্কুরিত হয় হৃদয়কাড়া এক গোলাপকলি। ফাতেমার কোলে জন্ম নেয় ফুটফুটে

এক পুত্র সন্তান। তাদের দাম্পত্য জীবনের আশা-আকাংখা কানায় কানায় ভরে যায়। শামিল তার এই শিশু পুত্রের নাম রাখে জামালুদ্দীন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা। শামিল তার ঘরের বারান্দায় ঘাসের স্তূপের উপর বসে আছে। ফাতেমা রান্না করছে। শিশু জামালুদ্দীন ঘুমাচ্ছে। এ সময় হঠাৎ করে শামিলের বোন ঘরে প্রবেশ করে কোনো ভূমিকা ছাড়াই শামিলকে তিরস্কার করে বলতে শুরু করে– 'ভাই! তুমি না বীর যুবক? তুমি না সিংহ? সোয়াটি বছর কেটে গেলো, এখনোও বুঝি তোমার ক্ষত শুকায়নি? ধিক্ তোমাকে! দাগেস্তানে তোমার মতো কাপুরুষ মুরীদ বোধ হয় আর একজনও জন্মায়নি! যে মায়েদের সন্তানদের তুমি গমরীতে রাশিয়ানদের হাতে যবাই করিয়েছিলে, যে বোনদের ভাইয়েরা গমরী রণাঙ্গনে শহীদ হয়েছিলো, যে অবুঝ শিশুদের পিতারা সেদিন নিহত হয়েছিলো, তাদের আর্তনাদ-আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠেছে, আর তুমি কিনা এখানে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আহলাদ-আমোদে মেতে আছো। শুধু আমিই বলছি না, সকলের মুখে একই কথা, শামিল যদি জিন্দা থাকে, তো কোথায় সে? কেনো সে আত্মগোপন করে গা বাঁচিয়ে বসে আছে? বৃদ্ধা মায়েরা জানতে চায়, সেই বীর যুবকের আত্মমর্যাদাবোধ কোথায় গেলো, যাকে আমরা সিংহ মনে করতাম?'

বোনের এই শ্লেষাত্মক মন্তব্য শুনে শামিল দাঁত কড় মড় করে গর্জে ওঠে। প্রচণ্ড রাগে-ক্ষোভে উচ্চ শব্দে বলে, ব্যস, অনেক হয়েছে, থামো এবার, থামো বলছি।'

শামিলের গায়ের লোম কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে যায়। সমস্ত দেহে তার কম্পন ধরে যায়। দু'চোখ থেকে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে যেনো। যেনো আক্রমণোদ্যত এক আহত সিংহ।

শামিল নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সামনে তার সব অন্ধকার হয়ে যায়। যে বোনের তিরস্কারে শামিলের এই অবস্থা, সেই বোন চীৎকার করে 'ভাই আমার' বলে জড়িয়ে ধরে। ফাতেমা দৌড়ে এসে স্বামীকে ঘরে তুলে আনার চেষ্টা করে। আঘাত খেয়ে শামিলের বুকের কাছের জখম তাজা হয়ে যায়। দর দর করে রক্ত ঝরতে শুরু করে। ভাইয়ের জখমের টাটকা রক্তে বোনের ওড়না লাল হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর শামিলের জ্ঞান ফিরে আসে। বোন লজ্জাবনত কণ্ঠে বলে– 'ভাইজান! আমাকে ক্ষমা করে দিন। মানুষের তিরস্কার শুনে আমি আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেছিলাম। না বুঝে আমি আপনার অনেক ক্ষতি করেছি। বাস্তবিক, আপনার ক্ষত এখনোও সম্পূর্ণ শুকায়নি। আপনি আমায় মাফ করে দিন।'

শামিল উঠে দাঁড়ায়। নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়ে তরবারী ও খঞ্জর হাতে তুলে নেয়। বোনকে বলে– 'তুমি তোমার ভাবী- ভাতিজাকে নিয়ে গমরী চলে এসো, আমি যাচ্ছি।'

শামিল ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং এক লাফে সামান্য দূরে দণ্ডায়মান ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। খঞ্জর দ্বারা ঘোড়ার গলায় বাঁধা রশি কেটে দিয়ে যিন-লাগাম ছাড়াই ঘোড়া হাঁকাতে শুরু করে।

দরজায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে ফাতেমা বিড় বিড় করে বলে ওঠে– 'ইয়া আল্লাহ! তুমি ওর মঙ্গল করো। যিন নেই, লাগাম নেই, ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। আল্লাহ! তুমি ওর সহায় হও।'

ফাতেমার ননদের চেহারা আনন্দে জ্বল জ্বল করতে শুরু করে। সে ফাতেমাকে বলে– 'ভাবী! তুমি একটুও চিন্তা করো না। দীর্ঘদিন পর আমি সেই শামিলকে দেখতে পেলাম, গমরীর মানুষ যাকে সিংহ বলে জানতো। আমার অগ্রজ ভারী আনন্দ পাচ্ছে ভাবী! চল আর বিলম্ব না করে আমরা রওনা করি।'

হামজা বেগ গমরীতে তার সেনাবাহিনী পরিদর্শন করছেন। ঠিক এ সময়ে একদিক থেকে শোরগোলের শব্দ ভেসে আসে– 'ঐতো শামিল এসে গেছে, ঐতো শামিল এসে গেছে।'

শুনে হামজা বেগ প্রথমে কিছুটা পেরেশান হয়ে পড়ে। পরে কী যেনো চিন্তা করে সৈন্যদের আদেশ দেয়– 'আমার মুরীদগণ! আমার মুজাহিদ বন্ধুগণ! মহান আল্লাহ আজ এক অকুতোভয় বীর মুজাহিদকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। এখানে পৌঁছামাত্র তোমরা তাকে সালাম করবে, সাদর অভ্যর্থনা জানাবে।'

শামিল হামজা বেগের সৈন্যদের নিকটে এসে পৌঁছালে সৈন্যরা তাকে সালাম করে, অভ্যর্থনা জানায়। শামিল অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে সৈন্যদের সারিতে দাঁড়িয়ে যায়। দেখে হামজা বেগ বলে– 'বীর জওয়ান! তোমার স্থান এটা নয়। তুমি আমার কাছে এসো। আজ থেকে তুমি আমার নায়েব। আমার পরেই তোমার স্থান।'

শামিল হামজা বেগের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। হামজা বেগের আদেশে সৈন্যরা তাকে পুনরায় সালাম করে। তারপর হামজা বেগ সৈন্যদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে চলে যেতে এবং পরদিন সকালে আবার সমবেত হতে আদেশ করে। শামিলকে নিয়ে হামজা বেগ গমরীর মসজিদে গিয়ে সে জায়গায় বসে পড়ে, যেখানে ইমাম গাজী মুহাম্মদ শাহাদাত লাভ করেছিলেন।

হামজা বেগ বললো, শামিল! তোমার আগমনে আমি এতো আনন্দিত হয়েছি যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে? এখনই বা তোমার পরিকল্পনা কী?

ঃ অতীতের কথা উল্লেখ না করাই আমি ভালো মনে করি। আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জিহাদ– শুধুই জিহাদ। আপনি নিশ্চয় দেখেছেন, এখানে এসেই আমি আপনার সৈনিকদের সারিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম।

ঃ কিন্তু তোমার জন্ম তো সাধারণ সৈনিকের সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার জন্য নয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহ তোমাকে হাজারো সৈনিকের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমি আশা করি, আমার নায়েব হয়ে তুমি দেশ ও জাতির প্রভূত সেবা করতে পারবে। এখন আর আমি তোমাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখতে চাই না। ঘরে যাও, মা-বোনের সাথে সাক্ষাৎ করো। বাকি আলোচনা আগামীকাল হবে।

শামিল চলে যাওয়ার পর হামজা বেগের দুই খাছ উপদেষ্টা তার নিকটে আসে এবং এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে সতর্কতার সাথে বলে, এ আপনি কী করলেন? শামিলকে আপনি নায়েব নিযুক্ত করলেন! শামিল যে গাজী মুহাম্মদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, তা কি আপনি ভুলে গেলেন?

ঃ শামিলকে তোমার চে' আমি ভালো জানি। শামিল নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী মানুষ। তদুপরি সম্ভ্রান্ত ও দুঃসাহসী মুজাহিদ। জিহাদ-ই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমি যতোক্ষণ পর্যন্ত রুশ হানাদার এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখবো, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যাপারে কোনো আশংকা নেই। রণক্ষেত্রে সকলের অগ্রণী ভূমিকা পালন করার মতো মানুষ সে। বীরত্ব এবং দুঃসাহসিকতায়ও তার জুড়ি মিলবে না। এমন এক মহান বীর মুজাহিদকে সাধারণ সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করা অযৌক্তিক। তোমাদের জানা নেই, গমরীর লড়াইয়ে হাজার হাজার রুশ সৈন্যের বেষ্টনী ভেদ করে একমাত্র শামিল প্রাণ রক্ষা করে পালাতে সক্ষম হয়েছিলো। অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছিলো সে। এমন বীর-বাহাদুরকে আমাদের ভয় করার কোনো কারণ নেই। আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস ও অকৃত্রিম আস্থা নিয়েই শামিলকে আমার নায়েব নিযুক্ত করেছি যে, সে আমার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হবে না এবং শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো কাজও করবে না।

এদিকে শামিল তার ঘরে মায়ের এক প্রশ্নের জবাবে বলছিলো, আম্মাজান! কুদরতের ফয়সালা মাথা পেতে মেনে নিতেই হয়। বর্তমানে হামজা বেগ দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমি তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। গাদ্দারী করলে তাকে শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। আল্লাহ যা ফয়সালা করেন, তার ব্যতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

শামিল দায়িত্ব গ্রহণের পর হামজা বেগের সেনাবাহিনীতে নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এক নবজীবন লাভ করে যেনো তারা। শামিলের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীতে পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের কাজ জোরেশোরে শুরু হয়ে যায়। শামিলের দক্ষতার ছোঁয়া পেয়ে হামজা বেগের জিহাদী অভিযান ব্যাপক গতি লাভ করে। তার মন আদিরিয়ার শাসক খানমের প্রতিশোধ চিন্তায় বিভোর।

হামজা বেগের পরিকল্পনা, প্রথমে খানমকে শায়েস্তা করতে হবে, তারপর রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে হবে।

শামিলের দক্ষ নেতৃত্বে খানমের বিরুদ্ধে হামজা বেগের সামরিক প্রস্তুতির পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। জিহাদের মুবাল্লিগগণ আদিরিয়ার দূর-দূরান্ত অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে খানমের সহযোগী-সমর্থকের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। আগে যারা খানমের বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করতেও ভীত ছিলো, এখন তারা স্পষ্ট বলছে, আমাদের দুশমনের বন্ধু আমাদের বন্ধু হতে পারে না। দুশমনের আগে তাদের অনুচর-গোমস্তাদের খতম করতে হবে।

হামজা বেগ তার নিষ্ঠা ও সততার প্রমাণ দেয়ার জন্য সবরকম আরাম-আয়েশ বর্জন করে নিতান্ত সরল জীবন অবলম্বন করেন। মাটিতে ঘুমান, অধিক সময় ইবাদত-বন্দেগীতে কাটান।

একদিন সৈন্য পরিদর্শন করার সময় হামজা বেগ আদেশ করেন– 'তোমাদের মধ্য থেকে এমন একজন সিপাহী আমার নিকটে আসো, যে নিজেকে অধিক শক্তিশালী মনে করে।' কিন্তু স্বেচ্ছায় কারো এগিয়ে আসার অপেক্ষা না করে নিজেই হাতের ইশারায় এক সিপাহীকে এগিয়ে আসতে নির্দেশ দেন। সিপাহী সামনে আসলে হামজা বেগ একটি কোড়া তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন– 'প্রথম ইমাম গাজী মুহাম্মদ শহীদের জীবদ্দশায় এক লড়াইয়ে আমি স্বেচ্ছায় রাশিয়ানদের হাতে বন্দীত্ব বরণ করেছিলাম। সেই জঘন্য অপরাধের শাস্তি আমি এখনোও পাইনি। আমি এখন ইমাম হিসেবে তোমাকে আদেশ করছি, এই কোড়া দিয়ে আমাকে একশটি আঘাত করো। আঘাতের মাঝে যদি আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, তবু শাস্তি বন্ধ করো না। এ অবস্থায় যদি আমি মৃত্যুবরণও করি, তবুও শাস্তি প্রদানের ধারা অব্যাহত রেখে একশ বেত্রাঘাত পূর্ণ করে তবেই ক্ষান্ত হবে।'

সিপাহী ইমামের আদেশ মতো তাঁর দেহে বেত্রাঘাত করতে শুরু করে। এক এক করে ষাটটি আঘাত খাওয়ার পর হামজা বেগ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কিন্তু সিপাহী বেত্রাঘাত অব্যাহত রাখে। একশ আঘাত সম্পন্ন হলে সামরিক ডাক্তার এগিয়ে আসে এবং ইমামের চিকিৎসা শুরু করে।

কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে হামজা বেগ পুনরায় দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এ ঘটনার পর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সর্বত্র হামজা বেগের নিষ্ঠা ও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

এবার হামজা বেগ সর্বপ্রকার খেলাধুলা ও ভোগ-বিলাসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন এবং ইবাদত-সাধনার প্রতি জোর দেন। মদ্যপ-তামাকখোরদের ধরে ধরে শাস্তি দিতে শুরু করেন।

❁ ❁ ❁

আদিরিয়ার শাসনকর্তা খানম তার খাছ কামরায় অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছে। একটু পর পর হামজা বেগের জবরদস্ত সামরিক প্রস্তুতির সংবাদ তার কানে আসছে। খানম এই সংবাদও পাচ্ছে যে, আদিরিয়ার জনগণ খানমের আনুগত্য ত্যাগ করে দলে দলে হামজা বেগের দলে যোগ দিচ্ছে।

চিন্তা-ভাবনা করে খানম একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। পুত্র ওমরকে ডেকে বললো– 'বৎস! পরিস্থিতি বড় ভয়াবহ। আমার আর অলসতা করার সময় নেই। তুমি এক্ষুনি তোমার দুধভাই হাজী মুরাদ এবং কয়েকজন খাদেমকে নিয়ে তিবলিস রওনা হয়ে যাও এবং রুশ গভর্নর ও কমাণ্ডারকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে সামরিক সাহায্যের আবেদন জানাও। আমি তাদের নামে একটি পত্রও লিখে দিচ্ছি।'

ওমর এবং হাজী মুরাদ দিন-রাত অবিশ্রাম সফর করে তিবলিস পৌছে এবং রুশ কমাণ্ডার ইনচীফ বেরন রোজন-এর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করে। কমান্ডার সীমাহীন ব্যস্ত। তাই সে কয়েকজন অধীন অফিসারকে বলে দেয়, আগুন্তুক লোক দু'টির সঙ্গে কথা বলো। যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় থাকে, তবে আমাকে অবহিত করবে।

অধীন অফিসার ওমর-হাজী মুরাদের সঙ্গে কথা বলার আগে তাদের আহারের নিমন্ত্রণ জানায়। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়। যথাসময়ে আহার পর্বও শেষ হয়। আহার শেষে আলোচনার বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও তার পরিবর্তে অফিসারগণ মদ-জুয়ায় মেতে ওঠে। ওমর-হাজী মুরাদও তাতে যোগ দেয়। জুয়ার নেশায় পড়ে ওমর সর্বস্ব খুইয়ে বসে। বাহনের দু'টি ঘোড়া ছাড়া সবই হারিয়ে ফেলে। এবার তার সম্বিৎ ফিরে আসলে হাজী মুরাদকে নিয়ে কক্ষে বাইরে এসে বলে, ঘোড়া দু'টোও যদি হারিয়ে বসি, তো বাড়ি যাবো কীভাবে? চলো, এবার ফিরে যাই। এখান থেকে সাহায্যের কোনো আশা নেই।

এদিকে হামজা বেগ শক্তিশালী একদল সৈন্য নিয়ে খোনজাকের নিকটে পৌছে যান। সৈন্যরা সেনা ছাউনি স্থাপন করছে, খঞ্জর ও তরবারীতে ধার দিচ্ছে।

খানম চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার মাথায় কিছুই আসছে না। হাতে সময়ও কম। অবশেষে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে খানম হামজা বেগের নিকট পত্র লিখে –

'আমি মুরীদ বাহিনীতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু অনিবার্য কারণে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আমি আপাতত অক্ষম। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি মুরীদ আন্দোলনের স্বার্থ পরিপন্থী কোনো আচরণ করবো না। আমার এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য আমার আট বছরের পুত্র শাহজাদা বোলাশকে জামানতস্বরূপ আপনার হাতে তুলে দিলাম।'

খানমের পত্র পড়ে হামজা বেগ এক অর্থপূর্ণ হাসি হেসে দূতকে লক্ষ্য করে বললেন– 'খানমের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে আমি প্রস্তুত আছি। তবে খানমের দুই পুত্র ওমর ও আবু নোতজালকে এসে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।'

দূত খানমের নিকট হামজা বেগের পয়গাম পৌছিয়ে দেয়। খানম পুত্র ওমরকে হামজা বেগের নিকট যেতে বলে। মায়ের আদেশ পালনার্থে ওমর রওনা হয়ে যায়। কিন্তু একে একে কয়েক ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওমরের ফিরে আসার নাম নেই। কোনো সংবাদও পাওয়া গেলো না। খানম আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চেহারা তার ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অস্থিরচিত্তে ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করে। কিন্তু না, ওমর আসছে না, ভালো-মন্দ কোনো সংবাদও নয়।

দীর্ঘ অপেক্ষা খানমের সহ্যের বাইরে চলে যায়। এবার সে তার আরেক পুত্র আবু নোতজালকে বলে, যাও তো বাবা, তুমি গিয়ে তোমার ভাইদের সংবাদ নিয়ে আসো– জলদি যাও। আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না!

আবু নোতজাল বললো, মা! আপনি বোধ হয় হামজা বেগ- এর চরিত্র জানেন না। হামজা বেগ আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আমি জানি সে আসলান খান-এর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে এসেছে।

ঃ আমি যা বলছি, তা-ই করো। মায়েরা সন্তান এ জন্য পুষে না যে, বিপদের সময় তারা উল্টো উপদেশ দেবে। আমার আদেশ, যাও- জলদি যাও।

ঃ বুঝেছি, আপনি আপনার সর্বশেষ পুত্রটিকেও যমের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছেন। ঠিক আছে, যাচ্ছি।

শাহজাদা আবু নোতজাল মহলের বাইরে বের হলে কয়েকজন খাদেম তার সঙ্গ নেয়। খাদেমের পোশাক পরে হাজী মুরাদও তাতে যোগ দেয়।

শাহজাদা আবু নোতজাল হামজা বেগের ক্যাম্পে পৌছলে তাকে স্বাগত জানানো হয় এবং অবহিত করা হয় যে, তোমার দু'ভাই তাঁবুতে সেনাপতির সঙ্গে আলাপ করছে।

আবু নোতজাল কক্ষের দিকে পা বাড়ায়। কক্ষে প্রবেশ করামাত্র হামজা বেগের সৈন্যরা তার উপর আক্রমণ করে বসে। শাহজাদার খাদেমরা চীৎকার করে ওঠে। ওমর দৌড়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। হামজা বেগের সৈন্যরা তখনই তাকে খুন করে ফেলে। আবু নোতজাল তরবারী কোষমুক্ত করে ভাইকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসে। ঠিক এ সময়ে হামজা বেগের সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা তার এক চোয়াল দিয়ে ঢুকে অপর চোয়াল দিয়ে বের হয়ে যায়। তবু সে তার শক্তি অনুযায়ী মোকাবেলা করে যায়। কিন্তু কতোক্ষণ? এক পর্যায়ে তারও নিথর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

হামজা বেগ খানম-এর আট বছরের পুত্র শাহজাদা বোলাশের উপরও আঘাত

হানেন। জবাবে হাজী মুরাদ হামজা বেগের উপর আক্রমণ করে বসে। দেখতে না দেখতে অসংখ্য তরবারী-বর্শা হাজী মুরাদকে ঘিরে ফেলে। হাজী মুরাদ অতি কৌশলে কোনো রকমে বেষ্টনী ভেদ করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। ঘোড়া এক লাফে হামজা বেগের ক্যাম্প অতিক্রম করে তীরবেগে খোনজাক অভিমুখে ছুটে চলে। দু'পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে খানম জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

এদিকে হামজা বেগ তার অধীনদের কাছে জানতে চাচ্ছেন, শামিল এখনো কেনো আসলো না? অধীনরা জানায়, বিভিন্ন দিক থেকে রুশ সৈন্যদের অবস্থান ও উপস্থিতির খোঁজ-খবর নিয়ে পরিকল্পনা সম্পন্ন করেই তিনি আসবেন। এ জন্যই তার আসতে বিলম্ব হচ্ছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে শামিল ক্যাম্পে এসে পৌছে। এসেই সে খানমের আত্মসমর্পণ ও তার দুই পুত্রের পরিণতির সংবাদ জানতে পারে। ক্ষুব্ধ হয়ে শামিল হামজা বেগের কক্ষে প্রবেশ করে এবং বলে, মহামান্য ইমাম! চুক্তি ভঙ্গ করা তো আমাদের নীতির পরিপন্থী কাজ!

ঃ চুক্তি এখনও হলো কোথায়? খানম এমনিতেই একটা শিয়ালের বাচ্চা; রাশিয়ানদের সাথে চলে সে আরও ধূর্ত হয়ে গেছে। পরাজয় নিশ্চিত দেখে প্রাণরক্ষার জন্যই এই চাতুরীর পথ বেছে নিয়েছে মাত্র। চুক্তি করে আমরা চলে গেলেই সে আবার রাশিয়ানদের সাহায্য নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করতো। আমি আমার প্রকৃত দুশমনকেই হত্যা করেছি।

হামজা বেগের বক্তব্য শুনে শামিল নীরব হয়ে যায়। কিন্তু তার চেহারা বলছে, এই জবাবে সে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। হামজা বেগ তাকে আরও আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, আমরা নীতি-আদর্শের স্বার্থে যুদ্ধ করছি। কিন্তু যুদ্ধের বেলায় নীতি অচল। ইমামের সিদ্ধান্তে তোমার আস্থা থাকা দরকার।

শামিল নিজ কাজে চলে যায়। নিয়ম-নীতিতে বিশ্বাসী শামিল হামজা বেগ-এর এই আচরণে অসন্তুষ্ট।

হামজা বেগ সেনাপতি বেশে খোনজাকে প্রবেশ করেন। কালো পতাকা উঁচু করে তার সৈন্যরা এক সারিতে মহল অভিমুখে ছুটে চলেছে। খানমের মহলের দরজায় পৌছে হামজা বেগ আদেশ করেন, গাদ্দারের গাদ্দার পুত্রের গাদ্দার স্ত্রীকে দরজা খুলতে বলো। মহলের খাদেমরা এগিয়ে আসে। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বললো, খানম এখন বেঁচে নেই। তিনি নিজের খঞ্জর দ্বারা আত্মহত্যা করেছেন।

এ সংবাদ শুনে হামজা বেগ বলে ওঠেন, ঠিক হয়েছে। বিশ্বাসঘাতকের জন্য যমীন এইরূপই সংকীর্ণ হওয়া দরকার যে, শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনকে নিজের জন্য বোঝা মনে করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়।

বিজয়ী হামজা বেগ মহলে প্রবেশ করেন এবং নিজের বিশেষ বাহিনীকে তলব

করেন। তারপর সৈন্যদের উদ্দেশে বলেন, আদিরিয়ার স্বতন্ত্র মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বাসঘাতক তার শেষ পরিণতি পেয়ে গেছে। আজ থেকে আমি আমার খান হওয়ার কথা ঘোষণা করছি। আগামীকাল শুক্রবার-জুমার দিন। শোকরানার নামায এখানকার মসজিদেই আদায় করা হবে। কিন্তু আমি মহলে নয়– তাঁবুতে রাত কাটাবো। এই মহলে আমার বিশেষ বাহিনীর সৈন্যরা অবস্থান করবে।

পরদিন সকালে আসলান খান- এর দূত এসে আদিরিয়ার নতুন খান এবং দাগেস্তানের ইমাম হামজা বেগের সঙ্গে একান্তে কথা বলার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। হামজা বেগ তাতে সম্মত হন।

দূত পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে আবার পকেটে রেখে দিয়ে আংটির পাথরের নীচ থেকে আরেকটি চিরকুট বের করে হামজা বেগের হাতে দেয়। হামজা বেগ চিরকুটটি পাঠ করেন-

'মুজাহিদ ও গাজী হামজা বেগ! এবার আমি-তুমি দু'জন মিলে মাতৃভূমিকে কাফেরমুক্ত করতে পারি। তুমি আমার যোগ্য সন্তান।'

হামজা বেগ চিরকুটটি পড়ে দূতকে বললেন, যে কাগজটি পকেটে রেখেছো, দেখি তাতে কী আছে?

দূত সেই কাগজের টুকরাটি বের করে হামজা বেগের হাতে দিয়ে বললো, এই পত্র আপনার নয়; রাশিয়ানদের হাতে পড়ে গেলে তাদের জন্য এই চিঠি।

হামজা বেগ পত্রটি পাঠ করেন–

'হামজা বেগ! রাশিয়ার অনুগত খানমকে হত্যা করে তুমি ভালো করনি। আমি তোমার থেকে অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবো।'

শেষের পত্রটি পড়ে হামজা বেগ বললেন– 'আসলান খান হয় সীমাহীন ধূর্ত, নয়ত বেজায় কাপুরুষ।'

বিজিত খোনজাকে জুমার নামাযের প্রস্তুতি শুরু হয়। দ্বি-প্রহরের প্রখর রোদে বিজয়ী বাহিনীর কালো পতাকা চিকচিক করছে। কালো ইউনিফর্ম পরিহিত সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে মসজিদের দিকে এগিয়ে চলছে। হামজা বেগও মসজিদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। একজন গুপ্তচরের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছেন তিনি। গুপ্তচর যথাসময়ে এসে পৌঁছে। তাকে দেখেই হামজা বেগ মসজিদ অভিমুখে রওনা দেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি গুপ্তচরকে বললেন, কী সংবাদ নিয়ে এসেছ বলো।

গুপ্তচর জানায়, একজন ভয়ংকর ব্যক্তি বেঁচে গেছে! নাম তার হাজী মুরাদ। গতকাল আমাদের ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। লোকটি খানজাদা। শৈশবে মা মারা গেলে আদিরিয়ার খান তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে খানমের দুধ পান করেছে। তার পিতা এবং আদিরিয়ার খানের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব

ছিলো। পিতার মৃত্যুর পর সে একান্তভাবে খানমের কাছে বসবাস করতে শুরু করে। তার এক ভাই ওসমানও এখানে এসেছিলো। কিন্তু এখন দু'জনই লাপাত্তা। স্থানীয় লোকেরা জানায়, হাজী মুরাদ অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ ও শক্তিশালী মানুষ। তার হাতে আপনার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা আছে। আপনার দেহরক্ষীরা যেনো সতর্ক থাকে।

এ রিপোর্ট শুনে হামজা বেগ বললেন, নামাযের পর তুমি আবার যাও, আরো তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করো।

গুপ্তচরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হামজা বেগ মসজিদের দরজায় পৌঁছে যান। হামজা বেগ এবং তার বারজন দেহরক্ষী মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো আবায় আবৃত। হামজা বেগ মসজিদে প্রবেশ করামাত্র মুসল্লিরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। দাগেস্তানের ইমাম জুমার নামাযের ইমামতি করার জন্য এগিয়ে যান।

ইত্যবসরে মুরীদের পোশাক পরিহিত দু'জন লোক সারির মধ্য থেকে উঠে দ্রুত ইমামের দিকে এগিয়ে যায়। তারা ইমামের কাছে গিয়ে অকস্মাৎ খঞ্জরের আঘাত শুরু করে দেয়। লোক দু'জন হাজী মুরাদ ও ওসমান। খঞ্জরের আঘাতে হামজা বেগ ওখানেই ধরাশয়ী হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে মুরীদরা আক্রমণকারী লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু হাজী মুরাদ লাফ দিয়ে মসজিদের দেয়াল টপকে বেরিয়ে যায়। দেয়ালের বাইরে মুরীদের পোশাক পরিহিত কয়েকজন অশ্বারোহী তার জন্য অপেক্ষমান। হাজী মুরাদ ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

ইমাম হামজা বেগের আকস্মিক মৃত্যুতে মুরীদ বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। সৈন্যরা হামজা বেগের লাশ তুলে নিয়ে দাফন-কাফনের আয়োজন শুরু করে। কিন্তু সকলের মুখে একই প্রশ্ন, এখন দাগেস্তানের ইমাম কে হবেন? আবার প্রত্যেকে নিজে নিজেই উত্তর দেন, শামিল... একমাত্র শামিল।

সৈন্যরা দূত পাঠিয়ে শামিলকে ঘটনার বৃত্তান্ত অবহিত করে। শামিল দূতকে বিদায় দিয়ে মুরাকাবায় নিমগ্ন হয়।

খোনজাকের মানুষ শামিলের জন্য অপেক্ষমান। বিজয়ী-পরাজিত সকলেই শামিলের পথপানে তাকিয়ে আছে।

চারদিন পর হঠাৎ করে শামিল খোনজাকে আত্মপ্রকাশ করে। সৈন্য-জনসাধারণ সকলে তার তৃতীয় ইমাম হওয়ার কথা ঘোষণা করছে। শামিল এখন ইমাম। দাগেস্তানের ইমামরূপে তিনি ভাষণ প্রদান করেন –

'সময় অনেক পেরিয়ে গেছে। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। সফর বেশ দীর্ঘ। পথ বড় দুর্গম। এখন থেকে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব সহ্য করা হবে না। কারো সঙ্গে কোন আপোস নেই। এখন থেকে সর্বশক্তি, সব উপকরণ, সকল মানুষ একই লক্ষ্যে উৎসর্গিত। তাহলো দাগেস্তানের আযাদী, কাফকাজের স্বাধীনতা। তোমাদের কেউ

কেউ আমাকে জানো। অবশিষ্টরা অচিরেই জানতে পারবে। আমার শাসনে কেউ অন্যায় দেখতে পেলে, তার আমাকে অমান্য করার অধিকার থাকবে। কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি ন্যায়ের পথে, হকের পথে থাকবো, ততোক্ষণ কেউ আমার বিরুদ্ধাচরণ করলে কঠিন শাস্তি দেবো। আমি একক সিদ্ধান্তে কোনো কাজ করবো না। আমার মিশন চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে। তোশামোদ করার অভ্যাস নেই এমন বিচক্ষণ বীর ব্যক্তিগণ হবেন আমার উপদেষ্টা। আপনারা সকল সৈন্য অবিলম্বে গমরী পৌঁছে যান। আর খোনজাকের অধিবাসীদের বলছি, আজকের পর থেকে যদি কেউ গান্দারীর ইতিহাস পুনর্জীবিত করার চিন্তা করেন, তবে সময়ই বলে দিবে এই চিন্তা বোকামী ছিলো। গাদ্দারদের আশা-আকাঙ্খাকে আমি বিষণ্নতায় পরিণত করে ছাড়বো। আপনারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বাঁচতে শিখুন। মৃত্যু আমাদের সবাইকে ধাওয়া করে ফিরছে। যে কয়দিন বেঁচে থাকবো, যেনো সম্মান ও স্বাধীনতার সাথে বেঁচে থাকতে পারি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।'

আট.

ইমাম শামিল বিধ্বস্ত দাগেস্তানের পুনর্বিন্যাসে আত্মনিয়োগ করেন। অপরদিকে প্রথম জার রুশ নেকুলাই অপেক্ষা করছেন, যেনো দাগেস্তানে তার সেনাবাহিনীর দখল সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং আরোও বহু জনপদে যেনো তার ফরমান তামিল করা হয়।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে একের পর এক সংবাদ আসতে শুরু করে, প্রতিকূল আবহাওয়া, জঙ্গলের পোকা-মাকড় ও মশার আক্রমণে হাজার হাজার রুশ সেনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং মৃত্যুবরণ করছে। মৃত্যুর হার দিন দিন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে, তারা অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। লাগাতার এ জাতীয় দুঃসংবাদ আসতে শুরু করলে জার আদেশ দেন, যেনো তার সৈন্যরা জঙ্গল ত্যাগ করে বাইরে এসে খোলা মাঠে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান নেয় এবং পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা করে।

গমরী এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ থেকে রুশসেনা সরে যাওয়ার সাথে সাথে সমগ্র দাগেস্তানে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। দাগেস্তানবাসীর জীবনধারা স্বাভাবিক হতে শুরু করে। জনমনে আনন্দের বন্যা শুরু হয়ে যায়।

প্রচণ্ড শীতের মওসুম। রাশিয়ার অধিকাংশ এলাকা বরফে ঢাকা। জার তার মহলের খাস কামরায় বিশ্রাম করছেন। এক স্টাফ অফিসার ভেতরে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দণ্ডায়মান। চেহারা তার মলিন-বিমর্ষ। দু'ঘন্টা পর সে মহলে প্রবেশের অনুমতি লাভ করে। খাস কামরায় প্রবেশ করে স্টাফ অফিসার জারকে সম্মানপ্রদর্শন করে সামরিক কায়দায় সালাম দিয়ে করজোড় দাঁড়িয়ে থাকে।

ঃ কেনো এসেছো, বলো।

ঃ আলমপনাহ! সেনাপতি গরিবস কাফকাজ থেকে এই রিপোর্টটি পাঠিয়েছেন।

ঃ পড়ো দেখি, সেনাপতি কী লিখেছে!

অফিসার রিপোর্টটি পড়তে শুরু করে– 'মহারাজ! কাজী মোল্লার স্থানে আরেক বিদ্রোহী ময়দানে এসেছে। নাম তার হামজা বেগ। জনগণ তাকে দ্বিতীয় ইমাম বলে থাকে... ।'

ঃ এখনো কেনো তাকে গ্রেফতার বা হত্যা করা হলো না? মনে হচ্ছে, আমার আদেশ থাকা সত্ত্বেও সৈন্যরা বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছে না!

ঃ ইনচার্জ অফিসারের পরিপূর্ণ রিপোর্ট পেশ করা আমার কর্তব্য। সেনাপতি গরিবস আরোও লিখেছেন, আলমপনার নিমকখোর সরদারদের সুপারিশে হামজা বেগকে প্রথমে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিলো। কারণ, গমরীর লড়াইয়ে সে আমাদের সহযোগিতা করেছিলো।

ঃ বিদ্রোহ– ক্ষমা...! নপূংসক কোথাকার! এমন নিমকহারামকে কেনো ক্ষমা করা হলো, সেনাপতিকে তার জবাব দিতে হবে। কোনো বিদ্রোহীকে ক্ষমা করার কথা আর যেনো আমাকে শুনতে না হয়।

ডাক অফিসার পেছনে সরে যায়। নীরবে বাইরে বের হয়ে সেনাপতির নিকট চলে যায়। অফিসারগণ পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে মতবিনিময় করে। সকলের অভিমত, বাদশাহ প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেননি। আর পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন ব্যতীত আদেশ জারি করায় বিপর্যয় অনিবার্য।

কাফকাজের বিদ্রোহের সংবাদ ধীরে ধীরে সেইসব নেতৃবর্গ পর্যন্ত পৌছে যায়, যারা সরাসরি রাজ দরবারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে রাশিয়ার সাধারণ জনগণ এ সবের কিছুই বুঝে না। তারা শুধু এতোটুকু জানে, বহু দূরে রুশ সীমান্তের নিকট কিছু বে-দীন মুসলমান বাস করে, যারা মহারাজকে নিজেদের প্রভূ বলে স্বীকার করে না। এ কারণে মহারাজা মাঝে-মধ্যে তাদের শায়েস্তা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে রাজাধিরাজের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সকল রুশ নাগরিকের ধর্মীয় দায়িত্ব।

অল্প কিছুদিন পরই জার নতুন বিদ্রোহী হামজা বেগের পতনের সংবাদ পান। হামজা বেগের পতনকে নিজের কৃতিত্ব দাবি করে রুশ অফিসার তিবলিস থেকে রাজধানীতে এই পত্রটি প্রেরণ করে–

'হামজা বেগ আমাদের সহযোগী খানমকে প্রতারণা করে হত্যা করেছে। সে খানমের সাথে সন্ধির আলোচনার বাহানায় এসেছিলো। কিন্তু তার কয়েকজন সশস্ত্র সাথী অতর্কিত আক্রমণ করে খানম এবং তার তিন পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

এ সংবাদ পেয়েই রাজ সৈনিকের একটি বাহিনীকে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমাদের বীর সৈনিকরা যারপরনাই ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ করে অল্প সময়ে বিদ্রোহীদের কোমর ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছে। হামজা বেগ এবং তার খাছ নায়েবকে ঘটনাস্থলেই খুন করা হয়েছে। অবশিষ্টরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্রোহীরা এখন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।'

এ সংবাদ শুনে জার সীমাহীন উৎফুল্ল হন। হামজা বেগের নিহত হওয়ার সংবাদে ব্যথিত হয় শুধু একজন– আসলান খান। কারণ, হামজা বেগ খানমের কন্যা শাহজাদী সুলতানাকে তার হাতে তুলে না দিয়েই নিহত হলো।

❖ ❖ ❖

শামিল ইমামতের দায়িত্ব হাতে নেয়ার সাথে সাথে দাগেস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন দিন দিন জোরদার হতে শুরু করে। প্রথম ইমাম গাজী মুহাম্মদ এবং হামজা বেগ দাগেস্তানের জনগণকে জাগ্রত ও সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গোত্রীয় জীবনাচার পরিবর্তন করা সহজ নয়। সহজ নয় নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী পোষা। উপায়-উপকরণ কম। জনসাধারণের আর্থজীবন সামান্য ফসল, ফল ও শিকারের উপর নির্ভরশীল। সামান্য কৃষি উৎপাদন ছাড়া দাগেস্তানীদের এমন বিশেষ কোনো আয়-উপার্জন নেই, যা সামরিক উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। ক্ষেত-খামারে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাতে কৃষকদের প্রয়োজন মেটানোই দায়।

দাগেস্তানের এক গোত্রের মানুষ অপর গোত্রের কারো অধীনে লড়াই করা অপমানজনক মনে করে। এমতাবস্থায় তাদের সংগঠিত করা কঠিনই বটে। অপরদিকে জার রুশের বিশাল-বিস্তৃত রাজত্ব। উপায়-উপকরণ ও সমরাস্ত্রের তার অভাব নেই। অভাব নেই তার সুদক্ষ ও সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর। জারের আদেশে স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় লাখো মানুষ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তারা উপযুক্ত ভাতা পায়। সর্বোপরি তারা আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত।

জার-শামিলের উপকরণের এই যে পার্থক্য, ইমাম শামিল এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবহিত। এই পার্থক্য কাক-চড়ুই-এর পার্থক্য নয়– পার্থক্য হাতি ও পিঁপড়ার। এ কারণেই ইমাম শামিল গাজী মুহাম্মদ শহীদকে তাড়াহুড়া না করার পরামর্শ দিতেন। তাড়াহুড়ার ফলে রাশিয়ানদের সর্বশক্তি নিয়ে মোকাবেলায় আসা ছিলো অপরিহার্য বিষয়। আর তখন সর্বশক্তি ব্যয় করেও তাদের ঠেকানো স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তথাপি ইমাম শামিল জিহাদের চেতনা ও শাহাদাতের উদ্দীপনা দিয়ে উপকরণের এই অভাব পূরণ করতে সচেষ্ট। শামিলের ধারণা, সমগ্র কাফকাজের মুসলিম গোত্রগুলো যদি জিহাদী চেতনায়

উজ্জীবিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে অন্তত অন্য কোথাও থেকে সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

ইমাম শামিল তার সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস এবং জনসাধারণকে জাগ্রত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করতে শুরু করেন। কিন্তু এ জাতীয় যে কোনো ভাষণের পর তিনি নিজেকে প্রশ্ন করতেন, এই সাহায্য করবে কে? ভারতবর্ষের মুসলমান? তারা তো নিজেরাই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। ইরান-আফগানিস্তানের অবস্থাও ভালো নয়। ওসমানিয়া সালতানাত? হয়তো তারা আমাদের সাহায্য করবে, যদি তারা বিজাতীয় চক্রান্ত থেকে নিরাপদ থাকে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যের শক্তিগুলো তাদের ধাওয়া করে ফিরছে। আফ্রিকার মুসলমান? তারা তো ইচ্ছে করলেও এ পর্যন্ত আসতে পারবে না। তাছাড়া তাদের স্বাধীনতাও আমাদের মতো হুমকির সম্মুখীন। ইংরেজ-ফরাসী তাদেরকে তাদের দুর্বলতার সাজা প্রদান করছে, যেনো দুর্বলদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের মুসলমান একই সময়ে এভাবে দুর্বল হয়ে গেলো কেনো? এ প্রসঙ্গে এসে ইমাম শামিলের দৃষ্টি অতীতের পাতা উল্টিয়ে বিলাসপ্রিয় বাদশাহদের রাজপ্রাসাদ এবং খানকার বে-আমল লোকদের সমাগম পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এখানে এসে ইমাম শামিল দিশা হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু এই বলে নিজেকে বুঝ দেন যে, অবস্থা যা-ই হোক, হাল ছাড়া যাবে না। ঈমান-আমল, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে কাজ আমাকে কিছু করতেই হবে। আমার দায়িত্ব সাধ্য অনুপাতে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সফলতা আল্লাহর হাতে। সফল না হওয়া অপরাধ নয়– অপরাধ সফলতার জন্য চেষ্টা না করা।

ইমাম শামিল প্রথমে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি দেন। নিজেদের মধ্যে শরীয়তের বিধান চালু করেন। শরীয়া বিধান অমান্যকারীদের শাস্তি দিতে শুরু করেন। তারপর 'সব মুসলিম ভাই ভাই' শ্লোগান তুলে মুসলিম গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস শুরু করেন।

ইমাম শামিলকে আল্লাহ তাআলা ভাষা-বাগ্মিতা ও সুঠাম স্বাস্থ্য-শরীর দান করেছেন। তিনি লড়াই করেন সিংহের মতো, দৌড়ান চিতার মতো আর কথা বললে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে শ্রোতাদের মন। কিন্তু মুশকিল হলো, দাগেস্তানের বাইরের মানুষ আরবীর পরিবর্তে অন্য ভাষায় কথা বলে। তা-ও এক দু'টি নয়– অসংখ্য তাদের ভাষা। সেসব এলাকায় গিয়ে ইমাম শামিল স্থানীয় ভাষায় ভাষণ দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আরবী ভাষণে যে গতি ও প্রভাব, স্থানীয় ভাষায় তা আসছে না। ইমাম শামিল বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে আপোস-মীমাংসা করিয়ে তাদেরকে দুশমনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে ফিরে আসেন। কিন্তু পরে দেখা যায়,

কোনো এক অবিবেচকের সামান্য বোকামীতে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেছে।

পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে গোত্রগুলোকে দুশমনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার একটি মাত্র পন্থা। তাহলো, যতো দ্রুত সম্ভব তাদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো। কিন্তু এতে আশংকাও কম নয়। এমনও হতে পারে, যথারীতি যুদ্ধ শুরু হলো, পরিস্থিতি শত্রুর পক্ষে চলে গেলো, শত্রু বাহিনীর জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলো, এমতাবস্থায় তারা ময়দান ত্যাগ করে পালিয়ে গেলো। আবার মুখোমুখি লড়াইয়ে এই আশংকাও উড়িয়ে দেয়ার মতো নয় যে, শত্রুপক্ষ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়ে তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে স্বাধীনতাকামীদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে। তাই সবদিক বিবেচনা করে ইমাম শামিল অবলম্বন করেছেন তৃতীয় পন্থা। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে সরাসরি ও মুখোমুখি লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তিনি গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। সাথে সাথে স্থানীয় লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বুঝাতে থাকেন।

ইমাম শামিল গমরীর পরিবর্তে উখলগুকে তার মিশনের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন। এই গ্রামটি কোয়েসু দরিয়ার কূলে এক পাহাড়ে অবস্থিত। পাহাড়টি ছয়-সাত ফুট উঁচু, যা তিনদিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত, যেনো কুদরতই এই তিনদিক থেকে লোকালয়টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এই তিনদিক থেকে দুশমন সীমাহীন ঝুঁকি মাথায় নিয়েই কেবল আক্রমণ করতে পারে। অপরদিক থেকে একটি গভীর অথচ সংকীর্ণ নালা পাহাড়টিকে পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। খানিকটা নিম্নে একটি সরু ও সংকীর্ণ গলিপথই অন্যান্য পাহাড়ের সঙ্গে এই পাহাড়ের একমাত্র মিলন সূত্র।

পাহাড়টিতে আছে বেশ ক'টি ক্ষুদ্র কুটির। একটি মাত্র দোতলা ঘর। যুদ্ধ বন্দিদের আটক রাখার জন্য রাশিয়ানরা এই ঘরটি নির্মাণ করেছিলো। দোতলা হলেও ঘরটি তেমন বড় নয়। এটিই এখন দাগেস্তানের রাজভবন, ইমাম শামিলের কার্যালয়। এই পাহাড়ে এখন দাগেস্তান তথা সমগ্র কাফকাজের স্বাধীনতা এবং জার রুশের সেনাবাহিনীর মোকাবেলার পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

ইমাম শামিলের স্ত্রী ফাতেমা শিশুপুত্র জামালুদ্দীনকে জিহাদের গান ও বীরত্বের কাহিনী শোনান। ইমাম শামিলও কাজের ফাঁকে ঘরে এসে অবসর সময়ে পুত্র জামালুদ্দীনের হাতে কাঠের খঞ্জর তুলে দিয়ে তা ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। কিছুদিন পর ইমাম শামিলের গুলবাগিচায় আরো একটি ফুল প্রস্ফুটিত হয়। ইমাম শামিল দাগেস্তানের প্রথম ইমামের নামে এই পুত্রের নাম রাখেন গাজী মুহাম্মদ। তার ক'দিন পর ইমাম শামিলের মা পুত্রের নিকট চলে আসেন এবং পুত্রের সঙ্গে পাহাড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ইমামের দায়িত্ব গ্রহণের পর ইমাম শামিল সংবাদ আদান-প্রদানে উন্নত

ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি এমন বেশ কিছু ঘোড়া সংগ্রহ করেন, যারা কোহেস্তানী অঞ্চলসমূহে ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ায় আর লাফিয়ে খানা-খন্দক পার হওয়া এবং দ্রুত এদিক-ওদিক ঘুরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ। দাগেস্তানের প্রতিটি গ্রামের লোকদের আদেশ দিয়ে রাখা হয়েছে, যেনো তারা সর্বক্ষণ এ ধরনের প্রশিক্ষিত ঘোড়া প্রস্তুত রাখে এবং সারাক্ষণ ঘোড়ার পিঠে যিন বেঁধে রাখে, যাতে কোনো সংবাদবাহক গ্রামে পৌঁছে একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে নতুন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যেতে পারে। কোনো সংবাদবাহক পথে জখম কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়লে যাতে সঙ্গে সঙ্গে তার সেবা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, গ্রামবাসীদের প্রতি সে আদেশও ইমাম শামিল দিয়ে রেখেছেন।

কোহেস্তানী ঘোড়সওয়ার যখন ঘোড়া দৌড়ায়, তখন তাদের ক্ষিপ্রতা দেখে স্থানীয় লোকেরাও থমকে দাঁড়ায়। কোহেস্তানীদের ঘোড়া সমতল-অসমতল, পাথুরে, আঁকাবাকা, উচু-নীচু ও দুর্গম সব রকম পথ সমান গতিতে এমনভাবে অতিক্রম করে, যেনো সে বাতাসের উপর ছুটে চলেছে। প্রচণ্ড গরম, তীব্র শীত, প্রলয়ংকারী ঝঞ্ঝা, নদী-নালা, বন-জঙ্গল ও রাত-দিন সব তাদের কাছে সমান। সর্বাবস্থায় সকল পরিস্থিতিতে তারা সমান দক্ষ। এসব ঘোড়ার আরোহী রাশিয়ানদের প্রতিটি পদক্ষেপ-পরিকল্পনার সংবাদ অতিদ্রুত ইমাম শামিলের দফতরে পৌঁছিয়ে দেয়। রাশিয়ার রাজধানী থেকে কোনো অফিসার বদলী, পদচ্যুতি কিংবা নিয়োগ লাভের যে কোনো সংবাদ রুশ সৈন্যদের নিকট পৌঁছার আগে দাগেস্তানের রাজধানীতে পৌঁছে যাচ্ছে।

কিন্তু সংবাদ আদান-প্রদানের এই উন্নত ব্যবস্থাপনার সুফল লাভের জন্য ইমাম শামিলের গুপ্তচরদের ত্যাগ ও বিশ্বস্ততা অপরিহার্য। কোনো একজনের গাদ্দারী গোটা মিশনের জন্য, সমগ্র দেশবাসীর জন্য অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন করতে পারে। ইমাম শামিল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড স্থির করেছেন। কাপুরুষতার শাস্তি মৃত্যু অপেক্ষাও কঠিন। রণাঙ্গনে কাপুরুষতা প্রদর্শনকারী মুরীদদের সঙ্গে তাদের সহকর্মীরা-ই নয়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও বয়কট করে। এ ধরনের লোকদের পিঠে একখণ্ড কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়, যা তাদের কাপুরুষতার প্রমাণ বহন করে। আবার এই কাপুরুষদেরকে তাদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সুযোগও প্রদান করা হয়। যে কাপুরুষ পরবর্তী লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ বা গাজী হতে পারে, তার হারানো মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যথায় তার জীবন মৃত্যু অপেক্ষাও কঠিন বলে পরিগণিত হয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ইমাম শামিলের মুজাহিদ বাহিনী বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। যে সেনাবাহিনী

কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকদের থেকে মুক্ত, বিজয় তাদের অনিবার্য।

রুশ সেনাসংখ্যার অনুপাতে ইমাম শামিলের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত কম। কোনো অভিযানে সংঘাত হয় বিশ আর এক এর। কোথাও একশ বনাম এক এর। তথাপি অস্ত্রশক্তিতে সমান সমান হলেও কথা ছিলো। কিন্তু তা-ও নয়। রুশ সেনারা সংখ্যায় অগণিত হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রেও সজ্জিত। পক্ষান্তরে ইমাম শামিলের সৈন্যরা ব্যবহার করছে খঞ্জর, তরবারী ও বর্শা। আর আছে অপর্যাপ্ত জংধরা পুরাতন বন্দুক আর পিস্তল।

স্বল্পসংখ্যক সৈন্য আর এই সামান্য সেকেলে অস্ত্র নিয়েই ইমাম শামিলের স্বাধীনতা যুদ্ধের আয়োজন। পন্থা তার গেরিলা আক্রমণ। শত্রুর সেনাক্যাম্প, সেনাছাউনি ও কাফেলার উপর হঠাৎ আক্রমণ করে শত্রুবাহিনীকে বিপর্যস্ত করাই ইমাম শামিলের পরিকল্পনা। আপাতত তিনি সম্মুখ লড়াই এড়িয়ে চলছেন।

কাফকাজ, দাগেস্তান ও চেচনিয়া গেরিলা যুদ্ধের জন্য বেশ উপযোগী। ঘন জঙ্গল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ও সমতল ভূমি সবই স্বাধীনতাকামীদের নিরাপদ মোর্চার কাজ দেয়। স্থানীয় লোক বলে মুজাহিদগণ অত্র অঞ্চলের অলি-গলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। পরিকল্পনা প্রস্তুত করার পর একদিন ইমাম শামিল তার নায়েবদেরকে তলব করেন এবং বললেন –

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমরা প্রত্যেকে 'ইজ্জতের জীবন নতুবা ইজ্জতের মৃত্যু'র নীতিতে বিশ্বাসী। তোমাদের কারুর যদি এই নীতিতে আস্থার অভাব থাকে, তার সামরিক জীবন থেকে অব্যাহতি নেয়ার অনুমতি আছে। আমাদের পরীক্ষার প্রকৃত সময় সবেমাত্র শুরু হলো। জনবল আমাদের নিতান্ত কম, উপকরণও একেবারেই সামান্য। জিহাদের স্পৃহা, বীরত্ব আর নির্ভীকতা আমাদের সম্বল। দুশমনের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে এনে সে অস্ত্র-ই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে। এসব লক্ষ্য অর্জনে আমাদের বাজের মতো ছো মারা, সিংহের মতো লড়াই করা এবং ঝড়ের মতো ছুটে চলা শিখতে হবে। এখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করবো না; বরং শত্রুর সেনাছাউনি, সেনাবহর এবং অস্ত্রের ডিপোতে অতর্কিত হামলা করে অস্ত্র ছিনিয়ে আনতে হবে এবং তাদের বিপাকে ফেলে রাখতে হবে। যতোটুকু সম্ভব ক্ষতিসাধন করতে হবে। তোমাদের যার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, যে কোনো মূল্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। আমরা আল্লাহ তাআলার একত্ব এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খতমে নবুওতে বিশ্বাসী। পবিত্র কুরআন আল্লাহর পথে জিহাদকারীদেরকে পরকালে উত্তম পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছে। শহীদের মর্যাদা অনেক উন্নত। শাহাদাতের ফযীলতের কথা স্মরণে রেখে দায়িত্ব পালন করলে আমাদের অগ্রযাত্রা সহজ থেকে সহজতর হয়ে যাবে। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অপেক্ষা কে কেমন লড়াই

করছে, তা-ই বেশি বিবেচ্য। তাছাড়া যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের হাতে ততো ক্ষতি সাধিত হয় না, যতোটুকু ক্ষতি হয় নিজেদের দু'একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। ভারতবর্ষে নবাব সিরাজুদ্দৌলা এবং সুলতান টিপুকে আপন লোকদের গাদ্দারীর ফলেই পরাজয়বরণ করতে হয়েছিলো। পবিত্র মক্কায় বসে কোনো এক সময় আমি অবহিত হয়েছিলাম, মীরজাফর আর মীর সাদেকের গাদ্দারী-ই ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের পরাজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলো। বাগদাদের পতনকেও আপন লোকেরাই হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছিলো।'

জনৈক নায়েব ঃ মহামান্য ইমাম! আপনি মক্কা গিয়েছিলেন কবে?

ইমাম শামিল ঃ সেই পুরনো স্মৃতিচারণের সময় এটা নয়। তুমি তো জানো, আমি মিথ্যা কথা বলি না। ঘটনাটি কয়েক বছর আগের।

ইমাম শামিল তার নায়েবদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন এবং মুরীদদেরকে রুশসেনাদের উপর চোরাগুপ্তা হামলা শুরু করার আদেশ দেন। অবশেষে সভার সমাপ্তি ঘটে।

ইমাম শামিল তার মুজাহিদ বাহিনীকে নতুনভাবে বিন্যস্ত ও সংগঠিত করে যে রূপ দিয়েছেন, তা এ রকম -

ইমাম শামিল নিজে কমান্ডার ইনচীফ। তার অধীনে একশ কমান্ডার। এরা 'নায়েব' উপাধিতে পরিচিত। প্রত্যেক নায়েবের অধীনে দশজন করে মুরশিদ। একজন মুরশিদের অধীনে একশজন করে মুজাহিদ। এই হিসাবে ইমাম শামিলের মুজাহিদের সংখ্যা এক লাখ। কিন্তু বাস্তবে তার এক লাখ মুজাহিদ নেই। মুরশিদের পদে উত্তীর্ণ অফিসার মুজাহিদদের কমান্ড করার অধিকার লাভ করে। উপরন্তু তাদের দায়িত্ব হলো মুরশিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দক্ষ মুজাহিদ তৈরি করা।

ইমাম শামিল দাগেস্তানের সব নাগরিকের প্রতি আদেশ জারি করেছেন, জিহাদ চলাকালে কোনো নায়েব বা মুরশিদ যখন যে অঞ্চলে যাবেন, সেখানকার বাসিন্দারা তার থাকা-খাওয়া ও নিরাপত্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে এবং তিনি যাকে যে আদেশ দেন, নির্দ্বিধায় সে তা পালন করবে। নায়েব-মুরশিদ যাদেরকে জিহাদের জন্য তলব করবেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তারা অবশ্যই তাতে সাড়া দেবে।

ইমাম শামিলের সাধারণ সৈনিকদের ইউনিফর্মের রং খাকি। অফিসার তথা মুরশিদ-নায়েবগণ পরিধান করেন কালো পোশাক। মাথায় বাঁধেন সবুজ পাগড়ি। তবে সিপাহী-অফিসার সকলে নিজ নিজ ইউনিফর্মের উপর কালো আবা ব্যবহার করেন। তাদের পতাকার রং-ও কালো। কালো ইউনিফর্ম পরিহিত সৈনিক আর কালো পতাকা দেখলে আম-জনতা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। নিজের সৈনিকদের দেখে সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হোক, তা ইমাম শামিলের উদ্দেশ্যও বটে।

সাধারণ সৈনিকদের মুরশিদ এবং মুরশিদদের নায়েব পদে উত্তীর্ণ হতে অসাধারণ মেধা, বীরত্ব ও যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়। যে সৈনিক রণাঙ্গনে দুশমনের সারিতে ঢুকে দুশমনের বিপুল ক্ষতি সাধন করে কেবল জীবন্ত-ই ফিরে আসে না, বরং তাদের আগ্নেয়াস্ত্রও ছিনিয়ে নিয়ে আসে, তার পদোন্নতির পথ সুগম হয়ে যায়। মুরশিদগণ আপন আপন অধীন সৈনিকদের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করতে পারবেন; কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা ইমাম শামিল ছাড়া আর কারো নেই।

নায়েব ও মুরশিদগণ ইমাম শামিলের নির্দেশ মোতাবেক সীমিত আকারে গেরিলা আক্রমণ শুরু করে দেন। আজ এক রুশী সেনাবহরের উপর হামলা হল, তো পরদিন হামলা হল কোনো ছাউনির উপর। কিন্তু আক্রমণকারীগণ সংখ্যায় এতো নগণ্য যে, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ানরা একে সামরিক অভিযান বলে স্বীকার করছে না।

ইমাম শামিলের দক্ষ নেতৃত্ব, সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাপক জনসমর্থনের সংবাদ রুশ কর্তৃপক্ষের কানে পৌছে যায়। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য নাজরানের গভর্নর হাউসে তাদের উর্ধ্বতন অফিসারদের বৈঠক বসে। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, বিদ্রোহীদের সাম্প্রতিক তৎপরতা এবং তাদের নতুন ইমাম সম্পর্কে শাহেনশাহকে অবহিত করতে হবে, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে শাহেনশাহ আমাদের দোষারোপ করতে না পারেন।

ইমাম শামিলের এ তৎপরতার সংবাদ নাজরান থেকে তিবলিস পৌছে যায়। সেখানেও এ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয় এবং এ সংবাদ সেন্টপিটার্সবার্গেও পৌছিয়ে দেয়া হয়।

জার এই সংবাদ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আচ্ছা, এ বিদ্রোহীদের সমূলে উৎখাত করতে না পারার কারণটা কী?

শাহেনশাহ তার খাস মহলে নতমুখে পায়চারি করছেন আর এ বিষয়ে রাণীর সাথে কথা বলছেন। শাহেনশাহর বক্তব্য– 'লোকগুলো বেশ গোয়ার প্রকৃতির। লড়াই করে, জীবন দেয়। আবার বেকায়দায় পড়লে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু ক'দিন পর পুনরায় সেই অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়। এখন আমার এই আদেশ-ই দিতে হবে, যেনো বিদ্রোহীদের ধরে একজন একজন করে খুন করা হয়। তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরও যেনো তরবারীর আঘাতে টুকরো টুকরো করা হয়, যাতে কেউ বিদ্রোহ করার কথা কল্পনাও করতে না পারে। আমি কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করবো, কাফকাজের সর্বত্র বিদ্রোহীদের ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করতে কতো সৈন্য আর কী অস্ত্রের প্রয়োজন।'

❁ ❁ ❁

জার রুশ যে সময়ে সেন্টপিটার্সবার্গে রাণীর সাথে এ বিষয়ে কথা বলছিলো, তখন নাজরান থেকে কয়েক মাইল দূরে আকাশচুম্বী পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজি এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করছিলো। তিন হাজার রুশ সৈন্যের একটি বাহিনী অসংখ্য তোপ এবং অন্যান্য সমরাস্ত্র নিয়ে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাচ্ছে। কাফেলাটি যখন এমন একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় উপনীত হয়, যার উভয় দিক বড় বড় পাথরখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত, ঠিক তখন চল্লিশ-পঞ্চাশজন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে ছুটে এসে রুশ সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘোড়ার লাগাম দাঁতে চেপে ধরে দু'হাতে পিস্তলের গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তারপর এলোপাতাড়ি তরবারী চালিয়ে সবশেষে খঞ্জর হাতে তুলে নেয়। এই অতর্কিত আক্রমণে অগণিত রুশ সৈন্য খাক-খুনের মাঝে ছটফট করতে থাকে। রুশ অফিসার পরিস্থিতি উপলব্ধি করে পাল্টা অভিযানের নির্দেশ দেয়ার আগেই আক্রমণকারী অশ্বারোহীগণ রুশ সেনাদের বিপুলসংখ্যক রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে নিমিষে অদৃশ্য হয়ে যায়। আক্রমণকারী এই অশ্বারোহীগণ ইমাম শামিলের সৈন্য। উদ্দেশ্য দুশমনের নিকট থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে আনা।

যে কোনো গেরিলা আক্রমণের মোকাবেলায় রুশ সেনারা এলোপাতাড়ি ফায়ার ছুঁড়তে শুরু করে দেয়। মুখোমুখি লড়াইয়ে এলোপাতাড়ি ফায়ার করলে তা ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু ইমাম শামিলের মুজাহিদদের উপর এ ফায়ারিং কোনোই কাজে আসে না। দুর্ঘটনাবশত কোনো মুজাহিদের গায়ে গুলি বিদ্ধ হওয়া স্বতন্ত্র কথা। ইমাম শামিলের সৈন্যরা রুশ সেনাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আর সে পরিস্থিতিতে তাদের উপর ফায়ার করা নিজেদেরই সৈন্যদের উপর আক্রমণ করার নামান্তর।

এ ধরনের গেরিলা আক্রমণের ধারা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিরুপায় হয়ে রুশ সেনা কমান্ডার পচকিভচ তার বিশেষ সেনাদলকে তলব করে, যারা নিশানাবাজিতে দক্ষ। এমনিতে প্রত্যেক সৈনিককেই নিশানাবাজির প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কিন্তু এই বাহিনী এমনসব সৈন্য দ্বারা গঠিত, যারা বেজায় ভিড়ের মধ্যেও টার্গেট মতো নিশানা করতে সক্ষম। তবে রুশ সেনাপতি এই বিশেষ বাহিনীকে মাঠে নামানো সত্ত্বেও মুজাহিদদের খঞ্জরে ভাঙন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। রুশ সৈন্যদের ছোরা মুজাহিদদের তরবারীর কাছে অকেজো। মুজাহিদদের তরবারীর আঘাত এতোই কার্যকরী যে, তা রুশী বন্দুকের নল কেটে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। এ ধরনের আক্রমণের শিকার হলে রুশ সৈন্যরা গাজর-মুলার মতো টুকরো টুকরো হতে থাকে। মুজাহিদদের তখন আনন্দের সীমা থাকে না।

এক অভিযানে মুজাহিদরা একটি রুশ সেনাবহরের উপর আক্রমণ চালায়। সুযোগ পেয়ে রুশ সৈন্যরা এক মুজাহিদকে ঘিরে ফেলে ছোরার আঘাত শুরু করে। মুজাহিদ গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। অসংখ্য রুশ সৈন্য মুজাহিদের

দেহে রাইফেলের গুলি চালাতে থাকে এবং বাট দ্বারা আঘাত করতে থাকে। সমস্ত দেহ তার থেতলে ও ঝাঝরা হয়ে যায়। তথাপি সেই মুজাহিদ শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত এতো দক্ষতার সাথে অনবরত খঞ্জর চালাতে থাকে যে, তাতে কয়েকজন রুশ সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে। মুজাহিদ যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখনো তার খঞ্জর এক রুশ সৈন্যের বুকের উপর বিদ্ধ; মুজাহিদ সেটি টেনে বের করতে চেষ্টা করছে।

রুশ অফিসাররা ইমাম শামিলের এই গেরিলা অভিযানের জবাবে নিয়মতান্ত্রিক হামলা শুরু করে দেয়। রুশ সৈন্যরা এ মর্মে আদেশ পায় যে, বিদ্রোহীদের গুরুত্বপূর্ণ বসতিগুলোর প্রতি এগিয়ে যাও। পথে যতো প্রাণী চোখে পড়বে, সব কচুকাটা করবে। এমনকি ফসলাদি পর্যন্ত পিষে তছনছ করবে। আদেশ মোতাবেক রুশ সৈন্যরা মুজাহিদদের বসতি অভিমুখে অগ্রযাত্রা শুরু করে। সংবাদ পেয়ে মুজাহিদরা তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে পাহাড়ে-জঙ্গলে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা রাস্তার দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পথে স্থানে স্থানে সংঘাত শুরু হয়।

রুশ সৈন্যরা তিন সারিতে অগ্রসর হয়। এক সারির সৈনিকদের মুখ রাস্তার একদিকে। দ্বিতীয় সারির সৈনিকদের মুখ সামনের দিকে। অপর সারির সৈনিকেরা সম্মুখে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে ডানে-বামে দেখে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এতো সতর্কতা সত্ত্বেও তাদের উপর পাথর আর গুলির বৃষ্টি চলছে। কোনো কোনো স্থানে মুজাহিদরা তাদের সব আয়োজনকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে রুশ সৈনিকদের সারির মধ্যে ঢুকে পড়ে খঞ্জর, তরবারী, গুলি, পাথর এমনকি লাঠি দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত হানছে। এতে মুজাহিদদেরও রক্ত ঝরছে। তবে মুজাহিদদের আক্রমণে রাশিয়ানদের যে পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে, তার তুলনায় তা কিছুই নয়। রুশ সৈন্যরা জঙ্গল থেকে ঘোড়ার জন্য ঘাস সংগ্রহ করতে গেলেও নিরাপদে ফিরতে পারছে না। ককেশাশের প্রচণ্ড শীতের রাতে আগুন জ্বালানোর জন্য জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে গেলেও রুশ সৈন্যরা মুজাহিদদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

অনেক সময় রুশ অফিসাররা রুশ সৈনিকদের অগণিত লাশ ও জখমীদের দেখে অবলীলায় বলে ওঠে– 'অনর্থক, অহেতুক এ যুদ্ধ। এই লড়াই আর আত্মহত্যা এক কথা। বুঝি না, শাহেনশাহ এতো জীবনের বিনিময়ে এই পার্বত্য ভূমিতে কেনো নিজের পতাকা উড়ানো জরুরি মনে করছেন?'

কিন্তু রুশ অফিসার ও সৈনিকরা যে নিরুপায়! কাফকাজ জয় করা তাদের শাহেনশাহ'র আদেশ। রুশ সৈনিকরা ময়দানে মুখোমুখি লড়াই করার পরিকল্পনা নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে এসে দুশমনের টিকিও চোখে দেখে না। অথচ গুলি, খঞ্জর আর তরবারী অনবরত তাদের রক্তপান করেই চলেছে।

চতুর্দিকে পাহাড় আর জঙ্গল। পাখির কিচির মিচির শব্দ কানে আসলে রাশিয়ানরা আতংকিত হয়ে পজিশন গ্রহণ করে। এক রুশ সৈনিকের পায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে কোনো পাথর নীচে গড়িয়ে পড়লে অপর সৈনিকরা থর থর করে কেঁপে ওঠে। অনেক সময় এমনও হচ্ছে, জংলী জানোয়ারের চলার শব্দ পেয়ে তারা ফায়ার ছুঁড়ছে, পাছে মুজাহিদ এগিয়ে আসছে কিনা এই আশংকায়। এভাবে তারা অসংখ্য গুলি নষ্ট করছে।

যেসব রুশ সৈন্য মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, তারাও প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে, ভর্তি হয় তাদের নিজস্ব অস্থায়ী হাসপাতালে। হাসপাতাল রোগীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে অফিসার বক্ বক্ করে বলতে শুরু করে– 'এখানকার সবকিছুই আমাদের শত্রু। জঙ্গল, পাহাড়, বাতাস, পানি সবই আমাদের দুশমন। কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনে রক্ষা পেলে রোগে আক্রান্ত হয়ে তাকে মরতে হয়।'

কাফকাজে পৌঁছার পর রুশ সৈন্যদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। অভিযান পরিচালনার জন্য যে বাহিনীকে প্রেরণ করা হয়, তাদের ব্যাপারে কেউ এ নিশ্চয়তা দিতে পারে না, তারা উদ্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুতে পারবে কিনা। রাতে যারা ক্যাম্পে অবস্থান করছে, তারা জানে না, ভোর পর্যন্ত তারা জীবিত থাকবে কি-না।

কিছু রুশ জেনারেল প্রকৃত-ই সাহসী যোদ্ধা। কিন্তু যারা সাহসী নয়, তারাও সাহসিকতার অভিনয় করতে বাধ্য। কোনো অফিসারের কাপুরুষতা যদি যুদ্ধের ময়দানে তার জীবন রক্ষায় সহায়তা করে, তো রণাঙ্গনের বাইরে সেই কাপুরুষতা-ই তার মৃত্যুর পরওয়ানায় পরিণত হয়।

রুশ সেনাপতিরা কাফকাজে যারপরনাই প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার। অধীন অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য তাদের পরিকল্পনা-পদক্ষেপের সীমা নেই। ইমাম শামিল যেমন শাহাদাতকে তার জীবনের পরম লক্ষ্য মনে করেন, তেমনি রুশ সেনাপতিরা যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণকে শাহেনশাহ'র সন্তুষ্টির কারণ জ্ঞান করে।

কাফকাজ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে রুশ সেনারা নিজ ক্যাম্পেই অরক্ষিত। এক মুহূর্তের জন্য তারা নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারে না। এ কারণে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তারা বিশেষ একটি মাপকাঠি ঠিক করে নিয়েছে। অনেক সময় মুজাহিদরা ক্যাম্পে অতর্কিত গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তাই রুশ সৈনিকদের পলায়ন ঠেকানোর জন্য এবং সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার নিমিত্তে রুশ সেনাপতিরা একটি পন্থা স্থির করেছে। সেনাপতি ক্যাম্পের অভ্যন্তরে একটি অলিখিত আদেশ জারী করে রেখেছে যে, যদি

ক্যাম্পে বিদ্রোহীদের আক্রমণ হয়, তা হলে কেউ কোনোও রকম ভীতি, অস্থিরতা বা আতংক প্রদর্শন করতে পারবে না। আহার করতে বসেছো, তো আরামে খাও; মদ পান করছো, তো করতে থাকো। এর মধ্যে যদি আক্রমণ শুরু হয়, ভাব দেখাতে হবে, কিছুই হয়নি। যে অফিসার বা সৈনিক গুলির হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে, সে কাপুরুষ বলে বিবেচিত হবে। গুলি নিক্ষেপকারী যদি সম্মুখেও এসে পড়ে, তবুও মদের পাত্র হাত থেকে ফেলা যাবে না, মদের বোতল মুখ থেকে সরানো যাবে না।

রুশ জনসাধারণের জীবনের মান ক্রীতদাসের চেয়েও হীন। তারা অশিক্ষিত, হতদরিদ্র। শৈশব থেকেই তাদের এ শিক্ষা দেয়া হয়, রাজা তাদের খোদা। রাজা খৃষ্টবাদের মুহাফিজ। এ কারণে রাজার আদেশে জীবন উৎসর্গ করা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাদের দৃষ্টিতে রাজা হলেন অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বা অতিমানব। জার তাদের দেহ-প্রাণের মালিক, দেশের রাজা এবং ভগবানের অবতার। এ কারণে বিশ্বাসে কঠোর অশিক্ষিত রুশ সৈনিক যখন যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করে, তখন তারা বীরত্বের সাথে লড়াই করে। জারের জন্য জীবন দিতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না।

রুশ সৈনিকদের ক্যাম্প চারকোণা বিশিষ্ট। ক্যাম্পের বাইরে পদাতিক বাহিনী ও তোপখানা। ভেতরে অশ্বারোহী বাহিনী ও ট্রান্সপোর্ট। ক্যাম্পের চারদিকে কড়া প্রহরার আয়োজন। কিন্তু এতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মুজাহিদরা ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছে যায়। চতুর্দিক থেকে গুলিবৃষ্টি শুরু হলেই কেবল তারা মুজাহিদদের আগমনের কথা টের পায়।

অধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্পগুলোর চারদিকে তারা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছে। তথাপি মুজাহিদরা অবলীলায় সেই বেড়া ডিঙ্গিয়ে ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। অসংখ্য প্রহরী মাটিতে শুয়ে পড়ে আক্রমণকারীদের পায়ের আওয়াজের অপেক্ষা করতে থাকে। রাতের আঁধারে কিছুই দেখা যায় না। তাই প্রহরীদের প্রতি আদেশ, কোনোদিক থেকে গাছের পাতা নড়ার শব্দ কানে আসা মাত্র যেনো সেদিকে ফায়ার ছুঁড়তে শুরু করে। সারাটি রাত জাগ্রত থেকে চোখ-কান খোলা রেখে পাহারা দেয়া বড় কঠিন কাজ। এ কারণে যে সৈনিকের ভাগে পাহারার দায়িত্ব অর্পিত হয়, সে নিজেকে হতভাগ্য মনে করে। পাহারাদার সৈনিকদের মতে এই পাহারার চেয়ে যুদ্ধের ময়দান অনেক নিরাপদ। ওখানে শংকা ও অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। ক্যাম্পের ভেতরে অফিসার সিপাহীদের সর্বদা চৌকস থাকতে হয়। ইউনিফর্ম ও বুট পরিহিত অবস্থায়-ই তারা নিদ্রা যায়, যাতে সময় মতো দ্রুত আক্রমণকারীদের মোকাবেলায় দাঁড়ানো যায়। কেবল ভোরবেলা রুশ সৈন্যরা নিশ্চিন্ত মনে নাস্তা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে। কারণ, এ সময়টিতে ইমাম

শামিল এবং তার সব মুরীদ ফজর নামায আদায় করার পর দীর্ঘক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত ও দরূদ-তাসবীহ পাঠে মগ্ন থাকেন। এটা তাদের নিয়মিত আমল।

জারের রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে কাফকাজের সেনাক্যাম্পগুলোতে চিঠি-পত্র ও অন্যান্য সংবাদ আদান-প্রদানে এক মাসেরও অধিক সময় ব্যয় হয়। ডাক বহনকারী গাড়ির এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে অন্তত পনের দিন। আর পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করলে ছয়- সাত মাসের কমে এই পথ অতিক্রম করা যায় না। ফলে যে সৈন্যদেরকে কাফকাজে প্রেরণ করা হয়, তারা মনে করে, এ পরপারে পাড়ি জমানো ছাড়া কিছু নয়। কাফকাজ আসার পর স্বজনদের স্মরণে তাদের মন ব্যাথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের একমাত্র পন্থা, জারের আদেশ মোতাবেক কাফকাজ জয় করা। এ কারণে তারা জীবন বাজি রেখে লড়াই করে। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত রুশ সৈন্যদের একজনেরও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই অবান্তর।

ইমাম শামিল ও তাঁর মুরীদগণ কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করছেন। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের পরিপূর্ণ শৃংখলা ও দক্ষতার সাথে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন বিচক্ষণতার সাথে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া। দাগেস্তান-বরং সমগ্র কাফকাজের মানুষ বিলাসিতা পরিহার করে এখন সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে। জীবনের উপায়-উপকরণও তাদের সীমিত। গাজী মুহাম্মদ শহীদ ও হামজা বেগ মুসলিম গোত্রগুলোকে শরীয়তের পাবন্দ বানিয়েছিলেন। আর ইমাম শামিল কঠোর নিয়মনীতি চালু করে সেই গোত্রগুলোর সামগ্রিক জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

প্রথম জার আলেকজান্ডার রাশিয়ার সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোতে, বিশেষ করে সীমান্তের আশেপাশে এককভাবে এমন লোকদের বসতি দান করেছিলেন, যারা যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর জান-প্রাণ সেবা করতো আর স্বাভাবিক অবস্থায় চাষাবাদ করে জীবন কাটাতো। বড় বড় সামরিক অফিসারদের জায়গীরের নামে বিপুল পরিমাণ জমি দান করা হয়েছিলো। ফলে তারাই ছিলো অত্র অঞ্চলের জমিদার। যেসব এলাকায় সামরিক বাহিনীর লোকদের বসবাস, সেসব এলাকা এখন পরিপূর্ণ এক একটি শহর। প্রথম আলেকজান্ডার তার জীবদ্দশায় এই সীমান্ত এলাকায় দেড় লাখ সৈন্যকে বসতি দান করেছিলেন। তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দাগেস্তানের মুজাহিদরা যখন তাদের জিহাদী কার্যক্রম শুরু করে, তখন দক্ষিণাঞ্চলের রিজার্ভ সেনাবাহিনী ছাড়াও রাজধানী এবং অন্যান্য ছাউনি থেকে একের পর এক সেনাদল প্রেরণ শুরু হয়ে যায়। এমনকি রাশিয়ার পদানত নতুন বসতি পোল্যান্ড এবং জর্জিয়া থেকেও লোক ভর্তি করে দাগেস্তানে

প্রেরিত হতে আরম্ভ হয়। জারের আদেশ অনুযায়ী সংখ্যা পূরণ না করে উপায় ছিলো না। ফলে সেনা অফিসার এমন সব লোকদেরও যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতে শুরু করে, যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা বলতে কিছু নেই।

ইমাম শামিলের নেতৃত্বে অপারেশন শুরু হবার পর রুশ সৈন্যদের বিপুল ক্ষতি হতে থাকে। রাশিয়াকে প্রতি বছর দু'লাখ করে নতুন সৈন্য দক্ষিণাঞ্চলের দিকে প্রেরণ করতে হচ্ছে। সৈন্য প্রেরণ করা জারের পক্ষে কোনো ব্যাপারই ছিলো না। তার অঙ্গুলি নির্দেশে লাখ লাখ 'গোলাম' ধরে হাজির করা হতো। কিন্তু সেনাপতি আধুনিক ও অতিরিক্ত অস্ত্রের আবেদন জানালে জার ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠেন–

'আধুনিক অস্ত্র– আরো অস্ত্র! তোমাদের এই বিলাসিতায় আমি সহযোগিতা করতে পারবো না। অস্ত্র নয়– প্রয়োজন হলে আরো সৈন্য নিয়ে যাও। বিদ্রোহীদের পায়ে পায়ে রুশ সৈন্য দাঁড় করিয়ে দাও। অন্যথায় আমার এই কোটি কোটি গোলাম কাজে আসবে কী করে?'

সেনাপতিগণ বার বার পত্র লিখে জারকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, পায়ে পায়ে সৈন্য দাঁড় করিয়েও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। জারকে তারা আরো অবহিত করে, বিদ্রোহীরা এতোই দুর্ধর্ষ যে, অতর্কিত হামলা করে রুশ সৈন্যদের গাজর-মুলার মতো টুকরো টুকরো করে অক্ষত ফিরে যায়। রুশ সৈন্যরা তার কোনই প্রতিকার করতে পারছে না। অবশেষে জার বাধ্য হয়ে পর্যাপ্ত আধুনিক অস্ত্র সরবরাহের আদেশ জারি করেন। দৈত্যের মতো বিশাল বিশাল তোপ দাগেস্তান অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। গোলাবারুদ পৌছানোর জন্য হাজার হাজার গাড়ি তৎপর হয়ে ওঠে। রাশিয়ার দশ লাখ সৈন্য মুষ্টিমেয় মুজাহিদকে নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। রুশ সৈন্যদের কয়েকটি বাহিনীকে 'কাসূক' বলা হয়। এরা মূলত সেই কাজাক, যারা শত শত বছর ধরে যাযাবর জীবন যাপন করে আসছে। লুটপাট করে বেড়ানো ছিলো তাদের পেশা। পাহাড়-জঙ্গল দিয়ে অতিক্রমকারী কাফেলার উপর তারা হামলা চালাতো। অনেক সময় আক্রান্ত কাফেলার সঙ্গে তাদের কঠিন মোকাবেলাও করতে হতো। এতে তারাও গেরিলা যুদ্ধের কলা-কৌশল আয়ত্ব করে ফেলে। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী রাস্তার আশেপাশে তারা বাস করতো। কোনো কাফেলার আগমনের সংবাদ পেলেই তারা হানা দিতো এবং কাফেলার লোকদের সর্বস্ব লুট করে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতো।

ইমাম শামিলের জোর প্রচেষ্টায় কাফকাজের কিছু এলাকায় ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করার সাথে সাথে খৃষ্টবাদের সংরক্ষক জার নেকুলাই অস্থির হয়ে ওঠেন। প্রতিরোধ ও দমন অভিযান আরো জোরদার করার জন্য সেনাপতি-অফিসারদের তাকীদ দেয়া হয়। যাযাবর কাজাকদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের

বাগে আনার তদবির শুরু করে। পাদ্রীদের প্রচেষ্টায় কাজাকদের সমাজ-রীতিতে নতুন এক প্রথার সংযোজন ঘটে। তাহলো, যে কাজাক যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো একজন মুসলমানের মাথা কেটে আনতে না পারবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করার যোগ্য বিবেচনা করা হতো না।

দাগেস্তানে রুশ সাম্রাজ্যবিরোধী অভিযান শুরু হলে প্রথমে নবীন ও অনিয়মিত সৈনিকদের ব্যবহার করা হলো। কিন্তু তাদের দ্বারা যখন কাজ হলো না, তখন নিয়মিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদের মাঠে নামানো শুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতাকামীদের গেরিলা অভিযান রুশ সেনাপতিদের হেস্তনেস্ত করে তুললে এবার 'কাস্‌ক' বাহিনীর প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। জারের নিকট আবেদন করে তারা 'কাস্‌ক' বাহিনীর সহযোগিতা লাভ করে। এই বাহিনী গেরিলা যুদ্ধে বেশ দক্ষ। স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের মতোই অসম সাহসী ও দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন। 'কাস্‌ক' বাহিনী নিজেদের যুদ্ধবাজ বংশের সদস্য জ্ঞান করতো।

'কাস্‌ক' বাহিনী ময়দানে আসার ফলে সাময়িকের জন্য স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীর শক্তি কিছুটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। 'কাস্‌ক'দের মাঠে আসার আগের লড়াইগুলোতে উভয় পক্ষ একটি রীতির উপর একমত ছিলো। তাহলো, যুদ্ধের পর উভয় পক্ষ নিজ নিজ নিহত ও আহতদের তুলে নিয়ে যেতো এবং নিহতদের আপন আপন পদ্ধতিতে দাফন করতো। যুদ্ধের পরে আহতদের এবং নিহতদের লাশ তুলে নেয়ার ব্যাপারে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো না। কিন্তু 'কাস্‌ক' বাহিনী এই রীতির ধার ধারে না। তারা না নিজেদের নিহতদের লাশ দাফন করে, না প্রতিপক্ষের নিহতদের লাশ দাফন-কাফন করতে দেয়। এখন এই নিয়ম চালু হয়েছে যে, উভয় পক্ষের যে যেখানে নিহত হয়, কোনরকম গর্ত খুঁড়ে ওখানেই তাকে পুঁতে রাখা হয়। তাছাড়া রুশ সৈন্যরা আবশ্যিকরূপে তাদের নিহত সাধারণ সৈন্য ও অফিসারদের কবরে কাঠের তৈরি ক্রুশ স্থাপন করে রাখতো। এ জন্যে রুশ সৈন্যদের নিকট বিপুল পরিমাণ ক্রুশ মজুদ থাকতো। 'কাস্‌ক' বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ময়দানে অবতরণ করার পর রুশ জেনারেলগণ ইমাম শামিলকে এই বার্তা প্রেরণ করে –

'সংঘাত এখন অনর্থক। তোমাদের গেরিলাদের মোকাবেলায় এখন আমাদেরও সুদক্ষ গেরিলা বাহিনী আছে। আমাদের সৈন্যসংখ্যা সমুদ্রোপকূলের বালুকণার চেয়েও বেশি। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও আমাদের হাজারো সৈন্য জীবনে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাই বলছি, তুমি জারের আনুগত্য মেনে নাও এবং নিজের লোকদের অহেতুক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করো।'

ইমাম শামিল সেনাপতিদের এই বার্তার জবাবে লিখেন –

'আকাশ ভেঙে পড়লে সব রুশ সেনা ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মিছমার হয়ে

যাবে। আর আমরা সম্পূর্ণ অক্ষত বেঁচে যাবো। কারণ, আমরা বাস করি পাহাড়ের গুহায় আর গভীর অরণ্যে মাটির তলায়। আমার মুজাহিদ বাহিনী সমুদ্রের তরঙ্গ। এই তরঙ্গ তোমাদের কোটি কোটি বালিকণা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অনায়াসে। তোমাদের আচরণ প্রমাণ করেছে, তোমরা বিষধর সর্প। আমাদের অজ্ঞাতে কিংবা ঘেরাও করে তোমরা আমাদের দংশন করতে পারো, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সাপের সঙ্গে মানুষের সন্ধি হতে পারে না। তোমরা সমগ্র বিশ্বের সব সাগর-নদীর উপকূলের বালুকারাশির সমান; বরং তার চেয়েও বেশি সৈন্য নিয়ে এসো। আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো।'

ইমাম শামিলের পত্রের জবাবে রুশ সেনাপতি আবার লিখেছে –

'তোমার মাথায় বিবেক-বুদ্ধি আছে কি- না আমার সন্দেহ হচ্ছে। বলো তো, তোমরা কিসের জন্য লড়াই করছো, জীবন দিচ্ছো? অগম্য পাহাড়, কাঁটায় ভরা বৃক্ষরাজি আর দুর্গম পথ-ঘাট ছাড়া তোমাদের এই ভূ-খণ্ডে আছেই বা কী? এমন হীন সম্পদ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা চরম বোকামীর পরিচয় নয় কি?'

ইমাম শামিল জবাব দেন–

'অগম্য পাহাড়, কাঁটায় ভরা বৃক্ষরাজি আর দুর্গম পথ-ঘাট যদি তুচ্ছই হয়, তাহলে তোমরা এসব দখল করার জন্য লড়াই করতে এসেছো কেনো? তোমরা তোমাদের জারকে বুঝাও– যেনো সে আমাদের এই তুচ্ছ সম্পদ দখল করার মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করে। যতো তুচ্ছই হোক, এসব সম্পদের মালিক আমরা। তোমাদের সম্পদ দখল করার জন্য আমরা যুদ্ধের ময়দানে আসিনি। যদি আমার সাধ্যে কুলোয়, তাহলে আমি আমার এই ভূ-খণ্ডের প্রতিটি গাছের গোড়ায় ঘি-মাখন, দুর্গম পথ-ঘাটের কাঁদা মাটিতে মধু আর সুগন্ধি মেখে দেবো। কখনো যদি আমার সময় হয়, তাহলে এদেশের প্রতিটি পাথরের গায়ে মুক্তার মালা পরিয়ে দেবো। সত্যের লড়াইয়ে এসব জিনিসই আমার সঙ্গী। আমি শুধু এবং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লড়াই করছি।'

রুশ অফিসারগণ তাদের পরিকল্পনা ও অবস্থানের সমর্থনে সেসব যুক্তি-প্রমাণও পেশ করে, যা যে কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অন্য জাতিকে নিজেদের করতলে আনার সময় পেশ করে থাকে। রুশ কমান্ডার তার গোমস্তাদের মাধ্যমে এই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয় যে, জার রুশ একান্ত দয়াপরবশ হয়েই কাফকাজের গোত্রগুলোর জীবনের মান উন্নত করতে চাচ্ছেন। জারের ইচ্ছা, তিনি এদেশে নতুন রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করে দেবেন। শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং কৃষিকার্যে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন, যাতে এদেশের জনসাধারণের জীবনের মান উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে যায়।

কিছুদিন পর রুশ কমান্ডার ইমাম শামিলকে লিখে –

'আমাদের তো ইচ্ছা ছিলো তোমাদের দেশের দুর্গম ও অসমতল রাস্তা-ঘাট উন্নততর সড়কে পরিণত করে দেবো, তোমাদের দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিশৃংখলার অবসান ঘটিয়ে সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করবো, যাতে জনগণ শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে। কিন্তু তুমি আমাদের এই মহৎ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছো।'

ইমাম শামিল কমান্ডারের এই পত্রের জবাবে লিখেন –

'তোমার পত্র পড়ে আমি অবাক্ না হয়ে পারলাম না। তোমরা সেই লোকদের প্রতি জোরপূর্বক দয়া করতে চাও, যারা তোমাদের দয়া নিয়ে বাঁচতে চায় না। আমাদের দেশের রাস্তাঘাট যদি দুর্গম, জরাজীর্ণ হয়, আমাদের দেশের পথঘাট যদি চলাচলের অযোগ্য হয়, তার জন্য তোমরাই দায়ী। শোনো কমান্ডার, আমাদের এ দুর্গম পথ-ঘাট তোমাদের কাছে তুচ্ছ হলেও আমাদের নিকট তা মূল্যবান সম্পদ। পথ-ঘাটের এই দুর্গমতার কারণেই জারের অগণিত সৈন্য আমাদের বিরুদ্ধে তার 'মহৎ উদ্দেশ্য' সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। আমি অকপটে স্বীকার করি, আমি কোনো রাজা-বাদশা নই। আমি শামিল একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু আমার পাহাড়-পর্বত, গহীন অরণ্য আমাকে রাজা-বাদশাহর চেয়েও বেশি শক্তিশালী বানিয়েছে। যেদিন আমাদের দেশের রাস্তা-ঘাট দুর্গম থাকবে না, সেদিন আমরা দুর্বল হয়ে যাবো। সেদিন হয়তো তোমাদের সেনাবাহিনী জারের দয়া দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার নামে আমাদের এই ভূ-খণ্ড দখল করে নিতে পারবে। এখন আমাদেরকে "অবাধ্য", 'বিদ্রোহী' বলা হয়। ক'দিন পরে 'দুষ্কৃতিকারী' 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয়া হবে। কিন্তু এতে আমাদের কোনো উদ্বেগ নেই।'

রুশ কমাণ্ডার দাগেস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে সব কৌশল ব্যয় করে। কিন্তু কাফকাজবাসীদের বিভ্রান্ত করার মত কোনো কৌশলই তার ফলপ্রসূ হয়নি। ইটের জবাবে তাকে পাটকেল খেতেই হয়েছে।

অবশেষে রুশ অফিসার যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করে দেয়। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কার্যকর অভিযান পরিচালনা করার জন্য বিপুলসংখ্যক সৈন্য পাহাড়ে-জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হাতে নেয়। উদ্দেশ্য, অধিক সৈন্য দেখিয়ে মুজাহিদদের মনে ভীতির সঞ্চার করা।

নয়.

ইমাম শামিলকে কোনোভাবে ঘায়েল করতে না পেরে রুশ সেনারা যুদ্ধের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। এবার তারা তমিরখানশুরা ও কবারদা উভয়দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। কবারদায় নিয়োজিত রুশ সৈন্যরা মধ্য চেচনিয়ায় অভিযান শুরু করে। কাস্ক বাহিনী ছাড়াও তাতারি রেজিমেন্ট এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম শামিল তমিরখানশুরার দিক থেকে দাগেস্তান অভিমুখে অগ্রসরমান রুশ সৈন্যদের মোকাবেলা করছেন এবং ব্যাপকহারে তাদের ক্ষতিসাধন করে চলছেন।

চেচনিয়ার মুসলিম গোত্রগুলো জান-প্রাণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রুশ সৈন্যদের সাথে টিকে ওঠতে পারছে না তারা। চেচেনরা ইতিপূর্বে ইমাম শামিলের হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু এখন শক্তিতে রাশিয়ানদের সাথে টিকতে না পেরে তারা পূর্বের ন্যায় সন্ধি কিংবা নিরপেক্ষতার পথ বেছে নিতে চায়।

কিন্তু এখন সন্ধি বা নিরপেক্ষতার পথ অবলম্বন করার অর্থ তাদেরকে ইমাম শামিলের বায়আত থেকে সরে আসা। এর পরিণতি কী হতে পারে, চেচেনদের তা ভাবনার বিষয়। তাদের ভালো করেই জানা আছে, যে ইমাম বিপুল শক্তির অধিকারী গণনাতীত রুশ সৈন্যের মোকাবেলা করতে পারেন, সেই ইমাম নিজের মুরীদদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এবং বায়আত থেকে সরে আসার উপযুক্ত সাজাও দিতে পারবেন।

রুশ সৈন্যরা চেচনিয়ায় একের পর এক সামরিক বিজয় অর্জন করে চলেছে। বিজিত এলাকাগুলোকে তারা আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলছে। বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামার উজাড় করে দিচ্ছে। দিশেহারা হয়ে অবশেষে চেচেনরা ইমাম শামিলের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রতিনিধি দলের দায়িত্ব, যে করে হোক তারা ইমাম শামিল থেকে সাময়িকের জন্য রুশদের সঙ্গে সন্ধি করার অনুমতি নিয়ে আসবে। কিন্তু প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ভালো করেই জানে, ইমাম শামিল তাদেরকে রাশিয়ানদের সামনে মাথানত করার অনুমতি দেবেন না। তাই শলা-পরামর্শ করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এমন এক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ইমামের নিকট পৌঁছুতে হবে, ইমাম শামিল যাকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। সিদ্ধান্ত হলো, প্রথমে তারা ডাক্তার আবদুল আজীজের সাথে কথা বলবে। তিনি সহযোগিতা না করলে মোল্লা মুহাম্মদের শরণাপন্ন হবে। তিনিও যদি তাদের কথায় কর্ণপাত না করেন, তাহলে ইমাম শামিলের মায়ের খেদমতে আর্জি পেশ করা হবে।

সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ডাক্তার আবদুল আজীজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা যখন ডাক্তার আবদুল আজীজের ঘরে পৌঁছে, তখন তাঁর ঘরে কয়েকজন জখমী পড়ে ছিলো। ডাক্তার আবদুল আজীজ তাদের চিকিৎসায় ব্যস্ত। ডাক্তার আবদুল আজীজ প্রতিনিধি দলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং ঘরে বসতে দেন। খাদেম শরবত তৈরি করে তাদের আপ্যায়ন করে। ডাক্তার আবদুল আজীজ প্রতিনিধি দলের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে দলনেতা বললো–

'আমাদের আধ্যাত্মিক পিতার মহামান্য পিতা! আপনি আমাদের সাহায্য

করুন। দাগেস্তানের ইমাম আপনার জামাতা। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যথেষ্ট সম্মান দান করেছেন। আমাদের অবস্থা হলো, আমরা যদি যুদ্ধ অব্যাহত রাখি, তাহলে আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। রাশিয়ানদের সঙ্গে সন্ধি করতে গেলে ইমামের তিরস্কারের ভয়। আপনার কাছে আমরা করজোড় অনুরোধ করছি, আপনি ইমামের নিকট থেকে আমাদেরকে এই অনুমতি নিয়ে দিন যে, আমরা সাময়িকের জন্য রাশিয়ানদের সঙ্গে সন্ধি করে নিই।'

ডাক্তার আবদুল আজীজ বললেন, তোমরা কি অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলতে চাও?

দলনেতা বললো, এছাড়া যে আমাদের কোনো উপায় নেই!

আবদুল আজীজ বললেন, এই লড়াইয়ে দুশমনের আসল টার্গেট আমার জামাতা। তোমরা তো গাছের পাতার ন্যায়। ওরা এদেশের মুসলমানদেরকে মূল থেকে উপড়ে ফেলতে চায়। আমার জামাতার একটি মাত্র জিনিসের প্রয়োজন। হয় ইজ্জতের জীবন নতুবা ইজ্জতের মৃত্যু। তার নীতি, একদিনের জন্য হলেও সিংহের মতো বাঁচতে হবে। ভবিষ্যতে কখনো যদি স্বয়ং শামিল আপনাদের মতো এমন পরিস্থিতির শিকার হয় আর আমার কন্যা ফাতেমা আমার কাছে আপনাদের ন্যায় আর্জি নিয়ে আসে, তবে তাকেও আমি সেই জবাবই দেব, যা আপনাদের দিয়েছি। বীর মুসলমান মরেও জীবিত থাকে আর কাপুরুষ জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃতদের চেয়েও অসহায় বলে বিবেচিত হয়। জামাতা শামিলের কাজে আমার হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। কন্যা ফাতেমার প্রতিও আমার আগাম উপদেশ, যেনো সে শামিলের পছন্দ-অপছন্দকে নিজের পছন্দ-অপছন্দ বলে অকপটে মেনে চলে।

ডাক্তার আবদুল আজীজের নিকট ব্যর্থ হয়ে প্রতিনিধি দলটি এরাগল পৌঁছে। কিন্তু এরাগলের শায়খ মোল্লা মুহাম্মদের কোনো পাত্তা নেই। তারা লোকমুখে শুনতে পায়, রাশিয়ার গোয়েন্দা ও সৈন্যরাও তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাঁর কোনো সন্ধান পাচ্ছে না। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করে ফিরে রওনা দেয়। এরাগল থেকে সামান্য দূরে জঙ্গলে পৌঁছামাত্র হঠাৎ বৃক্ষরাজির আড়াল থেকে রহস্যময় ধরনের এক ব্যক্তি তাদের সামনে বেরিয়ে আসে এবং বলে–

'মহোদয়গণ! আপনারা বোধ হয় মোল্লা মুহাম্মদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন?'

দলনেতা বললো, হ্যাঁ। কিন্তু আপনি তা জানলেন কী করে? আপনি কে?

রহস্যময় ব্যক্তি বললো, আমাকেই মানুষ মোল্লা মুহাম্মদ বলে ডাকে। আপনারা কেনো এসেছেন, সবই আমার জানা আছে। ডাক্তার আবদুল আজীজের সঙ্গে আপনারা কি আলাপ করে এসেছেন, তাও আমার অজানা নয়।

ঃ মহামান্য শায়খ! আমাদের প্রতি রহম করুন। ডাক্তার আবদুল আজীজ

আমাদেরকে নিরাশ করেছেন। আমাদের পেছনে অগ্নিকুন্ড সামনে অথৈ সমুদ্র। আত্মরক্ষার কোনো পথ আমরা দেখছি না।

ঃ আপনাদের মধ্যে শিক্ষিত কেউ আছেন কি?

ঃ জি হ্যাঁ, পীর ও মুরশিদ! আমার কিছুটা লেখা-পড়া জানা আছে।

ঃ তবে তো আপনার ইতিহাস জানা আছে। জানা না থাকলে শুনুন। স্বল্পসংখ্যক সৈন্যও যদি দৃঢ়পদে ময়দানে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, তারা কখনো পরাজিত হয় না। তারা পৃথিবীর মানচিত্র পাল্টে দিতে পারে। আমি যাকে একবার ইজ্জতের মৃত্যুর সবক শিখিয়েছি, তাকে অপমানের দীক্ষা দিতে পারি না। যাকে আমি উর্ধ্বপানে দৃষ্টি রাখার মন্ত্র দিয়েছি, এখন তাকে অধঃপাতে যাওয়ার পরামর্শ দেই কি করে?

ঃ পীর ও মুরশিদ! ক্ষেত্র বিশেষে সন্ধির স্বার্থকতা আমাদের চেয়ে আপনি ভালো জানেন। সন্ধি তো নবীর আদর্শের পরিপন্থী নয়।

ঃ কোথায় পয়গম্বর আর কোথায় আমরা! রাশিয়ানদের পক্ষ থেকে যদি কখনো সন্ধির প্রস্তাব আসে, তাহলে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। উহুদের ময়দানে যুদ্ধের পট পরিবর্তন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রিয়নবী (সা.) দৃঢ়পদ থেকে আমাদের জন্য এক অনুপম শিক্ষা রেখে গেছেন। আপনারা যদি ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, তো যান, কাজ চালিয়ে যান। আমি আমার অভিমত শুনিয়ে দিলাম।

একথা বলে মোল্লা মুহাম্মদ পুনরায় জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যান। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা উখলগু অভিমুখে যাত্রা করে।

❁ ❁ ❁

ইমাম শামিল এখন তমিরখানশুরার উপকণ্ঠে তাঁর মুজাহিদ বাহিনীর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করছেন। চেচেন প্রতিনিধি দলটি ইমামের বাড়িতে এসে উপনীত হয়। তারা মেহমানখানায় বসে ইমাম শামিলের মায়ের সঙ্গে কথা বলার আবেদন জানায়। ইমাম শামিলের মা পর্দার আড়াল থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হন। প্রতিনিধি দলের নেতা ইমাম শামিলের মাকে বললেন, আমরা চেচনিয়ার মুসলিম নাগরিক। কবারদার দিক থেকে রুশরা আমাদের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু করেছে। আমরা কাপুরুষ নই, বিশ্বাসঘাতকও নই। আমরা রুশদের যথাসাধ্য মোকাবেলা করেছি। কিন্তু উপায়-উপকরণ আমাদের নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায় আমরা যুদ্ধ অব্যাহত রাখা আত্মহত্যার সমান বলে মনে করি। রুশরা আমাদের শিশু-কিশোরদেরও যবাই করছে। গাঁ-গ্রাম, বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ভস্ম করছে। বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার সব নষ্ট করে দিচ্ছে। এখন আপাতত রুশদের সঙ্গে সন্ধি করে আমরা জান-মাল রক্ষা করতে চাই। এর জন্য ইমামের অনুমোদন প্রয়োজন। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলেই আমরা অধিক প্রস্তুতি সহকারে আবার ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

চেচেন প্রতিনিধি দলের বক্তব্যে ইমাম শামিলের মায়ের মন বিগলিত হয়ে যায়। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ইমাম ঘরে আসলে এ ব্যাপারে তাঁর নিকট সুপারিশ করবেন।

এই ঘটনার তিনদিন পর ইমাম শামিল উখলগু পৌছেন। উখলগু পৌছেই তিনি আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে নায়েবদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। বৈঠক ঈশার নামাযের পরও অব্যাহত থাকে। বৈঠক সমাপ্তির পর যখন ইমাম উঠে ঘরে যেতে উদ্যত হন, তখন তাঁকে অবহিত করা হয়, একটি চেচেন প্রতিনিধি দল আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য অপেক্ষা করছে। ইমাম শামিল প্রতিনিধি দলের সদস্যদের তলব করেন। ইত্যবসরে একজন খাদেম এসে বললো, হযরত! আপনার আম্মা আপনাকে যেতে বলেছেন।

সংবাদ পেয়ে ইমাম তৎক্ষণাৎ ঘরে চলে যান এবং বলে যান যে– ফিরে এসে আমি মেহমানদের সাথে কথা বলবো।

ঘরে পৌছে ইমাম মাকে সালাম করেন। কুশল বিনিময়ের পর ডাকার কারণ জিজ্ঞেস করেন। মা বললেন– 'বৎস! তুমি আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর পথে জিহাদে নিবেদিত তোমার জীবন। আমি বিশ্বাস করি, কোন্‌টা সঠিক, কোন্‌টা ভুল, তুমি তা ভালো জানো। তবে চেচেনরা যদি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি না রাখে, তো অহেতুক তাদের জীবন ধ্বংসে করিয়ে লাভ কি? তুমি তাদের অনুমতি দিয়ে দাও, তারা রাশিয়ানদের সাথে সন্ধি করে জীবন-সম্পদ রক্ষা করুক।'

ঃ মা! চেচেনদের ব্যাপারে আপনি এতো ভাবছেন কেনো?

ঃ বৎস! তাদের কয়েকজন লোক আমার নিকট এসেছিলো। নিজেদের দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে তারা কান্নাকাটি করছিলো। তোমার নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবো বলে আমি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

ঃ এ সময়ে রাশিয়ানদের সাথে সন্ধি করার অর্থ অস্ত্র ত্যাগ করা। আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি মা! কিন্তু দেখি, এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে কী নির্দেশনা দেন।

মায়ের অনুমতি নিয়ে ইমাম শামিল ঘর থেকে বের হন এবং নায়েবদের আদেশ দেন– 'চেচেন প্রতিনিধি দলের সদস্যদের নিয়ে তোমরা মসজিদের বারান্দায় বসো। আমি এস্তেখারা করে দেখি, আল্লাহ কী সিদ্ধান্ত দেন।'

ইমাম শামিল অজু করে মসজিদে প্রবেশ করেন। দু'রাকাত নামাজ পড়ে এস্তেখারার জন্য মসজিদের এক কোণে বসে পড়েন।

চেচেন প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ এবং কয়েকজন নায়েব মসজিদের বারান্দায় উপবেশন করে অপেক্ষা করছেন, ইমাম কখন বারান্দায় এসে তাঁর সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেন।

দিন শেষে রাত আসে। একসময় রাতও শেষ হয়ে যায়। ইমাম এখনোও মুরাকাবায় নিমগ্ন। এ অবস্থায় আরো একটি দিন কেটে যায়। উখলগুর পুরুষেরা সবাই মসজিদের বাইরে সমবেত। অপেক্ষা তাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একটি মুহূর্ত এখন তাদের নিকট বছরের সমান মনে হচ্ছে।

দিন শেষে আবার রাত আসে। কিন্তু উপস্থিত জনতার কেউ এক পা নড়ছে না। কেউ এক ফোঁটা পানিও মুখে দিচ্ছে না। কারণ, তাদের ইমাম ছত্রিশটি ঘন্টা না খেয়ে। ইমাম কখন উঠে এসে কী ঘোষণা দেন কেউ বলতে পারছে না। সকলের দৃষ্টি মসজিদের দরজায় নিবদ্ধ।

মুরাকাবা অবস্থায় ইমাম শামিলের তিনদিন তিনরাত কেটে যায়। মসজিদের বাইরে অপেক্ষমান লোকদের অবস্থা অবর্ণনীয়। তিনদিনের অনাহারে তাদের মুখমণ্ডল শুকিয়ে ফ্যাকাশে-বিবর্ণ হয়ে গেছে। দীর্ঘ অপেক্ষার ফলে তাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, দেখতে কয়েকদিনের রোগাক্রান্ত বলে মনে হচ্ছে।

সমগ্র মসজিদ চত্বর জুড়ে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। এরূপ নীরবতা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুর পূর্বাভাস বহন করে। মনে হচ্ছে, প্রকৃতির সব কিছু থেমে গেছে। দুনিয়ার সব অস্থিরতা একত্রিত হয়ে উখলগুতে আছড়ে পড়ছে।

ইমাম শামিল আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে আছেন। নিবেদিতপ্রাণ মুরীদগণ ইমামের সিদ্ধান্তের জন্য অধীর অপেক্ষমান। এ সিদ্ধান্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অস্ত্র সমর্পণ করে রাশিয়ানদের আনুগত্য মেনে নেয়া কিংবা জীবন বাজি রেখে শত্রুর মোকাবেলায় লড়াই অব্যাহত রাখার প্রশ্ন।

চতুর্থ দিন সূর্যোদয়ের পর হঠাৎ মসজিদের দরজা খুলে যায়। অস্থিরচিত্তে অপেক্ষমান হাজার হাজার জনতা আপন আপন জায়গায় নিথর-নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান। ইমাম শামিল মসজিদের বহির্দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যান। চেহারা তাঁর বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। চোখ কোঠরাগত।

ইমাম শামিল দাঁড়িয়ে আছেন। জনতাও নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে । ইমামের আদেশে কয়েকজন নায়েব তাঁর মাকে নিয়ে আসেন। মা-ও অন্যদের ন্যায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে যান।

কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকার পর ইমাম শামিল মুখ খুললেন–

"উখলগুর অধিবাসীগণ! তোমাদের কিছু লোক কাফেরদের আনুগত্য মেনে নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে এবং গতানুগতিক অনুমতি নেয়ার জন্য এখানে এসেছে। নিজেদের লজ্জাকর দুর্বলতা, আত্মবিশ্বাসহীনতা ও কাপুরুষতার পূর্ণ অনুভূতি তাদের ছিলো। তাই তারা সরাসরি আমার নিকট না এসে আমার মায়ের মমতার আশ্রয় নিয়েছে। তারা জানে, নারীর হৃদয় অল্পতে গলে যায়। আমি আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহান আল্লাহর সমীপে দিক-নির্দেশনার

জন্য নিবেদন জানিয়েছি। তিনদিন তিনরাত মুরাকাবায় কাটিয়েছি। এই দীর্ঘ ধ্যান-মুরাকাবায় আমি যা নির্দেশনা পেয়েছি, তাতে আমি নিশ্চিত, কাফেরদের আনুগত্য মেনে নেয়ার চে' জীবন দেয়া বহুগুণ উত্তম। রাশিয়ানদের সাথে চেচেনদের সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত, যিনি সর্বপ্রথম আমার সামনে রাশিয়ানদের আনুগত্যের অনুমতি দেয়ার সুপারিশ করেছেন, তাকে একশ বেত্রাঘাত করা হোক। তোমরা কি জানো, সেই লোকটি কে?... আমার মা।'

ইমাম শামিলের এই ঘোষণা শোনামাত্র উপস্থিত জনতা চমকে ওঠে। বিবর্ণ হয়ে যায় তাদের মুখমণ্ডল। নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে যায় কয়েক মুহূর্ত। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তারা ইমামের সমীপে মায়ের পক্ষে ক্ষমা ভিক্ষা করে।

কিন্তু ইমাম অটল, অনড়। ঘোষিত সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়তে প্রস্তুত নন তিনি। অমনি আদেশ দেন, ঐ মহিলাকে গাছের সাথে বেঁধে ফেলো।

কয়েকজন সাহসী মুরীদ সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করে, মহামান্য ইমাম! আমাদের যে কেউ আম্মাজানের শাস্তি নিজে ভোগ করতে প্রস্তুত আছি। আমাদের একজনকে আপনি একশ বেত্রাঘাত প্রদান করুন। তবুও শ্রদ্ধেয় আম্মাজানকে মুক্তি দিন।

ঃ না তা হতে পারে না। আমি বুঝি, তোমরা একথা এ জন্যই বলছো যে, সাজাপ্রাপ্তা মহিলা আমার মা। শাস্তি হয়তো তাকে ভোগ করতে হবে, নতুবা যার সঙ্গে তার নিকটতম রক্ত সম্পর্ক আছে, তাকে ভোগ করতে হবে।

ইমাম শামিলের মাকে একটি গাছের সাথে বাঁধা হলো। ইমাম নিজে কোড়া নিয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং নিজের দেহের সর্বশক্তি ব্যয় করে বেত্রাঘাত করতে শুরু করেন। এক এক করে পাঁচটি আঘাত করার পর বৃদ্ধা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ইমাম শামিল বেত্রাঘাত বন্ধ করেন। তারপর মায়ের বন্ধন খুলে তাঁর দেহকে গাছ থেকে সরিয়ে ফেলেন। কয়েকজন নায়েব এগিয়ে এসে ইমামের মাকে ধরে নিয়ে শুইয়ে দেন। ইমাম শামিল গায়ের জুব্বা খুলে এবার নিজে গাছের সঙ্গে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যান। তারপর এক নায়েবকে আদেশ দেন, আমাকে গাছের সাথে বেঁধে দাও। নায়েব আদেশ পালন করে। ইমাম পুনরায় আদেশ দেন, অবশিষ্ট পঁচানব্বইটি বেত্র আমাকে দাও। আমার খাতিরে যদি একটি বেত্রও কম করা হয়, তাহলে যে এই অপরাধ করবে, তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হবে।

এক নায়েব দেহের সর্বশক্তি ব্যয় করে বেত্রাঘাত শুরু করেন। ইমাম শামিলের দেহের চামড়া ছিড়ে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে। পিঠে কোড়ার আঘাত পড়ামাত্র রক্ত ছিটকে পড়ছে। ইমামের নিম্নাংশের পোশাক রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তবু শাস্তি অব্যাহত থাকে। ইমাম উহ্ পর্যন্ত বলছেন না।

একটি একটি করে পঁচানব্বইটি বেত্রাঘাত শেষ হয়। নায়েব সামনে অগ্রসর হয়ে

ইমামের বন্ধন খুলে দেয়। ইমাম জুব্বা পড়ে জনতার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন–

'ঐ গাদ্দাররা কোথায়, যারা রাশিয়ানদের আনুগত্য মেতে নিতে চায়?

নায়েবগণ চেচেন প্রতিনিধি দলের সদস্যদের টেনে ইমামের কাছে নিয়ে যায়। অসংখ্য তরবারী ইমামের অঙ্গুলী নির্দেশের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ বুঝে নেয়, এবার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া আর সম্ভব নয়। কিন্তু তথাপি তারা স্থির, শান্ত। তারা ভাবছে, যে ব্যক্তি নিজের মাকে এতো কঠিন শাস্তি দিতে পারে এবং স্বয়ং নিজে পঁচানব্বইটি বেত্রাঘাতের দণ্ড সহ্য করতে পারে, তার আদেশে মৃত্যুদণ্ড লাভ করাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। এমন মহান ব্যক্তির অনুসারীদের আসলেই রাশিয়ানদের আনুগত্য মেনে নেয়া বেমানান।'

ইমাম শামিল প্রতিনিধি দলের সদস্যদের উদ্দেশে বললেন–

'তোমরা রাশিয়ানদের আনুগত্য মেনে নিতে চাচ্ছো। তোমাদের কারণে আমার দুর্বল বৃদ্ধা মায়ের মুখ থেকে রাশিয়ানদের আনুগত্যের কথা বের হয়েছে। তোমাদের কারণে আমি নিজেও পঁচানব্বইটি বেত্রাঘাত ভোগ করেছি। তোমাদের কারণে উখলগুর অধিবাসীদের অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। পঁচাত্তরটি ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্ত তাদের চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে। তোমরা কঠিনতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছো।'

'কিন্তু... কিন্তু আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেবো না। তোমরা এলাকায় ফিরে যাও। এলাকার লোকদেরকে বুঝাও,রাশিয়ানদের আনুগত্য মেনে নেয়া আর বিশ্বাসঘাতকতা করা সমান কথা। আর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। তোমরা তোমাদের লোকদের জিজ্ঞেস করো, তারা ইজ্জতের মৃত্যু চায়, না যিল্লতের? শত্রুর মোকাবেলায় লড়াই করে জীবন দেয়ার নাম শাহাদাত, যা মুমিনের এক মহান নেয়ামত। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যিল্লতির মৃত্যু। এলাকায় গিয়ে তোমরা লোকদের ইজ্জতের পথ দেখাও।'

দশ

সে রাতে মোল্লা মুহাম্মাদ এসে ইমাম শামিলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইমাম তাকে যথাযথ মর্যাদার সাথে বসতে দেন, সাদর আপ্যায়ন করেন এবং আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চান। কুশল বিনিময় ও প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর নির্জনে বসে মোল্লা মুহাম্মাদ ইমাম শামিলকে বললেন–

'বর্তমানে তুমি দাগেস্তানের ইমাম। তোমাকে ইমাম বানিয়ে আল্লাহ আমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন। তোমার কাজে হস্তক্ষেপ করা আমি পছন্দ করি না। আজ উখলগুতে তুমি যা কিছু করলে– সব আমি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তোমার সেই মজলিসে আমি উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে চিনতে

পারেনি। রাশিয়ানদের সাথে সন্ধি করতে ইচ্ছুক চেচেন প্রতিনিধি দলটি আমার কাছেও গিয়েছিলো। তোমার শ্বশুর ডাক্তার আবদুল আজীজের নিকটও গিয়েছিলো। আমি তাদেরকে সে জবাবই দিয়েছি, যা তুমি দিয়েছো। কিন্তু তোমার আজকের আচরণ দেখে আমি যারপরনাই প্রীত হয়েছি। যুদ্ধে অনেক কিছু ঘটে থাকে। কখনো সম্মুখে অগ্রসর হতে হয়, কখনো পেছনে সরে আসতে হয়। কখনো জয়, কখনো পরাজয়। অনেক সময় নিজের বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করার জন্য সময়ের প্রয়োজন পড়ে; আর সময় লাভের জন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে সন্ধিও করতে হয়। নিজের অবস্থান বহাল রেখে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে সামান্য শিথীলতা অবলম্বন, খানিকটা ছাড় প্রদান কাপুরুষতা নয়। হতে পারে, কখনো তুমি দুশমনের হাতে ধরা পড়ে যাবে। তখন সন্ধির পথ অবলম্বন না করলে তারা তোমাকে জীবিত ছাড়বে না। আর তুমি বেঁচে থাকতে না পারলে তোমার এই মিশনও স্তব্ধ হয়ে যাবে, সমগ্র কাফকাজ রাশিয়ানদের গোলামে পরিণত হবে।'

ঃ আপনার এই উপদেশগুলো ভবিষ্যতে আমাকে আলোকবর্তিকার কাজ দেবে। কিন্তু পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে, তা আপনার চে' কে ভালো জানবে? শত্রু সৈন্যরা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় এগিয়ে আসছে। ভয়ংকর অস্ত্রে সজ্জিত তারা। দুশমনের গোমস্তারা গোত্রগুলোর ওফাদারি ক্রয় করার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করছে। আমি মনে করি, এই অবস্থায় শিথীলতা অবলম্বন করার ফল হবে ধ্বংসাত্মক। আমি চাই, দাগেস্তানে মুসলমানদের একটি মাত্র পথ অবশিষ্ট থাকুক। জিহাদ কিংবা মৃত্যু। জিহাদের পথে অর্জিত হয় শাহাদাত। আমি শাহাদাতহীন স্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘৃণার বস্তুতে পরিণত করতে চাই।

ঃ হ্যাঁ, বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার এই অবস্থানই সঠিক। আমার কথার অর্থ হলো, ভবিষ্যতে যে কোনো অবস্থায় এই নীতিকেই আকড়ে থাকা ঠিক হবে না।

ঃ হযরত! শত্রুর তুলনায় আমরা অত্যন্ত দুর্বল। আমাদের অস্ত্র যা আছে, প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। আপনি দু'আ করবেন, যেনো আমরা আরো অস্ত্র, আরো শক্তি অর্জন করতে পারি। দুশমনের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে এনে আমাদের লড়াই করতে হয়। প্রয়োজন শুধু বন্দুক-পিস্তলের হলে তো কথা ছিলো না। প্রয়োজন যে আরো ভারী অস্ত্রের– তোপ-কামান। এসব তো আর ছিনিয়ে আনা যায় না। তাছাড়া এসব ভারী অস্ত্র ব্যবহার করতে আমরা জানিও না। দুনিয়ায় আমাদের সাহায্য করার মতোও তো কেউ নেই। বলুন হযরত! এই অসহায়ত্ব থেকে আমরা কীভাবে মুক্তি পেতে পারি?

ঃ পরিস্থিতির নাজুকতার ব্যাপারে আমিও পুরোপুরি সচেতন। কী বলে যে আমি তোমার সাহস বৃদ্ধি করবো, খুঁজে পাচ্ছি না। তবে বৎস! সাহস হারাবার কোনো কারণ নেই। আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা

আমাদের জীবনের লক্ষ্য। সত্যের জন্য লড়াই করে জীবন দেয়াও এক চরম সাফল্য। তোমার কাজ চেষ্টা করা। ফলাফল আল্লাহর হাতে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যারা জান-প্রাণ চেষ্টা করে, তারা ঐসব লোকদের চে' অনেক উত্তম, যারা হাল ছেড়ে বসে থাকে। তুমি তোমার সাধ্য পরিমাণ চেষ্টা চালিয়ে যাও, মনোবল হারিও না।

ঃ পীর ও মুরশিদ! আমরা তরবারী আর খঞ্জর দ্বারা তোপের মোকাবেলা করছি। এর চে' বড় চেষ্টা আর কী হতে পারে?

ঃ আরো একটি জরুরি কথা বলে যাচ্ছি। তা হলো, তুমি তাখতিনিয়া এবং দাগেস্তানের ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করো। এর জন্য তাখতিনিয়ার খান-এর কন্যা জাওয়াহেরকে তুমি বিয়ে করে নাও।

ঃ পীর ও মুরশিদ! এ আপনি কী বলছেন? ফাতেমা থাকতে আমি আরেকটি বিয়ে করবো? এ যে আমার কল্পনারও অতীত!

ঃ শাসক ও সেনাপতিদের প্রয়োজনে এ কাজ করতে হয়। এ বিয়ের মাধ্যমে তোমার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ফাতেমা সন্তুষ্টচিত্তে এতে সম্মতি দেবে। রাজনৈতিক কিংবা সামরিক স্বার্থ থাকলে একাধিক বিয়ে করায় দোষ নেই। একজন সাধারণ মানুষই তো একত্রে চারটি বিয়ে করতে পারে। তাছাড়া যুদ্ধ চলমান এলাকায় পুরুষদের এমনিতেই একাধিক বিয়ে করতে হয়। অন্যথায় স্বামীর অভাবে মহিলারা বিপথগামিতার পথে অগ্রসর হয়।

ঃ ইতিপূর্বে আমি এ বিষয়ে কোনো চিন্তা-ই করিনি। আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুললেন। ফাতেমার আপত্তি না থাকলে আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি।

মোল্লা মুহাম্মদ যে দিক থেকে আসলেন, সে দিকে চলে গেলেন। ইমাম শামিল ঘরে যান। ঘরে পৌছামাত্র স্ত্রী ফাতেমা কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলে ওঠেন– 'অপর কামরাটি আমি ঠিক করে রেখেছি– জাওয়াহের-এর জন্য। আপনি জলদি বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে ফেলুন।'

ঃ আশ্চর্য! কথা হলো আমার আর শায়খের মধ্যে। তুমি ওসব জানলে কি করে?

ঃ আপনাদের ঐ আলোচনার খবর আমি জানি না। আমাকে আব্বাজান লিখেছেন– 'দাগেস্তানের ইমামের আরেকটি বিবাহ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। এ ব্যাপারে তোমার সহযোগিতা প্রয়োজন।' তাছাড়া আব্বাজান না বললেও আমার কোনো আপত্তি থাকতো না। আপনার সন্তুষ্টিই আমার সন্তুষ্টি। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থই আমার স্বার্থ।

ইমাম শামিল ঃ তার মানে, শায়খ প্রথমে আমাদের আব্বাজানের সঙ্গে কথা বলেছেন বোধ হয়।

কয়েকদিন পর ইমামের ঘরে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী জাওয়াহের এসে পৌছে এবং ফাতেমার সদ্ব্যবহারে অতি অল্প সময়ে ফাতেমার অন্তরঙ্গে পরিণত হয়। ইমাম শামিল এই বিয়ের ফলে ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমামের নির্দেশনায় চেচনিয়ার মুসলিম গোত্রগুলো তাদের কর্মকৌশলে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে। তারা নিজ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করার বদলে তাখতিনিয়ায় সমবেত হতে শুরু করে।

তাখতিনিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্গম এলাকা। এলাকার বন-জঙ্গল অত্যন্ত গহীন এবং পাহাড়-পর্বত বেশ উঁচু। গেরিলা যুদ্ধের জন্য এই এলাকা বেশ উপযোগী। এ কারণে তাখতিনিয়ার রুশ সৈন্যদের অগ্রযাত্রা যে থেমে যায়, শুধু তা-ই নয়– অনেক সময় তারা পিছু হটতেও বাধ্য হয়। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মুজাহিদদের সহায়ক। ঝড়-বৃষ্টি, মশা-মাছি সবই মুজাহিদদের দোস্ত, রাশিয়ানদের দুশমন।

ইমাম শামিলের দুর্ধর্ষ বাহিনীও রুশ সৈন্যদের উপর জোরদার আক্রমণ করে বসে। তাখতিনিয়ায় রুশ সৈন্যদের কমাণ্ড সেনাপতি ফায়-এর হাতে। তিনি তার এক অধীন অফিসারকে তিবলিসে কমান্ডার ইন চীফ-এর কাছে এ পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করেন–

'এ মুহূর্তে যদি আমরা আমাদের সর্বশক্তি তাখতিনিয়ায় নিয়োগ করতে পারি, তাহলে এই অঞ্চলকে বিদ্রোহীদের কবল থেকে মুক্ত করা যেতে পারে। এরপর আমরা পুরোদমে দাগেস্তানে হামলা করতে পারবো। কিন্তু এ পরিকল্পনায় সাফল্য লাভের জন্য প্রথমে শামিলের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়া প্রয়োজন, যাতে সে তাখতিনিয়াবাসীদের সাহায্য করতে না পারে এবং আমাদের সেনাবহরের উপর আক্রমণ পরিচালনা বন্ধ রাখে।'

কমান্ডার বেরন রোজন সেনাপতির এ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। শাহজাদা দাদিয়ানী সেনাপতি ফায়-এর প্রতিনিধি হিসাবে ইমাম শামিলের সঙ্গে সন্ধির আলোচনা করে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত হয়, উভয় পক্ষের কেউ দাগেস্তানে অন্যের উপর আক্রমণ করবে না। রাশিয়ার সেনাবহর তমীরখানগুরা এবং তাখতিনিয়ার মাঝে চলাচলের জন্য বিকল্প কোন পথ অবলম্বন করবে।

তাখতিনিয়ায় স্বাধীনতাকামীদের দমন করার জন্য অসংখ্য তাজাদম রুশ সৈন্য অত্র অঞ্চলে পৌছে গেলে স্বাধীনতাকামীরা যথারীতি লোকালয় ত্যাগ করে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। রুশ সৈন্যরা তাদের শূন্য ঘর-বাড়ি, বাগ-বাগিচা ও ফসলের ক্ষেত-খামার আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। তাদের পানির কূপগুলো পর্যন্ত তারা মাটি দিয়ে ভরে দেয়।

ইমাম শামিল সন্ধি করার পর তার কিছু সৈন্য তাখতিনিয়ার স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। অবশিষ্টদেরকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার কাজে নিয়োজিত করেন।

গ্রীষ্মকাল ঘনিয়ে এলে কমান্ডার বেরন রোজন তাখতিনিয়ায় অবস্থানরত রুশ সৈন্যদের তমীরখানশুরা পৌঁছার আদেশ দেন। শীতের মৌসুম রুশ সৈন্যদের জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। কঠিন বরফপাতের ফলে পথ-ঘাট বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ি চলাচল ও তোপ ব্যবহার কঠিন হয়ে পড়ে। সৈন্যরা খোলা আকাশের নীচে প্রচণ্ড শীতে থর থর কাঁপতে কাঁপতে মরতে শুরু করে। স্বাধীনতাকামীরা এই মওসুমে তাদের অভিযান জোরদার করে, আক্রমণের গতি বাড়িয়ে দেয়। ওরা এই ভূখণ্ডের-ই সন্তান। এখানকার কোন্ মওসুমে কীভাবে টিকে থাকতে হবে, তা তাদের জানা আছে। কিন্তু প্রতি বছর এই শীতের মওসুমে রুশ সৈন্যদের পাহাড় ত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হয় এবং বিজিত অঞ্চলসমূহ আবার স্বাধীনতাকামীদের দখলে চলে আসে।

সেনাপতি ফায় এবং কর্নেল দাদিয়ানী সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে তমীরখানশুরার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা যে পথে রওনা হয়, সে পথটি ইশিলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেছে। ইশিলতা সেই জায়গা, যেখানে হামজা বেগ-এর মৃত্যুর সময় ইমাম শামিল তাঁর বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছিলেন। রুশ সৈন্যরা ইশিলতার নিকটে পৌঁছুলে ইমামের দূত সেনাপতি ফায়-এর নামে এই পত্রটি বহন করে নিয়ে যায়-

'এই পথ অবলম্বন করে তুমি চুক্তি পরিপন্থী কাজ করেছো। এমতাবস্থায় আমি কি ধরে নেবো যে, তোমার-আমার সন্ধিচুক্তি বাতিল হয়ে গেছে?'

সেনাপতি ফায় পত্রটি পাঠ করে অট্টহাসি হাসে এবং অবজ্ঞার সাথে বলে- 'জংলী, বে-দীনদের সঙ্গে চুক্তির কোনো মূল্য আছে নাকি? চুক্তি তো হয় সুসভ্য লোকদের সঙ্গে।'

দূত ফিরে এসে ইমামকে সেনাপতি ফায়-এর জবাব এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করে। ইমাম তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দেন। পরদিন ভোরে রওনা হয়ে সন্ধ্যার সময় তারা ইশিলতা পৌঁছে। ইশিলতার জনবসতিগুলো ততোক্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ঘর-বাড়ি আগুনে ভস্মিভূত। গলিতে গলিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে অসংখ্য নারী ও শিশুর লাশ। বিধ্বস্ত ঘরের ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে আছে কয়েকজন শহীদ। স্থানে স্থানে পড়ে আছে জন্তু-জানোয়ারের মৃতদেহ। তাদের রক্তে লাল হয়ে আছে ইলিশতার পথ-ঘাট। ইলিশতার কূপগুলোও শহীদদের লাশে পরিপূর্ণ। মসজিদগুলো সব বিধ্বস্ত।

ইমাম শামিল তাঁর সাদা ঘোড়ায় সওয়ার। দৃষ্টি তাঁর শহীদদের লাশের প্রতি নিবদ্ধ। তার পেছনে নায়েবগণ। নায়েবদের পেছনে সাধারণ সেনাবহর। বাতাসের তালে পত্ পত্ করে উড়ছে তাদের কালো পতাকা। তাঁরা সকলে নির্বাক্। কারো মুখে রা নেই। এক গভীর নীরবতা বিরাজ করছে সমগ্র এলাকা জুড়ে। কেবল বাতাসের শো শো শব্দ ইশিলতার হতভাগ্য অধিবাসীদের এই করুণ পরিণতিতে মাতম করে ফিরছে।

ইমাম শামিলের নায়েব সুরখাই খান মুজাহিদদের নিকটে গিয়ে বললেন–

'ইশিলতার এই শহীদদের আত্মা, বিধ্বস্ত বসতি, এই বাক্হীন জীব-জানোয়ার তোমাদেরকে কী বলছে জানো? তারা বলছে, তোমরা তোমাদের তরবারীগুলোকে বলো, যেনো ওরা এই মুহূর্তে আল্লাহর গযবে পরিণত হয়, যেনো ওরা এক্ষুনি নিজেদেরকে বজ্রকন্যা প্রমাণিত করে। এক্ষুনি যদি তোমাদের তরবারীগুলো উড়ে গিয়ে জালিমদের মস্তক ছিন্ন করতে না পারে, তাহলে তোমরা কাপুরুষ বলে বিবেচিত হবে। আর শুনে রাখো, আজ একজন জালিমও যদি তোমাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, তাহলে এই শহীদদের আত্মা তোমাদের ক্ষমা করবে না।'

ইমাম শামিল হঠাৎ ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে সৈন্যদের কাছে এসে বলে ওঠেন– 'থামো, তোমরা প্রতিশোধ নেয়ার যথেষ্ট সময় পাবে। আগে শহীদদের দাফন করো।'

নায়েব ও মুজাহিদগণ শহীদদের জানাযা-দাফনে আত্মনিয়োগ করেন। অপরদিকে সেনাপতি ফায়, কর্নেল দাদিয়ানি, কয়েকজন অফিসার ও সিপাহী প্রতি মুহূর্তে ইমাম শামিলের আক্রমণের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। গাছের একটি পাতা ছিঁড়ে পড়লেও রুশ সৈন্যদের রাইফেলে মুখ খুলে যায়। অবশেষে রুশ সৈন্যরা তমীরখানশুরায় পৌঁছে যায়। হেডকোয়ার্টারের চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে।

একদিন-দু'দিন করে পুরো সপ্তাহ কেটে যায়। কিন্তু শামিলের কোনো অভিযানই তাদের চোখে পড়ছে না। সেনাপতি অফিসারদের বৈঠকে তলব করে। যথাসময়ে বৈঠক শুরু হয়। অফিসারদের উদ্দেশে সেনাপতি বললো–

'আমাদের ধারণা, শামিল সোজা হয়ে গেছে। তার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। আসলে এই জংলী মানুষগুলো সেই ভাষা-ই বুঝে, যা আমি ইশিলতায় প্রয়োগ করেছি। আরো দু'-একটি আঘাত হানতে পারলে আশা করি ওরা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

সেনাপতি কলগুনো বললো, আমি মনে করি, শামিলের এই রহস্যময় নীরবতা উদ্দেশ্যহীন নয়। নতুন করে অভিযান পরিচালনার আগে ভালো করে খোঁজ-খবর নেয়া প্রয়োজন। শীত শুরু হয়ে গেছে। খুব সম্ভব শামিল এ কৌশল-ই অবলম্বন

করে বসে আছে যে, শীতের সুযোগে সে আমাদের উপর বড় ধরনের হামলা চালাবে আর আমাদের সৈন্যরা বরফঢাকা রাস্তায় তার সৈন্যদের দয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

শাহজাদা দাদিয়ানী বললো, আমিও অনুরূপ মত পোষণ করি।

সেনাপতি ফায় অফিসারদের পরামর্শ মোতাবেক অভিযান পরিচালনা আপাতত স্থগিত থাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেয় এবং ইমাম শামিলের গতিবিধি আন্দাজ করার জন্য গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করে।

সেনাপতি পচকিভচ দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডিং-এর দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর তিন বছর কেটে গেছে। এ তিন বছরে তাকে দাগেস্তান, চেচেনিয়া এবং কাফকাজের আরো কিছু এলাকায় সামরিক অভিযান পরিচালনা ছাড়া ১৮৩৬ সালে ইরানী সৈন্যদের সাথেও লড়াই করতে হয়েছে। সেনাপতি পচকভিক-এর সবচে' বড় সাফল্য, সে কাক্ষ বাহিনী এবং গোত্রীয় রেজিমেন্টগুলোর সহায়তায় মুজাহিদদের উপর তীব্র আক্রমণের সূত্রপাত করেছিলো। মুজাহিদদের নির্দিষ্ট একটি অবস্থানকে টার্গেট করে সে অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করতো। কখনো কখনো এই আক্রমণ রুশ সৈন্যদের জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হলেও অধিকাংশ সময় তার অভিযান সফল হতো। কিন্তু জার নেকুলাই তার সৈন্যদের কর্মতৎপরতার এই গতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার আকাঙ্ক্ষা ছিলো, আরো অনেক দ্রুত সমগ্র কাফকাজের উপর চিরদিনের জন্য রাশিয়ার দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের সম্ভাবনা চিরতরে খতম হয়ে যাক।

কমাণ্ডার পচকিভচ তমিরখানশুরা ও কবারদা উভয় দিক থেকে আক্রমণ করে দাগেস্তান ও চেচনিয়াকে জয় করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। তমিরখানশুরার দিক থেকে পরিচালিত আক্রমণ মোকাবেলা করে ইমাম শামিলের মুজাহিদ বাহিনী। এই বাহিনী রুশ সেনাপতির পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়। তবে চেচনিয়ায় কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয় রুশরা। কিন্তু তাতে রুশ কমাণ্ডারের আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। ফলে জার নেকুলাই কমাণ্ডার ইন চীফ পচকিভচকে বরখাস্ত করে সেনাপতি বেরন রোজনকে নতুন কমাণ্ডার ইন চীফ নিয়োগ করেন।

কমান্ডার ইন চীফ পরিবর্তন রুশ অফিসার ও সিপাহীদের উপর সাধারণত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। কারণ, জারের সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রত্যেক নতুন কমাণ্ডার সৈন্যদেরকে অসহনীয় যুদ্ধের নরকে নিক্ষেপ করে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের ন্যায় এলোপাতাড়ি লড়াই করে বিপুলসংখ্যক সৈন্যের ক্ষতিসাধন করার পর তারা যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কিন্তু সেনাপতি পচকিভচ যেহেতু কমাণ্ডার ইন চীফ পদ লাভ করার আগেও

দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর নায়েব কমান্ডার ইন চীফ ছিলো, তাই সে দ্রুত বিজয় লাভের নেশায় পড়ে নিজের সৈন্যদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা পছন্দ করেনি। কিন্তু সেনাপতি বেরন রোজনের সেনানায়ক হিসেবে খ্যাতি থাকলেও সে ছিলো নিতান্ত গোঁড়া প্রকৃতির। সে কারো পরামর্শ ও মতামতের তোয়াক্কাই করতো না এবং তার জানা ছিলো, কাফকাজে গোঁড়ামীর ফল কখনোই ভালো হয়নি।

✿ ✿ ✿

১৮৩৭ সালের হেমন্ত কাল। কমাণ্ডার ইন চীফ জেনারেল রোজন তিবলিসে তার প্রাসাদ -সদৃশ বাসগৃহে বসে সুরাপানে লিপ্ত। ইত্যবসরে রাজ দরবার থেকে একটি বিশেষ পয়গাম এসেছে বলে খবর পায়। অজানা আশংকায় কেঁপে ওঠে সেনাপতির মন। তবে নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে পয়গাম তলব করে। খাদেম মোহরাংকিত একটি লেফাফা বরতনে রেখে সেনাপতির সামনে পেশ করে। সেনাপতি লেফাফাটি খুলেই চমকে ওঠে। এ যে জার নেকুলাই'র দরবারী মন্ত্রীর পত্র। পত্রের বক্তব্য নিম্নরূপ-

'রাজাধিরাজ, খৃষ্টধর্মের মুহাফিজ ও মহান প্রভূ জার নেকুলাই শীঘ্র তিবলিস পরিদর্শনে আসছেন। আলমপানাহ'র আদেশ, কাফকাজের বিদ্রোহী শামিলকে তিবলিসে জীবিত হোক মৃত হোক তাঁর সামনে পেশ করতে হবে। শাহেনশাহ'র সফরের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। শাহী সাওয়ারী রওনা হওয়ার চূড়ান্ত তারিখ ঠিক হলেই আপনাকে জানিয়ে দেয়া হবে।'

সেনাপতি রোজন পত্রখানা পড়েই মাথায় হাত চেপে বসে পড়েন। তারপর বিড় বিড় করে বলতে শুরু করেন, শীঘ্র জীবিত কিংবা মৃত শামিলকে হাজির করতে হবে। রাজা-বাদশাদের খায়েশ এমন আকাশকুসুমই হয়ে থাকে। শাহেনশাহ আসুন, তবেই তিনি দেখতে পাবেন, এখানকার পাহাড়-জঙ্গলে না তার আদেশ চলে, না তাঁর গোলামদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়।

খানিকটা চিন্তা করে সেনাপতি তার অধীনদের আদেশ করেন, ফিল্ড হেডকোয়ার্টারকে জানিয়ে দাও, অতি শীঘ্র আমরা তার ওখানে গিয়ে পৌঁছবো।

তমীরখানশুরার রুশ সেনা-হেডকোয়ার্টারের চার পার্শ্বে সশস্ত্র সৈন্যদের কড়া প্রহরা। দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাকমাণ্ডার হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত। তার আশংকা, ইমাম শামিল নিশ্চিত এখানে অভিযান পরিচালনা করবেন। সেনাপতি রোজন ফিল্ড হেডকোয়ার্টারের এক কক্ষে সংশ্লিষ্ট স্টাফ অফিসারদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন। হঠাৎ তিনি গর্জন করে বলে ওঠেন-

'অসম্ভব! অসম্ভব! আপনাদের প্রত্যেকের জানা থাকা দরকার, শাহেনশাহ'র কর্ণ 'অসম্ভব' শব্দটা শুনতে অভ্যস্ত নয়। শামিলকে যদি জীবিত কিংবা মৃত তার সামনে পেশ করা না যায়, তাহলে আমাদের একজনেরও নিস্তার হবে না। তখন

আমাদের জীবনে রক্ষা পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়বে।'

ফিল্ড কমাণ্ডার ঃ ইচ্ছা করলে আমাদেরকে আপনিও শাস্তি দিতে পারেন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আপনার চোখের সামনে। শাহেনশাহ শীঘ্র এসে পড়ছেন। এ মুহূর্তে আমরা সব সৈন্য যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেও শামিলকে হত্যা বা গ্রেফতার করতে পারব না।

ঃ তোমার বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু যে কোনো মূল্যে শামিলকে হত্যা বা গ্রেফতার করতেই হবে। শক্তিতে, প্রতারণায়, ছল-চাতুরীতে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সবুজ বাগান, সুরম্য অট্টালিকার লোভ দেখিয়ে– যেভাবে হোক শামিলকে হত্যা বা বন্দি করা চাই।

ঃ এটা অসম্ভব মহামান্য সেনাপতি! শামিল দুধের শিশু নয় যে, আমরা যা বলবো তা-ই সরলতার সাথে মেনে নেবে। আলোচনার প্রস্তাব দিলে সে এমন জায়গায় বসার কথা বলবে, যেখানে গেলে উল্টো আমাদেরই তার হাতে ধরা খেতে হবে। অযথা আত্মপ্রবঞ্চনার পথে পা রেখে লাভ নেই মাননীয় সেনাপতি!

ঃ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে শামিল সম্মত হতে পারে। আমরা শাহেশাহকে আবেদন জানাবো, যেনো তিনি রাজ দরবারে শামিলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন, যাতে শামিল ও তার সঙ্গীরা যুদ্ধের পথ পরিহার করে বন্ধুত্বের প্রতি উৎসাহিত হয়।

ঃ একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, শামিল আমাদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করবে না। আর উল্টো সে-ই যদি এমন শর্ত আরোপ করে বসে, যা পালন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে, তখন?

ঃ সেনাপতি! তুমি শামিলের নিকট আলোচনার প্রস্তাব পাঠাও। আলোচনার জন্য সে যেখানে ইচ্ছা বসতে পারে। আমাদের পক্ষ থেকে তুমি কথা বলবে। আলোচনার স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা কৌশল অবলম্বন করবো। তাতে কাজ হয়ে গেলে তো হলোই; অন্যথায় কী করব, পরে দেখবো।

অফিসারদের বৈঠক সমাপ্ত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর এক রুশ সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে হাতে সাদা পতাকা ধারণ করে উখলগু অভিমুখে রওনা হয়।

উখলগুর ইমাম ভবনে ইমাম শামিল তার নায়েবদের সঙ্গে উপবিষ্ট। ইমাম শামিল গুপ্তচদের মাধ্যমে তিবলিস থেকে যেসব সংবাদ পেয়েছেন, তা নিয়ে নায়েবদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন। গুপ্তচররা জানায়, জার নেকুলাই অতিশীঘ্র তিবলিস আগমন করছেন এবং তাঁর নির্দেশ, তিনি ইমাম শামিলকে জীবিত বা মৃত নিজের সামনে উপস্থিত দেখতে চান। দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাকমাণ্ডার বেরন রোজন তমিরখানশুরা পৌঁছে গেছেন।

ইমাম শামিল ও তার নায়েবদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত যে, রাশিয়ানরা এক্ষেত্রে কোনো না কোনো কূট-কৌশলের পথ অবলম্বন করবেই। আর সম্ভবত এই কৌশল

হবে আলোচনার কৌশল। এই কৌশল ব্যর্থ হলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। আর যথাসম্ভব এই আক্রমণ পরিচালিত হবে জারের বিদায়ের পর। কাজেই আমাদের আক্রমণের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি শুরু করা প্রয়োজন।

পরামর্শের পর ইমাম শামিল সিদ্ধান্ত নেন, উখলগুতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে এবং তোপের গোলা থেকে নিরাপত্তাদানকারী মোর্চা তৈরির কাজে জর্জিয়ার সেই সৈন্যদের নিয়োজিত করতে হবে, যারা পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আরো সিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু উখলগুর অবস্থান পাহাড়ের পাদদেশে নিম্নভূমিতে, তাই পাহাড়ের উপরে উঁচুতে আমাদের আরেকটি নতুন বসতি স্থাপন করতে হবে।

অবিলম্বে হাজার হাজার মুরীদ জর্জিয়ার সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে উখলগুর অভিমুখে রওনা হয়। উঁচু পাহাড় পর্যবেক্ষণ করে তারা পাথর কেটে মোর্চা তৈরি ও গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। এই পাহাড়টি অন্তত এক বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত, যার অর্ধেকটা উঁচু উঁচু পাথর দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিকল্পনায় এদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে যে, তোপের গোলায় পাথর ভেঙ্গে পড়লে তাতে যেনো মোর্চা ও ঘরের কোন ক্ষতি না হয় এবং চলাচলের পথও বন্ধ না হয়।

রুশ অফিসার ঘোড়া হাঁকিয়ে হেডকোয়ার্টারের সামান্য দূরে পৌঁছামাত্র ছয়জন অশ্বারোহী মুরীদ তার গতিরোধ করে। অফিসার মুরীদদের সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। মুরীদরা তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, আমাদের সঙ্গে কোনো আলাপ নেই। আলাপের প্রয়োজন হলে ইমামের সঙ্গে করতে হবে।

রুশ অফিসারকে আটকে রেখে ইমামকে সংবাদ দেয়া হলো। ইমাম শামিল তার খাস নায়েব সুরখাই খানকে রুশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রেরণ করেন। তাকে বলে দেন, আলোচনার জন্য যেন 'আত্মাপুরী' নামক স্থানকে নির্বাচন করা হয়।

উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের আলাপের পর সিদ্ধান্ত হয়, মূল আলোচনা শুধু ইমাম শামিল ও সেনাপতি কলগনুর মধ্যে আত্মাপুরীতে অনুষ্ঠিত হবে। উভয়ের সঙ্গে একজন করে দোভাষী থাকবে। নিরাপত্তার জন্য ছয়জন করে গার্ড একশ গজ ব্যবধানে পেছনে অবস্থান করবে।

আত্মাপুরী একটি রহস্যময় এবং ভয়ানক জায়গা। এক উঁচু পাহাড়ে বৃহদাকার একটি পাথরখণ্ড। পাথরের নীচে অলৌকিকভাবে নির্মিত একটি চবুতরা। চারদিকে ঘন ও আকাশচুম্বী বৃক্ষমালা। পাশেই বেশ বড় একটি কূপ। কূপ থেকে উৎসারিত পানির শব্দ চারদিকের পরিবেশকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে। চবুতরার উপরে পাথর এবং আশেপাশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজী থাকার কারণে সেখানে দিনের

বেলায়ও রাতের ঘোর অন্ধকার বিরাজ করে। কিংবদন্তি আছে যে, এই স্থানটি প্রেতাত্মার আবাস।

রুশ সেনাপতির একপা নেই। কাফকাজের এক লড়াইয়ে প্রতিপক্ষের গোলার আঘাতে সেটি উড়ে গেছে। কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বীরত্বের কারণে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। ঘোড়ায় চড়ে তার ছয়জন সেনাপতি এবং ছয়জন নিরাপত্তা কর্মী এগিয়ে চলছে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে বডিগার্ডরা থেমে যায়। সেনাপতি কলগানু ঘোড়া থেকে নেমে লাঠিতে ভর করে হেঁটে চবুতরায় গিয়ে বসে। সঙ্গে তার দোভাষী।

একই সময়ে বিপরীত দিকে কালো পতাকার সারি চোখে পড়ে। সকলের সামনে ইমাম শামিল। একটি সাদা ঘোড়ায় সওয়ার তিনি। পেছনের ছয়টি ঘোড়ায় কালো পোশাক পরিহিত ছয়জন নায়েব। হাতে তাদের দাগেস্তানের কালো পতাকা। বাতাসের তালে তালে পত্ পত্ করে উড়ছে পতাকাগুলো। ইমাম শামিলও নির্দিষ্ট স্থানে ঘোড়া থেকে নেমে চবুতরা অভিমুখে আগমন করেন।

আলোচনা শুরু হলো। ইমাম শামিল বললেন, যেহেতু আলোচনার প্রস্তাব তোমাদের পক্ষ থেকে এসেছে, তাই তুমিই কথা শুরু কর। ইমাম শামিলের দোভাষী রুশ সেনাপতিকে ইমামের বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়।

রুশ সেনাপতি বললেন, অহেতুক রক্তক্ষয় বন্ধ হওয়া দরকার। আমাদের পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন অসম্ভব কিছু নয়। বিদ্রোহমূলক তৎপরতা পরিহার করে তুমি শান্তির পথ অবলম্বন করো। আমরা শান্তির মর্যাদা দিতে জানি। আমাদের বিশ্বাস, এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ঃ 'বিদ্রোহ' শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে। তোমাদের রাজ্যে যদি কেউ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তবে তাকে তোমরা বিদ্রোহী বলতে পারো। এটা তোমাদের রাজ্য নয়। এটা আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, জন্মভূমি। অহেতুক রক্তক্ষয় না-ই যদি কামনা করো, তাহলে তোমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাও। আমরা আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য লড়াই করছি।

ঃ বর্তমান বিশ্বে বেশ ক'টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বড় সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে পরিচিত হচ্ছে। তোমার এলাকা রাশিয়ার অঙ্গরাজ্যে পরিণত হলে সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করবে বলে আমরা মনে করি।

ঃ রাশিয়ার সাধারণ নাগরিক কতো সুখে আছে, আমরা তা জানি। অত্র অঞ্চলের মানুষ রাশিয়ার দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকাই পছন্দ করে।

ঃ আমাদের দেশে স্থানে স্থানে সড়ক ও বড় বড় কল-কারখানা নির্মিত হচ্ছে। জমির উৎপাদন দিন দিন বাড়ছে। রাশিয়া একটি সুসভ্য দেশ। আমাদের আনুগত্য

মেনে নিলে তোমরা লাভবানই হবে।

ঃ কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তাকারী লাখ লাখ শ্রমিক ও তাদের স্ত্রী-সন্তানরা না খেয়ে মরছে। এমন একটি দেশকে তোমরা সভ্য বলছো, যে দেশের জমিদারদের কুকুর পালিত হয় কৃষকদের স্ত্রীদের স্তন চুষে আর কৃষকদের শিশুরা নিজ মায়ের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত।

ঃ কিন্তু আমাদের শাহেনশাহ যে এ অঞ্চলের পথ ধরে সামনে অগ্রসর হতে চাচ্ছেন। আমাদের সৈন্যরা যাতে এ পথে নিরাপদে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে, তোমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের-তোমাদের মাঝে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ঃ জালিম-মজলুমের বন্ধুত্ব কখনোই সম্ভব নয়। বিজয়ী-বিজিত আপন হতে পারে না। সুসভ্য-অসভ্য সুহৃদ হতে পারে না। জার যে পথ কামনা করছেন, তা কেবল আমাদের লাশের উপর দিয়েই তৈরি হতে পারে।

ঃ তা হয়ত তোমাদের লাশের উপর দিয়েই নির্মিত হবে। কিন্তু আমি চাচ্ছি, এমনটি না হোক। আমরা তোমাদের দুশমন ঠিক; কিন্তু আমি বন্ধু হয়ে তোমাকে বলছি, সময় ও পরিস্থিতি তোমাদের বিপক্ষে। তোমরা কতোদিন লড়াই চালাতে পারবে?

ঃ আমরা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো। তোমার পরামর্শের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা কেনো লড়াই করছি, তা বুঝবার মতো বিবেক তোমাদের নেই। আমরা পরকালের জীবনে বিশ্বাসী। এ কারণে আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না। আমাদের নীতি, হয় ইজ্জতের জীবন, নতুবা ইজ্জতের মৃত্যু।

ঃ তোমরা বেশিক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে না। আমাদের কাছে এমন বড় বড় তোপ আছে, যা তোমাদের কল্পনার অতীত। সেসব তোপের গোলায় তোমাদের পাহাড়গুলো তুলার মত উড়ে যাবে। সমতল ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হলে সেখানে পুকুর সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ঃ তবে তো ভালোই হবে। পানির জন্য আর আমাদের কষ্ট করতে হবে না। এতে তোমাদের সেসব পূর্বপুরুষের জুলুমেরও প্রতিবিধান হয়ে যাবে, যারা আমাদেরকে পিপাসায় মারবার জন্য আমাদের অসংখ্য কূপকে মাটি দিয়ে ভরে দিয়েছিল।

ঃ এটা তামাশার সময় নয়। আমি সত্যি সত্যি বলছি, গাড়ির দীর্ঘ বহর গোলাবারুদ নিয়ে ধেঁয়ে আসছে। আসছে কয়েক মাইল দূরে নিক্ষেপণযোগ্য তোপ-কামান। তরবারি আর খঞ্জর দ্বারা তোমরা আমাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। এখনো সময় আছে, হঠকারিতা ছেড়ে জারের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে নাও।

ঃ বন্ধুত্ব আর আনুগত্যে পার্থক্য আছে। তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও; আমরা তোমাদের বন্ধু হয়ে যাবো। কিন্তু জারের দাসত্ব বরণ করে নেয়ার নাম যদি বন্ধুত্ব হয়, তাহলে এটা অসম্ভব। আমরা স্বাধীন হয়ে জন্মেছি, স্বাধীনই থাকবো। বাজপাখির চরিত্র তোমাদের অজানা। সিংহের স্বভাব সম্পর্কে তোমরা অনভিজ্ঞ।

ঃ এখনোও সময় আছে। আমার পরামর্শ মেনে নাও। অন্যথায় বাজ-সিংহ যা-ই হও, পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আমাদের গুলি বাজ-সিংহ উভয়কেই ঠাণ্ডা করে দিতে সক্ষম।

ঃ ব্যস হয়েছে, আর কোনো কথা থাকলে বলতে পারো।

ঃ তুমি যদি শাহেনশাহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত থাকো, তো ভালো। অন্যথায় এখানেই আলোচনার ইতি।

ঃ তোমরা বড় ধূর্ত। সেনাপতি ফায়-এর বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা তো এই সেদিনের কথা। তোমার মতো জারও যদি এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হন, আসতে পারেন, অন্যথায় যা হবার তা-ই হবে।

ঃ (রাগে-ক্ষোভে দাঁত কড় মড় করে) খামুশ! কোন রুশ তার মহান শাহেনশাহ'র অপমান বরদাশত করতে পারে না! একথা বলে রুশ সেনাপতি ইমামের প্রতি থু-থু নিক্ষেপ করে। সুরখাই খান বাজের মত ছুটে এসে সেনাপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার খঞ্জর ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই ইমাম শামিল ব্যাঘ্রের ন্যায় মোড় ঘুরিয়ে সুরখাই খানের হাত ধরে খঞ্জর ছিনিয়ে নেন এবং ধমক দিয়ে বললেন, সরে যাও এখান থেকে। ইতর-ভদ্রের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সেই পার্থক্য আমাদের বজায় রাখতে হবে। রুশ সেনাপতির দেহরক্ষীরা দৌড়ে আসে। কিন্তু ইমাম শামিলের দেহরক্ষীরা ছুটে আসে তার আগেই। সেনাপতি রাগে লাল হয়ে যায়। কিন্তু কিছুই সে বলতে পারছে না। এক দেহরক্ষীর সাহায্যে সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে এবং বলে, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন শিকল পরিহিত অবস্থায় তোমরা আমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। একথা বলেই সে ঘোড়া হাঁকায়।

ঃ আর তোমাদের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ফায়, তোমাদের শাহজাদা দাদিয়ানী এবং তোমাদের কমাণ্ডার ইন চীফ রোজন-এর দিনও শেষ হয়ে এসেছে। সময় শীঘ্রই বলে দেবে, অপমান কার কপালের লিখন আর ইজ্জত কার ভাগ্যলিপি!

এগারো.

সেনাপতি কলগনু তমিরখানশুরা ফিরে যায়। পুনরায় উচ্চ পর্যায়ের সেনা অফিসারদের বৈঠক বসে। কলগনু শামিলের সঙ্গে আলোচনার ব্যর্থতার কথা

অবহিত করে। এবার উখলগুতে আক্রমণ পরিচালনা সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কলগনু নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলে, ওই বন্য বিদ্রোহীর সঙ্গে সংঘাতে আমার আপত্তি নেই। লোকটার প্রতি আমার ব্যক্তিগত আক্রোশও আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে হামলা করা বোকামীর পরিচয় হবে। শামিল কাজী মোল্লা বা হামজা বেগ নয়। তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা কঠোর ও অত্যন্ত মজবুত। আমার আশংকা হচ্ছে, শাহেনশাহ'র আগমনের সময়টিতে উল্টো আমাদের উপর হামলা করে সে শাহেনশাহ'র সামনে আমাদের লাঞ্ছিত করে কিনা। আমার মতে, আমরা শাহেনশাহকে এই বলে আশ্বস্ত করবো যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। শামিলকে উপস্থিত না করার অজুহাত হিসাবে বলবো, শামিল নিজেই শাহেনশাহ'র খেদমতে হাজির হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যদি সে মহানের দরবারে হাজির না হয়, তাহলে তখন তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

১৮৩৭ সালের অক্টোবরের বিকাল বেলা। জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। নগরীর সমস্ত মানুষ শাহী মেহমানখানা অভিমুখী সড়কের দু'পার্শ্বে দণ্ডায়মান। জারের সম্মানে সড়কের দু'পাশের বাড়ি-ঘর, দেয়াল ও গাছ-গাছালিতে হাজার হাজার থান মূল্যবান যে রেশমি কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো, বৃষ্টির পানিতে ভিজে সব জবজবে হয়ে গেছে। জনতা হাঁটু পরিমাণ কাঁদা পানিতে দাঁড়ানো। বিজিত এলাকার হাজার হাজার সুসজ্জিত শাহজাদী, নওয়াবজাদী এবং বড় বড় অফিসারদের বেগমগণ ভিজে একাকার। দীর্ঘ এক সপ্তাহের পরিশ্রম সব পণ্ড হয়ে গেছে। বাতাসের গতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। কিন্তু নিজ অবস্থান থেকে এক পা-ও নড়বার সাধ্য নেই কারুর। সবাই যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য। শাহেনশাহ এসে পড়লেন বলে। সবাই অধীর অপেক্ষমান। গোলাম-মনীব, গরীব, জাগিরদার, কৃষক সবাই শাহেনশাহ'র আগমন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত গেলো বলে। এক অশ্বারোহী হাতে ধরা ঘন্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসে। দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে ঘোড়া। ঘোড়ার পায়ের আঘাতে ছিটকেপড়া কাঁদা-পানিতে দু'পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনতার পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লায় একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ টু শব্দটি করছে না।

কিছুক্ষণ পর অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনী আত্মপ্রকাশ করে। এই বাহিনী খানিকটা এগিয়ে আসার পর পিছনে একটি বাহন চোখে পড়ে– রাজবাহন। রাজাধিরাজ জার নেকুলাই'র বাহন। রাজবাহনের পেছনে আরো একটি অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনী। তার পেছনে তিবলিসের গভর্নর, বিজিত এলাকাসমূহের শাহজাদা ও অন্যান্য উর্ধ্বতন অফিসার বহনকারী গাড়ি।

রাজবাহন আরো এগিয়ে আসে। সম্মুখে আসামাত্র জনতা বুকে হাত রেখে মাথানত করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

রাজবাহনে উপবিষ্ট সুঠাম-সুদেহী একজন মানুষ। সমস্ত দেহ তার মোটা কোটে আবৃত। কোট পরিধানের কারণে তাকে আরো মোটা মনে হচ্ছে। তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাঁপটায় তার নাক লাল হয়ে গেছে। দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। মাথায় লম্বা গরম টুপি। নিজ আসনে অপলক নেত্রে বসে আছেন তিনি। ডানে-বামে তাকাচ্ছেন না এক পলকের জন্যও।

রাজবাহন শাহী মেহমানখানায় প্রবেশ করে। গভর্নর ও অফিসারদের বেগমগণ মেহমানখানার প্রধান ফটক পর্যন্ত পথের দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি ফটকের নিকটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। গভর্নর পেছনের গাড়ি থেকে নেমে সামনে চলে যায় এবং জার নেকুলাই'র প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়। জার তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে অপরদিকের দরজা দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে লালগালিচার উপর দিয়ে হেঁটে খাস কামরায় চলে যান।

তিবলিসের গভর্নর কমান্ডার ইনচীফ বেরন রোজন, নায়েব কমান্ডার শাহজাদা দাদিয়ানী এবং অন্যান্য অফিসারদের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে-বিবর্ণ। ফিল্ড কমান্ডার সেনাপতি কলগনু ও জেনারেল ফায়-এর প্রতিও তিবলিসে হাজির হওয়ার আদেশ জারি হয়েছে।

জার এখন তিবলিসে। রুশ সেনাপতি তার শাহেনশাহ'র আদেশ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। ইমাম শামিলকে মৃত বা জীবিত হাজির করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। গভর্নর, অফিসার, বেগম, শাহজাদী ও দাসীগণ শাহেনশাহ'র দৃষ্টি কাফকাজ ও শামিল থেকে অন্যত্র ফিরিয়ে নেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যায়। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তির অবসানকল্পে তুর্কী গোসলখানায় শাহেনশাহ'র গোসলের ব্যবস্থা করা হয়। দাসী এবং জর্জিয়া-মংগোলিয়ার শাহজাদীগণ শাহেনশাহকে গোসল করানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু শাহেনশাহ'র এসবের প্রতি দৃষ্টি নেই। মনোহারী কিছুই যেনো তার সামনে ঘটছে না। তিনি যখনই কথা বলছেন, সামরিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলছেন। জারের দৃষ্টি গোসলখানার ছাদের উপর নিবদ্ধ। গভীরভাবে কী যেনো ভাবছেন তিনি। এক রূপসী দাসী সাহস সঞ্চয় করে বললো, জীবনের নিরাপত্তা পেলে দাসী আলমপানাহকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

ঃ বলো।

ঃ মনে হচ্ছে শাহেনশাহে আলম এ মুহূর্তে কী যেনো ভাবছেন। শাহেনশাহ এমন কী সমস্যায় পড়লেন, দাসী তা জানতে পারে কি?

ঃ আমি ভাবছি, তিবলিস আমার সিংহাসন থেকে অনেক দূরে। রাজধানী থেকে এখানকার সামরিক তৎপরতার খোঁজ নেয়া সত্যিই দুঃসাধ্য। ওখানে বসে আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়, আমার সেনাবাহিনী কেনো সফল হতে

পারছে না। আসলে এ ধরনের গোসলখানায় গোসল করতে অভ্যস্ত অফিসার যুদ্ধের ময়দানের কষ্ট বরদাশত করতে পারবে কেনো!

দাসী তার নৈরাশ্য লুকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। জার গোসলের শেষ পর্ব সমাপ্ত না করেই পোশাক তলব করেন।

পরদিন গভর্নর এক সপ্তাহের প্রোগ্রামের তালিকা জারের সামনে পেশ করে। জার তালিকায় চোখ বুলিয়ে বললেন, নাচ, ড্রামা, মংগোলিয়ার বাজনা, গান, বাদ্য...।

জার প্রোগ্রামের তালিকা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে জিজ্ঞেস করেন, মহড়া কবে হবে? বিদ্রোহীকে কখন হাজির করা হবে?

ঃ আলমপনাহ! এই প্রোগ্রাম আপনার প্রজাদের পক্ষ থেকে। সামরিক প্রোগ্রাম কমান্ডার ইন চীফ প্রস্তুত করে রেখেছেন।

ঃ সেনাপতিকে ডেকে আনো।

দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডার ইন চীফ সেনাপতি বেরন রোজন আপাদমস্তক সামরিক উর্দিতে আবৃত হয়ে জারের কক্ষে প্রবেশ করে সামরিক কায়দায় জারকে সালাম জানায়।

ঃ মহড়া কবে হবে?

ঃ বাদশাহ নামদার! যখন বলবেন, তখনই মহড়ার ব্যবস্থা হবে। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অনুমতি হলে প্রজাদের প্রোগ্রামের পরই মহড়ার ব্যবস্থা করি।

ঃ বিদ্রোহীকে এখনোও খুন কিংবা গ্রেফতার করা হয়নি?

ঃ শামিল নিজে শাহেনশাহ'র খেদমতে উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আপনার আগমনের এই শুভ মুহূর্তে আমরা রক্তক্ষয় ভালো মনে করিনি।

ঃ বুঝেছি। তুমি মহড়ার আয়োজন করো। এ মহড়ায় শামিল যেনো উপস্থিত থাকে। আমি মহড়ার মাঠ থেকেই ফিরে রওনা হবো।

সেনাপতি রোজন যথাজ্ঞা বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। মুখমন্ডল তার বিবর্ণ। সমস্ত শরীর কাঁপছে। নিজের দফতরে পৌঁছামাত্র সেনাপতি ফায় এবং কলগন্নুও এসে পৌঁছে। শাহজাদা দাদিয়ানীকে ডেকে আনা হয়। উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারগণ মহড়ার পরিকল্পনা ঠিক করছে। কিন্তু সব নির্বিকার। সকলের মনে একই প্রশ্ন, এখন উপায় কী? শামিলকে কী করে মহড়ায় উপস্থিত করা যায়?

কিন্তু কারো নিকট এ প্রশ্নের জবাব নেই।

শাহী মেহমানখানার নিকট এক একর জমির উপর ছোট্ট একটি 'কাফকাজ' তৈরি করা হয়। এখানে মাটি, পাথর, গাছ, নদী, সমুদ্র, গভীর গর্ত ইত্যাদি এমনভাবে প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এসব বস্তু কাফকাজে আছে। ধরে

নেয়া যায় এটিই কাফকাজ। কাফকাজের এই নকশা সেনাপতি রোজনের বিচক্ষণতার ফসল। এই নকশা প্রস্তুতির কাজে বেশ ক'টি গোত্রের লোকদের থেকেও সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। মন খুলে ব্যয় করা হয়েছে বিপুল অর্থ। সেনাপতি রোজনের উদ্দেশ্য, এই নকশা দেখে যেনো জার কাফকাজে তাঁর সৈন্যদের ব্যর্থতার কারণ উপলব্ধি করতে পারেন। এই নকশা জারকে পরিস্থিতি বুঝাবার শেষ চেষ্টা। জার যদি এই নকশা দেখে তার সেনাপতিদের সমস্যা উপলব্ধি করেন তো ভালো। অন্যথায় বিপদ অনিবার্য।

মহড়ার জন্য নির্ধারিত দিনের সকাল বেলা জারের সমীপে ককেশাশের ভূ-চিত্র পরিদর্শনের আবেদন জানানো হয়। জার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান এবং চিত্র দেখার জন্য অস্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জার চিত্রটিকে চতুর্দিক থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে হঠাৎ কমান্ডার ইন চীফ-এর প্রতি দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলে ওঠেন– 'সেনাপতি! তোমার এবং তোমার লোকদের এই মনোযোগ ও দক্ষতা যদি আসল কাজে ব্যয় করা হতো, তাহলে আজ নকশার পরিবর্তে আমি আসল কাফকাজই দেখতে পেতাম।'

অফিসারদের কারো মুখে রা নেই।

রাজবাহন জারের নিকটে আনা হলো। জার তাতে উঠে বসেন। বাহন প্যারেড ময়দান অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

হাজার হাজার রুশ সিপাহী প্যারেড ময়দানে সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান। শাহজাদা দাদিয়ানী, সেনাপতি ফায় ও সেনাপতি কলগনু আলাদা আলাদা বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। জার কমান্ডার ইন চীফ-এর সঙ্গে প্যারেড পরিদর্শন করছেন। হাঁটতে হাঁটতে শাহজাদা দাদিয়ানীর নিকটে পৌঁছুলে শাহজাদা সামরিক কায়দায় জারকে সালাম করে। জার তার দেহ থেকে উর্দি টেনে খুলে ফেললেন এবং তাকে ঠেলে সাধারণ সৈন্যদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেন। আবার সেনাপতি কলগনুর নিকট পৌঁছে তার সামরিক প্রতীক ক্ষুদ্র ছড়িটি ছিনিয়ে নেন এবং মুখে শুধু বললেন– 'বরখাস্ত'।

এই বলে জার তার চবুতরায় পৌঁছে যান এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই বললেন, 'এরা সবাই অপরাধী। শাহেনশাহকে এরা মিথ্যে তথ্য প্রদান করেছে। বিদ্রোহী শামিল না খুন হয়েছে না গ্রেফতার। শামিল আসলে এদের সঙ্গে কোনো ওয়াদা-ই করেনি। আমার কিছুই বুঝতে বাকি নেই।

অত:পর সেনাপতি রোজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে জার বললেন– 'কমান্ডার ইন চীফ বেরন রোজন! তোমাকেও সাসপেন্ড করা হলো। সেনাপতি গলুভনকে দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো।'

সেনাপতি গলুভনকে উদ্দেশ করে বললেন– 'সেনাপতি! এখনই তুমি দায়িত্ব

বুঝে নাও? আগামী বছর পুনরায় আমি কাফকাজ সফরে আসবো। বিদ্রোহের ধারা চিরতরে বন্ধ করে দাও।'

একথা বলেই জার গাড়িতে চড়ে বসেন। গাড়ি সেন্টপিটার্সবার্গ অভিমুখে ছুটতে শুরু করে।

কয়েকদিন পর আরো একটি গাড়ি তিবলিস ত্যাগ করে রওনা হয়। পদচ্যুত সেনাপতি কলগনু তার আরোহী। সঙ্গে তার কেউ নেই। একজন সাধারণ সিপাহীও নয়। নিতান্ত-ই একা সে।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একজন অশ্বারোহী ছুটে এসে তার গতিরোধ করে। কলগনুকে গাড়ি থামাতে বলে। কলগনু গাড়ি থামায়। আগন্তুক একটি চিরকুট তার হাতে দেয়। কলগনু চিরকুটটি খুলে পাঠ করে–

'কলগনু! বলো, আজ কে লাঞ্ছিত? শামিল না তুমি?'

কলগনু কাগজটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। তারপর ছিন্ন কাগজগুলোতে ঠিক এমনভাবে থু-থু নিক্ষেপ করে, যেমনি করেছিল আখাপুরীতে। কলগনু সম্মুখপানে ছুটে চলে।

❁ ❁ ❁

দক্ষিণাঞ্চলীয় নয়া রুশ কমাণ্ডার ইন চীফ গুলুভন কাফকাজের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। কাফকাজের দুর্গম পাহাড়-পর্বত, গহীন বন-জঙ্গল আর প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত সমস্যার কারণে রুশ বাহিনীর ইতিপূর্বে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, তার আলোকে অত্র অঞ্চলে সামরিক চাপ বহাল রাখার জন্য দু'লাখ তাজাদম সৈন্যের প্রয়োজন। নতুন কমাণ্ডার ইন চীফ সেন্টপিটার্সবার্গে সেনা হেডকোয়ার্টারকে তার এই প্রয়োজনের কথা জানায়। সাথে সাথে বিপুলসংখ্যক বড় তোপ সরবরাহের আবেদনও জানায়। তাছাড়া অতিরিক্ত কাসৃক বাহিনীও তলব করে সে। তার এসব চাহিদা পূরণ করতে হেডকোয়ার্টারের বেশ সময়ের প্রয়োজন।

রুশ সেনাহেডকোয়ার্টার আর কাফকাজের মাঝে দূরত্ব অনেক। দ্রুতগামী গাড়িতে করে সফর করলেও সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে কাফকাজ পৌঁছুতে প্রচুর সময় লেগে যায়। সে ক্ষেত্রে তোপ আর পদাতিক বাহিনীর কাফকাজ পৌঁছুতে কতো সময়ের প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়। কমাণ্ডার ইন চীফকে এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে কয়েক মাস।

যেসব রুশসেনা কাফকাজে লড়াই করবে, কমাণ্ডার ইন চীফ গুলুভন সেনাপতি গ্রেবকে তাদের কমাণ্ডার নিযুক্ত করে। সেনাপতি গ্রেব একজন অভিজ্ঞ ও সাহসী সালার। ইতিপূর্বে বেশ ক'টি যুদ্ধে সে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে।

সেনাপতি গ্রেব অধীন অফিসারদেরকে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত

করে। তার পকিল্পনা হলো, প্রথমে পাহাড়-জঙ্গলের বসতিগুলোকে ধ্বংস করতে হবে। তারপর যে কোনো মূল্যে হোক শামিলকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে চূড়ান্ত লড়াইয়ের মাধ্যমে তাকে হত্যা করতে হবে।

পরিকল্পনা মোতাবেক আয়োজন শুরু হয়ে যায়। অপরদিকে ইমাম শামিলও দুর্জয় প্রতিরোধ আয়োজনে ব্যস্ত। উখলগুকে তিনি অতিশয় দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত করার কাজে লিপ্ত। সাধ্য পরিমাণ অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করছেন তিনি। এখন যুদ্ধের প্রতিটি পয়েন্টে, প্রতিটি সেনা ছাউনিতে অখন্ড নীরবতা বিরাজ করছে। এই নীরবতা প্রবল ঝড়ের পূর্বাভাস।

প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে রুশ সেনাদের বেশ সময় লেগে যায়। ১৮৩৯ সালের শুরুর দিকে তারা সামরিক মহড়া শুরু করে। শুরু হয় সৈন্যদেরকে গহীন বন-জঙ্গল, নদী-নালা আর সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ অতিক্রম করার প্রশিক্ষণ। ইমাম শামিল রুশ বাহিনীর এই প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ১৮৩৯ সালের মে মাসে তিনি তার পরিবার-পরিজনকে উখলগু নিয়ে আসেন। মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও আড়াই মাসের শিশু সন্তান সব এখন উখলগুলোতে অবস্থান করছেন। পরিবার-পরিজনকে উখলগুতে নিয়ে আসার কারণ, উখলগুতে ইমাম শামিল চূড়ান্ত লড়াই করতে চান। ইমামের নায়েব-মুরীদগণও নিজ নিজ পরিজনকে উখলগু নিয়ে আসেন।

রুশ সেনাদের যে মওসুমের অপেক্ষা, তা এসে গেছে। ১৮৩৯ সালের ১৫মে রুশ বাহিনী তাদের অভিযান শুরু করে। পরিকল্পনা মোতাবেক ইমাম শামিলের বাহিনী পথে স্থানে স্থানে ছোট-খাট প্রতিরোধও সৃষ্টি করছে। তবুও রুশ বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

১৮৩৯ সালের ২৯ জুন-এ শুরু হয় আসল যুদ্ধ। মাঝারি আকারের দু'টি তোপ পুরাতন উখলগুর পাদদেশে একটি পাহাড়ের সমতল চূড়া থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। উখলগুর দিক থেকে কোনো পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে না। রুশ কমাণ্ডার তার সৈন্যদের সামনে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়। তারা পুরাতন উখলগুতে ঢুকে পড়ে। বাড়ি-ঘর অলি-গলি সব শূন্য। রুশ অফিসার ও সিপাহীরা সবাই পেরেশান। সকলের মুখে একই প্রশ্ন, ওরা গেলো কোথায়? ওদের ফাঁদে আটকে গেলাম নাতো আমরা? শামিল কোনো ষড়যন্ত্র করছে না তো?

দ্বি-প্রহরের খানিক আগে রুশসেনারা নতুন উখলগুর বহিঃফটকের সামান্য দূরে অপর এক পাহাড়ের উপর তোপ স্থানান্তরিত করে। এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ শুরু হয়। হাজার হাজার গোলা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু নয়া উখলগুও সম্পূর্ণ নীরব। কোনো পাল্টা আক্রমণ নেই। নেই কোনো জনমানুষের শব্দ-সাড়া।

সর্বাপেক্ষা উঁচু গৃহটির উপরে একটি কালো পতাকা উড়ছে। দূর থেকেই

চোখে পড়ছে পতাকাটি। এক ঘন্টা পর ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় রুশ অফিসার তার সৈন্যদের বললো, সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ করতে হবে। যেসব সৈন্য এই অভিযানের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুত আছো, তারা সামনে এগিয়ে আসো।

হাজার হাজার রুশ সৈন্য এর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অফিসারের আদেশ অনুসারে তারা উখলগুর বাইরের প্রাচীরে আরোহণ করার চেষ্টা শুরু করে। সৈন্যরা বিভিন্ন দিক দিয়ে একে অপরের কাঁধে দাঁড়িয়ে উপরে উঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ উপর থেকে বড় বড় পাথর এবং গাছের কর্তিত টুকরা গড়িয়ে নীচে পড়তে শুরু করে। প্রাচীরে আরোহণের কাজে সচেষ্ট সৈন্যদেরকে গড়িয়ে নিয়ে পাথর আর কাঠখন্ডগুলো নীচে পড়ছে। একদল পাথরপেষা হয়ে নীচে পড়ে যাওয়ার পর এগিয়ে আসে আরেক দল। তাদেরও একই পরিণতি ঘটে। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাড়ে তিনশ রুশসেনা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাদের মৃতদেহগুলো বিরাট স্তূপে পরিণত হয়। তাদের রক্তে লাল হয়ে যায় প্রাচীরের একটি অংশ। যেনো লাল রং চড়ানো হয়েছে তাতে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে প্রাচীরে আরোহণের প্রচেষ্টা ত্যাগ করে তারা পেছনে সরে যায়। পরবর্তী চারদিন রুশ বাহিনীর অভিযান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

রণাঙ্গন নীরব। রুশ সেনাপতি বড় তোপের অপেক্ষা করছে। এসব তোপ আসছে তমীরখানশুরা থেকে। চার চারটি ঘোড়া এক একটি তোপ টেনে নিয়ে আসছে।

৪ঠা জুলাই বৃহৎ দু'টি তোপ উখলগুর পূর্ব প্রান্তে এমন একটি পাহাড়ের চূড়ায় তুলে নেয়ার চেষ্টা করা হয়, উখলগুর প্রধান ফটকের ঠিক সম্মুখে যার অবস্থান। পাহাড়-চূড়ায় সমবেত হাজার হাজার রুশসেনা। রশি বেঁধে টেনে তোপগুলোকে চূড়ায় তুলছে তারা। এক সময়ে তোপগুলো চূড়ায় উঠে যায়। গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যায়।

প্রথম গোলাটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর মনে হলো, আকাশে মেঘ গর্জন করছে এবং ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। উখলগুর প্রাচীরের একাংশ এমনভাবে উড়ে যায়, যেনো তা পাথরের নয়- বালির তৈরি প্রাচীর ছিলো। কমান্ডার গ্রেব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে ওঠে, কাজ হয়ে গেছে। দেখবো এবার বেটা রক্ষা পায় কী করে? গোলন্দাজকে সে আবার গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেয়। এবার দ্বিতীয় গোলাটি প্রাচীরের অপর এক অংশে ছিদ্র করে দেয়। তারপর একের পর এক অনবরত অসংখ্য গোলা নিক্ষেপ করা হয়। নতুন উখলগুর সব তছতছ হয়ে যেতে শুরু করে। পাথর, ঘর-বাড়ি মানুষ সব। কমান্ডার গ্রেব নিশ্চিত হয়, এবার ইমাম শামিলের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তছনছ হয়ে গেছে এবং মোর্চাগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন সে সিপাহীদের আদেশ করে, সামনে অগ্রসর হও এবং সমগ্র উখলগু দখল করে ফেলো।

রুশ সেনারা সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীর অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে তারা। সামান্য অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ তাদের উপর গুলিবৃষ্টি ও খঞ্জরাঘাত শুরু হয়। জবাবে তারাও এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। কিন্তু তারা কোনো দুশমন দেখতে পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, যেনো মানুষজন ছাড়াই আপনা-আপনি গুলি আর খঞ্জর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। মুজাহিদরা তাদের পাতাল বাংকার থেকে এই অভিযান পরিচালনা করছে। রুশ সেনাদের যে-ই সামনে আসছে, তাকেই তারা টার্গেট করছে।

প্রথম সারির সৈন্যরা নিহত ও আহত হওয়ার পর এবার দ্বিতীয় সারির সৈন্যরা এগিয়ে আসে। তারাও মুজাহিদদের শিকারে পরিণত হয়। এভাবে একের পর এক সারি সারি রুশসেনা অগ্রসর হতে থাকে আর মুজাহিদরা তাদেরকে হত্যা করতে থাকে। রুশসেনাও শেষ হচ্ছে না, মুজাহিদদের রাইফেলও থামছে না।

সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং রুশসেনারা পেছনে সরে যাওয়ার আদেশ পায়। সেনাপতি গ্রেব-এর জানা আছে, রাত্রিকালে মুজাহিদরা রুশদের জন্য যম হয়ে দেখা দেয়।

৬ জুলাই থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত এমনি কান্ড চলতে থাকে। প্রতিদিন ভোরবেলা উখলগুর উপর গোলাবর্ষণ শুরু হয়। তারপর রুশ বাহিনী সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু তারা পায়ে পায়ে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রথম গোলাবর্ষণের পর যে পরিমাণ সৈন্য অভিযানে অংশ নিয়ে সম্মুখসমরে অগ্রসর হয়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে তার সামান্য ক'জন।

১২ জুলাই তমীরখানগুরা থেকে আরো দশ হাজার সৈন্য এসে গ্রেব বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু সেনাপতি গ্রেব লড়াইয়ের আদেশ দিচ্ছেন না। তিনি সামরিক প্রকৌশলী ও কারিগরদের লম্বা সিঁড়ি তৈরি করার আদেশ দেন এবং লম্বা লম্বা রশি সংগ্রহ করতে বলেন।

১৫ জুলাই পর্যন্ত আরো কয়েকটি তোপ বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়। সেনাপতি গ্রেব আদেশ দেন, গোলাবর্ষণ শুরু করো- করতে থাকো- রাত দিন সারাক্ষণ। দীর্ঘ ষাট ঘন্টা পর্যন্ত উখলগুর উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। এই গোলাবর্ষণে ইমাম শামিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কোনো গোলা মোর্চার ভেতরে নিক্ষিপ্ত হলে সাথে সাথে সেখানে অবস্থানরত সব মুজাহিদ শহীদ হয়ে যান। পাথরের আড়ালে বসে থাকা মুজাহিদরাও মাঝে মধ্যে গোলার শিকারে পরিণত হচ্ছেন। রুশ বাহিনীর তীব্র ও অবিরাম গোলাবর্ষণের ফলে মুজাহিদরা শহীদদের কাফন-দাফন এবং আহতদের সেবা-চিকিৎসার সুযোগটুকু পর্যন্ত পাচ্ছেন না। গোলাবর্ষণ শুরুর ষাট ঘন্টা পর রুশ গুপ্তচর সেনাপতি গ্রেবকে রিপোর্ট করে, শামিলের সব শেষ হয়ে গেছে। মানুষ-অস্ত্র-গবাদিপশু সব। এমনকি এখন খাওয়ার পানিটুকু পর্যন্ত তাঁর

নেই। এখন সে পালাবার পথ খুঁজছে।

এ রিপোর্ট পাওয়ামাত্র গ্রেব তার সৈন্যদেরকে শেষ আক্রমণের আদেশ দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কমান্ডার গ্রেব তার সৈন্যদের তিনভাগে বিভক্ত করে। প্রত্যেক গ্রুপে ছয়শ করে সৈন্য। এক গ্রুপের সৈন্যদেরকে সিঁড়ি, রশি ও কোদাল নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়া হয়। দ্বিতীয় গ্রুপের সৈন্যরা রাইফেল তাক করে এগিয়ে যেতে শুরু করে। অগ্রসরমান সৈন্যদের নিরাপত্তার জন্য পুনরায় তোপখানার ফায়ার খুলে দেয়া হয়। উখলগুর প্রধান ফটক সংলগ্ন দুর্গটি তারা বিনা বাধায় অতিক্রম করে। কিন্তু দুর্গ অতিক্রম করে সামান্য অগ্রসর হওয়া মাত্র পাথর কেটে নির্মিত বাংকারে অবস্থানরত মুজাহিদরা অগ্রসরমান রুশ সেনাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। প্রথমে তারা রুশ অফিসারদের হত্যা করে। এটা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা, যাতে রুশ সেনাদের আদেশ দেয়ার কেউ না থাকে। অফিসারদের খতম করার পর তারা সাধারণ সৈন্যদের হত্যা করে তাদের অস্ত্র দখল করতে শুরু করে। রুশ সেনাদের একটি গ্রুপ উপরে মুজাহিদ বাংকারের দিকে উঠতে চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে বড় বড় পাথর ও গাছের গুঁড়ি নীচের দিকে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। পাথর ও গাছের গুঁড়িগুলো বাংকার অভিমুখে অগ্রসরমান রুশ সেনাদের নিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়তে থাকে। দলের সব ক'জন রুশ সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এগিয়ে আসে তৃতীয় বাহিনী। এই বাহিনীকে স্বাগত জানায় মুজাহিদদের নারী ও শিশু-কিশোররা। মহিলাদের পরণে পুরুষের পোশাক, যাতে রুশ সেনারা দেখে তাদের পুরুষ মনে করে। শিশু-কিশোররা রুশসেনাদের সারির ভেতরে ঢুকে পড়ে এতো দক্ষতার সাথে খঞ্জর পরিচালনা করে যে, পরে ইমাম শামিল নিজেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। এই তৃতীয় গ্রুপের একজন সেনাও জীবিত ফিরে যেতে ব্যর্থ হয়।

রাতে গুপ্তচররা সেনাপতি গ্রেবকে অনুযোগের সাথে জানায়, আমাদের প্রথম রিপোর্টটি ভুল ছিলো। আমরা প্রতরণার শিকার হয়েছিলাম। যাদের দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে রিপোর্ট করেছিলাম, তারা মূলত শামিলেরই লোক। বাস্তব চিত্র হলো, শামিলের হাতে এখনোও বিপুলসংখ্যক সৈন্য আছে। অস্ত্র ও রসদের মজুদও রয়েছে। তার আহত সৈন্যদের সে দরিয়ার ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেখানে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে আহতদের সেবা-চিকিৎসা চলছে।

রিপোর্ট শুনে সেনাপতি গ্রেব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। গুপ্তচরদের বিদায় দিয়ে সে স্বগতোক্তি শুরু করে–'আমার ইজ্জত-সম্মান সব শেষ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। এই অভিযানে আমিও যদি ব্যর্থ হই, তাহলে আমার আত্মহত্যা ছাড়া উপায় থাকবে না।'

সেনাপতি গ্রেবের নিরাশ হওয়ার উপায় নেই। তাই তোপখানার অফিসারদের

সে পুনরায় অবিরাম গোলাবর্ষণ করার আদেশ দিয়ে নিজে নতুন পরিকল্পনা তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিদিন সেনা অফিসারদের বৈঠক বসে। বৈঠকে ইমাম শামিলের বাংকারগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার পন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সেনাপতি গ্রেব একদিন হাসিমুখে বৈঠকে উপস্থিত হয়। বৈঠকের কার্যক্রম শুরু হওয়া মাত্রই সে বললো–

'এবার কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছে। আমি যদি আমার পরিকল্পনায় সফল হতে পারি, তাহলে নিশ্চয় মাহরাজ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।'

এক অফিসার ব্যাকুল হয়ে পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চায় । সেনাপতি গ্রেব বললো–

'গুপ্তচর বৃত্তির জন্য আমাদের তাতারী কিংবা অন্য কোন গোত্রের লোকদের উপর নির্ভর করতে হয়। সত্য বলতে কি, আমরা এদের যাকেই গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োগ করি, সে-ই আসলে শামিলের লোক কিনা এমন একটি আশংকা আমাদের তাড়া করে ফিরে। এ কারণে কিছু কথা এ যাবত আমি আপনাদেরকে বলিনি। দেয়ালেরও কান থাকে কিনা তাই। আর একথা সত্য যে, শামিলের নিকট আমাদের তোপ-বিধ্বংসী হাতিয়ার নেই। সাথে সাথে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ঐ ইঁদুরগুলোর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের হত্যা করা সম্ভব নয়। তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করলেই আমাদের ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এ কারণে মুসলিম সেনাদের মনোবল ভেঙে দেয়া একান্ত প্রয়োজন। তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে, এখন আর তাদের জীবনে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। এখন হয় তাদের জীবন দিতে হবে, অন্যথায় অস্ত্রসমর্পণ করতে হবে। শামিল বড় চতুর মানুষ। একে একে কয়েকবার সে অবিশ্বাস্যরূপে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে। আমরা যতো তীব্র আক্রমণই পরিচালনা করি না কেনো, সে কিন্তু জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ত্রুটি করবে না। আশংকামুক্ত থাকা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।'

এক অধীন অফিসার বললো, কিন্তু জনাব! ঘটনা কিন্তু অন্য রকম। শামিলের মা-বোন-স্ত্রী সন্তানও তার সঙ্গে আছে।

গ্রেব বললো, পৃথিবীর সবাই তার সঙ্গে থাকুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমাদের ভাবনার বিষয় একটাই। তা হলো, শামিল প্রাণে রক্ষা পেলে ভবিষ্যতে আবারো সে আমদের জন্য সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। যে ব্যক্তি নিজের জীবনের পরোয়া করে না, স্ত্রী-সন্তানকে উৎসর্গ করে দেয়া তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। এ কারণে আমাদের পরিকল্পনার প্রথম কাজ হচ্ছে, ঘেরাও আরোও শক্ত করতে হবে; এতো শক্ত যে, একটি পিঁপড়াও যেনো ভেতর থেকে বের হতে না পারে।

এর জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম সারিতে প্রতি বিশ ফুট অন্তর আমাদের একজন করে সশস্ত্র সৈন্য দাঁড়াবে আর দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়াবে দশ ফুট অন্তর। তৃতীয় সারিতে রাইফেলধারী সৈনিক ছাড়াও থাকবে তোপখানার ইউনিট। প্রহরীরা রাতদিন সারাক্ষণ সর্ব্বোচ্চ সতর্ক থাকবে। ঘোষণ দেয়া হবে, যে প্রহরী দায়িত্ব পালনে ক্রটি করবে, তাকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করা হবে। উখলগুকে তিন দিক থেকে সমুদ্র ঘিরে রেখেছে, যা আমাদের জন্য এক অলৌকিক সহযোগিতা। একদিন সময় দেবো। আগামী দিনের পর উখলগু যেনো বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমরা যাদের প্রেরণ করবো, ঠিক তারাই ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার পাবে। এতে শামিল নিশ্চিত বুঝে নেবে, যতো যা কিছু-ই করুক, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ তাকে হতেই হবে। অল্প ক'টা হাতিয়ার আর সামান্য রসদ নিয়ে ক'দিন-ই আর চলতে পারবে সে?

সকল অফিসার সেনাপতি গ্রেব-এর এ পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বললো– 'আপনি ঠিক বলেছেন। বড় চমৎকার পরিকল্পনা!'

গ্রেব পুনরায় বললো–

'পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ হলো, শামিলের নিকট প্রস্তাব পাঠাতে হবে, যদি সে তার পুত্রকে পণ হিসেবে আমাদের হাতে তুলে দেয়, তাহলে আমরা যুদ্ধ বন্ধ করে দেবো এবং সে যে শর্ত দেবে, ঠিক সেই শর্তের ভিত্তিতেই অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে।'

সকল অধীন অফিসার একবাক্যে বললো, কঠিন- অসম্ভব। শামিল এই প্রস্তার গ্রহণ করবে না কিছুতেই।

গ্রেব বললো, আমরা যদি অসম্ভবকে সম্ভব বানাতে না পারি, তাহলে কিছুদিন পর আমাদেরকেও রোজন,ফায়, কলগনু আর দাদিয়ানীর ন্যায় অপদস্ত হতে হবে। তোমরা আমার প্রথম পরিকল্পনার ব্যাখ্যা শুনে নাও। এতোদিনে নিশ্চয় শামিলের মনে এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে থাকবে যে, এ মুহূর্তে সে আমাদের কঠোর বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে। জীবন বাজি রেখেই এখন বাংকারে অবস্থান করছে সে। মা-বোন -স্ত্রী-সন্তানও তার সঙ্গে আছে। এমতাবস্থায় যদি আমরা কোনো প্রকারে তার মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে পারি যে, এ যুদ্ধে জীবন রক্ষা করা তারই মিশনের জন্য কল্যাণকর, তাহলে হয়তো সে আমাদের করায়ত্তে এসে যাবে। আমার জানা মতে এরাগলের জনৈক ব্যক্তিকে সে তার রূহানী ওস্তাদ বলে মান্য করে। লোকটি বে-দীন জংলীদের পাদ্রীও বটে। যদি আমরা সেই লোকটির মাধ্যমে শামিলকে বলাতে পারি যে, এবারের মতো যেভাবে হোক নিজের জীবন রক্ষা করো, যাতে ভবিষ্যতে প্রতিপক্ষের ঘেরাওয়ে না এসেই লড়াই করতে পারো; তাহলে তার কথা শামিল মানতে পারে।

এক অফিসার বললো, কিন্তু সেই পাদ্রী শামিলকে একথা কেনো বলবে? কীভাবেই বা বলবে?

গ্রেব বললো, তিনি যে শামিলকে একথা বলবেন না, আমিও তা জানি। তিনি তো শামিলকে বরং একথাটাই বলে থাকেন যে,রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মহৎ কাজ। কাজী মোল্লাও তার শিষ্য ছিলো। এমন ভয়ানক ব্যক্তিটিকে শেষ করে দেয়া এমনিতেই প্রয়োজন। কয়েক মাস হলো আমি আমাদের স্থানীয় কয়েকজন বিচক্ষণ লোককে পরিকল্পিতভাবে তার শিষ্যদের দলে ঢুকিয়ে রেখেছি।

এরাগলের সেই পাদ্রীর গায়ে দু'টি চিহ্ন আছে। চিহ্ন দু'টো শামিলও দেখে থাকবে নিশ্চয়। এক. আংটি, দুই. কাঠ ও পাথরের টুকরার তৈরি হার। হারটি হাতে নিয়ে পাদ্রী কী যেনো যপ করেন। মাঝে মধ্যে হারটি গলায়ও ঝুলিয়ে রাখেন। আমার লোকেরা কোনো প্রকারে অজ্ঞান করে রাতে তাকে জঙ্গলে নিয়ে যাবে। সেখানে আমাদের সৈন্যরা পূর্ব থেকে অপেক্ষমান থাকবে। তারা পাদ্রীকে তুলে ক্যাম্পে নিয়ে যাবে।

এ সুযোগে পাদ্রীর শিষ্যদের মধ্যে ঢুকে থাকা আমাদের লোকদের একজন পাদ্রীর চিহ্ন দু'টো নিয়ে শামিলের নিকট গিয়ে তাকে পাদ্রীর পক্ষ থেকে আমাদের সাজানো পয়গাম পৌছাবে। পয়গাম হবে মৌখিক, কিন্তু ভাষা হবে পাদ্রী যেমন বলেন ঠিক তেমন।

অফিসারগণ সেনাপতি গ্রেব-এর এ প্রস্তাবের প্রতি একবাক্যে সমর্থন ব্যক্ত করে এবং সেনাপতির দূরদর্শিতার প্রশংসা করে। সভায় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরিকল্পনার প্রথম অংশ মোতাবেক উখলগুর অবরোধ শক্ত করা হয়। তমিরখানশুরা ও তিবলিস থেকে আরো সেনা তলব করা হয়। তমিরখানশুরা থেকে দশ হাজার নতুন সৈন্য এসে পৌছুলে উখলগুর অবরুদ্ধ মুজাহিদদের উপর চাপ বৃদ্ধির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। বড় তোপগুলো উঁচু জায়গায় পৌছিয়ে দেয়া হয়। ছোটগুলোকে আরো সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। উখলগুর চারদিকের প্রহরাও কঠোর করা হয়।

১৩ জুলাই ভোরবেলা তোপগুলো আগুন আর লোহা নির্গত করতে শুরু করে। বিরামহীন তীব্র গোলাবর্ষণে অধীন রুশ অফিসাররা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়ে। এক অফিসার সেনাপতি গ্রেব-এর কাছে সবিনয়ে জানতে চায়, জনাব! পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা নেই কি?

সেনাপতি গ্রেব ধমকের সুরে জবাব দেয়, পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি অবগত। প্রতিটি অভিযানই আমাদের পরিকল্পনার একটি অংশ। তুমি তোমার নিজের কাজ করো গিয়ে।

২ আগষ্ট ভোরে পদাতিক বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ পায়। রুশ পদাতিক বাহিনীর সেনারা মুজাহিদদের আক্রমণ এড়িয়ে সম্মুখসমরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা পদে পদে প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রায় একশ মুজাহিদ গুলিবৃষ্টির মধ্যদিয়ে পদাতিক রুশ সেনাদের দিকে ধেয়ে আসে। নিকটে পৌছতে পৌছতে বাইশজন মুজাহিদ শহীদ কিংবা গুরুতর আহত হয়। অবশিষ্টরা রুশ সেনাদের ভেতরে ঢুকে রাইফেলের পরিবর্তে তাদের প্রিয় হাতিয়ার খঞ্জর চালাতে শুরু করে। মুজাহিদদের এই সীমাহীন দুঃসাহসিক অভিযান রুশ সেনাদের হতবিহ্বল ও বিপর্যস্ত করে তোলে। দিশেহারার মতো তারা নিজেদের লোকদের উপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। এক ঘন্টা যাবত তীব্র লড়াই চলে। লড়াই করতে করতে সকল মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়। জীবন দিয়ে তারা রুশ সেনাদের মনে আরেকবারের মতো আতংক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। আক্রমণকারী পদাতিক রুশ সেনাদের সংখ্যা ছিলো আড়াই হাজার। তাদের সামান্য ক'জনই জীবন নিয়ে ফিরে যেতে সক্ষম হয়।

সেনাপতি গ্রেব দ্রুত দ্বিতীয় বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়। তারপর তৃতীয় বাহিনী, তারপর চতুর্থ। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুজাহিদরা একে একে প্রায় সকলেই শাহাদাতবরণ করেন। সেনাপতি গ্রেব-এর সৈন্যরা প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। সাধারণত এত বিপুল সৈন্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া যায় না। কিন্তু গ্রেব-এর সামনে এক বিরাট উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে গ্রেব তার সমুদয় সৈন্যকে লাশে পরিণত করতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

রুশ বাহিনী আরো দু'দিন উখলগুর উপর সামরিক চাপ বহাল রাখে। ৪ঠা আগস্টের সন্ধ্যাবেলা তারা পুনরায় জোরদার এক অভিযান চালায়। এ অভিযানে তারা তাদের সহকর্মীদের লাশ দিয়ে মোর্চার কাজ নেয়। সামনের সৈন্য আহত বা নিহত হলে পেছন সারির সৈন্যরা তার লাশের আড়ালে বসে ফায়ার শুরু করে দেয়। এ লড়াইয়েও অনেক মুজাহিদ শহীদ হন। তবে রুশদের ক্ষতির পরিমাণ ছিলো কয়েক গুণ বেশি।

রাতে যথারীতি যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। ইমাম শামিল মসজিদে গিয়ে নায়েবদের উদ্দেশে ভাষণ দেন।

তিনি বললেন–

'আমরা স্রেফ আল্লাহর জন্য লড়াই করছি। আল্লাহর ইচ্ছা-ই আমাদের ইচ্ছা। পরিস্থিতি বড় কঠিন। মনে হচ্ছে, জার তার সব সামরিক শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। ভয় তো করবে তারা, যারা জীবনকে মায়া করে। আমাদের কাছে তো শাহাদাত জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয়। তথাপি এই কঠিন মুহূর্তে আপনাদের কারো নতুন কোনো প্রস্তাব থাকলে তা ব্যক্ত করুন।'

নায়েব ইউনুস বললেন, আমাদের জীবন আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত। আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে আমার ধারণা, একই স্থানে চূড়ান্ত লড়াই করা কৌশলগত দিক থেকে আমাদের ঠিক হয়নি।

সুরখাই খান বললেন, এসব চিন্তা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে করা উচিত ছিলো। চূড়ান্ত লড়াই করার সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর এখন এসব চিন্তা বৃথা।

ইউনুস বললেন, নতুন নতুন সৈন্য এসে রুশ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। আমরা এখন সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। অস্ত্র এবং রসদ শেষ হওয়ার পথে। আমাদের শাহাদাত আর আত্মহত্যার পার্থক্য বুঝা উচিত।

ইত্যবসরে ইমাম শামিলের খাদেম এসে বললো, হযরত! এরাগল থেকে একজন লোক এসেছেন। আপনাকে তিনি একটি জরুরি পয়গাম জানাতে চান।

ইমাম শামিল বললেন, কে এসেছে, নিয়ে আসো।

কয়েক মুহূর্ত পর এক আগন্তুক নিকটে এসে ইমামকে সালাম করে। লোকটির পরিধানের কাপড় ভিজা। ইমাম শামিল লোকটিকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করেন, রুশ প্রহরীরা তোমাকে আসতে দিলো কীভাবে?

ঃ আমি নদীপথে সাঁতার কেটে এসেছি। মুরশিদের দোয়ায় বোধ হয় রুশরা আমাকে দেখতে পায়নি। আমার নাম তালহীক।

ঃ বলো কী উদ্দেশ্যে এসেছো?

তালহীক মাথার পাগড়ি খুলে হাতে নেয়। পাগড়ির ঝুলের গিরা খুলে একটি তাসবীহ ও একটি আংটি বের করে। মুখে লাগিয়ে চুম্বন করে বস্তু দু'টো ইমামের প্রতি এগিয়ে ধরে বলে, পীর ও মুরশিদ তাঁর এই চিহ্নগুলো আমাকে দিয়েছেন, যাতে আমি যে তাঁর শিষ্য, আপনার বিশ্বাস হয়।

ইমাম শামিল বস্তু দু'টোকে গভীরভাবে নিরীক্ষা করে দেখেন। তারপর আগুন্তুককে বললেন, বলুন, কী পয়গাম নিয়ে এসেছেন?

ঃ মহামান্য ইমাম! পীর ও মুরশিদ বলেছেন, এই বিপদসংকুল মুহূর্তে আমাদের ভালো-মন্দের ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া উচিত এবং আমাদের সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবান করে দেয়া দরকার। শায়খ বলেছেন, শিকারীর হাতে অবরুদ্ধ হওয়ার পর কৌশলে বেরিয়ে আসলে সিংহ বিড়াল হয়ে যায় না-সিংহ-ই থাকে এবং বনের রাজত্ব ফিরে পায়। অপরদিকে শক্ত পায়ে শিকারীর রাইফেলের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে তার পরিণতি স্পষ্ট। অনেক সময় তো এমনও হয় যে, বিপদের সময় সিংহ তার বাচ্চাদের সাময়িকের জন্য চোখের আড়ালে নিয়ে রাখে, যাতে নিজে সহজে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। পীর ও মুরশীদ আরো বলেছেন, কয়েক বছর আগে আরব উপমহাদেশে এক সিংহ ঠিক এমনিভাবে শিকারীর ফাঁদে আটকা পড়েছিলেন, যেমনি আজ দাগেস্তানের

ইমাম দুশমনের হাতে অবরুদ্ধ। সেই সিংহের নাম টিপু। অবরোধ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি নিজের দু'সন্তানকে জালিম শিকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে মুক্ত হয়ে তিনি জালিমদের সেই জুলুমের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন কড়ায়-গণ্ডায়।

ঃ হ্যাঁ, মক্কা শরীফে কার কাছে যেনো আমিও শুনেছিলাম, সুলতান টিপু সত্যিই সিংহের মতো লড়াই করেছিলেন।

ঃ পীর ও মুরশীদের আদেশ, আপনাকে পয়গাম পৌঁছিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে খবর জানাতে হবে। অন্যথায় এখনই আমি আপনার মুরীদ হয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। তবে মুরশিদকে খবরটা পৌঁছিয়ে আমি শিগ্‌গির ফিরে আসছি। অনুমতি হলে এবার উঠি।

সুরখাই খান বললেন, মহামান্য ইমাম! ইনি যাবেন কী করে? চারদিকে পাহারা। আসার সময় নদীর স্রোত তার অনুকূলে ছিলো। কিন্তু উজান ঠেলে যাওয়া যে কঠিন হবে!

তালহীক বললো, আমি শায়খে এরাগলের শিষ্য। তারই নিকট থেকে রহস্যময় উপায়ে কাজ করার তরিকা আমার রপ্ত করা আছে। দীর্ঘ সময় পানিতে ডুব দিয়ে থাকার এবং ডুবন্ত অবস্থায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার প্রশিক্ষণ আমার নেয়া আছে। তারপরও যদি দুশমন আমাকে দেখেই ফেলে, তাহলে আমার শাহাদাত নসীব হয়ে যাবে।

আগন্তুক বিদায় হয়ে যায়। ইমাম শামিল বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য নির্জনে চলে যান।

৫ আগষ্ট রুশ বাহিনী আক্রমণের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করে। মুজাহিদরাও বীরত্বের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই শুরু হয়।

✿ ✿ ✿

রাতের বেলা।

এক সীমান্ত এলাকার সরদার আবদাল রুশ সেনাপতি গ্রেব-এর তাঁবুতে প্রবেশ করে। চলমান লড়াইয়ে আবদালের অবস্থান নিরপেক্ষ। তাঁবুতে গ্রেবের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা হয়। তারপর দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে হাসিমুখে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

৬ আগষ্ট ভোরবেলা আবদাল সাদা পতাকা হাতে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। রুশ সেনারা তার গতিরোধ করে এবং ধরে কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে যায়। খানিক পর পতাকা উঁচু করে ইমাম শামিলের মোর্চা অভিমুখে রওনা হয়। এ খবর ইমাম শামিলের কানে দেয়া হয়। ইমাম বলেন, ওকে ভেতরে আসতে দিও না। কী বলতে এসেছে, বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে-ই বলতে বলো। হতে পারে, ও আমাদের

অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে এসেছে।

আবদালের সঙ্গে কথা বলার জন্য ইমাম শামিল সুরখাই খানকে প্রেরণ করেন। আবদাল সুরখাই খানকে বললো, রক্তক্ষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বিগত কয়েক শতাব্দীতে কাফকাজে এতো রক্ত ঝরেনি, যা এই এক মাসে ঝরেছে। আমি উভয় পক্ষের নিকট আপোসের প্রস্তাব নিয়ে ময়দানে এসেছি। আমি চাই, কোনো পক্ষের আর এক ফোঁটা রক্তও না ঝরুক । ইমাম শামিলকে বলুন, তিনি যেনো আলোচনার মাধ্যমে রুশদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করে নেন। খুনাখুনি অনেক হয়েছে, আর নয়।

ঃ আলোচনার ব্যাপারে রুশদের কোন শর্ত আছে কি?

ঃ আছে অবশ্যই। বিজয় এখন তাদের হাতের মুঠোয়। আজ না হোক কাল অবশ্যই ইমামের অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ না করলে ধ্বংস সুনিশ্চিত। আলোচনা শুরু করার আগে রুশরা জামানত চায়, যাতে তারা উর্ধ্বতন অফিসারদের আশ্বস্ত করতে পারে।

সুরখাই খান ইমাম শামিলের সাথে পরামর্শ করতে যান। আবদাল সেখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে থাকে। খানিক পরে এসে বললেন, আপনি এখন যান, আবার এক সময় এসে জবাব নিয়ে যাবেন।

আবদাল চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান তোপগুলো গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ।

৬ আগস্ট রাতে তমীরখানশুরা থেকে পাঁচ হাজার রুশসেনা উখলগুর নিকটে এসে পৌঁছে। সেনাপতি গ্রেব-এর আদেশে তাদেরকে রণাঙ্গন থেকে কিছুটা দূরে থামিয়ে দেয়া হয়। উখলগুতে আবস্থানরত সেনাদের থেকেও দু'-তিন হাজার সৈন্যকে রাতের আঁধারে তমীরখানশুরা থেকে আগত বাহিনীর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেনাপতি গ্রেবের আদেশ, আগামীকাল সূর্যোদয়ের পর থেকে যেনো তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পতাকা উড়িয়ে উখলগু অভিমুখে অগ্রসর হতে শুরু করে।

৭ আগস্ট ভোর হওয়া মাত্র আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ইমাম শামিল মসজিদে দাঁড়িয়ে দূরবীনের সাহায্যে চারদিকের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। জর্জিয়ার সৈন্যরা এ দূরবীনটি ইমামকে উপহার দিয়েছিলো।

হাজার হাজার রুশ সৈন্য উখলগু অভিমুখে এগিয়ে চলছে। নায়েব সুরখাই খান ও ইউনুস ইমামের কাছে উপস্থিত। শিশু জামালুদ্দীনও কাছে দাঁড়িয়ে। এ সময়ে ইমাম বললেন–

'অনেক সৈন্য ধেয়ে আসছে। অস্ত্র থাকলে আমি আজ উখলগুকে রুশদের সমাধিতে পরিণত করে ছাড়তাম। কিন্তু তা তো নেই। আমরা এখন কী করতে পারি!'

ঠিক এ সময়ে একটি গোলা এসে ইমামের অদূরে বিস্ফোরিত হয়। ইমাম অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যান। সুরখাই খান ও ইউনুস ইমামকে মোর্চায় নিয়ে যান।

সেদিন সন্ধ্যায় আবদাল আবার ফিরে আসে। তার প্রস্তাবের জবাব চায় সে। সুরখাই খান ইমামের পক্ষ থেকে জবাব দেন–

'নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির পরই কোনো আলোচনা শুরু হতে পারে।'

জবাব শুনে আবদাল ফিরে যায়। পুনরায় তুমুল লড়াই শুরু হয়। সেনাপতি গ্রেব রাগে-ক্ষোভে পাগলের মতো হয়ে যায় এবং অধীন অফিসারদের নিয়ে তর্জন-গর্জন করতে শুরু করে। বলে, এতো হাজার হাজার সৈন্য হারাবার পরও যদি আমাদের লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহলে আমাদের বড় অপ্রীতিকর পরিণতি ভোগ করতে হবে। কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। ইমাম শামিলকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার কোনো একটা পন্থা আমাদের বের করতেই হবে।

এক মেজর পাঁচ ফুট চওড়া একটি কাঠের তক্তা নিয়ে সেনাপতির সামনে উপস্থিত হয়। তক্তার বহিঃভাগে লোহার পাত বসানো। মেজর তক্তাটি সেনাপতি গ্রেব-এর সামনে রেখে বলে, দু'জন সৈন্য যদি এ তক্তাটি নিয়ে সামনে অগ্রসর হয় আর অন্যরা তার আড়ালে থেকে চলে, তাহলে মুজাহিদদের খঞ্জর ও গোলার আক্রমণ থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। আপনার অনুমতি পেলে আমি বিষয়টি পরীক্ষাও করে দেখতে পারি। আমি এরকম একশ তক্তা তৈরি করেছি।

সেনাপতি গ্রেব বললো, কোনো অসুবিধা নেই। তবে আমাদের সৈন্যরা এমন পথে অগ্রসর হবে, যে পথে উপর থেকে বড় পাথর বা অন্য কোনো ভারি বস্তু নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকা নেই।

মেজর এক হাজার সৈন্যকে পঞ্চাশজন করে বিশটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলকে এক একটি তক্তার আড়াল হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ করে। প্রত্যেক দলে দু'জন করে সৈন্য হাঁটুতে ভর করে তক্তাকে সামনে ধরে ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করে। অন্য সিপাহীরা পেছনে।

রুশ মেজরের এই রণকৌশল আংশিক সফল হয়। কোনো কোনো স্থানে উপর থেকে নিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথর তক্তা ভেঙে চুরমার করে রুশ সেনাদের পিষে নীচে পতিত হলেও কয়েকটি দল এই আক্রমণ প্রতিহত করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাফল্য দেখে সেনাপতি গ্রেব আরো এক হাজার সৈন্যকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়। তক্তার আড়ালে নিরাপদে যারা মুজাহিদদের মোর্চার নিকটে পৌঁছুতে সক্ষম হয়, তাদের সঙ্গে মুজাহিদদের হাতাহাতি লড়াই হয়। হাতাহাতি লড়াইয়ে মুজাহিদরা বেশ বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু রুশদের বিবেচনায় তাদের দশজন সৈনিক মৃত একজন মুজাহিদের শাহাদাতের সমান। নিজেদের দশজন সৈন্য খুইয়ে একজন

মুজাহিদকে শহীদ করতে পারাকে তারা সাফল্য জ্ঞান করে। পরবর্তী কয়েক দিন পর্যন্ত রুশরা এ নিয়মে লড়াই অব্যাহত রাখে।

পরদিন প্রত্যুষে যখন পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হয়, তখন মুজাহিদদের পানির পাত্র শূন্য হয়েছে দু'দিন পূর্ণ হলো। রসদ-পাতির মজুদও সম্পূর্ণ শেষ। শিশুদের অবস্থা বড় করুণ। ক্ষুৎ-পিপাসায় চিৎকার করছে তারা। দু'দিনের অনাহারে মুজাহিদরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। রুশ সেনাপতি অবরুদ্ধ মুজাহিদদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়ার খবর পায়। রুশ প্রহরীদের অধিকতর সতর্ক হওয়ার জন্য তাকিদ করা হয়।

আবদালকে পুনরায় ইমাম শামিলের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেনাপতি গ্রেব-এর অধীন এক অফিসার বলে, এখন প্রয়োজন কি? আর সামান্য চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই তো চূড়ান্ত লক্ষে পৌছুতে পারি। গ্রেব তাকে বুঝাবার চেষ্টা করে, এতো আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত হবে না। শামিল অতি ধূর্ত মানুষ। কোন ফাঁকে পালিয়ে যাবে, তুমি টেরও পাবে না। তাই আমাদের কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। তার পুত্রকে যদি আমরা কাবু করতে পারি, তাহলে বেটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। আমিও এটাই চাই যে, সে পালাবার চেষ্টা না করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাক।

নিরপেক্ষ সরদার আবদাল পুনরায় সুরখাই খানের সঙ্গে আলাপ করে। সুরখাই খান ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। কিন্তু বলিষ্ঠ ও উচ্চকণ্ঠে কথা বলে তিনি নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখতে সক্ষম হন। আবদাল বললো, রুশরা এ মর্মে সম্মত হয়েছে যে, ইমাম তার পুত্রকে আমার হাতে জামানত রাখলে তারা আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। আমি নিরপেক্ষ মানুষ; আলোচনার মাধ্যমে একটি মীমাংসা হয়ে গেলে জামালুদ্দীনকে আমি তার পিতার হাতে ফিরিয়ে দেবো। চলমান রক্তক্ষয়ে আমার হৃদয় কাঁদছে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমি এর চেয়ে উত্তম আর কোনো পথ দেখছি না।

সুরখাই খান বললেন, আগামীকাল সকালে আপনাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

আবদাল চলে যায়।

১৭ আগস্ট রাতে শিশু-সন্তানদের জীবন হাতে নিয়ে মুজাহিদরা পানি সংগ্রহের জন্য নীচে অবতরণ করে। রুশদের গোলাবৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এ অভিযান সাতজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করে।

কয়েকজন দুর্ধর্ষ মুজাহিদ খাদ্য সংগ্রহের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। রুশ বাহিনীর ক্যাম্প থেকে খাদ্য ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় তারা। তাদেরও কয়েকজন শহীদ হয়।

বারো.

১৭ আগস্ট ভোরবেলা যখন পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হয়, তখন যুদ্ধের বয়স ৫১ দিন। ইমাম শামিল পুত্র জামালুদ্দীনকে জামানতস্বরূপ নিরপেক্ষ সরদার আবদালের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জামালুদ্দীনের মা পুত্রকে উত্তম পোশাক পরিয়ে সাজিয়ে দেন। পিতা অস্ত্রসজ্জিত করেন পুত্রকে। কোমরে তরবারী ও খঞ্জর বেঁধে দেন। নায়েব সুরখাই খান, ইউনুস ও আমীর কালো পতাকা উড়িয়ে ইমামপুত্রের সম্মুখে সম্মুখে এগিয়ে চলেন।

খানিক দূরে আবদাল দু'টি ঘোড়া নিয়ে দণ্ডায়মান। একটি কালো অপরটি সাদা। জামালুদ্দীন সাদা ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পলকের জন্য পেছন পানে তাকায়। বিধ্বস্ত মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর নিথর দাঁড়িয়ে আছেন ইমাম। পলকহীন চোখ দু'টো কলিজার টুকরা জামালুদ্দীনের প্রতি নিবদ্ধ তাঁর।

জামালুদ্দীন এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসে। পতাকা অবনমিত করে জামালুদ্দীনকে সালাম জানান নায়েব। আবদাল নিজ ঘোড়ায় চেপে বসে।

দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি এগুতে শুরু করে। ঘন বৃক্ষরাজির আড়ালে মিলিয়ে যায় ঘোড়া দু'টো।

১৯ আগস্ট প্রত্যুষে রুশ সেনাপতি পিলুপাঞ্চ বেশ ক'জন অফিসার নিয়ে উখলগু এসে পৌঁছে। ইমাম শামিলের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সেনাপতি গ্রেব-এর পক্ষ থেকে এসেছে সে। ইমাম শামিল বিশিষ্ট নায়েবদের নিয়ে গুহাসম একটি পাতাল গৃহে রুশ প্রতিনিধিদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

সেনাপতি পিলু গুহায় প্রবেশ করে ইমামের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ইমাম নির্বিকার। রুশ সেনাপতির সঙ্গে হাত মিলালেন না তিনি। চেহারায় তাঁর গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদার ছাপ।

আমরা অহংকারীদের সাথে হাত মিলাই না। বললেন সুরখাই খান। লজ্জায়-ক্ষোভে লাল হয়ে যায় সেনাপতি। সুরখাই খানের প্রতি আড়চোখে দৃষ্টিপাত করে সে। অবশেষে নিজেকে সংবরণ করে ইটের উপর বিছানো একটি কাঠের তক্তায় বসে পড়ে।

আলোচনা শুরু হলো।

'যুদ্ধে আপনি পরাজিত। এবার নিয়মতান্ত্রিকভাবে অস্ত্রসমর্পণ করুন। শাহেনশাহ আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন।' সেনাপতি বললো।

'এক রণাঙ্গনের ফলাফল গোটা যুদ্ধের চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নয়। আমরা অস্ত্রসমর্পণ করতে শিখিনি। তবে আমাদের শর্ত মেনে নিলে ভবিষ্যতে আমরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পারি।' বললেন ইমাম শামিল।

ঃ বলুন, আপনার শর্ত দু'টো কী?

ঃ প্রথম শর্ত, আমরা যুদ্ধ বন্ধ করে গমরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাই। আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত,আমার পুত্র জামালুদ্দীন আবদালের কাছেই থাকবে। আমাদেরকে মাসে অন্তত একবার তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। যতোদিন পর্যন্ত এই চুক্তি বহাল থাকবে, ততোদিন আমরা কোনো পদক্ষেপ নেবো না।

'জামালুদ্দীন তো এখন তমীরখানশুরা অতিক্রম করে তিবলীস অভিমুখে এগিয়ে চলছে। শাহেনশাহ নিজেই তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।' নিষ্ঠুর অট্টহাসি হেসে সেনাপতি বললো।

ঝেঁকে ওঠে ইমামের সমস্ত দেহ। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর। প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগে তাঁর হৃদয়ে। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে-শোকে লাল হয়ে যায় তাঁর চেহারা। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন রুশ সেনাপতির মুখের দিকে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন– 'তোমরা আবারো বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। আমি এর প্রতিশোধ নেবো। বড় ভয়ংকর হবে সেই প্রতিশোধ।'

সেনাপতি পিলুর মুখে কটাক্ষ হাসি– 'নিজের জীবনের প্রতি রহম করুন জনাব! অস্ত্রত্যাগ না করলে নিজের জীবনটাও খোয়াতে হবে আপনার'।

'যে লজ্জাকর প্রতারণা তোমরা প্রদর্শন করেছো, তাতে তোমাদের এখান থেকে জীবিত ফেরত যেতে না দেয়াই ছিলো তার উপযুক্ত জবাব। কিন্তু আমরা মুসলমান। আমরা তোমাদের মতো প্রতারণা করতে পারি না। তোমরা বলছো, তোমাদের সাম্রাজ্য অনেক বিশাল, তোমাদের জার বিরাট এক রাজা। এটাই কি সেই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মহান রাজার মহান সেনাপতির চরিত্র? এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে।' ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন ইমাম।

রুশ অফিসাররা ফিরে যায়। তারা ক্যাম্পে পৌঁছামাত্র রুশি তোপ-কামান গোলাবর্ষণ শুরু করে। বাংকারে পৌঁছে ইমাম তাঁর নায়েবদের নিয়ে পরামর্শে বসেন। রাশিয়ানদের এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই অবরোধ থেকে বের হতে হবে। সিদ্ধান্ত হয়, ইমাম শামিল কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ, মা-বোন-স্ত্রী ও শিশুপুত্র সাঈদকে নিয়ে অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। অবশিষ্ট মুরীদগণ রুশদের মোকাবেলা করবে। অপরদিকে রুশরাও ইমামের পালাবার সকল পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

২০ আগস্টের ঘুটঘুটে আঁধার রাত। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ইমাম শামিল ফাতেমা, গাজি মুহাম্মাদ, সাহেদা, মা, বোন, দুধের শিশু সাঈদ এবং দশজন জানবাজ মুরীদকে সঙ্গে নিয়ে রশি বেয়ে উখলগুর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে নেমে পড়েন। ফাতেমা তখন অন্তঃসত্ত্বা। তৃতীয় সন্তানের মা হতে আর মাত্র এক মাস

বাকি। রশি বেয়ে নীচে অবতরণ করতে সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করতে হয় তাকে। চারদিকে তাক করা রাইফেল আর তোপ।

দক্ষিণ দিকে আধা ফার্লং দূরে নদীর মধ্যখানে এক চড়া। একটি গুহা আছে তাতে। ইমাম শামিলের পরিকল্পনা, প্রথমে সেই চড়ায় গিয়ে পৌঁছুতে হবে। তারপর সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা।

একজন একজন করে প্রত্যেকে উখলগুর উপর থেকে নীচে নেমে আসেন। শেষে রশির-ই সাহায্যে উপর থেকে নামিয়ে আনা হয় কয়েকটি কাঠের তক্তা। নায়েব তক্তাগুলো রশি দিয়ে বাঁধেন। তারপর ঘাস আর কাপড় দ্বারা তৈরি পাঁচটি কুশপুত্তলিকা নামিয়ে আনা হয় নীচে। মুজাহিদের পোশাকে ঘাস ভরে তৈরি করা হয় এইগুলো। এই কুশপুত্তলিকাগুলোকে দাঁড় করিয়ে কষে বাঁধা হয় তক্তার সাথে।

ইত্যবসরে আকাশে বিজলী চমকায়। বিজলীর আলোতে রুশ সৈন্যরা দেখতে পায়, কয়েকজন মুজাহিদ নৌকায় বসে আছে। গুলি ছুঁড়তে শুরু করে তারা। ইমাম ও নায়েব নেমে পড়েন পানিতে। একটি গুলি এসে ইমামের বোনের গায়ে বিদ্ধ হয়। সংবরণের চেষ্টা করে সে। কিন্তু তার অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে চাপা আর্তচিৎকার। ইমাম সঙ্গে সঙ্গে মোড় ঘুরিয়ে টেনে পানিতে নিয়ে আসেন বোনকে। হাত চেপে ধরে তার মুখে, যাতে আর চিৎকার করতে না পারে এবং দুশমন তাদের উপস্থিতি টের না পায়। কিন্তু মুহূর্ত পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। শহীদ হন ইমামের বোন।

কাঠের তক্তাগুলোকে পানিতে ভাসিয়ে দিতে আদেশ করেন ইমাম। কিছুক্ষণ পর আবার বিজলী চমকায়। ততোক্ষণে ভেসে চলে গেছে অনেক দূরে। তক্তার উপর দাঁড় করিয়ে বাঁধা কৃত্রিম মানুষগুলোকে মুজাহিদ মনে করে রুশ সৈন্যরা রাইফেলের মুখ ঘুরিয়ে দেয় সেদিকে। এ সুযোগে সঙ্গীদের নিয়ে সামনের চড়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন ইমাম।

তীব্র স্রোতে বয়ে চলেছে নদী। স্রোতের বিপরীতে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। এক নায়েব গাজী মুহাম্মদকে বুকে জড়িয়ে রাখেন। আরেকজন সাঈদকে। যাহেদা বেগম সাঁতার কাটছে। এক নায়েব ভর দিয়ে রেখেছেন ফাতেমাকে। তাকে সামলে রেখেছেন ইমাম নিজে।

আবার বিজলী চমকায়। পানির মধ্যে ডুব মেরে আত্মগোপন করে তারা। এবার বিজলী নেই। চতুর্দিক সূচীভেদ্য অন্ধকার। নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। হঠাৎ তীব্র এক ঢেউ কি একটি ভারী বস্তু ছুঁড়ে মারে ইমাম শামিলের প্রতি। ইমামের মাথায় প্রচন্ড এক আঘাত হানে। ব্যাথায় কুঁকিয়ে ওঠেন ইমাম। পর মুহূর্তে স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে আবার সেটি ছিটকে এসে তীব্রগতিতে হাতুড়ির মতো নিক্ষিপ্ত হয় ইমামের মায়ের কপালে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে

ফেলেন বৃদ্ধা। বস্তুটি শক্ত একটি কাঠ।

মাকে কাঁধে তুলে নেন ইমাম। বহু কষ্টে তাকে নিয়ে সম্মুখের চড়ায় গিয়ে পৌছেন তিনি। মাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখেন। ততোক্ষণে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে ফেলেছেন ইমামের মা।

ফাতেমার অবস্থাও শংকটাপন্ন। ইমাম অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন– 'আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি-ই আমার সন্তুষ্টি। তুমি আমাকে ধৈর্য ধারণের তাওফীক দাও।'

শোকাহত ইমাম মায়ের মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেন। ২২ আগষ্ট সারাদিন তারা গুহায় লুকিয়ে থাকেন। তার থেকে একশ ফুট দূরে আরো কয়েকটি চড়া। সেগুলোর পরে নদীর স্রোত ততো তীব্র নয়। কিন্তু এই একশ ফুট জায়গায় স্রোতের তীব্রতা এতই বেশি যে, পথটুকু অতিক্রম করা অসম্ভব।

ভেবে-চিন্তে নায়েবগণ সিদ্ধান্ত নেন, যে কোনোভাবে হোক এক দু'জন লোক একটি রশি নিয়ে স্রোত টেনে পরবর্তী চড়ায় পৌছুতে হবে এবং রশির এক মাথা সেখানে বড় একটি পাথরের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। তারপর রশি বেয়ে দুই প্রান্তরের মাঝের পথটুকু অতিক্রম করতে হবে সকলকে।

কিন্তু রশি বাঁধার জন্য অপর চড়ায় যাওয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করারই নামান্তর। তবে নায়েবগণ সকলেই এ ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইমাম শামিল বললেন– 'এ কাজ আমি করবো'।

ইমাম শামিল রশির এক মাথা কোমরে বেঁধে আল্লাহর নাম নিয়ে পানিতে নেমে পড়েন। তাঁর প্রত্যয় পানির স্রোতের উপর জয়ী হয়। অপর চড়ায় পৌছে রশিটি বড় একটি পাথরের সঙ্গে বেঁধে সেই রশি ধরেই ফিরে আসেন তিনি। এবার এক এক করে পালাক্রমে রশি বেয়ে সম্মুখের চড়ায় চলে আসতে শুরু করেন সবাই। এভাবে স্রোত ঠেলে অতিক্রম করা সন্তান সম্ভাবা ফাতেমার জন্য ছিলো বেশ কষ্টকর। তারপরও ইমামের পরামর্শে ফাতেমা আরেকটি রশির এক মাথা কষে নিজের দেহের সঙ্গে বেঁধে নেন এবং পানিতে নেমে পড়েন। অপরদিক থেকে দ্রুতগতিতে রশি টেনে ফাতেমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে একে একে প্রত্যেকে সম্মুখের চড়ায় পৌছে যান।

এ চড়ায় লুকিয়ে থাকার মতো জায়গা নেই। সামনে নদীর স্রোতও তেমন তীব্র নয়। তাই ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে কেটে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে শুরু করেন তারা। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করে তারা নদীর কূলে আসার চেষ্টা করেন। ঠিক এ সময়ে কি একটি জলজ প্রাণী ঠোকর মারে ফাতেমার ঘাড়ে। ভয়ে ফাতেমার মুখ থেকে চীৎকার বেরিয়ে আসে। মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে কূলে অবস্থানরত রুশ সৈন্যরা অন্ধকারে ফায়ার করতে শুরু করে। ফাতেমাকে সামলে নিয়ে ইমাম কূলের প্রায় নিকটে চলে আসেন। ফাতেমাকে নদীর কূলে একটি

ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে ইমাম ধীরে ধীরে উপরে উঠে যান। অতোক্ষণে রুশ সৈন্যদের এলোপাতাড়ি গুলিতে সাহেদা বেগম, শিশু সাঈদ এবং দু'জন নায়েব শহীদ হয়ে যান। গাজী মুহাম্মাদের পায়েও একটি গুলি বিদ্ধ হয়।

উপরে উঠেই ইমাম খঞ্জর হাতে নেন। আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন রুশ বাহিনীর উপর। চোখের পলকে তাঁর খঞ্জরের আঘাতে ৯ রুশ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দশমজন আত্মসংবরণ করে ইমামকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। গুলিটি ইমামের ডান বাহুতে এসে বিদ্ধ হয়। কিন্তু ইমাম আরেকটি গুলি ছোঁড়ার সুযোগ দেননি তাকে। উল্টো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের খঞ্জরটি আমূল বসিয়ে দেন তার পেটে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় সে।

অন্য সিপাহীরা এদিকে মনোযোগী হওয়ার আগেই ইমাম শামিল ফাতেমা, আহত গাজী মুহাম্মাদ এবং জীবনে রক্ষা পাওয়া চার নায়েবকে নিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে যান। রুশ সৈন্যরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে।

সঙ্গীদের নিয়ে অতি সন্তর্পণে ইমাম শামিল গমরী গিয়ে পৌছেন। ইমামের স্ত্রী ফাতেমার ক্লান্তদেহ এখন অসাড়। মুখমণ্ডল তার ফ্যাকাশে, দু'চক্ষু কোঠরাগত। ব্যাথায় চীৎকার করছে শিশুপুত্র গাজী মুহাম্মাদ। দু'দিনের না-খাওয়া তারা সকলে। সঙ্গীদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার কথা বলে ইমাম নিজেও একটি পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। মুহূর্ত মধ্যে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে তার ক্লান্ত চোখে।

পরদিন ভোর বেলা। পূর্বাকাশে সূর্য উঁকি-ঝুকি মারছে। কারো পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় ইমামের। হঠাৎ চমকিত হয়ে ওঠে বসেন তিনি। খঞ্জর হাতে তুলে নেন।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক আগন্তুক। ইমাম তাকে দেখেননি কখনো। একেবারেই অপরিচিত লোকটি। হাতে তার একটি পুটুলী।

অকস্মাৎ ইমামের এক নায়েব আগন্তুকের পিছনে এসে দাঁড়ান। আগন্তুক ইমামকে উদ্দেশ করে বলে. আপনি বোধ হয় আমাকে জানেন না। আমি কিন্তু আপনাকে জানি। আমি মোল্লা মুহাম্মদের পুত্র মোল্লা আহমাদ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আর আমি আমার কৈফিয়ত পেশ করার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

'কৈফিয়ত?' ইমামের কণ্ঠে বিস্ময়।

'জি হ্যাঁ, কৈফিয়ত! আগে আপনি কিছু খেয়ে নিন। বিস্তারিত কথা পরে হবে।' বলেই মোল্লা আহমাদ পুটুলীটি ইমামের সামনে রেখে দেন। নায়েব পুটুলিটি খুলে দেখেন, ভুনা গোশত আর রুটি। গোশত-রুটির একটি টুকরা মুখে দিয়ে খেয়ে দেখে নায়েব ইমামকে বললেন, অসুবিধা নেই, খেতে পারেন।

'আপনি বসুন, সব ঘটনা খুলে বলুন।' মোল্লা আহমাদকে উদ্দেশ করে ইমাম বললেন।

ইমাম শামিল ও তাঁর নায়েব আহার করছেন আর মোল্লা আহমদ ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন। শেষে বললেন, আমার জান্নাতবাসী পিতার পক্ষ থেকে আপনাকে যে পয়গম দেয়া হয়েছিলো, তা ছিলো সম্পূর্ণ বানোয়াট– মিথ্যা।

থমকে যান ইমাম। হাতের রুটিটি তাঁর ছুটে পড়ে যায় নীচে। মুখে দেয়া রুটি চিবুতে ভুলে যান। অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন মোল্লা আহমদের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পর আত্মস্থ হয়ে কাঁপা কণ্ঠে বললেন– 'জান্নাতবাসী?'

'জি হ্যাঁ, আব্বাজান শাহাদাতবরণ করেছেন। একবার কয়েকজন গাদ্দার অজ্ঞান করে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় রুশ ফৌজের ক্যাম্পে। কঠোর নির্যাতনের মুখে শহীদ করা হয় তাঁকে। তাঁর আংটি ও তসবীহসহ এক গাদ্দারকে পাঠানো হয় আপনার কাছে। আমি ঘটনা জানতে পারি দু'দিন পর। এক রুশ গুপ্তচর ঘটনাটি আমাকে জানায়। লোকটি ছিলো আব্বাজানের শিষ্য। তাই আব্বাজানের মৃত্যুতে সে-ও মর্মাহত হয় এবং সব ঘটনা আমাকে খুলে বলে।' বললেন মোল্লা আহমাদ।

'তা এখানে আপনি আসলেন কি করে?' জিজ্ঞাসা করলেন ইমাম।

'আপনাকে রুশদের প্রতারণার সংবাদ জানানোর জন্য বেশ ক'দিন ধরেই আমি এখানে আসবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তাদের প্রহরা ব্যবস্থা এত কঠোর যে, ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। আমার বিশ্বাস ছিলো, আল্লাহ্ আপনাকে শত্রুর অবরোধ থেকে জীবিত বের করে আনবেন। আমার মন বলছিলো, আমি অবশ্যই আপনার সাক্ষাৎ পাবো। আল্লাহর শোকর, আপনাকে পেয়ে গেছি। আপনি এখান থেকে দ্রুত চলে যান। গমরীর প্রতিটি প্রান্ত চষে ফিরবে রুশ বাহিনী।' বললেন মোল্লা আহমদ।

'আহ্! পীর ও মুরশিদ! আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন। জীবিত থাকতে তিনি আমাকে দিক-নির্দেশনা দিতেন। এখন আমি আপনার পরামর্শ কামনা করি।' বললেন ইমাম।

'অবস্থার পরিবর্তনে আপনজনরাও পর হয়ে যায়। মানুষ এখন দুনিয়া অন্বেষণে ব্যস্ত। মানুষের চিন্তাধারা বদলে গেছে। অচিরেই আপনার মাথার মূল্য ধার্য করা হবে এবং যে কেউ সেই অর্থ হাতে আনতে চেষ্টা করবে। আমার পরামর্শ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি দাগেস্তান ত্যাগ করুন এবং ফিরে আসার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতির অপেক্ষা করুন।' বললেন মোল্লা আহমাদ।

২৯ আগস্ট প্রত্যুষে সেনাপতি গ্রেব তার অধীন অফিসারদের বলল, 'কমাণ্ডার ইন চীফ যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য এবং শামিলকে জীবিত বা মৃত দেখার জন্য উদগ্রীব। কাজেই আজ চূড়ান্ত আক্রমণ চালাও।'

শুরু হয় রুশ বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণ। কিন্তু কোথাও কোন প্রতিরোধ নেই। ২৮ আগস্ট পাহাড়ে-পাহাড়ে রহস্যময় এক ঘোষণা প্রচার করা হয় যে, কেউ

নিজের জীবন নিয়ে পালাতে চাইলে বেরিয়ে যেতে পার। ঘোষণা শুনে এখনো বেঁচে থাকা মুজাহিদগণ মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে নদীর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কতিপয় নদী সাঁতরে জীবন নিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয় আর কতিপয়ের সলিল সমাধি ঘটে।

কোথাও কেউ প্রতিরোধ করছে না। শামিলের কোন পাত্তা নেই– এই সংবাদ শুনে সেনাপতি গ্রেব ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পাগলের মত আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে সে। অবরুদ্ধ মুজাহিদদের সর্বশেষ বাংকার পর্যন্ত পৌঁছে যায় গ্রেব। ঝাঁঝালো কণ্ঠে আদেশ করে, ধ্বংসস্তুপ খুড়ে দেখ, গোপন বাংকারে তল্লাশী চালাও। প্রতিটি লাশ গভীরভাবে পরীক্ষা কর। ওকে জীবিত বা ওর লাশ খুঁজে বের কর।

হাজার হাজার রুশ সৈন্য উখলগুর প্রতিটি প্রান্তে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালায়। ধ্বংসস্তুপ খুড়ে দেখে। প্রতিটি গুহায় গিয়ে অনুসন্ধান করে। পাথর সরিয়ে সরিয়ে নীচে গোপন পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

সূর্যাস্তের খানিক আগে অধীন অফিসার রিপোর্ট দেয়, 'কিছু-ই পাওয়া গেল না স্যার!'

শুনে সেনাপতি গ্রেব উত্তেজিত কণ্ঠে অফিসারকে বকতে শুরু করে– কিছুই পেলি না? লোকটি কি তাহলে আকাশে উড়ে গেল, না মাটিতে ধসে গেল! আমার এতসব ত্যাগ কি কোনই কাজেই লাগল না! যাও ওকে খুঁজে বের করে আন। আমি শামিলকে চাই-ই চাই। এর অন্যথা আমি শুনতে প্রস্তুত নই। মনে রেখ, যদি শামিল পালিয়ে গেছে প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রহরীদের প্রত্যেককে আমি গুলি করে হত্যা করব।

রাতভর মশালের আলোতে জীবিত বা মৃত শামিলের অনুসন্ধান অব্যাহত থাকে। পরের দিন ৩০ আগস্টও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ আর কবর খুড়ে খুড়ে লাশ শনাক্ত করা হয়।

৩১ আগস্ট সেনাপতি গ্রেব অফিসারদের বৈঠক আহ্বান করে। যথাসময়ে অধিবেশন শুরু হয়। গ্রেব বলে, শামিল জীবিত বেরিয়ে গেছে, না সত্যি মারা পড়েছে, তা নিশ্চয়তার সাথে বলা যাচ্ছে না। সত্যি সত্যিই যদি সে জীবন নিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে পুনরায় সে অধিক শক্তি সঞ্চয় করে যে আত্মপ্রকাশ করবে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর সে উত্থান ঠেকাবার শক্তি কারো থাকবে না। ভক্তরা তার এ জীবন নিয়ে বের হওয়াকে বিরাট কারামত মনে করবে। তাছাড়া শামিল পালিয়ে গেছে একথা স্বীকার করে নিয়েও আমরা প্রকাশ্যে তাকে সন্ধান করতে পারব না। তাই আমাদের নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে দাগেস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে দাও। তাতে যত ব্যয় যাবে যাক। ওকে গোপনে সন্ধান কর। যদি সে মারা

গিয়ে থাকে, তাহলে তার মৃত্যুর স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ কর।

কয়েকজন সিপাহী ও অফিসার নিয়ে সেনাপতি গ্রেব তমীরখানগুরা পৌছে যায়। তিবলিসে কমাণ্ডার ইন চীফ-এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ প্রেরণ করে। কমাণ্ডার ইন চীফ রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গে শাহেনশাহ নেকুলাইকে সুসংবাদ শোনানোর আয়োজন শুরু করে দেয়। জার-এর আদেশে এক সপ্তাহ পর্যন্ত উৎসব পালন করা হয়। উখলগুতে বীরত্ব প্রদর্শনকারী অফিসার-সিপাহীদের জন্য বিশেষ সংবর্ধনা ও মাল্যের আয়োজন করা হয়। কমাণ্ডার ইন চীফ তমীরখানগুরা পৌছে তার অফিসার ও জওয়ানদের গলায় মাল্য পরিয়ে দেয়।

তেরো.

দাগেস্তানে যতো রুশ সেনা ছিলো, তার অধিকাংশ উখলগুর লড়াইয়ে মারা গেছে। রুশ জেনারেলদের তিবলিস থেকে রিজার্ভ সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু এ লড়াই ইমাম শামিলের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

জার নেকুলাই'র নিকট সৈনিকদেরকে যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দেয়ানোর জন্য ইন্ধনের অভাব নেই। তার আদেশে লাখ লাখ গোলাম সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে প্রাথমিক ক্ষতি পূরণ করে নেয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু এ লড়াইয়ে ইমাম শামিল সর্বশান্ত হয়ে গেছেন। তাঁর সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে । জারের মতো ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ব্যবস্থাও তাঁর নেই।

ইমাম শামিলের অধিকাংশ নায়েব-মুরীদ এ লড়াইয়ে শাহাদাতবরণ করেছেন। যে ক'জন বেঁচে আছেন, সময় নষ্ট না করে তারা পুনরায় তৎপর হয়ে ওঠেন। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তারা আগ্রাসীদের মোকাবেলা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। শক্তিহীনতার অজুহাতে বাতিলের সামনে নত হয়ে জীবনযাপন করতে তাঁরা নারাজ।

এই রহস্যময় লোকগুলো নব উদ্যমে রহস্যময়ভাবে দাগেস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের কর্মতৎপরতা সন্ধ্যার পর রাতের আঁধারে শুরু হয় এবং সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণে শেষ হয়।

রাতের আঁধারে তাঁরা রুশ হায়েনাদের নির্যাতনের শিকার মুসলিম পরিবারগুলোর দ্বারে করাঘাত করছেন এবং গৃহবাসীদের সঙ্গে চুপিসারে আলাপ করছেন। আলোচনার পর প্রতিটি ঘর রুশ বিরোধী এক একটি শক্ত দুর্গে পরিণত হচ্ছে।

ইমাম শামিলের নায়েব-মুরীদগণ একটি সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে পরম নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে সাফল্য অনিবার্য। স্বল্পসংখ্যক মানুষও যদি সততার সঙ্গে কাজ করে, তাহলে তা ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনে।

গাদ্দার, মুনাফিক ও অসৎ মানুষ সংখ্যায় অনেক হলেও তারা সুফল অর্জনে ব্যর্থ থাকে। মুনাফিকরা কাজ করে মানুষকে দেখানোর জন্য। তাদের মনের সঙ্গে কথার কোনো সম্পর্ক থাকে না। মুনাফিক করে এক, মনে থাকে আর এক। তারা ফুল ছিটালেও তা কলিজায় কাঁটার মতো বিদ্ধ হয়। ক্ষমতা পেলে আপন লোকদের উপরও এমন অত্যাচার চালায় যে, শত্রুর পর্যন্ত গা শিউরে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া নতুন বসতিগুলোতে মহৎপ্রাণ লোকদের শক্তি নিঃশেষ করার জন্য এরূপ গাদ্দার ও মুনাফিক লোকদেরই বেছে নেয়। আর সব যুগেই এমন অনেক লোক থাকে, যারা মাথা দিয়ে নয়– পেট দিয়ে চিন্তা করে। যে-ই তাদের উদরপূর্তি করে দেয়, তারই গোলামে পরিণত হয়।

উখলগুর লড়াইয়ের পর রুশ সেনাপ্রধান পিলু দাগেস্তানের স্থানীয় লোকদের এক দলকে আরেক দলের হাতে দুর্বল ও অপদস্থ করার কৌশল অবলম্বন করে। সেনাপতি গ্রেবকে পদোন্নতি দিয়ে সে বিজিত অঞ্চলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ শক্ত করার আদেশ দেয়। সেনাপতি গ্রেব এমন কতিপয় তাতারী ও স্থানীয় লোককে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে, যাদের চরিত্র কাফকাজের ঋতুর মতোই রূপান্তরশীল। আজ যার ওফাদার গোলাম, কাল তার পিঠে ছুরিকাঘাত করতে তাদের একটুও ভাবতে হয় না।

আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিয়ে সেনাপতি গ্রেব তাদের হাতে বিজিত অঞ্চলসমূহের নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করে। তাতারী সম্প্রদায় এমনিতেই যুদ্ধবাজ। রক্তারক্তি তাদের প্রিয় কাজ। মানুষকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখলে তারা আনন্দ পায়।

হাতে ক্ষমতা পেয়ে তারা এবার সর্বত্র এমন ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্মম অত্যাচার চালাতে শুরু করে, যেনো শিকারী বন্যপশু শিকার করছে। অপরাধী বা সন্দেহভাজন লোক না পেলে নিরপরাধ লোকদের ধরে ধরে তাদের হাত-পা বেঁধে, গলায় রশি লাগিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে গলিতে গলিতে টেনে-হেঁচড়ে নির্যাতন চালায়। অনেক সময় ধৃত নিরপরাধ ব্যক্তির এক পা রশিতে এক ঘোড়ার সঙ্গে, অপর পা আরেক ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দুই ঘোড়াকে দু'দিকে হাঁকিয়ে দেয়। শক্তিশালী দুই ঘোড়ার বিপরীতমুখী টানাটানির ফলে লোকটির দেহ ছিঁড়ে দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়।

তাদের কাছে কারোর ইজ্জতই নিরাপদ নয়। যখন যে ঘরে ইচ্ছা ঢুকে পড়ে এবং যা ইচ্ছা করে বেড়ায়। তাদের অপতৎপরতায় সমগ্র দাগেস্তানবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সেনাপ্রধান পিলু এবং তার উর্ধ্বতন অফিসারগণ এই ভেবে উৎফুল্ল যে, দাগেস্তানের বিদ্রোহকে চিরতরে নিঃশেষ করার কাজ চলছে। অথচ তাদের এই

ধারণা ভুল। তাদের পদলেহী গোমস্তাদের আচরণে সৃষ্ট চাপা ক্ষোভ অল্প দিনের মধ্যে রুশ সাম্রাজ্য বিরোধী নতুন বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে।

নায়েব-মুরীদগণও তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। পূর্বে যারা ইমাম শামিলের মিশনকে সমর্থন করতো না, এখন তারাও এ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, ইমাম শামিলের অবস্থানই সঠিক। 'অপমানের জীবনের চেয়ে ইজ্জতের মৃত্যু-ই শ্রেয়' এ কথা-ই সত্যি।

উখলগুর অবরোধ থেকে ইমাম শামিলের জীবন নিয়ে বেরিয়ে আসা ছিলো এক অলৌকিক ঘটনা। তাঁর বীরত্বের কাহিনী এখন জনতার মুখে মুখে। সব মানুষের মনের দাবি, ইমাম শামিল আবারো ময়দানে এসে রুশ এবং তাদের লেলিয়ে দেয়া হায়েনাদের শায়েস্তা করুন।

মোল্লা আহমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইমাম শামিল গোপনে চেচনিয়া চলে যান। চেচনিয়ায় ইমাম শামিলের শৈশবকালের কয়েকজন সহপাঠী বাস করে। মোল্লা মুহাম্মাদের শিষ্যও তারা। তারা ইমাম শামিলকে বেশ সম্মানের সাথে বরণ করে নেয়। পাশাপাশি তাঁর সহযোগিতা করার জন্য পার্শ্ববর্তী ক'জন গোত্রনেতাকে উদ্বুদ্ধ করে। তারা চেচনিয়ার সর্বত্র এ আওয়াজ ছড়িয়ে দেয় যে, শামিল শুধু দাগেস্তানেরই নয়-আমাদেরও ইমাম। সাথে সাথে তারা একথাও মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দেয়, ইমাম শামিল এক গোপন আস্তানায় সামরিক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন এবং শীঘ্র আগের চেয়ে অধিক শক্তি নিয়ে ময়দানে আসছেন।

রুশ সেনা কর্মকর্তারাও বসে নেই। তারা দাগেস্তান ও চেচনিয়ার মুসলিম গোত্রগুলোর নিকট থেকে অস্ত্র নিয়ে নেয়ার প্রস্তাব করে। জার এ প্রস্তাব মঞ্জুর করতে না করতেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, দাগেস্তানের সব মানুষের নিরস্ত্র করে ফেলা হবে এবং যথারীতি জারের প্রজায় পরিণত করা হবে।

দাগেস্তানের সর্বত্র দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এ গুজব। ক্ষোভে ফেটে পড়ে সর্বস্তরের জনতা। রাশিয়ার সহযোগী গোত্রগুলোও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তরবারী আর খঞ্জর হলো দাগেস্তানের অলংকার। অস্ত্র ছাড়া তাদের জীবনই অর্থহীন। সেই অলংকার কিনা ছিনিয়ে নেবে রুশ বাহিনী! অস্ত্র তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বলা যায়, অস্ত্র তাদের জীবন। আর এ অস্ত্র কেড়ে নেয়া তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়ার নামান্তর।

ঠিক এ সময় চেচনিয়া থেকে ইমাম শামিল জিহাদ ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তমীরখানশুরা থেকে এরাগল পর্যন্ত এবং চেচনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। আনন্দের আতিশয্যে সকলে এখন বলে বেড়াচ্ছে সিংহ জীবিত আছেন, আল্লাহর সৈনিক বেঁচে আছেন।

ইমাম শামিল আবার জিহাদের ময়দানে। উখলগুর ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর

মাত্র ছয় মাস সময়ের মাথায় কয়েকগুণ বেশী শক্তি নিয়ে ইমাম শামিল পুনরায় শত্রুর মুখোমুখি। যেসব গোত্র ইতিপূর্বে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলো, এখন তারাও এসে ইমামের সঙ্গে যোগ দেয়। এক বছরের মধ্যে ইমাম শামিল সমগ্র দাগেস্তান ও চেচনিয়ার অবিসংবাদিত নেতা ও শাসকে পরিণত হন।

ইমাম শামিল এবার তার যুদ্ধনীতিতে একটি পরিবর্তন সাধন করেন। গোপনে হানা দিয়ে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ রুশ অফিসারদের গ্রেফতার করে বন্দি করতে শুরু করেন তিনি। তাঁর এ নতুন ও অভিনব অভিযানের ফলে রুশ সেনাপতিদের মনে কম্পন ধরে যায়।

ইমাম শামিলের দুরন্ত মুজাহিদ বাহিনী থেকে রুশ সেনারা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করে। রণাঙ্গন থেকে অফিসারদের এই দূরত্ব একদিকে সাধারণ সৈন্যদের ধ্বংসের, অপরদিকে জারের রোষ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া পুত্র জামালুদ্দীনকে মুক্ত করে আনার জন্যও ইমামের গুরুত্বপূর্ণ রুশ কয়েদির প্রয়োজন।

চৌদ্দ.

নিরপেক্ষ সরদার আবদাল আট বছর বয়সী কিশোর জামালুদ্দীন ইবনে শামিলকে নিয়ে রওনা হয়। ধীরে ধীরে ইমাম শামিলের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় তারা। উখলগু পেরিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ামাত্র হঠাৎ কয়েকজন রুশ অফিসার ছুটে এসে তাদের ঘিরে ফেলে এবং রাইফেল দু'জনের বুকে তাক করে ধরে। কিশোর জামালুদ্দীনকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে একটি ঘোড়াগাড়িতে তুলে বসায়।

ঘটনাটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। জামানতের নামে জামালুদ্দীনকে রুশদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যই এ প্রতারণা করেছে আবদাল। সরদার আবদাল যাতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারে, সেজন্যই এভাবে তার পরামর্শ অনুযায়ী একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে রুশরা। তবে জামালুদ্দীন যদিও আট বছরের অবুঝ কিশোর; কিন্তু সে ইমামে দাগেস্তানের পুত্র- সিংহশাবক। তাকে জানানো হয়েছিলো, তার পিতা ও রুশদের মধ্যে একটি সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত সে আবদালের নিকট অবস্থান করবে।

নিজেকে রুশদের বেষ্টনীতে দেখে প্রথমে সে ঘাবড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃত ঘটনা বুঝে ফেলে সে। আবদালকে উদ্দেশ করে বলে- 'গাদ্দার! দাগাবাজ! দেখবি অচিরেই তোর মা তোর জন্য মাতম করবে।'

রুশরা বলে, একে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বাচ্চা ভেবে বে-পরোয়া হলে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

দু'জন বলিষ্ঠ রুশ অফিসার কিশোর জামালুদ্দীনকে গাড়িতে বসিয়ে দু'জন তার দু'পার্শ্বে বসে তাকে বাহুবন্ধনে আটকে রাখে। গাড়োয়ান ঘোড়া হাঁকায়।

গাড়ি তমীরখানশুরা অভিমুখে ছুটে চলে।

তমীরখানশুরা পৌছে গাড়ি ও লোক দুইজন পরিবর্তন হয়ে যায়। পাঁচজন রুশ অফিসার জামালুদ্দীনকে অন্য একটি বড় গাড়িতে তুলে নিজেদের মাঝে বসায়। গাড়িটি তিবলিস অভিমুখে রওনা হয়।

দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা-কমান্ডার গলুভন জামালুদ্দীনের সংবাদ পেয়ে গেছেন আগেই। তিবলিস বসে অধীন অফিসারদের নিয়ে কিশোর কয়েদি জামালুদ্দীদের অপেক্ষা করছেন তিনি। অফিসারদের মধ্যে কর্নেল দানিয়েলও উপস্থিত। দানিয়েল দক্ষিণ চেচনিয়ার একজন সরদার এবং জার রুশের এক নিবেদিতপ্রাণ সহযোগী। তার সম্মানার্থে জার তাকে রুশ বাহিনীর কর্নেলের পদ দিয়ে রেখেছেন। কমান্ডার ইন চীফ সেনাপতি গলুভন দানিয়েলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, আমি আশা করি কর্নেল! তুমি এর সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে। কী বলো, দোভাষীর প্রয়োজন হবে না তো?

ঃ না, হবে না।

ঃ আচ্ছা, ও কি তোমাকে চিনবে?

ঃ বোধ হয় চিনবে। শামিল নিশ্চয় তাকে আমার কথা বলে থাকবে। আমি যে ওর পিতার ঘৃণ্য দুশমন!

ঃ কোনো পরামর্শ থাকলে বলো।

ঃ ওকে নিরস্ত্র করা না হয়ে থাকলে,আগে ওর থেকে অস্ত্র নিয়ে নেবেন। আপনি তো জানেন, আমাদের শিশু-কিশোররাও খঞ্জর চালনায় দক্ষ। ওরা অনেক সময় বড়দেরকেও পরাস্ত করে ফেলে।

কমান্ডার ইন চীফ এতোক্ষণে জামালুদ্দীনের পৌছানোর সংবাদ পেয়ে যান। অফিসারদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। বাইরে উন্মুক্ত আঙ্গিনা। আঙ্গিনার মধ্যখানে এসে থেমে যায় গাড়ি। রক্ষী কমান্ডার গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। সহাস্যে কমান্ডার ইন চীফকে সালাম করে জামালুদ্দীনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কমান্ডার ইন চীফ-এর সামনে এনে দাঁড় করায়। কমান্ডার ইন চীফ আদেশ করেন, এর থেকে খঞ্জরটি নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করো। পলকের মধ্যে জামালুদ্দীন সিংহের ন্যায় ঘোড় ঘুরিয়ে আঙ্গিনার এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং নিজের ভাষায় কী যেনো বলে। দানিয়েল বেগ কমান্ডার ইন চীফকে বলে, ছেলেটি বলছে– 'কারো নিজের মায়ের বুক খালি করার সখ থাকলে সে আমার সামনে আসুক।'

ঃ আসলেই কি ও অস্ত্র ত্যাগ করবে না?

ঃ কক্ষনো না। এ মুহূর্তে ছেলেটি নিজের জীবন নিয়ে খেলতে প্রস্তুত। যে-ই

এখন এর সামনে আসবে, তাকেই নির্ঘাত আঘাত করে বসবে।

কমান্ডার ইন চীফ-এর নির্দেশে কয়েকজন অফিসার রাইফেল তাক করে জামালুদ্দীনের প্রতি এগিয়ে যায়। কিশোর জামালুদ্দীন সরল মনে তাকিয়ে আছে রাইফেলগুলোর প্রতি। মুহূর্ত মধ্যে অনমনস্ক হয়ে পড়ে অবুঝ বালক। হঠাৎ শক্তিশালী দু'জন অফিসার পেছন দিক থেকে এসে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে জামালুদ্দীকে। হাত থেকে কেড়ে নেয় তার খঞ্জর। জামালুদ্দীন তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। ঝাপটা দিয়ে অফিসারদের লাথি মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে সে। নিজের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে বলে– 'কাপুরুষের দল! সাহস থাকে তো একজন একজন করে এসে আমার মোকাবেলা করো! অন্যথায় আমার খঞ্জরটা আমাকে দিয়ে দাও।'

অফিসার জামালুদ্দীনকে টেনে একটি কক্ষে নিয়ে যায়। জামালুদ্দীনের সঙ্গে তমীরখানশুরা থেকে আসা অফিসার কমাণ্ডার ইন চীফকে বললো, উখলগু ত্যাগ করার পর এ পর্যন্ত ছেলেটি কোনো পানাহার করেনি। মনে হচ্ছে, বালকটি না খেয়ে মরে যাবে; তবু কিছু মুখে দেবে না।

একজন রুশ অফিসার কমাণ্ডারকে বললো, আমার বন্ধু দানিয়েল বেগ যদিও ছেলেটির বেশ স্তুতি গাইলেন, তবু আমি মনে করি, অনুমতি হলে এক মিনিটে ছেলেটিকে কাবু করে ফেলা যেতে পারে।

ঃ তা কীভাবে?

ঃ আমাকে আমার পন্থা প্রয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতা দিন; কাংখিত ফলাফল দেয়ার দায়িত্ব আমার।

কর্নেলের কথা অনুযায়ী জামালুদ্দীনকে পুনরায় টেনে আঙ্গিনায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। রুশ কর্নেল জামালুদ্দীনের খঞ্জরটি হাতে করে তার দিকে এগিয়ে যায়। নিকটে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করে এবং খঞ্জরটি তার হাতে তুলে দেয়। বিস্ময়কর এক হাসি ফুঠে ওঠে জামালুদ্দীনের মুখে। হাসিমুখে খঞ্জরটি নিয়ে কোমরে বেঁধে নেয় ছেলেটি। রুশ কর্নেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আবার হাসে। কর্নেল কপালে হাত ঠেকিয়ে পুনরায় তাকে সালাম করে পেছনে সরে যায় এবং কমান্ডার ইন চীফকে বলে, ছেলেটির পক্ষ থেকে এখন আর কোনো আশংকা নেই। ও বুঝে নিয়েছে, ওকে বিশ্বাস করে আমরা ওর অস্ত্র ওকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আর ও ওর অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না।

নিজের নাম-পরিচয় গোপন রেখে কর্নেল দানিয়েল দোভাষীর দায়িত্ব পালন করে এবং জামালুদ্দীনকে বলে, এরা তোমাকে বন্ধু মনে করে। এদের লড়াই তোমার পিতার সঙ্গে– তোমার সঙ্গে নয়। এরা তোমাকে বড় বড় শহর দেখাবে, এদের বাদশাহ- যিনি অনেক বড় রাজা– তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুশি হবেন।

অতি তাড়াতাড়ি তোমাকে তার নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। আচ্ছা বেটা! তুমি কিছু খাও না কেনো? তুমি তো আমাদের মেহমান, রাশিয়ার রাজার মেহমান। খাওয়ার জন্য তুমি যা চাইবে, তা-ই তোমাকে দেয়া হবে।

কর্নেল দানিয়েলের স্নেহসুলভ কথায় জামালুদ্দীন গলে যায়। মনের আতংকভাব কেটে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে সে। সম্মত হয়ে যায় খাওয়ার জন্য। জামালুদ্দীনের ভাষা বুঝে এমন একজন ভৃত্যকে তার সেবায় নিয়োজিত করা হয়। ভৃত্য জামালুদ্দীনের রুচি মোতাবেক থাকা-খাওয়ার আয়োজন করে।

পরদিন সকালে অপর একটি ঘোড়ার গাড়ি তিনজন রুশ অফিসার, একজন দোভাষী এবং জামালুদ্দীনকে নিয়ে সেন্টপিটার্সবার্গ অভিমুখে রওনা হয়। দীর্ঘ সফর। দোভাষীকে বলে দেয়া হয়, পথে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় কোন বস্তু বা দৃশ্য চোখে পড়লে যেনো জামালুদ্দীনকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। বারবার নানাভাবে যেনো ছেলেটিকে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়, রাশিয়া বিশাল এক রাজ্য। এ দেশে এমন এমন বস্তু, শহর-নগর ও প্রাসাদ আছে, যা কাফকাজে নেই।

রাতে সরকারী গেস্টহাউজে বিশ্রাম নেয়ার পর গাড়িটি পুনরায় সম্মুখপানে এগিয়ে চলে। দু'সপ্তাহ পথ চলার পর গাড়ি মস্কো পৌঁছে। জামালুদ্দীন বিশাল বিশাল প্রাসাদ, সোনালী গীর্জা, হাট-বাজার ও দোকান-পাট অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখতে শুরু করে। কিন্তু তার নিকট সবচে' বেশি বিস্ময়কর হলো সেসব নারী, যারা খোলা মুখে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মস্কোয় জামালুদ্দীনকে গভর্নরের মহলে রাখা হয় এবং পরদিনই আবার সেন্টপিটার্সবার্গ অভিমুখে রওনা করা হয়। মস্কো থেকে রাজধানীগামী সড়কটি পাকা এবং বেশ প্রশস্ত। দ্রুত ছুটতে শুরু করে গাড়ি।

জার নেকুলাই'র দরবারী পদস্থ সেনা অফিসার ও উপদেষ্টামণ্ডলীর দৃষ্টিতে ইমাম শামিলের পুত্র কিশোর জামালুদ্দীনের রাজধানীতে আগমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। তাদের চোখে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উখলগুর বিজয়। কিন্তু জারের নিকট এই বিজয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ জামালুদ্দীন। জার নির্দেশ জারী করেন, জামালুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হবে তাঁর দরবারে। বিষয়টি বিস্ময়কর ঠেকে সকলের কাছে। এ জাতীয় উদ্যোগ-আয়োজন তো কোনো শক্তিধর প্রতিপক্ষকে প্রভাবিত করার জন্যই করা হয়। কিন্তু জামালুদ্দীন তো তেমন কেউ নয়। জামালুদ্দীন রাশিয়ার মহাআতংক ইমাম শামিলের এক অবুঝ পুত্র বৈ নয়! কিন্তু এটি জারের নির্দেশ। কার সাধ্য টু শব্দটি করে? জার কখনো ভুল করেন না; সব সময় সঠিক সিদ্ধান্তই নেন তিনি।

জারের দরবারে এনে উপস্থিত করানোর আগে জামালুদ্দীনকে একথা বুঝানোর পূর্ণ চেষ্টা করা হয় যে, জার বহু বড় বাদশাহ, অনেক রাজার রাজা। বিশাল তাঁর

সাম্রাজ্য। এ কারণে তার দরবারে গিয়ে মানুষ মাথা নত করে তাকে কুর্নিশ করে এবং তাকে আলমপনাহ, মহারাজ, ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে হয়। শুনে জামালুদ্দীন বলে, আমাদের দেশে মানুষ কাউকে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্ণিশ করে না। আমার আব্বাও তো একজন রাজা। কিন্তু তাকে তো কেউ মাথা নত করে সালাম করে না! আমরা একে অপরকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সম্মান করি।

রুশ অফিসাররা আপ্রাণ চেষ্টা করে, যেনো জামালুদ্দীনের মনে জারের প্রতি সামান্য হলেও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা নিস্ফল প্রমাণিত হলো।

জার নেকুলাই সিংহাসনে সমাসীন। সকল দরবারী ও অফিসারবর্গ আপন আপন স্থানে দন্ডায়মান। জারের নির্দেশ পেয়ে শাহী ফৌজের দু'জন অফিসার জামালুদ্দীনকে নিয়ে দরবারে প্রবেশ করে এবং যথারীতি রাজাকে সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু জামালুদ্দীন সোজাসুজি ঢুকে সটান দাঁড়িয়ে যায়।

দরবারের উজীর জামালুদ্দীনকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। জার নিজ আসনে বসে বসেই জালালুদ্দীনের প্রতি হাত এগিয়ে দেন। নিকটে পৌছলে তিনি জামালুদ্দীনকে সিংহাসনের উপর তুলে নিজের কাছে বসান। কাঁধে হাত রেখে আদর দেন। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে বললেন– 'তুমি একজন বীর পিতার সন্তান। তুমি আমার মেহমান হয়েছো দেখে আমার আনন্দ লাগছে। তোমাকে আমি এখানকার সবচে' ভালো স্কুলটিতে ভর্তি করে দেব; তুমি আমাদের ভাষা শিখবে। ভালো ভালো ঘোড়া, সুন্দর সুন্দর পোশাক, সুস্বাদু খাবার, মূল্যবান খঞ্জর, উন্নত তরবারী, বিশাল বালাখানা– যা চাইবে তা-ই তুমি পাবে। আর হ্যাঁ, এখন থেকে তুমি আমার বন্ধু।'

কিশোর জামালুদ্দীন বসে আছে নিশ্চুপ। জার আদেশ করেন, ছেলেটিকে আরামে-স্বাচ্ছন্দে রাখবে। একে এমন জায়গায় থাকতে দেবে, যেনো অন্য শিশু-কিশোরদের সঙ্গ পেতে পারে এবং তার মনে আনন্দ আসে। সপ্তাহে দু'দিন একে আমার কাছে নিয়ে আসবে। যখন যা চাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেবে। আমাদের আস্তাবলের যে ঘোড়াটি তার পছন্দ হয়, সওয়ারীর জন্য তা-ই তাকে দেবে এবং শাহী ক্যাডেট স্কুলে এর শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। কেউ এর সঙ্গে অতীত সম্পর্কে কথা বলবে না। কাফকাজের যেসব সরদার বা তাদের সন্তান এখানে অবস্থান করছে, তারা যেনো সামনে না আসে। জার জামালুদ্দীনের পিঠে আলতো চাপড় মেরে মন্ত্রীকে নির্দেশ দেন, এখন একে দরবার থেকে নিয়ে যাও।

জামালুদ্দীন দরবার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে জার দরবার মুলতবী ঘোষণা করে খাস কামরায় চলে যান।

জার নেকুলাই সীমাহীন আনন্দিত। তথাপি মনে মনে কী যেনো ভাবছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর রাণী জারিয়ানা অনুমতি নিয়ে জারের কক্ষে প্রবেশ করে এবং

বলে, বাদশাহ্ নামদার! অনুমতি হলে একটি প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নটা আমার একার নয়– দরবারের সকলের। কিন্তু মুখ থেকে বের করার সাহস পায়নি কেউ।

ঃ তার মানে তুমি জানতে চাচ্ছো, নিজের দুশমন ও বিদ্রোহীর সামান্য একটি পুত্রকে আমি এতো মর্যাদা কেনো দিলাম, তাই না?

ঃ আলমপানাহ্ ঠিকই ধরেছেন; দুরদর্শিতাহেতু আপনি আমার মনের প্রশ্ন বুঝে ফেলেছেন।

ঃ শোন জারিয়ানা! কাফকাজে এখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ ছেলেটির পিতা পরাজিত হয়েছে ঠিক; কিন্তু আমার প্রবল আশংকা, সে হোক বা অন্য কেউ হোক, অতি দ্রুত পুনরায় তারা আমাদের বাহিনীর মোকাবেলায় এসে দাঁড়াবে। কাফকাজে এ যাবত যতো জননেতার আবির্ভাব ঘটেছে, এ ছেলেটির পিতা তাদের সকলের চে' বেশি সাহসী। আমরা ছেলেটির মন জয় করে নেবো, তাকে আমাদের রংয়ে রঙিন বানাবো; রাশিয়ান বানাবো। তারপর যখন প্রয়োজন হবে, তাকে কাফকাজে ব্যবহার করবো। তখন ছেলেটি সেখানে আমাদের প্রতিনিধ হয়ে এমন কাজ করতে পারবে, যা আমাদের সৈন্যরা পারবে না। ছেলেটির পিতা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে। তখন আমরা এরই মুখ দিয়ে বলাবো– 'আমার পিতা ভুল করছেন। জার রুশ-ই কাফকাজবাসীদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি কাফকাজবাসীদের কল্যাণ-ই কামনা করেন। তিনি নিতান্ত দয়ালু মানুষ।' একথা বলে জার খিল খিল করে হেসে ফেলেন। জারিয়ানাও হেসে ফেলে।

জামালুদ্দীনকে রুশ ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তাকে শাহী ক্যাডেট স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। স্কুলে জামালুদ্দীন রাজপুত্র ও মন্ত্রী-সচিবদের সন্তানদের সঙ্গে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। নিয়মিত চিত্তবিনোদন এবং ঘোড়সওয়ারীর ব্যবস্থাও করা হয় তার জন্য। ধীরে ধীরে কিশোর জামালুদ্দীনের কচি মন থেকে কাফকাজ হারিয়ে যেতে শুরু করে। আস্তে আস্তে রাশিয়ার রং গাঢ় হতে আরম্ভ হয় তার হৃদয়ে। দিন গড়িয়ে মাসে আর মাস গড়িয়ে বছরে পরিণত হতে থাকে। জামালুদ্দীন কোহেস্তানী থেকে রুশীতে পরিণত হতে থাকে। জামালুদ্দীন তো একটি কচি চারা, যাকে একস্থান থেকে তুলে নিয়ে অন্য স্থানে রোপন করা হয়েছে মাত্র।

পনেরো.

উখলগুর যুদ্ধের পর কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতেও রুশবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় এলাকায় বিপুলসংখ্যক দুর্গের দীর্ঘ এক সারি। রুশীদের ভাষায় এর নাম 'মহা সামরিক দুর্গ'। যেসব অঞ্চলে এ দুর্গের অবস্থান, তার দৃষ্টান্ত সেই সমুদ্রের ন্যায়, যা কখনো থাকে প্রশান্ত, কখনো তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ।

১৮৪০ সালে এ উপকূলীয় অঞ্চলে একটি ঝড় এসে হানা দেয়। রুশী জার ও সেনাপতিদের নামে নির্মিত দুর্গগুলো এক এক করে স্বাধীনতাকামীদের সামনে মাথানত করতে শুরু করে। সর্বপ্রথম পদানত হয় লাজারক দুর্গ। তারপর উইলিয়ামিনভ। তারপর স্বাধীনতাকামীরা এগিয়ে যায় নেকুলাই দুর্গের প্রতি। এ দুর্গটির প্রতিরক্ষার জন্য রুশরা জীবনের বাজি ধরে। দুর্গের অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হতে শুরু করে। অবশেষে আল্লাহ স্বাধীনতাকামী মুমিনদের সাহায্য করেন। রুশ সৈন্যরা এখানকার মৌসুমী আবহাওয়ার সঙ্গে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারলো না। ম্যালেরিয়া ও কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিলে স্বাধীনতাকামীরা অবরোধ তুলে নিয়ে নিরাপদ এলাকায় চলে যায়। কয়েক মাস পর আবহাওয়া অনুকূল হলে মুজাহিদরা পুনরায় আক্রমণ করার পর প্রাথমিক সংঘাতেই এ দুর্গের পতন ঘটে। তারপর মেখানুচকি দুর্গ মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এভাবে এক এক করে অসংখ্য উপকূলীয় দুর্গ স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের পদানত হয়।

জার নেকুলাই'র দৃষ্টি এবার এসব হারানো দুর্গের পুনরুদ্ধার এবং অত্র অঞ্চলে আরো দুর্গ নির্মাণের প্রতি নিবদ্ধ হয়। দুর্গগুলোর পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব অর্পণ করেন সেনাপতি রায়ভচকির উপর। বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেনাপতি রায়ভচকি অত্র অঞ্চলে উপনীত হন এবং গিয়েই একটি করে পত্র দিয়ে কয়েকজন দূতকে কাফকাজের বিভিন্ন গোত্রনেতার কাছে প্রেরণ করেন। তিনি পত্রে লিখেছেন–

'মহান জার রাজাধিরাজ নেকুলাই আমাকে তার দুর্গ পুনরুদ্ধারের এবং নতুন নতুন দুর্গ নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছেন। সকল বিদ্রোহী, অবাধ্যকে আমি জীবন রক্ষা করার সুযোগ দিচ্ছি। তোমরা বারবার এ আশায় বিদ্রোহ করছো যে, তুর্কী সুলতান তোমাদের সাহায্য দেবেন। কিন্তু এটি তোমাদের ভুল ধারণা; সুলতান কখনো তোমাদের সাহায্যে আসবেন না। যদি তোমরা রুশ রাজার কল্যাণ লাভে ধন্য হতে চাও, তাহলে জারের আনুগত্য মেনে নাও। অন্যথায় নির্মম পরিণতি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।'

কাফকাজের গোত্রপতিরা এ জাতীয় পত্রের জবাব সাধারণত ভিন্ন ভিন্নভাবেই প্রেরণ করতেন। কিন্তু এই পত্রটি তাদের হাতে পৌঁছে এমন এক সময়ে, যখন দক্ষিণ-পূর্ব চেচনিয়ায় ইমাম শামিল এক বিবেচ্য শক্তি হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর নিবেদিত নায়েবগণ উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতেও জিহাদের তাবলীগ করে ফিরছিলেন। এ মুবাল্লিগণ তাদের দাওয়াতে কাফকাজবাসীদের জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি ঐক্যের উপরও বেশ জোর দিতেন এবং বলতেন– 'রুশদের দাসত্ব থেকে যদি মুক্তি পেতে হয়, তাহলে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মুক্তি অর্জনে ঐক্যের বিকল্প নেই। ঐক্যই শক্তি, ঐক্যেই বরকত।'

ফলে রুশ সেনাপতির পত্রের জবাব প্রেরণের আগে গোত্রপতিগণ একে অপরের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন মনে করেন। তারা রুশ সেনাপতির পত্রের একটি কপি ইমাম শামিলের নিকটও প্রেরণ করেন। ইমামের পরামর্শে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন জবাব না দিয়ে একটি একক জবাব প্রস্তুত করেন। তারা লিখেন–

'জারকে তুমি শুধু 'রাজা' বলেই সম্বোধন করো। কোথাকার তিনি 'রাজাধিরাজ'? তাকে তুমি একথাও বুঝাও; যেনো তার করুণা তিনি নিজের প্রজাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। আমাদের তাঁর করুণার প্রয়োজন নেই। আর তোমরা যারা নিজেদেরকে 'সভ্য' মনে করে থাকো, কথা বলার আদব-কায়দা শিখে নিও। আমরা আমাদের বসত-ভিটা, মাতৃভূমি ও সম্মান-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করছি। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য যারা লড়াই করে, তাদেরকেই যদি তোমরা বিদ্রোহী ও অবাধ্য বলো, তাহলে প্রকৃত বিদ্রোহীদের কী নামে স্মরণ করবে? তোমরা যেসব দুর্গ নির্মাণ করেছো, সেগুলোকে আমরা আমাদের জঙ্গলে জারের অহমিকার কবর ও ক্ষমতার সমাধিসৌধ বলে মনে করি। এরূপ কবরের সংখ্যা যদি তোমরা বাড়াতে চাও, তো ইচ্ছেমতো বাড়াও। আর যদি তোমাদের মধ্যে সামান্যতম সভ্যতা ও মানবতা থাকে, তাহলে দুর্গগুলো ভেঙে চুরমার করে দাও এবং আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাও। আমরা কখনো কোনো রুশ ভূখণ্ডে আক্রমণ করব না। অন্যথায় সামনে আস– দেখ 'নির্মম পরিণতি' কাকে বরণ করতে হয়! আর হ্যাঁ, তুর্কী সুলতান বা অন্য কোনো মুসলমান শাসক যদি আমাদের সহযোগিতা করার যোগ্য হতেন, তাহলে আমাদের সীমানা অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হওয়ারই তোমাদের সাহস হতো না। আমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যুদ্ধ করি, তাঁরই নির্দেশ মোতাবেক তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা জীবন দিয়ে থাকি।'

প্রতিটি গোত্রের সব ক'জন নেতা নিজ নিজ দেহের রক্ত দিয়ে এ জবাবি পত্রে স্বাক্ষর করেন। পত্রখানা পেয়ে সেনাপতি রায়ভচকি হতভম্ব হয়ে পড়েন। মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেন তিনি। এর আগে কখনো সব গোত্রের অধিপতিদের যৌথ স্বাক্ষরিত এমন পত্র পাননি তারা। ইতিপূর্বে কেউ নিজের গায়ের রক্ত দিয়েও পত্রে স্বাক্ষর করেনি।

সেনাপতি রায়ভচকির সাহস থাকলে জার নেকুলাই'র সামনে দাঁড়িয়ে বলতো, এরা তো ঠিকই বলছে। এদের মাতৃভূমি কব্জা করার জন্য আমরা এমন জিদ্ ধরলাম কেনো? কিন্তু তিনি যে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার একজন প্রজা– নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করাই যে তার কর্তব্য। তবু সাহস সঞ্চয় করে তিনি কমান্ডার ইনচীফ ও জারকে অবহিত করেন– 'হিংস্র কাবায়েলীদের মধ্যে ঐক্য জন্ম নিচ্ছে। এটি বড় ভাববার বিষয়। আমার ধারণা, রহস্যময় কোনো একটি শক্তি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ

করার জন্য কাজ করছে। সরদাররা আমার পত্রের জবাব আলাদা আলাদা না দিয়ে যৌথভাবে দিয়েছে। তারা পত্রে স্বাক্ষর করেছে নিজ নিজ শরীরের রক্ত দ্বারা।'

কাবায়েলী সরদারদের ঐক্যের সংবাদ শুনে জার তার গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকে তৎপরতা আরো জোরদার করার আদেশ দেন।

সেনাপতি রায়ভচকি তিবলিসে তার হেডকোয়ার্টারকে লিখে পাঠান, যেনো তোপ ও গোলা-বারুদ সড়কপথে না পাঠিয়ে সমুদ্রপথে প্রেরণ করা হয়। আর জাহাজে করে কিছু সৈন্য প্রেরণের কথাও বলা হয়।

কয়েক সপ্তাহ পর কয়েকটি রুশ জাহাজ সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে যেখানে রায়ভচকির ছাউনি, সেখানে এসে ভিড়ে। সেনাপতি রায়ভচকিরও ধারণা ছিলো, অস্ত্র ও সৈন্য সড়কপথে আসলে মুজাহিদরা গেরিলা হানা দিয়ে তার ক্ষতি সাধন করতে পারে। সমুদ্রপথেই তার সৈন্য ও অস্ত্র নিরাপদে এসে পৌঁছে যাবে। তার ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কৃষ্ণসাগরের কূলে এসে ভিড়ে অস্ত্র ও সৈন্যবাহী রুশ জাহাজ। নিজের এই অসাধারণ উদ্যোগ-আয়োজনকে গোপন রাখার জন্য সেনাপতি রায়ভচকি তার আগের সৈন্যদেরকে উপকূল থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। সর্বপ্রথম জাহাজ থেকে নেমে আসে চার হাজার সৈন্য। তারপর তারাই গোলা-বারুদ, তোপ-কামান নামাতে শুরু করে।

কৃষ্ণসাগরের উপকূল এখন চার হাজার রুশ সেনার পদভারে প্রকম্পিত। স্তূপ হয়ে আছে সেনাপতি রায়ভচকির বিপুল পরিমাণ অস্ত্র। ঠিক এমন সময়ে ঘোড়ার খুরাঘাতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে সমগ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল। হাজার হাজার মুক্তিকামী মুজাহিদ চোখের পলকে ঝড়ের মতো ধেয়ে এসে রুশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

স্থলের দিক থেকে রুশদের ঘিরে ফেলে তারা। রুশ সেনারা পেছনে সরতে সরতে চলে আসে সমুদ্রের একেবারে কূলে– পানির কাছে। এবার প্রবল আক্রোশে বীর বিক্রমে তাদের আরেকটি ধাওয়া দেয় মুজাহিদরা। উপায় না দেখে রুশ সৈন্যরা লাফিয়ে পড়ে পানিতে। সাথে সাথে পানির মধ্যে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকশ ডুবুরি মুজাহিদ। পানির মধ্যে প্রিয় অস্ত্র খঞ্জরের কৃতিত্ব দেখাতে শুরু করে তারা।

মুজাহিদদের এই আকস্মিক আক্রমণ রুশদের এমন আতংকিত করে তোলে যে, আর তাঁরা নিজেদের সামলাতেই পারলো না। ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেনাপতি রায়ভচকি তার সৈন্যদের আদেশ করেন, এখান থেকে সরে চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ো, বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলো, এমন কষে মার দাও যেনো একটি প্রাণীও জীবন নিয়ে পালাতে না পারে। পরে রুশ সৈন্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ঘেরাও সংকীর্ণ করতে

করতে যখন উপকূলের নিকটে চলে আসে, তখন বেলা সন্ধ্যা। মুজাহিদ গেরিলারা ততোক্ষণে কাজ সম্পাদন করে রহস্যময় উপায়ে উধাও হয়ে গেছে।

জাহাজে করে আসা রুশ সেনাদের বেশির ভাগই নিহত কিংবা আহত হয়েছে। তিনটি জাহাজে আগুন ধরে যায়। এসব জাহাজে করে যেসব গোলা-বারুদ আনা হয়েছিলো, সমুদ্রের পানিতে ডুবে তলিয়ে যায় সব। সমুদ্রে শত শত রুশ সেনার লাশ ভাসতে দেখা যায়।

সেনাপতি রায়ভচকি ধ্বংসযজ্ঞ এবং তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ শুনে পাগলের মতো হয়ে যান। সে রাতে এক তিলও ঘুমুতে পারেননি তিনি। অনুতাপ আর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটে তার সারাটা রাত। অবস্থাটা তার এমন দাঁড়ায় যে, মুখ থেকে সিগারেট বের করে হাতের আঙুল কামড়াচ্ছেন আবার আঙুল বের করে সিগারেট ফুঁকছেন।

পরদিন সকালে যখন তিনি জানতে পারেন, বিদ্রোহীদের ঘেরাও এবং জাহাজে করে আসা সৈন্যদের সাহায্যের জন্য যে বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিলো, তাদের উপরও গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। তিনি তিবলিসে তার হেডকোয়ার্টারে এই নাজুক পরিস্থিতির সংবাদ দেন। হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত কমান্ডার ইনচীফ সেনাপতি গলুভন রাগে দাঁত কড়মড় করে উঠে দাঁড়ান এবং রায়ভচকিকে তিরস্কার করতে করে শুরু করেন– 'অযোগ্য, অপদার্থ কোথাকার! শেষ পর্যন্ত গ্রেবকেই সেখানে যেতে হবে দেখছি।'

পনের হাজার সৈন্যকে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। দু'দিন পর সেনাপতি গ্রেব-এর নেতৃত্বে এই বাহিনী ভারী ভারী তোপ-কামান নিয়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। প্রথম দিনের বিকাল বেলা তারা উন্মুক্ত একস্থানে ছাউনি ফেলে। এ সময়ে একটি ঘোড়সওয়ার সাদা পতাকা উড়িয়ে ছাউনিতে এসে পৌঁছে এবং রুশ অফিসারদের হাতে একটি পত্র দিয়ে বলে– 'এটি আপনার কমান্ডার গ্রেব-এর হাতে পৌঁছিয়ে দিন।' বলেই লোকটি দ্রুতগতিতে ফিরে যায়।

অফিসার সঙ্গে সঙ্গে পত্রখানা সেনাপতি গ্রেব-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কমান্ডার ইনচীফ তার তাঁবুর বাইরে প্রদীপের আলোতে লেফাফা ছিঁড়ে পত্রখানা পড়তে শুরু করেন। তাতে উপরে রুশ ভাষায় এবং নীচে আরবী ভাষায় লিখা আছে–

'উখলগুর ঋণ শোধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও– শামিল।'

সেনাপতি গ্রেব পত্রখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং মাটিতে ফেলে দিয়ে ভারি বুটের তলায় পিষতে পিষতে বলেন– 'বজ্জাত! বেটাকে আমি দেখে ছাড়বো।'

পরদিন সকালে সেনাপতি গ্রেব কমান্ডার ইনচীফ-এর একটি পত্র পান। তাতে কমান্ডার লিখেছেন–

'শাহী তোপখানার কমান্ডার ইনচীফ সেনাপতি বেকুনিয়ান পরিদর্শনের জন্য রাতেই এখানে এসে পৌঁছেছেন। তিনি কাফকাজে একটি অভিযানের কমান্ড করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। বেকুনিয়ানের ইচ্ছা পূরণ করার ব্যবস্থা করুন। উপকূলবর্তী এলাকার দিকে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিন এবং প্লাটুনগুলোকে সেনাপতি বেকুনিয়ানের অধিনায়কত্বে অত্র অঞ্চলের যে স্থানে শামিল তৎপরতা চালাচ্ছে, সেখানে পাঠিয়ে দিন।'

কমান্ডার ইনচীফ-এর নির্দেশ মোতাবেক আয়োজন শুরু হয়। সেনাপতি বেকুনিয়ানের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যকে চেচেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিদ্রোহীদের দমন কবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অত্র অঞ্চলে যেতে হয় গমরীর মধ্য দিয়ে। রওনা হয়ে রুশ সেনাবহর যখন গমরী অতিক্রম করতে শুরু করে, তখন একজন নিম্নপদস্থ অফিসার কমান্ডার ইন চীফকে বলে, ১৮২২ সালে প্রথম বিদ্রোহী কাজী মোল্লা এবং তার মুরীদদের এ অঞ্চলে ধ্বংস করা হয়েছিলো।

ইমাম শামিল দাগেস্তানের একটি সীমান্ত এলাকায় তাঁর বাহিনীর পুনর্বিন্যাসে ব্যস্ত। গুপ্তচররা তাঁকে জানায়, শাহী তোপখানার কমান্ডার ইন চীফ সেনা অভিযানের নেতৃত্ব দেয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। সংবাদ শুনে ইমাম শামিল এক নায়েবকে ডেকে বললেন– 'তুমি পাঁচশ মুরীদ নিয়ে এগিয়ে যাও এবং লোকটার সখ পূরণ করে আসো।'

ইমাম শামিলের বাহিনী রুশ সেনাদের আগমনের পথে একটি উঁচু পাহাড় বেছে নেয়। দু'শ মুরীদ পাহাড়ের উপরে বড় বড় পাথর খণ্ডের আড়ালে বাংকার তৈরি করে নেয়। অপর তিনশ রাস্তার দু'ধারে ঘন বৃক্ষরাজির আড়ালে লুকিয়ে যায়।

রুশ বাহিনী পাহাড়ের নিকটে এসে পৌঁছামাত্র উপর থেকে বৃষ্টির মতো গুলি নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। সেনাপতি বেকুনিয়ান মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং তার বাহিনীকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তোপচীদেরকে পাহাড়ের উপর গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেন। ইত্যবসরে এক পার্শ্বে লুকিয়ে থাকা মুজাহিদরাও হামলা শুরু করে দেয়। রুশ সৈন্যরা তাদের রাইফেলের মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার অপর পার্শ্বে অবস্থানরত মুজাহিদরাও আক্রমণ শুরু করে। সেনাপতি বেকুনিয়ান একটি গাছের তলায় গিয়ে আশ্রয় নেন। সেই গাছেরই উপর থেকে হঠাৎ করে দু'জন মুজাহিদ নীচে লাফিয়ে পড়ে এবং রুশ সেনাপতির গায়ে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করতে শুরু করে। দেখে বেশ ক'জন রুশ সেনা ছুটে এসে মুজাহিদদের ঘিরে ফেলে। ততোক্ষণে রুশ সেনাপতি বেকুনিয়ানের ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। আরো পাঁচজন রুশসেনাকে লাশ বানিয়ে দুই মুজাহিদ শহীদ হয়ে যান।

সেনাপতি বেকুনিয়ানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রুশ সেনাদের মধ্যে অস্থিরতা ও

হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। তারা মনোবল হারিয়ে পেছনে সরে যায়।

এ দু:সাহসী লড়াইয়ে পাঁচশ মুরীদের চব্বিশজন শাহাদাতবরণ করেন। রুশ বাহিনী তাদের সেনাপতি এবং ১২৫২ জন্য সৈন্য ও অফিসারের লাশ ফেলে পালিয়ে যায়।

শাহী তোপখানার কমান্ডার ইন চীফ-এর মৃত্যু যদিও তার-ই ভুলের পরিণতি ছিলো, তথাপি জার এর দায়ভার কমান্ডার ইন চীফ গলুভন-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন এবং কঠোর ভর্ৎসনা দিয়ে কমান্ডার গনুভনকে লিখেন–

'এক বছর আগে তুমি বলেছিলে, শামিলকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু একটি বছরের মাথায় আবার সে পূর্বের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। সেনাপতি বেকুনিয়ানের মৃত্যুতে আমাদের মর্যাদায় কতোটুকু আঘাত লেগেছে, তাকি তুমি ভেবে দেখেছো? এখন বিদ্রোহীদের শক্তি-সাহস আরো বেড়ে যাবে। তবে তোমার পূর্বের কর্মদক্ষতা আমাকে সুপারিশ করছে, যেনো আমি তোমাকে এর ক্ষতিপূরণের সুযোগ দেই।'

জারের পত্রে রুশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার তমিরখানশুরা এবং তিবলিসে অবস্থানরত সেনাদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। সকলের মুখে একই কথা, 'আমাদের খোদাওন্দ আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে গেছেন। যদি সহসা আমরা তাকে সন্তুষ্ট করতে না পারি, তাহলে তার কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।'

কমান্ডার ইন চীফ গলুভন অফিসারদের একটি বৈঠক তলব করেন। তিনি অফিসারদেরকে শাহেনশাহ'র পত্র পড়ে শোনান এবং বলেন– 'সেনাপতি বেকুনিয়ানের মৃত্যুতে শাহেনশাহ প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন।'

সেনাপতি গ্রেব বললেন, হ্যাঁ জনাব! কথায় বলে, করবে ভল্লুক আর ধরা হবে রেন্ডিয়ার'। আমাদের দশাও হয়েছে ঠিক তা-ই। আপনি নিশ্চয় জানেন, এ অঞ্চলে যুদ্ধ করা চাট্টিখানি কথা নয়। সেনাপতি বেকুনিয়ান বোধ হয় মনে করেছিলেন, যুদ্ধ করা রেন্ডিয়ার শিকার করার মতই সহজ। তার বোকামীর কারণেই আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে।

কমান্ডার ইন চীফ বললেন, এখন বক্তৃতা করার সময় নয়। আমাদের পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করা দরকার। ভুল যারই হোক, এখন সবচে' বড় কথা হলো, শাহেনশাহ রুষ্ট। আমরা যদি সহসা কিছু একটা করে না দেখাতে পারি, তাহলে আমাদের পরিণতি সেনাপতি রোজন, কলগনু ও দাদিয়ানীর পরিণতি অপেক্ষাও শোচনীয় হবে।

গ্রেব বললেন, সেই পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়ার একটিই পথ– সখের বশে যুদ্ধ করার মানসিকতাসম্পন্ন কোনো সেনাপতি আমাদের পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

কমান্ডার ইন চীফ বললেন, ভবিষ্যতে এমনটি হবে না। তাছাড়া সেনাপতি বেকুনিয়ানের পরিণতির পর এখন আর সখ করে যুদ্ধে অংশ নিতে চাইবেও না কেউ।

রুশ অফিসারদের আলোচনা এ পর্যন্ত পৌছে। ঠিক এমন সময়ে দু'জন কাবায়েলী কমান্ডার ইন চীফ-এর জন্য জরুরি সংবাদ নিয়ে আসে। লোক দু'জন রুশদের বিশ্বস্ত গুপ্তচর ও বার্তাবাহক। কমান্ডার ইন চীফ বৈঠকের কার্যক্রম স্থগিত করে আসন থেকে উঠে বাইরে গিয়ে গুপ্তচরদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। সংবাদ হলো– 'শামিল কাজী কোমক আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।'

কাজী কোমক তমীরখানশুরা থেকে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গোত্র। গোত্রের সরদার রাশিয়ানদের অনুগত-সহযোগী। রুশদের সঙ্গে সে একটি চুক্তিও করে রেখেছিলো। চুক্তি অনুপাতে সে একটি রুশীয় কাস্‌ক রেজিমেন্টের সঙ্গে কাজী কোমক অবস্থান করছে। কাজী কোমকের সরদার সেই রেজিমেন্টের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য।

কমান্ডার ইন চীফ পুনরায় সভাকক্ষে প্রবেশ করেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে অফিসারদের অবহিত করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন, এক্ষুনি যদি কাজী কোমক অভিমুখে সৈন্য রওনা করা হয়, তাহলে পথেই রাত হয়ে যাবে। এতে শামিল বাহিনীর হাতে আমাদের বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত হলো, পরদিন অতি প্রত্যুষে দু' হাজার সৈন্য এবং তিনশ তোপ কাজী কোমক অভিমুখে রওনা হবে।

যথাসময়ে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে দু'হাজার সৈন্য এবং তিনশ তোপ কাজী কোমক অভিমুখে রওনা করে। কোনো রকম সংঘাত ছাড়াই তারা দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে।

সন্ধ্যার সময় তারা যখন কাজী কোমক গিয়ে পৌছে, ততোক্ষণে ইমাম শামিল কাজী কোমকের সরদার, তার স্ত্রী-সন্তান, রুশ রেজিমেন্ট এবং তার বিশেষ কাস্‌ক রক্ষীদের বন্দি করে নিয়ে গেছেন।

ষোল.

রুশ সেনাকর্মকর্তাগণ চেচনিয়ায় স্বাধীনতাকামীদের তৎপরতা তীব্র হওয়ার সংবাদ পাচ্ছেন একের পর এক। কমাণ্ডার ইন চীফ গলুভন দাগেস্তান ও পূর্ব চেচনিয়ায় ইমাম শামিলের সঙ্গে বুঝা-পড়ার দায়িত্ব সেনাপতি গ্রেব-এর উপর ন্যস্ত করে নিজে পশ্চিমাঞ্চলীয় রণাঙ্গনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। গ্রেব অত্যন্ত অভিজ্ঞ, অসীম সাহসী ও সহনশীল সেনানায়ক। কিন্তু এ মুহূর্তে রাগে-ক্ষোভে পাগল হয়ে গেছেন তিনি। মাত্র এক বছর আগে যে লোকটিকে তিনি ধূলিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, এখন কিনা সে জার রুশের প্রবল শক্তিধর সেনাবাহিনীকে

শুধু হুমকি-ই দিচ্ছে না, বরং রুশ বাহিনীর উপর আক্রমণও করে বসেছে!

বর্তমানে ইমাম শামিল তাঁর নতুন কেন্দ্র দারগীনে অবস্থান করছেন। বাম্বাত এবং আন্‌ধীতেও মজবুত বাংকার তৈরি করে রেখেছেন তিনি। বাম্বাত দারগীনের কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। আর আন্‌ধীর অবস্থান তারও পরে। এ দু'টি স্থানে সৈন্য মোতায়েন এবং মোর্চা স্থাপন করার উদ্দেশ্য হলো, যাতে মুজাহিদদের কোনো একটি অবস্থান রুশীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে গেলে অন্যান্য স্থানে মোতায়েন মুজাহিদরা পেছন দিক থেকে রুশ ফৌজের উপর আক্রমণ চালাতে এবং পেছন থেকে তাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে। যদি রুশরা তিনটি ঘাঁটিকেই অবরুদ্ধ করতে চায়, তাহলে যাতে তাদের বিপুলসংখ্যক সৈন্য ময়দানে আসতে বাধ্য হয়। সেনাপতি গ্রেব-এর সিদ্ধান্ত, যতো সৈন্যের প্রয়োজন হবে দেবেন, তবু ইমাম শামিলের তিনটি অবস্থানকেই ঘিরে ফেলে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া হবে, যেমনটি ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করা হয়েছিলো উখলগুতে।

সেনাপতি গ্রেব দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রওনা হয়ে যান। তার এ বাহিনীতে আছে তিন হাজার ঘোড়া আর আড়াইশ গাধা। গাধাগুলোর পিঠে অস্ত্র ও রসদ বোঝাই করা। এসব সামানপত্র নিয়ে পাহাড়-জঙ্গলের পথ ধরে অতিক্রম করছে রুশ বাহিনী। চার হাজার সৈন্য গাধার বহরের পেছনে এবং চার হাজার সামনে। পথের দু'ধারে গাধার বহরের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত এক হাজার করে দু'হাজার সৈনিক।

কয়েক মাইল দীর্ঘ এই রুশ সেনাবহরটি প্রথমদিন বড় কষ্টে পথ অতিক্রম করে মাত্র আড়াই থেকে তিন মাইল। তা-ও আবার সম্ভব হয়েছে পথে কোনো সংঘাত-সংঘর্ষ না ঘটায়।

রাতে এ বাহিনী এক পাহাড়ের পাদদেশে একটি উন্মুক্ত স্থানে ছাউনি ফেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর শুরু হয় প্রবল ঝড়। তারপর মুষলধারায় বৃষ্টি। মুহূর্ত মধ্যে তছনছ হয়ে যায় রুশ বাহিনীর ছাউনি। নেমে আসে প্রচণ্ড শীত। সারাটা রাত ঠাণ্ডায় থর থর করে কাঁপতে থাকে তারা। ঘুমুতে পারেনি একতিলও। সকাল পর্যন্ত প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে কয়েকশ সৈন্য।

ভোর হতে না হতে কাফেলাকে রওনা হওয়ার আদেশ দেন সেনাপতি গ্রেব। ক্লান্ত-অবসন্ন ও জ্বরাক্রান্ত সৈন্যরা পা টেনে টেনে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে শুরু করে। ছাউনির স্থান থেকে সম্মুখের রাস্তার দু'ধারে ঘন বৃক্ষমালা।৬ যেখানে গাছ নেই, সেখানে পড়ে আছে বড় বড় পাথরখণ্ড। স্থানে স্থানে পথে প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে রেখেছে ইমাম শামিলের সৈন্যরা। কোথাও কোথাও পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল পাথর।

বৃক্ষরাজি ও পাথরমালার আড়ালে পজিশন নিয়ে বসে আছে মুজাহিদরা।

উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে তারা। কাঙ্ক্ষিত সেই মোক্ষম সুযোগটি পেয়ে যায় এক সময়ে। হঠাৎ রাস্তার দু'দিক থেকে শুরু হয় গুলি বৃষ্টি। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনশ'রও বেশি রুশ সেনা নিহত এবং আড়াইশ আহত হয়। রোগীদের সংখ্যা বেড়ে যায় অনেক। সকল রুশ সেনা ও সিপাহী সম্পূর্ণ নিশ্চিত, যে যমের হাতে তারা ধরা পড়েছে, তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর পথ নেই। কিন্তু সাধারণ সিপাহীদের কাজই হলো নির্দেশ পালন করা আর জীবন দেয়া! কী ঘটেছে আর কী ঘটবে, তার কল্পনা করারও অধিকার তাদের নেই।

দ্বিতীয় রাতে রুশ সেনারা ছাউনি ফেলার জন্য আর একত্রিত হতে পারল না। সন্ধ্যা নাগাদ কোনো এক উন্মুক্ত স্থানে গিয়ে উপনীত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন সেনাপতি গ্রেব। কিন্তু স্বাধীনকামীরাও বসে নেই। দুশমনদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্যবস্থাও করে রেখেছে তারা। একটি প্রতিবন্ধক সরিয়ে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করলে সিপাহী ও গাধার বহরের মাঝে আরেকটি প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। যেখানেই পথের কোনো এক পার্শ্বে উঁচু স্থান আছে, সেখান থেকেই বিশাল বিশাল পাথর ও বড় বড় গাছের ডাল গড়াতে গড়াতে রাস্তায় এসে পড়ছে।

রাতের আঁধারে রাইফেলের গুলি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা নিশ্চিত নয়। আবার মুজাহিদদের কাছে এতো গোলাও নেই যে, অন্ধকারে এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে তা নষ্ট করা যায়। ফলে এ রাতে গুলির পরিবর্তে মুজাহিদরা তাদের খঞ্জর ও তরবারির পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করে। তাদের দাশ্না শত শত রুশ সেনার নাপাক দেহে বিদ্ধ হয়। অসংখ্য সিপাহীর রক্ত পান করে তাদের সুপ্রিয় অস্ত্র কঞ্জল।

তৃতীয় দিন সেনাপতি গ্রেব তার নিজের ভুল উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি বুঝতে পারেন, গন্তব্যে পৌঁছুতে আরো কয়েকদিন চলে যাবে আর এভাবে আক্রমণ চলতে থাকলে ততোক্ষণে বোধ হয় একজন অফিসার-সেনাও জীবিত থাকবে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগ্নহৃদয়ে তিনি সৈন্যদের ফেরত রওনা হওয়ার আদেশ দেন।

দাগেস্তানের জঙ্গল ও পাহাড়ি পথে এতোগুলো উট-গাধা নিয়ে সেনা অভিযান যেমন ভুল,মাঝপথ থেকে ফিরে আসার নির্দেশও তেমনি নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ পাওয়ামাত্র রুশ সেনাদের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায়। অপরদিকে বেড়ে যায় মুজাহিদদের শক্তি ও সাহস। এবার রুশ সৈন্যদের নিকট মাল-সম্পদের হেফাজতের তুলনায় নিজেদের জীবন রক্ষা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সপ্তম দিনে ক্যাম্পে এসে পৌঁছে এ কাফেলা। পেছনে রেখে আসে তিন হাজার সিপাহীর লাশ, সমুদয় সামান, রসদ ও ভারী অস্ত্র। যে সাত হাজার সৈনিক ফেরত পৌঁছে, তাদেরও এক হাজার গুরুতর আহত। তীব্র জ্বরে কোঁকাচ্ছে প্রায় সমপরিমাণ সিপাহী।

এ পরিস্থিতিতে সেনাপতি গ্রেব-এর স্থলে যদি অন্য কেউ হতো, তাহলে জার তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতেন না। তিনি তাকে বরখাস্ত করেই ক্ষান্ত হতেন না; কঠিন শাস্তিও প্রদান করতেন। কিন্তু গ্রেব হলেন জারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার যোগ্যতা ও সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় জারের প্রবল আস্থা। কমাণ্ডার ইন চীফ জারের নিকট এ সেনা অভিযানের ব্যর্থতা এবং রুশ সেনাদের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছালে তিনি কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। কিন্তু দারগীনে সেনা অভিযানের এ চরম ব্যর্থতা ও নির্মম পরিণতি সেনাবাহিনীতে গ্রেবের আস্থা নিঃশেষ করে দিয়েছে। সেনাপতি গ্রেব তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ইমাম শামিলের অধিকৃত অঞ্চলসমূহে হঠাৎ আরো দু'টি ঝটিকা আক্রমণ করে বসেন। কিন্তু এ আক্রমণও সেনাপতি এবং গ্রেব তার বাহিনীর জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়।

❁ ❁ ❁

সরকার কিংবা সরকারের ক্ষমতাধর কোনো ব্যক্তির প্রশাসনিক ব্যর্থতা গোপন রাখা যায়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের কোন ব্যর্থতাই গোপন রাখা যায় না। রাজা-উজির-দরবারীরা জনসাধারণকে যে কোনো ব্যাপারে বোকা বানাতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হওয়া সেনা কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় রাখতে পারে না। সর্বোপরি নিরীহ কাউকে বলির পাঠা বানিয়ে নিজের দোষ তার ঘাড়ে চাপানোর সুযোগও প্রশাসনের আছে। কিন্তু রণাঙ্গনে পরাজয়বরণকারী সেনাপতিকে তার ব্যর্থতার সকল দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়।

শাহেনশাহ জারের এ সুযোগ আছে যে, তিনি এক সেনানায়ককে ব্যর্থতার জিম্মাদার সাব্যস্ত করে আরেক সেনানায়ককে দায়িত্ব দিতে পারেন। কিন্তু ইমাম শামিলের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইমাম শামিল জারের ন্যায় রণাঙ্গন থেকে দূরে থাকতে পারেন না। বরং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি অভিযানে তিনি নিজেই সেনাপতিত্ব করেন। এ কারণে মুক্তিকামী মুসলমানদের যে কোনো বিজয় ইমাম শামিলের বিজয়, যে কোনো পরাজয় ইমাম শামিলেরই পরাজয়। ইমাম শামিল না বিজয়ের জন্য পুরস্কৃত বা মাল্যভূষিত হন, না পরাজয়ে তাঁর পদাবনতি কিংবা পদচ্যুতির প্রশ্ন আসে। জয়-পরাজয় উভয় অবস্থায়ই ইমাম শামিল তাঁর নায়েব ও মুরীদদের পরম ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র।

যারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করে, তাদের সাধনাকে জয়-পরাজয়ের পাল্লায় ওজন করা যায় না। দেখার বিষয় হলো, সত্যের সৈনিকরা কতো বীরত্ব এবং কীরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করছে।

সেনাপতি গ্রেব-এর ব্যর্থতা ও অনাস্থা চরম আকার ধারণ করে। কমাণ্ডার ইন চীফ এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ অপেক্ষা করছে, জার কখন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু জার সম্পূর্ণ নীরব।

১৮৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে সেনাপতি গ্রেব নিজেই আবেদন পেশ করেন, যেনো তাকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এ ধরনের আবেদন একজন সেনানায়কের পক্ষে আত্মহত্যার নামান্তর। ইমাম শামিল সেনাপতি গ্রেব থেকে উখলগুর পরাজয়ের প্রতিশোধ এভাবে নিলেন যে, গ্রেবকে তিনি আত্মহত্যার জন্য বাধ্য করলেন।

একদিনের বিকাল বেলা। একটি ঘোড়াগাড়ি তমীরখানগুরা থেকে সেন্টপিটার্সবার্গ অভিমুখে রওনা হবে। হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে এক তাতারী ঘোড়সওয়ার। রওনার জন্য উদ্যত গাড়িতে উপবিষ্ট অফিসারের কোলে ঘোড়ার পিঠ থেকে একখণ্ড কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে যায় লোকটি। রুশ অফিসার সেনাপতি গ্রেব ভাঁজ খুলে পত্রখানা পড়তে শুরু করেন। আরবী ও রুশ ভাষায় তাতে লেখা আছে–

'রাজাধিরাজ জারের মহান সেনাপতি! আমার হিসাব-নিকাশ তো এখনো শেষ হয়নি। সবেমাত্র সেই খুনের হিসাব শেষ হয়েছে, যা প্রবাহিত হয়েছিলো উখলগুর মাটিতে। কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো, তার হিসাব নেয়ার কাজ তো এখনো বাকি। তার জন্য তোমার আরো একটু অপেক্ষা করা আবশ্যক ছিলো। কিন্তু মহান সেনাপতি! তুমি যাও। আমি জানি, তুমি তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মালিক নও। তোমার স্বাধীনতা শুধু বিশ্বাসঘাতকতা করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তোমার দুশমন আমি; কিন্তু আমার শত্রু তুমি নও– জার, যার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তোমার মতো সেনাপতিও বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। এই পত্রখানার স্থলে একটি ধারাল খঞ্জরও তোমার হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু আমরা প্রতারণা করি না। কারণ, আমরা তোমাদের মত অসভ্য নই।

–শামিল

পত্রখানা পড়তে পড়তে সেনাপতি যখন 'শামিল' শব্দটি পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন তার অবস্থা এমন হয়ে যায়,যেনো তিনি বিজয়ী দুশমনের সামনে নিশ্চল কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। গ্রেব পত্রখানা ভাঁজ করে দু'হাতে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়ে হঠাৎ থেমে যান। তারপর পত্রটি নীচে ছুঁড়ে ফেলার জন্য হাত বাড়ান। এবারও থেমে যান তিনি। সব শেষে পত্রখানা পকেটে রাখতে রাখতে স্বগতোক্তি করেন– 'এতে শামিলের স্বাক্ষর আছে, আছে আমার নাম। আমার জন্য এ এক বিরাট মর্যাদা।'

ঘোটকযান সেনাপতি গ্রেবকে নিয়ে তিবলিস অভিমুখে ছুটতে শুরু করে।

❁ ❁ ❁

এক মাস পর মস্কোর গভর্নর সেনাপতি নেডহার্ট রাজাদেশে সেনাপতি গ্রেব-এর স্থলাভিষিক্ত হন। সেনাপতি নেডহার্ট-এর দায়িত্ব গ্রহণে অধীন অফিসার এবং

সৈন্যদের শেষ আশা-ভরসাটুকুও শেষ হয়ে যায়। তাদের আশা ছিলো, সেনাপতি গ্রেব-এর স্থলে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতিকে নিয়োগ দেয়া হবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। সেনাপতি নেডহার্টের কাফকাজে লড়াই করার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। নেডহার্ট জার-এর একজন সেনানায়ক হওয়ার পাশাপাশি বহু বড় একজন জাগীরদারও বটে। তার ব্যক্তিগত সম্পদের কোনো হিসেব নেই। তাই তমীরখানগুরা পৌঁছেই সর্বপ্রথম তিনি অধীন অফিসারদের আদেশ দেন, 'দাগেস্তান, চেচনিয়া ও আওয়ারে ঘোষণা করে দাও, যে ব্যক্তি শামিলের মাথা এনে দিতে পাববে,তাকে সেই মাথার ওজনের সমান সোনা পুরস্কার দেয়া হবে। যে সব অঞ্চলে প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দেয়া সম্ভব না হবে, সেখানে নিজস্ব লোকদের দ্বারা কৌশলে গোপনে কথাটা ছড়িয়ে দিতে হবে।'

এ ঘোষণার এক সপ্তাহ পর। সেনাপতি নেডহার্ট তার দফতরে বসে আছেন। এ সময়ে এক অফিসার এসে সংবাদ দেয়, এক তাতারী কাবায়েলী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

ঃ লোকটা কি শামিলের মাথা নিয়ে এসেছে?

ঃ না, তা তো দেখলাম না।

ঃ তাহলে আর কী কারণে সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়?

ঃ লোকটি বলছে, তার নাকি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ একখানা পত্র দিতে হবে।

ঃ তাকে তল্লাশী নাও এবং চারজন সিপাহীর সঙ্গে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

তাতারি দূত দফতরে প্রবেশ করে নিজের ভাষায় বললো–

'আমি কাফকাজের সিংহ ইমাম শামিলের দূত। আপনার নামে আমি এই পত্রটি নিয়ে এসেছি।'

নেডহার্ট পত্রখানা খুলতে খুলতে বললেন, আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি শামিলের মাথা নিয়ে এসে থাকবে!

ঃ দূতের সঙ্গে আপনার এরূপ কথা বলা অনুচিত। দূতের কাজ শুধু বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়া। আমি যাচ্ছি। বলেই লোকটি কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় এবং ঘোড়ায় চড়ে পলকের মধ্যে হাওয়া হয়ে যায়।

সেনাপতি নেডহার্ট পত্রটি পাঠ করেন–

'নতুন সেনাপতি! মনে হচ্ছে, তোমার কাছে অনেক সোনা আছে। আমার মাথার ওজনের সমান সোনা দেয়ার কথা ঘোষণা দেয়ার আগে তোমার জেনে নেয়া প্রয়োজন ছিলো, আমার মাথার ওজন কতো। তুমিই একমাত্র রুশ সেনাপতি, যে আমার মাথার এতো মূল্য ধার্য করেছো। এর জন্য আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেনাপতি গ্রেব আমার মাথার মূল্য ধার্য করেছিলো মাত্র তিনশ রোবল। সম্ভবত সে কারণেই কেউ তার ঘোষণায় কান দেয়নি। তবে সেনাপতি নেডহার্ট!

আমি কিন্তু তোমার মাথার বিনিময়ে কাউকে একটি কানাকড়িও দেবো না। কারণ, একটি কড়িও তোমার মাথা অপেক্ষা বেশি মূল্যবান।

–ইতি

শামিল'

সেনাপতি নেডহার্ট পত্রখানা পড়ে রাগে-ক্ষোভে পাগল হয়ে যান। দাঁত কড়মড় করে বলতে শুরু করেন– 'জংলী, গোঁয়ার, বিদ্রোহী, অবাধ্য! বেটা আমাকে ভেবেছে কী? নির্বোধটা দেখছি সোনার আকর্ষণ সম্পর্কেও অবহিত নয়! বেটা জানে না, সোনার মহব্বত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ বাঁধায়, পুত্রকে পিতার শিরচ্ছেদে অনুপ্রাণিত করে!' একথা বলেই নেডহার্ট পত্রখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং বাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেন।

ইমাম শামিল তমীরখানশুরা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এক জনবসতি উলইয়ামিতে অবস্থান করছেন। সেনাপতি নেডহার্ট তার ছয় হাজার সৈন্যকে তিনটি প্লাটুনে বিভক্ত করে তিন দিক থেকে উলইয়ামীর উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন।

বাহিনী রওনা হয়ে যায়। রাতে তমীরখানশুরার পার্শ্বে একটি পাহাড়ের চূড়ায় প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা চোখে পড়ে। তারপর সম্মুখের আরো একটি পাহাড়ে– তারপর আরো একটিতে। অল্প সময়ের মধ্যে উলইয়ামীতে ইমাম শামিলের কানে রুশ বাহিনীর অগ্রাভিযানের সংবাদ পৌঁছে। প্রতিটি পাহাড়ে দৃশ্যমান অগ্নিশিখার সংখ্যা, মানুষের গতিবিধিই জানিয়ে দিয়েছে, রুশ সৈন্যরা সংখ্যায় কতো, আক্রমণ কোন্ কোন্ দিক থেকে আসছে এবং তাদের লক্ষ্য কী।

ইমাম শামিল তৎক্ষণাৎ তার বিশেষ ফোর্স ঈগল বাহিনীকে নিয়ে ঝটিকা বেগে তমীরখানশুরা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রওনা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাঁর নায়েব ও মুরীদদের বললেন–

'আমাদের উদ্দেশ্য তমীরখানশুরা জয় করা নয়। আমরা নতুন রুশ সেনাপতিকে শুধু এটুকু জানিয়ে দিতে চাই, আমরা কতো দ্রুততার সাথে স্থান পরিবর্তন করতে পারি; যাতে লোকটার মনে ধারণা জন্মে যে, নির্দিষ্ট কোনো এক স্থানে আমাদের অবরুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আমাদের আপাতত কর্মকৌশল হলো, রাশিয়ানদের ধাওয়া করতে থাকো, অস্থির করে চলো এবং মওকামত তাদের নতুন নতুন রাইফেল-বন্দুকগুলো ছিনিয়ে আনো। আমাদের সফর বেশ দীর্ঘ। সকাল পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। গুপ্তচররা পথে আমাদের জন্য তাজাদম ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে বলে সংবাদ পাঠিয়েছে– চলো।

উলইয়ামীর উপর আক্রমণের জন্য রওনা হওয়া রুশ বাহিনী সবেমাত্র এক তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করেছে। ঠিক এ সময়ে ইমাম শামিলের ঈগল বাহিনী তমীরখানশুরায় সেনাপতি নেডহার্টের হেডকোয়ার্টারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হেডকোয়ার্টারের দুর্গসম ইমারতের বাইরে বিভিন্ন ব্যারাকে এবং রাস্তাঘাটে যেখানে যতো রুশ চোখে পড়ে, ঈগল বাহিনী তাদের প্রত্যেককে নির্মমভাবে যমের হাতে তুলে দেয়। ঈগল বাহিনী দু'জন রুশ অফিসারকে ধরে ইমামের কাছে নিয়ে আসে এবং পরে ইমামের নির্দেশে তাদের ছেড়ে দেয়। এটি ইমাম শামিলের এক অভিনব রণকৌশল। উদ্দেশ্য, যাতে এরা জীবিত ফিরে গিয়ে সেনাপতি নেডহার্টকে জানাতে পারে যে, ইমাম শামিল স্বয়ং তমীরখানশুরা আক্রমণে সেনাপতিত্ব করেছেন। দুর্গে অবস্থানরত রুশ সেনারা নিজেদের সামলে নেয়ার আগেই ঈগল বাহিনী পলকের মধ্যে উধাও হয়ে যায়।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন সেনাপতি নেডহার্ট। তার উলইয়ামী আক্রমণের স্বপ্ন তো ধূলিসাৎ হলোই, পাশাপাশি ইমাম শামিলের তমীরখানশুরা আক্রমণ তার মুখে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। সেনাপতি নেডহার্ট কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন, এক কাবায়েলী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথা কাটছে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে তীব্রবেগে ইমাম শামিলের নিকট গিয়ে কর্তিত মাথাটা তাঁর পায়ে ছুঁড়ে মারছে। ইমাম শামিল বলছেন, আমি তো তার মাথার বিনিময়ে একটি কানাকড়িও দেয়ার কথা ঘোষণা করিনি। তারপরও তুমি এ বোঝা বহন করতে গেলে কেনো? জবাবে কাবায়েলী আদবের সঙ্গে বলছে, শুধু এটুকু দেখানোর জন্য যে, যে মাথা আমাদের ইমামের মাথার বিনিময়ে সোনা পুরস্কার দেয়ার পরিকল্পনা এঁটেছে, সেই মাথা আপন জায়গায় বহাল থাকা উচিত নয়।

সেনাপতি নেডহার্ট আবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে এ কল্পনা ছুঁড়ে ফেলে বিড় বিড় করে ওঠেন– 'না, এমনটি হবে না। সোনায় শক্তি আছে, আকর্ষণ আছে। তা প্রমাণ করে দেখাবো আমি।'

সেনাপতি নেডহার্টের তিন তিনটি অভিযানই শোচনীয়রূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দিশা হারিয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন তিনি। ইত্যবসরে শাহী ফরমান এসে পৌঁছে তার নিকট– 'এই দুর্ধর্ষ বিদ্রোহীর– ইমাম শামিলের– মূল আস্তানা দাগেস্তানে। তাই দাগেস্তানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে এর গোড়া কেটে দাও। দেখবে, এর যেসব শাখা-প্রশাখা চেচনিয়া ও আওয়ারে ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলো আপনা-আপনিই শুকিয়ে যাচ্ছে। বাইশ হাজার পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ সেনা পূর্ব থেকেই তোমার কাছে রয়েছে। তোমার প্রতিপক্ষের কাছে একটি তোপও নেই। ছোটও নয়, বড়ও নয়। তোমার সৈন্য বিপুল, অস্ত্র বেশি। আমি ফলাফলেরও আশা রাখি ততো বড়। ১৮৪৪-এর ডিসেম্বর নাগাদ যেভাবে হোক বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ

নির্মূল করে ফেলো। এক বছর সময় কম নয়।'

নেডহার্ট তার অধীন অফিসারদের বৈঠক তলব করেন এবং বললেন– 'ছাব্বিশ ব্যাটালিয়ন সাধারণ সেনা কাস্‌ক রেজিমেন্ট ও চল্লিশটি বড় তোপ কয়েক দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু শাহেনশাহ আমাদেরকে এক বছরের সময় দিয়েছেন। এক বছরের মধ্যে যদি আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে না পারি, তাহলে আমাদের মন্দ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আপনারা সঠিক পরামর্শ দিন, কর্মপদ্ধতি ঠিক করুন।'

সেনাপতি পাস্ক বললেন, আমরা লড়াই করবো, জীবনের বাজি লাগাবো। কিন্তু কিছুদিন হল ইমাম শামিল তার কৌশল পরিবর্তন করে নিয়েছে। আমাদের বাহিনী মাসের পর মাস সফর করে পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে এক স্থানে পৌঁছে, তো শামিল চলে যায় অন্য জায়গায়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর গন্তব্যে পৌঁছে আমরা শিকারের নাগাল পাই না। আমাদের আসা-যাওয়া সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এভাবে অহেতুক যাওয়া-আসায় আমাদের সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে; সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ছে।

নেডহার্ট বললেন, আসলে বিদ্রোহের এ নেতাটাকে কোনোভাবে কাবু করতে পারলেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। শামিলকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করতে পারলে আর কেউ আমাদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার সাহস পেতো না।

শাহজাদা ভুলগোরকী বললেন, ইংরেজরা এই বিধর্মীদের যে অঞ্চলেই গিয়েছিলো, সেখানেই তারা বিদ্রোহী সেনাদের তাদেরই লোক দ্বারা ধ্বংস করিয়েছিলো। আমরাও কি সে কৌশল অবলম্বন করতে পারি না?

সেনাপতি নেডহার্ট বললেন, লোকটার কাছে এমন কি মহল-প্রাসাদ, সোনা-রূপা আছে যে, মানুষ তা অর্জন করার জন্য তার সঙ্গে গাদ্দারী করবে? আমরাই বা কোন্ তাজ-তখত দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে দলে ভেড়াবার চেষ্টা করবো? লোকটা নিতান্ত সরল-সহজ জীবনযাপন করে এবং সাধারণ ঘরে ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো বাস করে। তবে এ ব্যাপারে আমি একটি পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছি। সময়মতো আপনারা সবকিছু জানতে পারবেন। এ মুহূর্তে আমাদের সামরিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা দরকার।

সেনাপতি পাস্ক বললেন, শামিলকে ঘায়েল করার একটিই মাত্র পন্থা। তাহলো, কাস্‌ক রেজিমেন্টগুলো তাদের বিদ্যুদ্গতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তাকে কোনো এক স্থানে ঘিরে ফেলবে। তারপর অবশিষ্ট সৈন্যরা জায়গাটা অবরোধ করে তাকে কাবু করে ফেলবে। যেমনটি করা হয়েছিলো উখলগুতে।

শাহজাদা ভুলগোরকী বললেন, কিন্তু সে তো উখলগুর শক্ত অবরোধ থেকেও বেরিয়ে গিয়েছিলো।

সেনাপতি নেডহার্ট বললেন, তা ঠিক তবে পুনরায় সংগঠিত হয়ে আমাদের মোকাবেলায় আসতে তার সময় লেগেছে একটি বছর। এখন যদি আমরা তাকে আরেকবার ঘিরে ফেলতে পারি– ঠিক উখলাগুর ন্যায়, তাহলে শাহেনশাহ'র আকাঙ্খা পূরণ হবে অবশ্যই। পরে কী হবে তা সময়মতো দেখা যাবে। সেনাপতি পাস্ক! গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করুন এবং কাসৃক রেজিমেন্টগুলোকে সতর্ক রাখুন, যাতে যথাসময়ে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে বিদ্রোহীটাকে ঘেরাওয়ে নিয়ে আসা যায়।

বৈঠক মুলতবী হওয়ার পর এক তাতারী গুপ্তচর সেনাপতি নেডহার্টের দফতরে প্রবেশ করে এবং বলে, 'সোনিতরিতে শামিলের মুখডাকা এক ভাই বাস করে। নাম তার শোয়াইব। সেখানকার সরদার গবেশের সঙ্গে তার পুরনো শত্রুতা রয়েছে। শোয়াইব গবেশের ছোট এক ভাইকে হত্যা করেছিলো। আঞ্চলিক রীতি মোতাবেক শোয়াইবকে হত্যা করা কিংবা তার থেকে রক্তপণ নেয়া গবেশের বৈধ অধিকার। কিন্তু শোয়াইবের মুখডাকা ভাই শামিলের শক্তিতে গবেশ ভীত ও নীরব।'

ঃ আচ্ছা, সেখানে কি আমরা এমন কিছু লোক পাবো, যারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য গবেশকে উত্তেজিত করে তুলবে? প্রয়োজন হলে আমরা তাদেরকে আর্থিক সাহায্যও প্রদান করবো।

ঃ হ্যাঁ, এমন লোক পাওয়া যাবে।

সেনাপতি নেডহার্ট আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং অন্য এক কক্ষে গিয়ে একটি লোহার বাক্স খুলে দু'টি থলে বের করে আনেন। থলে দু'টি গুপ্তচরের হাতে দিয়ে বললেন, একটি তোমার আর একটি তাদের। আমার কাছে সোনার অভাব নেই। তবে কাজ সন্তোষজনক হওয়া চাই।

কিছুদিনের মধ্যে সোনিতরিতে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়– 'গবেশের কোনো আত্মমর্যাদাবোধ নেই। লোকটার মুরোদ শেষ হয়ে গেছে। তার স্ত্রীটারই বা হলো কী যে, বেচারী এমন একটা অপদার্থের সঙ্গে ঘর করছে! দেখবে, গবেশের মেয়েদেরকে কোনো পুরুষ বিয়ে করবে না; পিতার কাপুরুষতা কন্যাদের ভুগিয়ে ছাড়বে।'

কথাগুলো ধীরে ধীরে গবেশের কানে পৌঁছতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে এর প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়ে যায়। কোনো কোহেস্তানী কাবায়েলী আত্মমর্যাদাবোধহীনতার অভিযোগ সহ্য করতে পারে না। তবে গবেশ এরপরও হয়তো নীরব থাকতো; কিন্তু তার যুবক পুত্র পিতার নামে এসব তিরস্কার শুনে শুনে ক্ষেপে ওঠে এবং পিতাকেও ক্ষিপ্ত করে তোলে। অবশেষে একদিন সুযোগ পেয়ে পিতা-পুত্র মিলে শোয়াইবকে হত্যা করে ফেলে।

শোয়াইব নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সেনাপতি নেডহার্ট পুনরায় তার বাক্স খোলেন এবং আশরাফী ভর্তি কয়েকটি থলে বের করে সোনিতরী পাঠিয়ে দেন।

এবার তার আঁটা পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়ন করার পালা। নেডহার্টের গুপ্তচরের নিয়োজিত লোকেরা গবেশকে বুঝাতে শুরু করে, শামিল তোমার বংশের একজনকেও জ্যান্ত রাখবে না। বাঁচতে হলে তোমাকে পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাহলো, শামিলকেও তোমার হত্যা করতে হবে।

গবেশ সোনাতরী থেকে পালিয়ে রুশীদের নিকট আশ্রয় নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। আবেদন পাঠায় নেডহার্টের কাছে। কিন্তু নেডহার্ট বলে পাঠান, যদি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তুমি এ আবেদন করতে, তাহলে সন্তুষ্টচিত্তে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতাম। এখন তোমাকে আশ্রয় দেয়ার অর্থ হবে, আমরাই তোমাকে দিয়ে শোয়াইবকে হত্যা করিয়েছি। শাহেনশাহ কোনক্রমেই বিষয়টি সমর্থন করবেন না। নিজ এলাকায় অবস্থান করে তুমি যতো রকম সাহায্য প্রার্থনা করবে, আমরা তা দেবো। সৈন্য, সোনা-রূপা, যা চাইবে আমরা সবই দিতে প্রস্তুত।

ইমাম শামিলের নিকট শোয়াইবের শাহাদাতের সংবাদ এসে পৌঁছে। তিনি মর্মাহত হন এবং শোয়াইবের কবরের কাছে এসে তার মাগফিরাতের দু'আ করবেন বলে স্থির করেন। অল্প ক'জন মুরীদ নিয়ে তিনি সোনিতরি অভিমুখে রওনা হন।

রুশীদের গুপ্তচর ও গোমস্তারা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে গবেশকে একথা বুঝাবার জোর প্রচেষ্টা চালায় যে, তুমি যদি শামিলকে হত্যা না করো, তাহলে সে তোমার গোটা বংশকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।

কয়েকদিন পর ইমাম শামিল সোনিতরী পৌঁছেন। সর্বাগ্রে তিনি কবরস্তানে গিয়ে শোয়াইবের কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে মাগফেরাতের দু'আ পাঠ করেন। তারপর তিনি সোনিতরীর মসজিদে যান এবং মসজিদের বাইরে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন–

'প্রতিশোধ গ্রহণ জাহেলী যুগের প্রথা। আমাদের নবীজি (সা.) কয়েকশ বছর আগেই এ প্রথা নির্মূল করে গেছেন। কিন্তু অত্র অঞ্চলে সে প্রথা এখনোও বহাল আছে দেখছি। গবেশের দাদা শোয়াইবের পিতাকে হত্যা করেছিলো। শোয়াইব হত্যা করেছে গবেশের ভাইকে। এখন গবেশ খুন করলো শোয়াইবকে। তার মানে শোয়াইবের আত্মীয়-স্বজনরা গবেশ থেকে অবশ্যই এর বদলা নেবে। আমি শোয়াইবের মুখডাকা ভাই। কিন্তু এ কুপ্রথা বহাল রাখাকে ইসলামবিরোধী কাজ মনে করি। তবে শোয়াইবকে যারা হত্যা করেছে, তাদের উপযুক্ত বিচার হওয়া চাই। আজ রাতে আমি আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়ে দু'আ করবো, যেনো তিনি আমাকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। সোনিতরির জনগণ। তোমরাও

এ ব্যাপারে চিন্তা করো। আগামীকাল সকালে এর ফয়সালা ঘোষণা করা হবে। গবেশকে বলে দাও, তার প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।'

রুশীদের চর গোমস্তারা গবেশ ও তার পুত্রদের উস্কানি দেয়, যদি এ রাতের আঁধারেই তোমরা কার্যসিদ্ধি করতে না পারো, তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে কঠোর নির্যাতনে দিয়ে হত্যা করা হবে। গোমস্তারা এ কথাও বলে, ইমামের একটি বাহিনী সকাল পর্যন্ত এসে পৌঁছুবে। তারপর সোনিতরির সকল বাসিন্দাকে শোয়াইব হত্যার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইমাম শামিল নিজে ঈশার নামাযের ইমামতি করেন। মুরীদগণ ছাড়া এলাকার আম-জনতাও ইমামের পেছনে জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় করে। নামায শেষ হলে ইমাম শামিল মসজিদে বসে দু'আ-দরূদে নিমগ্ন হন। মুরীদগণ মসজিদের বারান্দায় নফল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। ইমাম শামিল ও তাঁর মুরীদগণ ছাড়া মসজিদে এখন আর কোনো মানুষ নেই।

নামাযের পর কেটে গেছে অনেক সময়। হঠাৎ তিনজন লোক কালো চাদর মুড়ি দিয়ে ধ্যানমগ্ন ইমাম ও তাঁর মুরীদদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকে পড়ে মসজিদে। একস্থানে মসজিদের দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে জড়সড় হয়ে বসে পড়ে লোকগুলো। তারা গবেশ ও তার দু'পুত্র।

মধ্যরাতের পর দেয়াল ঘেঁষে বসে থাকা লোকগুলো উঠে ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করে। হঠাৎ পা ফস্‌কে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় গবেশ। মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে যান ইমাম। ধ্যান ভেঙে মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কে? ইত্যবসরে গবেশের পুত্র খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ করে বসে ইমামের উপর। ঝাঁপিয়ে পড়ে বাকি তিনজনও। ইমাম শামিল আক্রমণকারীদের চিনেন না; জানেন না তারা সংখ্যায় ক'জন। তিনি আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছেন; লাথি মেরে একজনকে ফেলে দেন নীচে। ঘাড়ে পা রেখে চেপে ধরে রাখেন তাকে। ইতিমধ্যে ইমামের ঘাড়ে খঞ্জরের আঘাত হানে আরেকজন। ইমামের এক হাত ও ঘাড় জখম হয় এ আঘাতে। তারপরও ইমাম নীচে চেপে রাখা লোকটাকে কাবু করে রেখে অন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইমাম সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

এতোক্ষণে পরিস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে আসে ইমামের মুরীদগণ। দ্রুত প্রদীপ জ্বালায় তারা। দেখে, ইমামের একপা গবেশের এক পুত্রের ঘাড়ে। দু'হাতে ঝাপটে ধরে রেখেছেন অপর পুত্রের গলা। আর অপর পায়ে লাথি মেরে প্রতিহত করছেন গবেশের আক্রমণ। বিনা অস্ত্রে লড়াই করছেন সশস্ত্র তিন ঘাতকের সঙ্গে। ইমামের ঘাড়, হাত, এক কাঁধ ও উরুদ্বয় জখম হয়ে গেছে। মুরীদগণ মুহূর্তের মধ্যে তিন সন্ত্রাসীকে কাবু করে ফেলে এবং ইমামের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করে।

সোনিতরির জনগণ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। গবেশ ও তার পুত্ররা যে দুশমনের প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে কাফকাজের মুক্তিদূত ইমাম শামিলকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়িয়েছে, তারা জানে না। এই গভীর রাতে জেগে আছে শুধু ইমামের ক'জন মুরীদ। তাদের কেউ ইমামের সেবা-শুশ্রূষায় রত। কেউ আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদাবনত হয়ে ফরিয়াদ করছে, এলাহী! তুমি আমাদের ইমামকে রক্ষা করো। ইমাম শামিলকে যদি তুমি আজ নিয়ে যাও, তাহ্‌লে কাফকাজে তোমার দীন ও কুরআনের সংরক্ষণে লড়াই করার মতো কেউ থাকবে না।

জখম ও রক্তক্ষরণে ইমাম শামিল দুর্বল হয়ে পড়লেও জ্ঞান হারাননি। মুরীদদের আদেশ করেন, আশংকা দূর হয়েছে বলে মনে হয় না। জানি না, সোনিতরির মানুষের উদ্দেশ্য কী। তোমরা জলদি করে বাহিনীকে সংবাদ দাও।

দু'টি ঘোড়ায় যিন বাঁধে দু'জন মুরীদ। পিঠে চড়ে তারা তীরবেগে ঘোড়া হাঁকায়। ভোর হতে না হতেই এক হাজার মুরীদের একটি বাহিনী সোনিতরির মসজিদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। গবেশ, তার দুই পুত্র ও তার আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত সোনিতরির সব মানুষ মসজিদের বাইরে দণ্ডায়মান। ইমামের নির্দেশের অপেক্ষা করছে তারা। বিশ্বাসঘাতকের নির্মম শাস্তি সম্পর্কে যদিও সকলে অবহিত, তবু এ মুহূর্তে ইমাম কি আদেশ করবেন, তা কেউ জানে না।

ইমাম শামিলের এক নায়েব আসলামী খান মসজিদের বাইরে আসেন এবং উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, গবেশ ও তার পুত্ররা আমাদের ইমামের মুখডাকা ভাই শোয়াইবকে হত্যা করেছিলো। ইমাম শরীয়ত অনুযায়ী তার বিচার করতে চেয়েছিলেন। রাতে তিনি আল্লাহর দরবারে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ ঐ অভিশপ্তরা হত্যা করার উদ্দেশ্যে ইমামের উপর আক্রমণ করে বসে। এমতাবস্থায় গবেশ ও তার পুত্ররা যে গাদ্দার এবং দুশমনের চর, সে ব্যাপারে কি আপনাদের কারো দ্বিমত আছে? তারা শোয়াইবকেও শুধু এ উদ্দেশ্যেই হত্যা করেছিলো যে, ইমাম শামিল তার কবর জেয়ারত করতে আসবেন আর সে সুযোগে তারা ইমামকে হত্যা করে ফেলবে।

ইমাম শামিল গাদ্দারদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। যে জাতি দেশদ্রোহী, ঈমান বিক্রেতা গাদ্দারদের শাস্তি দেয় না, সে জাতি মূলত নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করে। যে জাতি বিশ্বাসঘাতকতাকে ঘৃণ্য ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে প্রমাণিত করতে পারে না, সে জাতির মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি হতেই থাকে। যারা মানুষের ইমাম হয়ে গাদ্দারদের শাস্তি দেয় না, তারা দেশে এক ঘৃণ্য রীতিই প্রবর্তন করে, যা একটি জাতির জন্য আত্মঘাতির নামান্তর।

গাদ্দারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। গবেশ, তার দু' পুত্র ও দু' চাচাতো ভাইকে এবং শোয়াইবকে হত্যার জন্য যারা গবেশকে উস্কানি দিয়েছিলো, তাদের সকলকে এক

সারিতে দাঁড় করানো হয় এবং ইমাম শামিলের নির্দেশে তরবারীর আঘাতে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়।

সোনিতরির বাসিন্দারা তাদের এলাকায় এদের লাশ দাফন করতে অস্বীকৃতি জানায়। ইমাম শামিলের মুরীদরা লাশগুলোকে তুলে সোনিতরির বাইরে এক স্থানে নিয়ে ফেলে দেয়। সে থেকে স্থানটি 'গাদ্দারদের সমাধি' বলে আখ্যা পায়।

ইমাম শামিলের মুরীদগণ গাদ্দারদের লাশগুলোকে ফেলে ফিরে আসতে না আসতে পাঁচ অশ্বারোহী তীব্রবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে বস্তিতে প্রবেশ করে। গতি তাদের মসজিদ অভিমুখে। ইমাম শামিল এখনো মসজিদে অবস্থান করছেন। মসজিদের এক কক্ষে তাঁর শুশ্রূষা চলছে। মসজিদের বাইরে ইমামের সৈনিকগণ প্রস্তুত দণ্ডায়মান। পাঁচ অশ্বারোহী নিকটে চলে আসলে ইমাম শামিলের নায়েব আসলামী খান সামনের জনকে চিনে ফেলেন। লোকটি হাজী মুরাদ। আসলামী খানের নির্দেশে মুরীদগণ আগন্তুকদের সব ক'জনকে ঘিরে ফেলে। আসলামী খান হাজী মুরাদকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি রাশিয়ানদের সুহৃদের আগমনের হেতু জানতে চাই।

ঃ আমি আমার ভুলের জন্য অনুতপ্ত। রুশীদের বন্ধুত্ব আমাকে আযাদীর মূল্য ও গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, ভিনদেশি শাসক কখনো দেশের জনগণের আপন হয় না। তারা উদ্দেশ্য হাসিল করা পর্যন্তই বন্ধুত্বের সবুজ বাগান দেখাতে থাকে। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে তাদের বোল-ভাষা বদলে যায়, তাদের চোখ প্রভুর চোখে পরিণত হয়।

ঃ আপনার বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকলে তার প্রমাণ?

ঃ প্রমাণ দেবে ভবিষ্যৎ। আমি কার্যত রুশীদের হাতে বন্দি ছিলাম। গোলামীর জিঞ্জির ভেঙে আযাদীর সন্ধানে পালিয়ে এসেছি। ইমাম শামিলের একজন সাধারণ সৈনিক হয়ে আমি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। আপনি আমাকে একটিবারের মতো ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ করে দিন; তিনি আমাকে যে খেদমতের আদেশ দেবেন, একাগ্রচিত্তে তা পালন করার জন্য আমি নিজেকে ওয়াক্ফ করে দেবো।

হাজী মুরাদকে ইমাম শামিলের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছু বলতে উদ্যত হন তিনি। কিন্তু ইমাম শামিল হাতের ইশারায় তাকে বলতে নিষেধ করে বললেন– তুমি একজন সাহসী মানুষ। ফিরে এসেছো এ-ই তো অনেক। এখন তোমার ইচ্ছে কী বলো।

ঃ মহামান্য ইমাম! আমি আপনার নেতৃত্বে লড়াই করে রুশীদের থেকে আমার অপমানের প্রতিশোধ নেবো।

ঃ হাজী মুরাদ! তুমি আজ থেকে এ মুহূর্ত থেকে আমার এক নম্বর নায়েব।

এক্ষুনি তোমার অধীন সৈন্যদের নিয়ে পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলো। দু'-তিন দিনের মধ্যে আমি তোমাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবো।

❁ ❁ ❁

যে সময়ে সোনিতরিতে ইমাম শামিল ও হাজী মুরাদের এসব কথোপকথন চলছিলো, ঠিক তখন তমিরখানশুরায় সেনাপতি নেডহার্ট তার দফতরে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়ে গেছেন, সংহারী আক্রমণ সত্ত্বেও ইমাম শামিল বেঁচে আছেন এবং আক্রমণকারী ও তাদের সহযোগীরা প্রাণ হারিয়েছে। নেডহার্ট আরো জানতে পারেন, হাজী মুরাদ স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছে। হাজী মুরাদ একজন দুঃসাহসী, গোঁড়া ও যুদ্ধবাজ মানুষ। সে ইমাম শামিলের সঙ্গে যোগ দিলে দক্ষিণ ও পশ্চিম দাগেস্তানের মানুষ জানপ্রাণ দিয়ে ইমামের দলে ভিড়ে যাবে। তারা আদিরিয়ার খানম ও হামজা বেগের লড়াইয়ের ফলে সৃষ্ট তিক্ততাকেও ভুলে যাবে। কী যেনো ভাবতে ভাবতে নেডহার্ট হঠাৎ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং মেজর জেনারেল দানিয়েল বেগকে ডেকে পাঠান। দানিয়েল বেগ সেনাপতি নেডহার্টের কক্ষে প্রবেশ করে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়।

ঃ দানিয়েল বেগ! (আয়েসুর গবর্নর) আমি তোমার প্রজাতন্ত্রে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করছি।

ঃ কেনো স্যার?

ঃ বিদ্রোহীরা শক্তিশালী হতে চলেছে। তাদেরকে কোণঠাসা করে রাখতে হলে দক্ষিণ দাগেস্তানেও আমাদের সৈন্য থাকা প্রয়োজন, যাতে বিদ্রোহীরা আমাদের চাক্কির পাটায় এসে যায়।

ঃ তার মানে আমার প্রজাতন্ত্রে কার্যত আপনারই কর্তৃত্ব চলবে।

ঃ তাতে অসুবিধা কী? তুমি আমার বন্ধু।

ঃ চুক্তি অনুযায়ী আমার প্রজাতন্ত্রের শাসক আমি। আপনি আমার প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। আমি তো কেবল প্রজাতন্ত্রের বাইরে আপনার মর্জি মোতাবেক কাজ করতে বাধ্য।

ঃ দানিয়েল বেগ! চুক্তি পবিত্র সহীফা তো আর নয়! দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয় সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে। পরিস্থিতি বদলে গেলে চুক্তির আবশ্যকতাও শেষ হয়ে যায়। তোমার প্রজাতন্ত্রে সৈন্য প্রেরণ করা আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে দানিয়েল বেগ প্রথমে উর্দির ফিতা খুলে ফেলেন। তারপর উর্দিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। সেনাপতি নেডহার্ট অধীনদের আদেশ করেন— 'দানিয়েলকে গ্রেফতার করে ফেলো। লোকটি শাহী ফৌজের উর্দির অবমাননা করে মহারাজের মানহানি করেছে।'

কিন্তু দানিয়েল এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া হয়ে যান। রুশ অফিসার পেছন থেকে তাকে ধাওয়া করে। কিন্তু ততোক্ষণে তিনি চলে গেছেন বহু দূর।

পথে দানিয়েল বেগ জানতে পারেন, ইমাম শামিল সোনিতরিতে অবস্থান করছেন এবং হাজী মুরাদও সেখানে আছেন। দানিয়েল বেগ সোজা সোনিতরি গিয়ে উপনীত হন এবং ইমাম শামিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। সাদা চামড়াওয়ালাদের কাছে ওয়াদাখেলাপী, প্রতারণা, জুলুম সবই বৈধ। নিজের কৃতকর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত। আপনার অবস্থানই সঠিক মহামান্য ইমাম! আজ থেকে আপনি আমার প্রজাতন্ত্রকেও আপনার এলাকা বলে মনে করবেন। আপনি বললে আপনার নেতৃত্বে আমি সাদা চামড়াওয়ালাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত।

ঃ সকালের পথভোলা ছেলে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এলে তাকে দেউলিয়া বলা যায় না। তাওবার দরজা সব সময়ই উন্মুক্ত। তুমি যদি আমার কাঁধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করো, তাহলে আমি খুশীই হবো। কিন্তু তুমি আয়েসুর রাজা। প্রথমে নিজের রাজ্যে যাও; পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রজাদের অবহিত করো, তাদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত করো। যখন বুঝবে, প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, তখন এসে আমাকে সংবাদ দিও।

দানিয়েল বেগ তার প্রদেশের রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছেন এবং জনসাধারণকে একস্থানে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি পবিত্র কুরআন মাথায় নিয়ে জনতার সমারেশে এসে উপস্থিত হন। বললেন– 'বন্ধুগণ! আপনারা জানেন, আমি জগতের সব সুখ উপভোগ করেছি। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের সব উপকরণ আমার আছে। সম্পদ-সম্মান, সুনাম-শক্তি কোনো কিছুরই আমার অভাব নেই। কিন্তু আজ আমি (পবিত্র কুরআনকে দু' হাতে ধরে চুমু খেয়ে) এ পবিত্র কিতাবের কসম খেয়ে ঘোষণা করছি, আমি আমার অবশিষ্ট জীবনকে আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যয় করবো। এ মুহূর্ত থেকে শাহাদাতই হবে আমার জীবনের পরম কাম্য। আমি আমার এ মাতৃভূমির দুশমনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম; তার জন্য আমি অনুতপ্ত। ইমাম শামিল আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। এখন আমি তাঁর নেতৃত্বে জিহাদ করে মাতৃভূমির আযাদীর জন্য জীবন উৎসর্গ করবো। আপনারাও আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করুন।'

আয়েসুর রাজা দানিয়েল বেগের ইমাম শামিলের সঙ্গে যোগ দেয়ায় কাফকাজে রুশদের মর্যাদায় প্রচণ্ড এক আঘাত লাগে। তার অন্যতম কারণ, দানিয়েল বেগ রুশদের পুরনো সহযোগী এবং পরম বিশ্বস্ত। জারের সন্তুষ্টি অর্জনে তিনি কোনো ত্রুটি করেননি। দানিয়েল বেগ ছিলেন সমগ্র কাফকাজে রাশিয়ানদের অন্যতম অনুগত ব্যক্তিত্ব।

রুশ ছাউনি থেকে দানিয়েল বেগের পলায়ন সকলকে প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তোলে। প্রশ্ন জাগে, দানিয়েল বেগের ন্যায় পরীক্ষিত ওফাদারের সঙ্গেই যখন সম্পর্ক বহাল রাখা গেলো না, তাহলে আর কার সহযোগিতায় আমরা বিজয় অর্জন করবো? তাছাড়া আরো একটি বিষয় রুশদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যুদ্ধ তখন এক স্পর্শকাতর পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। ইমাম শামিল রুশদের সঙ্গে টক্কর দেয়ার শক্তি অর্জন করে ফেলেছেন। যুদ্ধ এখন নিক্তির অবস্থা ধারণ করেছে। একবার এ দলের পাল্লা ঝুঁকে যায় তো আবার অপর দলের পাল্লা ভারী হয়।

দানিয়েল বেগের ইমাম শামিলের সঙ্গে যোগ দেয়ায় এখন ইমামের পাল্লাই অধিক ভারী। ১৮৪৪ সালের মাঝামাঝিতে কাফকাজের লড়াইয়ে ইমাম শামিলের পাল্লা সত্যিই ভারী হয়ে গিয়েছিলো। সেনাপতি নেডহার্ট ও সেনাপতি পাস্ক কাস্‌ক রেজিমেন্টগুলোর সহায়তায় দু'-তিনবার প্রচণ্ড আক্রমণও চালিয়েছিলো এবং কাস্‌ক সেনারা বাস্তবিকই বিস্ময়কর বীরত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলো। কিন্তু স্রোত যেভাবে খড়কুটো ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ইমাম শামিলের পাল্টা আক্রমণ রুশদের অর্জিত সাফল্যসমূহকে তেমনি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জার নেডহার্টকে ১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু ডিসেম্বরের আগেই জুলাইয়ের শেষদিকে জার তাকে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। জার দেখছিলেন, বারবারের ব্যর্থতার ফলে নেডহার্ট মনোবল হারিয়ে ফেলেছেন এবং নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য অস্বাভাবিক বীরত্ব প্রদর্শন করে চলছেন, যা রুশ সেনাদের পক্ষে আরো ব্যাপক ধ্বংসাত্মক বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

সেনাপতি নেডহার্ট যেদিন তমীরখানগুরা থেকে বিদায় নিয়ে সেন্টপিটার্সবার্গ অভিমুখে রওনা হন, সেদিনই ইমাম শামিল তার নিয়ম অনুযায়ী নেডহার্টকে একটি পত্র লিখেন। একজন ঘোড়সওয়ার রুশ দুর্গের সম্মুখে আচমকা আত্মপ্রকাশ করে, যেনো লোকটা মাটি ফুঁড়ে ওঠে এসেছে কিংবা আকাশ থেকে অবতরণ করে দুর্গের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সান্ত্রী কিছু বুঝে ওঠতে না ওঠতেই লোকটা গোলাকার একটি কাষ্ঠখণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। গোলাকার এই কাঠের খোলে সেনাপতি নেডহার্টের নামে লেখা ইমাম শামিলের একখানা পত্র। সান্ত্রী পত্রটি অফিসারদের মারফত নেডহার্টের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। সেনাপতি নেডহার্ট পত্রখানা খুলে পড়তে শুরু করেন—

মহান সেনাপতি! তোমার জন্য আমার বড় মায়া হচ্ছে। তুমি আমার মাথার ওজনের সমান সোনা বহু দূর থেকে বহন করে এনেছিলে। আর এখন সেই বোঝা আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছো। হায়, যদি তোমার বোঝাটা হাল্কা হয়ে যেত! গবেশ ও তার পুত্ররা আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তোমার বোঝাটা হাল্কা করতে পারলো না। সেনাপতি নেডহার্ট! তুমি ইতিমধ্যেই হয়তো বুঝে ফেলেছো, যারা নিজেদের

মাথা হাতে করে ঘুরে বেড়ায়, তাদের মাথা কেউ কাটতে পারে না...।

-ইতি

শামিল'

পত্রখানা পাঠ করেই নেডহার্ট দ্রুত তা পকেটে পুরে রাখেন এবং ভগ্নহৃদয়ে তিবলিসগামী শটকে উঠে বসে পড়েন।

নেডহার্টের চলে যাওয়ার পর সেনাপতি পাস্ক অস্থায়ী কমান্ডার নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প ক'দিন পরই তিবলিসে সংবাদ আসে, শাহেনশাহ সেনাপতি অরনেস্টভকে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের কমান্ডার ইন-চীফ এবং দক্ষিণ রাশিয়ার ভাইসরয় নিযুক্ত করেছেন। অরনেস্টভ এ দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে শর্ত আরোপ করেছেন, তিনি শুধু শাহেনশাহ'র কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন এবং তিনি তার কাজে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ সহ্য করবেন না। শাহেনশাহ তার এ শর্তগুলোকে বিবেচনা করে দেখছেন।

অরনেস্টভের নাম শুনে রুশ সেনারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁতে আঙুল কামড়িয়ে থ মেরে বসে পড়ে। অরনেস্টভ! বুড়ো শিয়াল! রাজবংশের পর রুশ সাম্রাজ্যের সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিত্বশীল এক সদস্য। মান্যবর সেনাপতি! তিনি পাঁচ বছর আগে ষাট বছর বয়সে এ কারণে ইস্তফা দিয়েছিলেন যে, শাহেনশাহ তার সামরিক পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এবার শাহেনশাহ সেই লোকটিকে তলব করতে বাধ্য হলেন!

সতেরো.

ইমাম শামিল পুনরায় কাফকাজের বিশাল এক অঞ্চলের সর্বজনস্বীকৃত শাসক ও জননেতায় পরিণত হন। উখলগুর পরাজয়ের দাগও মুছে গেছে এতোদিনে। সেনাপতি গ্রেব ও নেডহার্ট লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। কিন্তু ইমাম শামিলের প্রাণপ্রিয় সহধর্মিনী ফাতেমার স্বাস্থ্য দ্রুতগতিতে ভেঙে যাচ্ছে। পুত্রের বিরহ-ব্যাথা ভেতরে ভেতরে ঘুণের মতো কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে তাকে। ইমাম তাঁর পুত্রহারা স্ত্রীর মনের ব্যথা বোঝেন। জামালুদ্দীনের বিরহে ছটফট করছে তাঁর নিজের মনটাও। তবু তিনি পুরুষ– বীর যোদ্ধা। নিজের ব্যাথাকে লুকিয়ে রেখে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন– 'দুঃখ করো না, জামালুদ্দীন অচিরেই ফিরে আসবে।

কিন্তু মায়ের মন স্থির হতে পারছে না কোনক্রমেই। ইমামের সান্ত্বনা বাণীর জবাবে ফাতেমা বলেন– 'আল্লাহ যদি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিতেন, তবেই আমি শান্ত হতে পারতাম। এখন আমি কিভাবে ধৈর্যধারণ করি; আমার কলিজার টুকরো যে দুশমনের হাতে বন্দি! জানি না, তারা আমার মাসুম পুত্রের সঙ্গে কেমন আচরণ করছে।' এই বলে অঝোরে কেঁদে ওঠেন ফাতেমা। পুত্র জামালুদ্দীনের

শোক মা ফাতেমাকে আস্তে আস্তে দুর্বল করে তোলে। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন ইমাম-পত্নী ফাতেমা।

জামালুদ্দীনকে অতি দ্রুত উদ্ধার করে আনার জন্য দুঃসাহসী এক পরিকল্পনা হাতে নেন ইমাম শামিলের নায়েব ও মুরীদগণ। রুশ অধিকৃত ভূখণ্ডে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ঢুকে ডজন ডজন রুশ অফিসার ধরে আনেন তারা। জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও মংগ্রেলিয়ার কয়েকজন শাহজাদা-শাহজাদীকেও বন্দি করেন ইমাম শামিলের দুর্ধর্ষ নায়েব-মুরীদগণ। কিন্তু তাতে জারের কানে পানি ঢোকে না মোটেও। যখনই তাঁকে কেউ পরামর্শ দেয়, মহারাজ! জামালুদ্দীনকে ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের বন্দিদের মুক্তির বিষয়টি একটু ভাবুন, তখন জার সিদ্ধান্তের সুরে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, না, এক হাজার শাহজাদা-শাহজাদীও যদি বন্দি হয়, তবু জামালুদ্দীনের সঙ্গে তাদের বিনিময় হবে না। জামালুদ্দীন আমার পরিকল্পনা অনুসারেই পিতার সম্মুখে যাবে।

ইমাম শামিল ও তাঁর নায়েবগণ অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, স্বয়ং জার নেকুলাইকে যদি বন্দি করা যায়, তবেই শুধু জামালুদ্দীনকে উদ্ধার করা সম্ভব– অন্যথায় নয়।

জার নেকুলাইকে গ্রেফতার করাও তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু ১৮৩৭ সালের পর জার এ পর্যন্ত তিবলিসের পথে পা রাখেননি একবারও।

কলিজার টুকরা পুত্র জামালুদ্দীনকে এক নজর দেখার এবং শেষবারের মতো বুকে জড়িয়ে ধরার বেদনা বুকে নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন ফাতেমা।

হৃদয়ে আরেকটি প্রচণ্ড আঘাত পান ইমাম শামিল। কিন্তু 'আল্লাহর ইচ্ছা এমনই ছিলো' বলে তিনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

ফাতেমার মৃত্যুর কিছুদিন পর ইমাম শামিলের এক নায়েব আওয়ার্দী মুহাম্মাদ তার ঝটিকা বাহিনী নিয়ে তিবলিসের উপকণ্ঠে এক রুশ অধিকৃত অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। বন্দি করে আনে বেশ ক'জন পুরুষ ও নারীকে। সেই বন্দিদের একজন হলো আর্মেনিয়ার বিশিষ্ট এক ব্যবসায়ীর কন্যা শেয়ানত। শেয়ানত ফাতেমারই ন্যায় দীর্ঘকায় ও সুন্দরী এক যুবতী।

শত্রুর হাতে বন্দিত্ববরণের কারণে সকল কয়েদি স্বভাবত বিমর্ষ। কিন্তু শেয়ানত অস্বাভাবিক রকম উৎফুল্ল। আওয়ার্দী মুহাম্মদ মেয়েটিকে ইমাম শামিলের সামনে উপস্থিত করে বললেন, এ মহিলা বন্দিত্ববরণ করে সীমাহীন আনন্দিত। কারণটা বুঝলাম না। দোভাষীর মাধ্যমে তার সঙ্গে কাথোকথন শুরু হলে সে বললো, দোভাষীর প্রয়োজন নেই; বেশ আগ্রহ করে বড় কষ্টে আমি আপনার ভাষা শিখেছি।

একথা শুনে ইমাম শামিল আনন্দিত হন এবং জিজ্ঞেস করেন-

বেটী! দুশমনের হাতে বন্দিত্ববরণ তো বড় কষ্টদায়ক ব্যাপার; তা তুমি আনন্দিত কেনো?

ঃ কারণ, আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন এবং বহুদিনের আকাঙ্খা আজ পূরণ হল। আপনাকে এক নজর দেখার স্বপ্ন আজ আমর বাস্তবে পরিণত হলো।

ঃ তাই বলে তুমি কোনো সুবিধা পেয়ে যাবে, এমনটা ভেবো না কিন্তু।

ঃ না, আমি কোনো সুবিধা চাই না।

ইমাম শামিলের নির্দেশে শেয়ানতকে অন্যান্য মহিলা বন্দীদের সঙ্গে একটি কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হলো।

কিছুদিন পর শেয়ানতের পিতা– যিনি একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী– চেচনিয়ার একটি গোত্র মারফত কন্যাকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি কন্যার মুক্তিপণ হিসেবে যতো প্রয়োজন অর্থ দেয়ার প্রস্তাব পেশ করেন।

ইমাম শামিল এ বিষয়ে তার নায়েবদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। নায়েবগণ সিদ্ধান্তের ভার ইমামের উপরই ন্যস্ত করে বললেন, আপনার যা ভালো মনে হয় করুন, আমাদের কিছু বুঝে আসছে না। ইমাম শামিল কোনো বিনিময় ছাড়াই শেয়ানতকে মুক্তি দেয়ায় সম্মতি প্রকাশ করেন এবং বললেন–

'আমরা পণ আদায় করার জন্য মানুষ বন্দি করি না। আমাদের উদ্দেশ্য, বন্দিদের বিনিময়ে আমাদের লোকদের মুক্ত করে আনা। যেহেতু শেয়ানতের পিতা আমাদের নিজস্ব এক গোত্রকে সুপারিশ ধরেছে, তাই আমরা তাকে ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত।

ইমাম শামিলের এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেয়ে শেয়ানত ইমামকে বলে পাঠায়, আমি ফিরে যেতে চাই না। তবে আপনি যদি আমাকে জোর করে ফেরত পাঠাতে চান, তা ভিন্ন কথা।

এ কথা শুনে ইমাম শামিল পুনরায় শেয়ানতকে সামনে উপস্থিত করান এবং নায়েবদের উপস্থিতিতে তার সঙ্গে কথা বলেন।

ঃ তুমি বড় বিস্ময়কর কথা বললে যে, শত্রুর বন্দিদশা থেকে মুক্তি নিয়ে পিতা-মাতার কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছো না!

শেয়ানত ঃ জি হ্যাঁ, আমি আপনার খাদেমা হয়ে আপনারই সান্নিধ্যে থাকতে চাই। তাছাড়া মেয়েরা আজীবন তো আর পিতা-মাতার কাছে থাকে না!

ঃ তুমি খৃষ্টান। তা না হলেও আমি খাদেমা বানিয়ে তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারতাম না।

ঃ আমি বহু আগ থেকে মনে মনে মুসলমান হয়ে আছি। ইসলাম গ্রহণের কোনো আনুষ্ঠানিকতা থাকলে তা-ও পালন করে নিতে আমি প্রস্তুত।

নায়েব আওয়ার্দী মুহাম্মদ বললেন, মহামান্য ইমাম! মেয়েটি যদি মুসলমান

হয়ে যায় আর তাকে যদি আপনার পছন্দ হয়, তাহলে আপনি তাকে বিয়ে করে নিন। এ মুহূর্তে আপনার একজন জীবন সঙ্গীনীর প্রয়োজনও রয়েছে। মেয়েটি তো তার ইচ্ছার কথা জানিয়ে-ই দিয়েছে।

নায়েব মুকাররম খান বললেন, মেয়েটি গ্রেফতারীর দিন থেকেই তার বান্ধবীদের বলছে, সে দাগেস্তানের সিংহ ইমাম শামিলের জীবন সঙ্গীনী হতে আগ্রহী। আমরা বিষয়টি নিয়ে মতবিনিময় করেছি। আপনি ইচ্ছে হলে মেয়েটিকে বিয়ে করে নিন। মেয়েটি মুসলমান হতে প্রস্তুত।

কয়েকদিন পর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শেয়ানত আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। ইমাম শামিল তার নতুন নাম রাখেন গাওহার বেগম। তিনি গাওহার বেগমকে বিবাহ করে নেন।

✿ ✿ ✿

আতারিদভ শেয়ানতের খালাতো ভাই। বয়সে তরুণ হলেও ছেলেটি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং বিলাসপ্রিয়। শেয়ানতের পাণিপ্রার্থী সে। কিন্তু শেয়ানত তাকে পছন্দ করে না। শেয়ানত বন্দি হওয়ার পর আতারিদভ শেয়ানতের পিতার নিকট গিয়ে বলে, এবার বে-দীনের কব্জা থেকে ফিরে আসলে কোন সম্ভ্রান্ত পুরুষ আপনার কন্যাকে গ্রহণ করবে না। তবে আমি আপনাকে এখনো নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আপনার ইজ্জতের খাতিরে আমি আমার মর্যাদা বিসর্জন দেব। শেয়ানতকে ফিরিয়ে আনুন; আমি তাকে বিয়ে করবো।

শেয়ানতের পিতা নিরুপায়। আতারিদভের কথার জবাবে কিছুই বলেন না তিনি। কিন্তু চেষ্টা করেও যখন নিজে কন্যাকে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না; শেয়ানত নিজেই যখন ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলো, এবার এর দায় চাপে আতারিদভের উপর। আত্মীয়-স্বজনরা বলাবলি করতে শুরু করে, আর কিছু নয়, শেয়ানত আতারিদভের ভয়েই আসছে না। ছেলেটির চরিত্র ও চাল-চলন যদি ভালো হতো, তাহলে এমন একটি মেয়ে কাবায়েলীদের কাছে থাকতে চাইতো না।

আতারিদভ বার বার শেয়ানতের পিতাকে বুঝাতে চেষ্টা করে, আমার ধারণা, শেয়ানত এমনটি করতে পারে না যে, শত্রুরা মুক্তি দিতে রাজি হওয়া সত্ত্বেও সে আসতে চায় না; এ আমার বিশ্বাস হয় না। আসলে ঐ বিধর্মী শামিলটাই তাকে ফেরত দিতে চায় না। যদি যথাযথভাবে চেষ্টা করা হয়, তাহলে আমি মনে করি, শেয়ানতকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

শেয়ানতের পিতা কয়েকদিন পর্যন্ত আতারিদভের কথা শুধু শুনতেই থাকেন; বলছেন না কিছুই। কিন্তু একদিন বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন, বেটা! আমার চেষ্টা যা করার করেছি। তুমি যদি কিছু করতে পারো করো; আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রয়েছে।

আতারিদভ শেয়ানতের উদ্ধার প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় এবং এর জন্য নিজের সিন্দুকের মুখ খুলে দেয়।

শেয়ানতের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের জন্য আতারিদভ কখনো রুশ অফিসারদের মাধ্যমে চেষ্টা চালায়, কখনো বা ইমাম শামিলের সমর্থক গোত্রগুলোর শরণাপন্ন হয়। ঠিক দু'বছর পর তার প্রচেষ্টা সফল হয়। ইমাম শামিল আতারিদভকে শেয়ানতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন।

কয়েকজন আত্মীয় ও রুশ সেনার সঙ্গে আতারিদভ রুশ অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্তে এসে উপনীত হয়। সীমান্তের রুশ সান্ত্রী তাকে বলে, তোমার আত্মহত্যা করারই যখন প্রয়োজন ছিলো, নিজ ঘরেই করে ফেলতে! তুমি যেখানে যাচ্ছো, সেখান থেকে ফিরে আসার আশা না রাখো যেনো।

আতারিদভ কোনো জবাব না দিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায়। সীমান্ত পেরিয়ে দু'-ফার্লং পথ অতিক্রম করার পর ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ এক ঘোড়সওয়ার আত্মপ্রকাশ করে। লোকটি আতারিদভের নিকট জরুরি কাগজ-পত্র তলব করে এবং তল্লাশী নেয়ার পর বলে, আসুন, আমার সঙ্গে আসুন। খানিক দূর অগ্রসর হওয়ার পর আত্মপ্রকাশ করে একটি ঘোড়সওয়ার বাহিনী। আতারিদভকে নিয়ে বাহিনীটি এগিয়ে যায় সম্মুখে। অদৃশ্য হয়ে যায় প্রথম অশ্বারোহী।

বর্তমানে ইমাম শামিলের 'দারুল ইমামত' দারগীন। ইমামের মুরীদরা আতারিদভকে নিয়ে এগিয়ে চলে। আতারিদভ ও তার ঘোড়া উভয়ের জন্য অত্র অঞ্চলের পথ-ঘাট বড় দুর্গম। এখানকার কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই। কোথাও নিম্নভূমি,কোথাওবা মালভূমি। রাস্তা কোথাও সরু-সংকীর্ণ, কোথাও আঁকাবাঁকা। পথ কোথাও চলে গেছে খাল-নদীর উপর কাঠের সরু সাঁকো পেরিয়ে।

মুরীদদের সুশিক্ষিত অশ্বপাল বাতাসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলছে। কিন্তু বার বার হোঁচট খাচ্ছে আতারিদভের ঘোড়া। বিরক্ত হয়ে মুরীদরা একটি প্রশিক্ষিত তাজাদম ঘোড়া প্রদান করে আতারিদভকে। নিজের ঘোড়াটা রেখে যায় গ্রামের লোকদের কাছে। শুধু নামাযের সময় হলে থেমে নামায আদায় করছে মুরীদগণ। বাকি সময় তীব্রগতিতে পথ চলছে তারা। রাতেও তারা বিশ্রাম করে মাত্র অল্প সময়ের জন্য।

দ্বিতীয় দিনই আতারিদভ সফরের ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার খাতিরে মুরীদরাও ধীরগতিতে চলতে বাধ্য হয়। ইমাম শামিলের যে কোনো অশ্বারোহীর রুশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে দারগীন পৌঁছুতে সময় লাগে মাত্র সাতদিন। কিন্তু আতারিদভের কারণে তাদের এ সফর অতিক্রম করতে লেগে যায় বার দিন।

এ কাফেলা যখন দারগীনের উপকণ্ঠে পৌছে, তখন চব্বিশজন অশ্বারোহীর অপর একটি বাহিনী তাদের স্বাগত জানায়। সামান্য সামনে অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছে আরো একটি দল। সবশেষে নদীর তীরে সেতুর গোড়ায় গিয়ে থেমে যায় কাফেলা। ইমামের চার নায়েব সেখানে অপেক্ষমান। আতারিদভকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যান তারা।

দারগীনের তিন দিকে নদী। দু'জায়গায় নদীর উপর কাঠের সেতু। সেতুগুলো নির্মাণ করা হয়েছে এমনভাবে, যাতে প্রয়োজনে সহজেই সরিয়ে ফেলা যায়।

একদিকে উঁচু একটি পাহাড়। ঘন গাছ-গাছালিতে ঢাকা পাহাড়টি। পাহাড়ের পেছন দিকে দেড় মাইল দীর্ঘ উৎরাই। এরই এক স্থানে ইমাম শামিলের বাসস্থান। ঘরের চারদিকে উঁচু উঁচু টিলা। প্রবেশ পথগুলোতে প্রহরা থাকে সর্বক্ষণ।

দাগেস্তানের ইমাম, কোহেস্তানের সিংহ ও রাশিয়ার দুশমন ইমাম শামিল সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে আতারিদভ। তার জানা মতে ইমাম শামিল একটি কিংবদন্তি– একটি উপাখ্যান।

আতারিদভ ইমাম শামিলের বাসভবনে এসে পৌছে। একটি অতি সাধারণ ঘরে নিয়ে বসানো হয় তাকে। শেয়ানতের সাক্ষাৎ লাভে উদগ্রীব আতারিদভ জানতে চায়, ইমামের মহলে কখন নাগাদ পৌছুতে পারবে সে। মুখে হাসি টেনে খাদেম বলে, তুমি যে ঘরে বসে আছো, প্রাসাদে বসবাসকারী লোকদেরও সে ঘরে বসবার সৌভাগ্য হয় না। এটিই আমাদের ইমামের বাসভবন। ইমামের স্ত্রীর আত্মীয় না হলে তুমি এ পর্যন্ত পৌছুতে পারতে না; তোমাকে ওই সেতুটির গোড়ায়ই থেমে যেতে হতো। প্রয়োজন হলে তুমি নেয়ে-ধুয়ে আরাম করো।

বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ে আতারিদভ। মুহূর্ত মধ্যে খরগোশের ন্যায় অলস নিদ্রায় তলিয়ে যায় সে।

ইমাম শামিল আচানক তার স্ত্রী গাওহার বেগমের কক্ষে প্রবেশ করেন এবং বললেন– 'বিষয়টি যদিও আমাদের নীতি-পরিপন্থী, তবু ইচ্ছে করলে তোমার কক্ষটিকে তুমি সাময়িকের জন্য সাজাতে পারো; যাতে এই সাধারণ কক্ষে সাক্ষাৎ করে তোমার ভাইয়ের মনে তোমার ব্যাপারে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।

ঃ আপনার নীতি-আদর্শকে আমি বরণ করে নিয়েছি। এখন এই অনাড়ম্বর সরল জীবনই আমার পছন্দ। কাজেই আমার কোনো লৌকিকতার প্রয়োজন নেই।

স্ত্রীর কথায় ইমাম শামিলের হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ জাগে।

বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আতারিদভ শেয়ানতের কক্ষে প্রবেশ করে। কক্ষের মধ্যখানে পর্দা ঝুলানো। পর্দার ভেতরে শেয়ানত উপবিষ্ট।

ভিতরে প্রবেশ করেই আতারিদভ বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, শেয়ানত! একি

তুমি? এই পর্দা কেনো তোমার কক্ষে? তুমি আমাকে দেখা দিচ্ছো না কেনো?

ঃ আমার নাম এখন শেয়ানত নয়– গাওহার বেগম। পর্দা ঝুলিয়েছি, তার কারণ, আমরা মুসলমান মহিলারা বেপর্দায় চলি না। পর্দা করা আমাদের ধর্মের বিধান।

শেয়ানতের কথাগুলো কানে আসামাত্র যেনো হঠাৎ করে আতারিদভের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করার চেষ্টা করে বলে, তা-তা-তাই বলে কি তুমি আমার সঙ্গেও পর্দা করবে? আমি তো তোমার বেগানা নই?

ঠিক এ সময়ে কক্ষের দরজায় করাঘাত পড়ে। ভেতরে প্রবেশ করেন ইমাম শামিল। বললেন– 'গাওহার! আমি অনুমতি দিচ্ছি, ইচ্ছে করলে তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পর্দা ছাড়াই কথা বলতে পারো। তবে এ অনুমতি কেবল আমার পক্ষ থেকে–আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়।

ঃ সারতাজ! এ আইনের ব্যাপার, শরীয়তের বিষয়। আতারিদভ এমনিতেই আমার জন্য পর-পুরুষ। তাছাড়া এখন তো সে আর আমার আত্মীয়ও নয়।

ইমাম শামিল বাইরে অপেক্ষমান খাদেমদেরকে মেহমানের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করার আদেশ দেন। কিছুক্ষণ পর আতারিদভ ইমাম শামিলকে উদ্দেশ করে বলে– 'আমি শেয়ানতের পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও আমার নিজের পক্ষ থেকে শেয়ানতের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য এসেছিলাম। আগে উপযুক্ত মুক্তিপণ দেয়ার প্রস্তাবও করেছিলাম। সম্ভবত সে পরিমাণটা আপনার চোখে কম হয়ে থাকবে। এখন আপনি যা চাইবেন, আমি তা-ই দিতে প্রস্তুত আছি।'

পুনরায় উঠে দাঁড়ান ইমাম শামিল। বললেন–

'আপনি আমাদের মেহমান। আমি তখনোও বলেছিলাম এবং এখনোও বলছি , গাওহার অর্থাৎ শেয়ানত মুক্ত। নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যখন খুশি তখনই সে ফিরে যেতে পারে। তবে তার মর্জির বিরুদ্ধে তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার শক্তি স্বয়ং জার নেকুলাই'রও নেই। আর মুক্তিপণের কথা বলছিলেন, না? শুনুন, গাওহার নিজে রাজি না হলে জারের সমুদয় সম্পদের বিনিময়েও আমি তাকে ফেরত দেবো না। আপনি ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে একাকি কথা বলে দেখতে পারেন। আমি আপনাকে বিকাল পর্যন্ত সময় দিলাম।'

একথা বলেই ইমাম শামিল কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। আতারিদভ গাওহার বেগমকে ফিরে যেতে রাজি করার চেষ্টা করে। কিন্তু গাওহার বেগমের মুখে স্পষ্ট জবাব–

'আমি দাগেস্তানের সিংহ ইমাম শামিলের স্ত্রী। আমি সুখময় দাম্পত্য জীবনযাপন করছি। আমি পূর্বের মিথ্যা ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আর আমি ফিরে যেতে চাই না, যেতে পারিও না। আব্বা-আম্মা ইচ্ছে করলে

যে কোনো সময় আমাকে দেখতে আসতে পারেন। আমিও কন্যা হিসেবে তাদের দেখতে যেতে পারি বটে; তবে ইমাম শামিলের স্ত্রী হওয়ার কারণে অন্যত্র যেতে পারি না।'

নিরাশ মনে ফিরে যেতে রওনা হয় আতারিদভ। ইমামের পক্ষ থেকে উন্নত একটি তাজাদম তাজী ঘোড়া উপহার হিসেবে দেয়া হয় তাকে। বাড়ি পৌছানো পর্যন্ত সময়ের জন্য পর্যাপ্ত পাথেয় দিয়ে রুশী এলাকার সীমান্ত পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া হয় তাকে।

আঠারো.

অরনেষ্টভ ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাফকাজ পৌছেন। এরমালভ ও অরনেষ্টভ বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন ঠিক; কিন্তু তারা দু'জনই যোগ্যতা, সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও বিচক্ষণতায় প্রসিদ্ধ। এরমালভ কাফকাজে জালেম ও শয়তান হিসেবে পরিচিত। তবে এখানকার মানুষ অরনেষ্টভের নাম কখনো শুনেনি। তিনি বেশির ভাগ সময় মংগোলিয়া, জর্জিয়া এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন।

অরনেষ্টভ কিছুদিন তিবলিসের সেন্ট ছাউনিতে অবস্থান করেন এবং ভাইসরয়-এর দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি তমীরখানশুরা গমন করেন এবং সেখানে অবস্থানরত অফিসারদের সঙ্গে দাগেস্তান ও তৎসংলগ্ন এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেন, তিনি ভাইসরয় হিসেবে তিবলিসেই অবস্থান করবেন এবং মাঝে-মধ্যে তমীরখানশুরাও যাওয়া-আসা করবেন।

অরনেষ্টভের কথার ধরণ বলছে, তিনি বিজয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। প্রবল আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছে তার বক্তব্য থেকে। তিনি অধীন অফিসারদের বলছেন, কাফকাজের লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি অতি নিকটে। নিজের পরিকল্পনা ও কৌশলের বিশুদ্ধতার উপর আস্থা তার ষোল আনা। তাই তিনি ইমাম শামিলকে একথা অবহিত করা জরুরি মনে করলেন যে, রুশ সেনাদের কমান্ড জারের পর রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিধর, সবচে' যোগ্য ও সাহসী ব্যক্তিটির হাতে এসেছে। তাই শামিলের উচিত নিজের লোকদের অহেতুক মৃত্যুর হাতে ঠেলে না দিয়ে শাহেনশাহ'র আনুগত্য মেনে নেয়া। অরনেষ্টভ এ মর্মে ইমাম শামিলের নামে একখানা পত্র লিখেন–

'আমি চাই তোমার এলাকার লাখ লাখ অধিবাসী যুদ্ধ-চুল্লির ইন্ধনে পরিণত না হোক। অতীতে যা ঘটেছে, তা ঘটেছে অপরিপক্ক সেনানায়কদের কারণে। অরনেষ্টভ জন্মগত ও বংশগতভাবেই সেনানায়ক। দক্ষিণ রাশিয়ার যে কোনো ভূখণ্ডের যে কারো সঙ্গে কথা বলে দেখো, আমাকে চেনে না বা জানে না এমন

একজন লোকও তুমি পাবে না। শাহেনশাহ্ বৃদ্ধ বয়সে আমার উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ভালোয় ভালো তুমি আমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার চেষ্টা করো না। অরসেষ্টভকে হয়তো তুমি জানো না।

তুমি এবং তোমার সহচররা অসভ্য একটা জাতি। সভ্যই যদি হতে, তাহলে সেসব স্বার্থ-সুবিধায় তোমরাও সমৃদ্ধ হতে, যা পেয়ে ধন্য হয়েছে আমার পরিকল্পিত সংস্কার অভিযানে শাহেনশাহ'র প্রজারা। খাদ্য-পানীয় ও ভোগ বিলাসের সুবিপুল উপকরণ আজ তোমাদের হাতেও থাকতো। মনে রেখো, শাহেনশা হয়তো অবাধ্যতা, বিদ্রোহ কিংবা এ জাতীয় শব্দমালা শুনতে অভ্যস্ত হতে পারেন। কিন্তু জীবনে আমাকে কখনো এসব শব্দ শুনতে হয়নি। শক্তির অভিধানে এসব শব্দ থাকেই না। তার স্থলে থাকে আনুগত্য, অধীনতা, প্রজা, আবেদন ইত্যাদি। এ চারটি শব্দের যে কোনো একটিকে তুমি বেছে নাও।'

অরনেস্টভ-এর পত্র ইমাম শামিলের হাতে এসে পৌঁছে। ইমাম শামিল নায়েবদের নিয়ে পরামর্শ করেন এবং পত্রের জবাবের ভাষা কেমন হবে, তা নিয়ে মতো বিনিময় করেন। সিদ্ধান্ত হয়, দাম্ভিকের পত্রের জবাবের ভাষা এতো কঠোর হওয়ার প্রয়োজন, যেনো পাঠ করে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ইমাম শামিল অরনেস্টভের নামে এ জবাবটি প্রেরণ করেন–

'অরনেস্টভ! তোমার শাহেনশাহ'র জন্য আমার করুণা হয় যে, তিনি তোমার মতো বিগত-যৌবন ও কথিত এক বৃদ্ধ সেনাপ্রতি শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলেন। 'কথিত সেনাপতি' এজন্য বললাম, আসলেই যদি তুমি সেনাপতি হতে, তাহলে এতোটুকু কাণ্ডজ্ঞান তোমার অবশ্যই থাকতো যে, এক সেনাপতির আরেক সেনাপতির সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। তোমার এতোটুকুও জানা নেই যে, সৈনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটায় তরবারীর ভাষা দিয়ে। জবান ব্যবহার করার সময় আসে তখন, যখন তরবারী জয়ী কিংবা অক্ষম হয়ে পড়ে।

তোমার অবগতির জন্য আমাকে লিখতে হলো, কাফকাজে এমন কোনো মানুষ নেই, যে জানে, অরনেস্টভ কোন্ পক্ষীর নাম? কিন্তু একটি নাম এমন আছে, যে নামটি শুধু তোমার দক্ষিণ রাশিয়াই নয়– সমগ্র রাশিয়ায়, সমগ্র কাফকাজের যে কারো জানা আছে। তোমার জার, সেনাপতি, অফিসার ও সিপাহীদের সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ লাখো মানুষের আত্মাও এ নাম সম্পর্কে অবগত। জানো, কী সে নামটি?– শামিল। আর হ্যাঁ, তুমি আমাদেরকে অসভ্য বলেছো। আমরা অসভ্যই বটে। কারণ–

- আমরা অন্যের দেশ দখল করতে যাই না।
- আমরা ভিন দেশের মানুষকে আমাদের গোলাম বানাই না।
- আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের ঘর-বাড়ি, বাগ-বাগিচা ও শস্যক্ষেত

পুড়িয়ে ভস্ম করি না। আমরা দুশমনের পানির কূপ-ঝরণা অবরোধ করে তাদেরকে পিপাসায় মারি না।

- আমরা কোনো মানুষকে আমাদের খোদা, মনিব কিংবা আমাদের জীবনের মালিক বলে স্বীকার করি না।

আমরা অসভ্য। আরো কারণ–

- আমাদের দেশে অধীনদের স্ত্রীরা পদস্থ অফিসারদের বাহুতে ঝুলে না। আমাদের দেশের গরীব মায়েরা তাদের স্তন প্রভূদের কুকুরকে চুষতে দেয় না। আমাদের দেশের মানুষ কারো মনিবও নয়, গোলামও নয়– মানুষই।
- আমার দেশের কোনো মানুষকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে যুদ্ধের আগুনে নিক্ষেপ করা হয় না।
- আমাদের দেশে মনিবের গোলামরা নিজ মনিবের কুকুরকে তাপ দেয়ার জন্য রাতভর কোলে নিয়ে বসে থাকে না।
- আমাদের দেশে হাজার হাজার মানুষ শাহেনশাহ'র মহল নির্মাণ করতে গিয়ে শীতে ঠক্ ঠক্ করতে করতে মৃত্যুবরণ করে না।
- আমাদের দেশে শিশুদেরকে পিতা-মাতার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমীরজাদা-আমীর জাদীদের দাস-দাসী হতে বাধ্য করা হয় না।

আমরা বাস্তবিক-ই অসভ্য। কারণ–

- আমরা জনবসতির উপর এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ করে শিশু-নারী ও বৃদ্ধদের হত্যা করি না।
- আমরা প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও দাগাবাজীকে বৈধ মনে করি না।
- আমরা কোনো ধ্বংসশীল মানুষের সন্তুষ্টির জন্য নয়– কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য লড়াই করি।

আমরা ধ্বংস-হত্যা, জুলুম-নির্যাতন ও লুট-তরাজকে সভ্যতা মনে করে উল্লাস করি না।

অরনেস্টভ! তুমি বলেছো, আমরা সভ্য হয়ে গেলে উপকৃত হতাম এবং আমাদের কাছেও ভোগ-বিলাসের পর্যাপ্ত উপকরণ থাকতো। তুমি তোমার শাহেনশাহ ও তার পূর্ব-পুরুষদের জিজ্ঞেস করো, কখনো আমরা তাদের কাছে কিছু চেয়েছি কি-না। শোন অরনেস্টভ! মানুষের ক্ষুধা দু' ধরনের হয়ে থাকে। পেটের ক্ষুধা ও মনের ক্ষুধা। আমরা মাঝে-মধ্যে পেটের ক্ষুধায় আক্রান্ত হই বটে; কিন্তু মনের ক্ষুধা কখনো আমাদেরকে স্পর্শ করে না। তোমার 'খোদাওন্দ' মনের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত। জর্জিয়া, মংগেলিয়া, আমরেতিয়াসহ আরো কয়েকটি অঞ্চল হজম করার পরও তার ক্ষুধা মেটেনি। দেশ দখলের আকাঙ্ক্ষা তার বেড়েই চলেছে।

অরনেস্টভ! তুমি আমাকে তোমার নির্বাচিত চার শব্দের যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলেছো। আমি তোমার সব ক'টি শব্দই প্রত্যাখ্যান করলাম। আমার সবচে' প্রিয় বাক্যটি হলো– আল্লাহর পথে জিহাদ।

–ইতি

শামিল'

অরনেস্টভের হাতে ইমাম শামিলের এ পত্রখানা পৌঁছুবার পর ক্ষোভে তার পাগল হয়ে যাওয়া ছিলো অনিবার্য। আর এ-ও স্বতঃসিদ্ধ যে, জার নেকুলাই'র পর রাশিয়ার সবচে' ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিটি যখন ক্ষোভে পাগল হয়ে যাবে, তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেনা অভিযান পরিকল্পনা করবেন এবং নিজের প্রথম অভিযানকে সফল করে তোলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

ইমাম শামিল তার নায়েবদের সঙ্গে অরনেস্টভের সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে মতবিনিময় করেন এবং শলা-পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেন, অরনেস্টভের প্রথম আক্রমণটি যে কোনো মূল্যে ব্যর্থ করতে হবে। ইমাম শামিল ও তাঁর অভিজ্ঞ নায়েবদের ধারণা, অরনেস্টভ ইমামের রাজধানী দারগীনের উপর আক্রমণ চালাবেন এবং এ আক্রমণে তিনি অধিক থেকে অধিকতর সৈন্য-শক্তি ব্যবহার করবেন।

শুরু হয়ে যায় অরনেস্টভের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলা করার প্রস্তুতি।

১৮৪৫ সালের ৩রা জুন ছয় ডিভিশন রুশ সৈন্য কমান্ডার ইন চীফ অরনেস্টভের নেতৃত্বে তমীরখানশুরা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে তৎপরতা শুরু করে। তাদের গতিবিধি দেখে মনে হলো, তারা বাম্বাত ও সালাতাও-এর মধ্যবর্তী গিরিপথটি কব্জা করে আন্‌ধীর দিকে এগিয়ে যাবে এবং আন্‌ধীকে পদদলিত করে অগ্রসর হবে দারগীন অভিমুখে।

অরনেস্টভ ও পাস্ক-এর অনুমান, এ গিরিপথটিকে যাতে তারা দখল করতে না পারে, ইমাম শামিল তজ্জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবেন। কারণ, এ গিরিপথটি দখলে নিতে পারলে আন্‌ধী ও দারগীন প্রবেশের পথ সুগম হয়ে যাবে।

আক্রমণকারী সেনাদের কমান্ডের দায়িত্ব সেনাপতি পাস্ক-এর উপর ন্যস্ত করে অরনেস্টভ নিজে পেছনে রয়ে যান। ৫ই জুন গিরিপথে পৌঁছে থ খেয়ে যায় সেনাপতি পাস্ক। কোনো প্রতিরোধ নেই। একটি গুলিও আসছে না কোনো দিক থেকে। কোথাও কারো কোন তৎপরতা নেই। এতে পাস্কের মনে ধারণা জন্মে, ইমাম শামিল রুশ সেনাদের মোকাবেলা করার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন এবং বোধ হয়, তিনি দারগীন রক্ষা করার আয়োজনেই ব্যস্ত রয়েছেন।

সেনাপতি পাস্ক তার সৈন্যদের আন্‌ধী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। সেনাপতি ভ্রেন্ত্রভ, লেবৃতিভ, নিয়াবনস্কী এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ সেনাপতিগণ নিজ নিজ ডিভিশন নিয়ে দ্রুতগতিতে সম্মুখে এগিয়ে যায়। ৬ই জুনের সন্ধ্যায় তারা আন্‌ধী

গিয়ে পৌঁছে। এবারও পথে কোনো প্রতিরো । সম্মুখীন হতে হল না তাদের।

পাস্ক যখন আন্‌ধীতে প্রবেশ করে, তখন সেখানে ছাই-ভস্ম ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কৌশল হিসেবে ইমাম শামিল আগুন লাগিয়ে পুড়ে ফেলেছেন সেখানকার সবকিছু। আশ-পাশের বস্তিগুলোকেও জ্বালিয়ে দিয়েছেন তিনি। শস্যক্ষেত, সবুজ ঘাস জ্বলছে সবই।

সমস্যায় পড়ে গেল পাস্ক। হাজার হাজার ঘোড়াকে খাওয়াবে কী সে? আন্‌ধীর কোথাও না আছে ঘাস, না আছে দানাদার খাদ্য। সৈন্যদের কাছেও যে খাবার আছে, তাতে দু'-চারদিন কাটবে বড়জোর। কাজেই রসদ এসে না পৌঁছা পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব নয়। পাস্কের এখন প্রবল ধারণা, সম্মুখেও পথে মানুষ ও ঘোড়ার কোনো খাদ্য মিলবে না; বিদ্রোহীরা পুড়ে ফেলে থাকবে সব।

রুশ সেনাদের রসদবাহী হাজার হাজার খচ্চর-গাধার বিরাট বহরটি এখনো গিরিপথে এসেই পৌঁছেনি। অতি ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে বহরটি। অরনেস্টভ কাস্ক বাহিনীর পাঁচটি রেজিমেন্ট নিয়ে ৮ই জুন আনধী পৌঁছে যায়। রসদবাহী কাফেলার সামনের অংশটি পৌঁছে ১৫ই জুন।

রসদ এসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পাষাণহৃদয় শক্তিশালী বিপুলসংখ্যক রুশ বাহিনীর মোকাবেলায় দন্ডায়মান মুষ্টিমেয় মুজাহিদের উপর নেমে আসে আল্লাহ'র গায়েবী মদদ। হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে। মুষলধারা বৃষ্টি আর তীব্র বায়ু হঠাৎ আন্‌ধীর উষ্ণতাকে প্রচন্ড শীতে পরিণত করে। রুশ সেনাদের বৃষ্টি ও বরফ-শীতল বায়ু থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। রাতে বৃষ্টির তীব্রতা আরো বেড়ে যায় এবং কনকনে শীত তীরের মতো রুশ সেনাদের গায়ে বিদ্ধ হতে শুরু করে। ২০শে জুন পর্যন্ত এই খোদায়ী মদদ মুজাহিদদের সঙ্গী হয়ে রুশ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টিতে সাড়ে চারশ রুশ সেনা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মারা যায় পাঁচশ ঘোড়া।

এ পরিস্থিতি দেখে বিষণ্ন হয়ে পড়েন অরনেস্টভ। সেনাপতি পাস্ক বলে– 'জনাব! নিজের চোখেই তো দেখলেন। এখানকার পরিবেশ-আবহাওয়াও আমাদের দুশমন। দেখবেন, এখন প্রতিদিন এ-ই ঘটবে। মানুষ-ঘোড়া প্রত্যহ মরতেই থাকবে। আগস্টের শেষ নাগাদ, অন্তত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও যদি আমরা দুশমনকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে না পারি, তাহলে আমাদের এতোদিনের বিজয়গুলোও পরাজয়ে পরিণত হবে। আমাদের সৈন্যরা এখানকার ঠাণ্ডা মওসুমের মোকাবেলা করতে পারবে না। আবার আমরা ফিরে গেলেও দুশমন আমাদের বিজিত অঞ্চলসমূহ পুনর্দখল করে নেবে। বছরের পর বছর ধরে এ-ই ঘটে আসছে জনাব!'

অরনেস্টভ বললেন, সেনাপতি! আমাদের না লোকের অভাব আছে, না ঘোড়ার। আমি সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে এখান পর্যন্ত সৈন্য ও ঘোড়ার সারি দাঁড় করিয়ে দেবো। সেপ্টেম্বর নাগাদ যে কোনো মূল্যে দুশমনের প্রথম ঘাঁটিটি নিশ্চিহ্ন হওয়া চাই। দারগীন এখান থেকে পনের মাইল দূর। প্রতিদিন এক মাইল করে পথ অতিক্রম করলে পনের দিনের মধ্যে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছে যেতে পারবো। তারপর সে অঞ্চলটিকে তছনছ করতে সময় লাগবে কয়েকদিন মাত্র।

২২ জুন পর্যন্ত আন্ধীর আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে আসে। অরনেস্টভ তার বাহিনীকে অগ্রযাত্রার আদেশ দেন এবং বলেন– 'দ্রুত– খুব দ্রুত– সর্বাবস্থায় দ্রুত'। কিন্তু রুশ বাহিনী আন্ধী ত্যাগ করে সম্মুখে রওনা হওয়ামাত্র দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার আদেশদাতা অরনেস্টভ 'ধীরে চলো-ধীরে' আদেশ দিতে বাধ্য হয়ে পড়েন।

দারগীন গমনের পথে স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রতিবন্ধক। কোথাও পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছের ডাল। কোথাও বিশাল বিশাল পাথর। কোথাও বা কাঁটাল ঝোপ-জঙ্গল।

এসব প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য এগিয়ে যায় রুশ বাহিনী। হঠাৎ বহু অজ্ঞাত স্থান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয় তাদের উপর। কখনো গাছের চূড়া থেকে কখনো বা পাথরের আড়াল থেকে। ফলে এক মাইল পথের বাধা অপসারণ করতে রুশ সেনাদের কেটে যায় একটি দিন। এতোক্ষণে অজ্ঞাত গোলার আঘাতে হতাহত হয় হাজার হাজার রুশ সৈন্য।

পরদিন সেনাপতি পাস্ক-এর পরামর্শে সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয় একটি তোপ। পরিকল্পনা হলে, কাফেলার একেবারে সম্মুখভাগে এই তোপ থেকে চারদিকে গোলাবর্ষণ করে গোলার ফাঁকে ফাঁকে এক জায়গার প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে। তারপর তোপটিকে আরো সম্মুখে নিয়ে গিয়ে সেখানকার বাধা দূর করা হবে। এভাবে গোলাবর্ষণ করে করে পথের সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে দারগীন পৌঁছে যাবো। কিন্তু–

কিন্তু তোপ প্রথম গোলাটি ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই তোপচী, তোপ বহনকারী, তোপে গোলা স্থাপনকারী এবং কমান্ডার সব লাশে পরিণত হয় যায়। তোপটি যে স্থানে স্থাপিত হয়েছে, তার পার্শ্বেই ঢালুতে কিছু জংলা। সেই জংলার মধ্যে লুকিয়ে থাকা মুজাহিদরা তোপ চালনায় নিয়োজিত সেনাদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দেয়।

ক্ষণকাল পর অপর ক'জন রুশ সিপাহী সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু একই পরিণতি বরণ করতে হয় তাদেরও। এবার সেনাপতি পাস্ক-এর নির্দেশে হাজার হাজার রুশসেনা তাদের রাইফেলগুলোর মুখ দু' পার্শ্বের ঝোপ-জঙ্গলের দিকে তাক করে দাঁড়ায়। এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ করে অন্তত পনের-বিশ মিনিট পর্যন্ত।

এবার তোপের কাছে এগিয়ে যায় রুশ সেনাদের তৃতীয় একটি ইউনিট। কিন্তু তোপের নিকটে পৌঁছার আগেই লাশ হয়ে যায় তারাও। পাগলপ্রায় সেনাপতি পাস্ক সৈন্যদের উদ্দেশ করে বলে, কাপুরুষদের দল! আজ এখানেই সব সৈন্য শেষ করে ফেলবো আমি। ঝোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো শীঘ্র। নির্দেশ পাওয়া মাত্রহাজার হাজার রুশসেনা গোলাবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে যায় জঙ্গলের দিকে।

শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ। ঝোপ থেকে খানিক দূরে পড়ে থাকা একটি পাথরের আড়াল থেকে সৈন্যদের দিকে শুরু হয় গোলাবর্ষণ। তথাপি কয়েকজন রুশসেনা লড়তে-মরতে পৌঁছে যায় ঝোপের নিকট।

ঝোপগুলোর পেছনে একটি পরিখা। তার মধ্যে পাওয়া গেলো তিনটি লাশ। এরাই সেই তিন মুজাহিদ, যারা এতোক্ষণ পর্যন্ত রুশ বাহিনীর পথ আগলে রেখেছে এবং কয়েক কুড়ি রুশ সেনাকে নিহত ও আহত করেছে।

সেনাপতি পাস্ক এবার নিজেই তোপের কাছে চলে যান। নিজেই গোলা নিয়ে তোপে ভরতে শুরু করেন। অমনি নড়ে ওঠে মুজাহিদদের 'লাশগুলো'র মধ্য থেকে একটি লাশ। পার্শ্বে দন্ডায়মান রুশ সেপাইর পেটে গিয়ে ঠেকে তার খঞ্জরধারী হাত। ওখানেই চিৎ হয়ে পড়ে যায় সৈন্যটি। দেখে অপর সৈন্যরা পাথর ও গোলার আঘাতে ঝাঝরা করে দেয় আহত মুজাহিদকে।

সম্মুখে এগিয়ে চলে রুশ বাহিনী। তাদের পায়ে পায়ে বাধা-প্রতিবন্ধক। বাধা দূর করে তারা এগুবার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ এখন তাদের নিত্যদিনের রুটিন। পাশাপাশি বৃক্ষমালা, পরিখা, গিরিপথ ও শস্যক্ষেতের মধ্য থেকে গোলাবৃষ্টি চলছে। রুশ বাহিনীও সমানে চালিয়ে যাচ্ছে তোপের গোলাবর্ষণ। গোলন্দাজ বাহিনী প্রাণ হারাচ্ছে একের পর এক। লড়ে-মরে ধীরগতিতে এগিয়ে চলছে রুশ বাহিনী।

১৮৪৫ সালের ২রা জুলাই রুশ বাহিনীর অগ্রগামী দলটি উপনীত হয় এমন এক স্থানে, যেখান থেকে দারগীনের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। কিন্তু সেখান থেকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় এর দূরত্ব কয়েক ফার্লং-এর বেশী হবে না। তাকালে দারগীনের বাড়ি-ঘর, গাছ-গাছালি সব দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে এখান থেকে সে পর্যন্ত পৌঁছুতে অতিক্রম করতে হয় পাঁচ মাইল পথ।

দারগীনগামী এ পথটি 'মৃত্যু পথ' নামে পরিচিত। দারগীন এলাকাটা বেশ উঁচু। পাঁচ মাইল পর্যন্ত কেবল চড়াই আর চড়াই। রাস্তাটি সরু ও আঁকা-বাঁকা। কোথাও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, কোথাও ঘন ঝোপ-ঝাড় ও বৃক্ষরাজির ভেতর দিয়ে, কোথাও বা বড় বড় পাথর খণ্ডের মাঝ দিয়ে চলে গেছে এ সরু পথ। অত্র অঞ্চলের প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি বৃক্ষ ও পাথর রাশিয়ানদের জন্য এক একটি মরণফাঁদ।

এ পথে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যে কতো কঠিন, সেনাপতি পাস্কের তা

জানা। তাই তিনি মনে মনে পরিকল্পনা করে রেখেছেন, এ পথে সর্বপ্রথম কাস্ক বাহিনীকে প্রেরণ করবেন। তারা রাস্তার দু'দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং ঝোপ-বৃক্ষ, পরিখা ইত্যাদিকে শত্রুমুক্ত করবে। তারপর দু'টি তোপ নিয়ে এগিয়ে যাবে অগ্রগামী বাহিনী। প্রতিবন্ধক অপসারিত করে রাস্তা পরিস্কার করে এগিয়ে যাবে তারা।

কিন্তু রসদবাহী গাড়ি-গাধা-খচ্চর প্রভৃতি এখনো আটকে আছে আন্‌ধীতে। রসদ না পৌঁছানো পর্যন্ত বাহিনীর অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। অরনেস্টভের অভিমত, বাহিনী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখুক। দারগীন পর্যন্ত রাস্তা যখন রুশ বাহিনীর দখলে চলে আসবে, তখন রসদ নিয়ে দ্রুত এবং সহজে এগিয়ে যাওয়া যাবে। অরনেস্টভ হলেন কমান্ডার ইন চীফ। তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

রাস্তার দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে কাস্ক বাহিনী। মূল রাস্তা হয়ে চড়াই অভিমুখে এগিয়ে যেতে শুরু করে অগ্রগামী ইউনিট।

কুমীর তার শিকারকে খাবলে ধরে যেভাবে নীরবে পানির মধ্যে হারিয়ে যায়, আসল পথকে আপদমুক্ত করার উদ্দেশ্যে রাস্তার দু'দিকে ছড়িয়ে পড়া কাস্ক বাহিনীটি ঠিক সেভাবে হারিয়ে যেতে শুরু করে।

ব্যর্থ হয়ে যায় রাস্তা নিরাপদ করার পরিকল্পনা। মন্থর হয়ে যায় অগ্রগামী ইউনিটের অগ্রযাত্রা।

এদিকে আন্‌ধী থেকে সংবাদ আসে, ইমাম শামিলের মুরীদ বাহিনী রসদ বহনকারী কাফেলার উপর গেরিলা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। আশংকা হচ্ছে, রুশ সিপাহী এবং ঘোড়া না খেয়ে মারা যাবে।

বিপাকে পড়ে যান অরনেস্টভ। ভাবনার সাগরে ডুবে যান তিনি। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন, প্রত্যেক কমান্ডার নিজ নিজ বাহিনীর অর্ধেক সৈনিককে আন্‌ধী ফেরত পাঠাবে এবং তারা আপন আপন অংশের রসদ নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসবে।

আন্‌ধী অভিমুখে রওনা হয় আধা ফৌজ। অবশিষ্টরা অবস্থান করছে এখানেই। কিন্তু আন্‌ধী থেকে 'রসদ নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসা' বললেই তো আর হয়ে গেলো না! এই যাওয়া এবং আসা দু'-ই ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য। সাধারণ মোকাবেলার পর তারা যে পথ অতিক্রম করে এসেছিলো, সে পথে এখন কঠিন সংঘাতের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের।

রসদ আনার জন্য আন্‌ধীতে যেতে ও আসতে সময় গেলো সাতদিন। প্রাণ দিতে হলো দেড় হাজার রুশ সৈনিকের। আহত হলো অগণিত। মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ঘোড়ার সংখ্যা কতো, তা গুণে আসতে পারেনি তারা।

১০ জুলাই দারগীন অভিমুখে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। আক্রমণকারী বাহিনীর সেনাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেনাপতি পাস্ক-

এর উপর। কমান্ডার ইন চীফ আরো সৈন্য ও রসদ সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সেনাপতি পাস্ক বললেন– 'আমার বীর সেনানীরা! আসমানের খোদা ও যমীনের খোদার দৃষ্টি তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ। খোদা জার-এর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। গন্তব্য আমাদের দারগীন। দৌড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, বুকডাউন করে যে যেভাবে পারো সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকো। শক্তিশালী সামুদ্রিক-উর্মিমালার ন্যায় এগিয়ে চলো। পথে কোথাও থামা যাবে না। অন্যথায় দুশমন আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তোমাদের যদি সঙ্গীদের লাশের স্তূপ মাড়িয়েও অগ্রসর হতে হয়, তবুও নির্দ্বিধায় এগিয়ে যাবে। যে কোনো মূল্যে হোক দারগীন জয় করে আমাদের শাহেনশাহ ও পূর্বপুরুষদের আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। চলো, সম্মুখে অগ্রসর হও।

'সম্মুখে অগ্রসর হও' কথাটা এখনো সেনাপতি পাস্ক-এর মুখ থেকে সম্পূর্ণ বের হয়নি; অমনি চার নিরাপত্তা ইউনিটের এক সিপাহী ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফিয়ে ওঠে ঝাপিয়ে পড়ে তার উপর। প্রচণ্ড এক আঘাত হানে হাতের খঞ্জর দ্বারা। বিদ্ধ হয় সেনাপতি পাস্ক-এর পেটে। ছুরি দ্বারা তরমুজ কাটার ন্যায় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় সেনাপতির মেদবহুল পেটটা।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি লাফ মেরে সিপাহী চড়ে বসে সন্নিকটে দণ্ডায়মান একটি ঘোড়ার পিঠে। বিস্ময়াভিভূত রুশ সৈনিকদের মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় প্রশিক্ষিত ঘোড়াটি।

এই কাস্‌ক সিপাহী ইমাম শামিলের একজন মুরীদ–মুজাহিদ। সুপরিকল্পিত এই কাজটা সে এতো দ্রুত, এতো অল্প সময়ে সম্পন্ন করে নিরাপদে পালিয়ে যায় যে, রুশ অফিসার ও সিপাহীরা এক পলক দেখল মাত্র, কিছু করার সুযোগ পেলো না।

পাস্ক-এর মৃত্যুসংবাদ বজ্র হয়ে পতিত হয় অরনেস্টভের উপর। সেনাপতি পাস্ক ছিলো এই বাহিনীর সবচে' সাহসী, নির্ভীক, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ সেনাপতি। সংবাদটা শুনে অরনেস্টভ বলে ওঠলেন– 'পাস্ক মরেনি, মরেছে আমার দু' ডিভিশন সৈন্য।'

অরনেস্টভের কাছে পাস্ক বাহিনীর অফাদারী সংশয়গ্রস্থ হয়ে পড়ে। দৃষ্টি চলে যায় তার পেছনের দিকে। পথে দু'দিকে জঙ্গলে প্রবেশ করে উধাও হয়ে যাওয়া লোকগুলোও কি তাহলে শামিলের লোক ছিলো? এখন অবশিষ্ট সৈন্যদের উপর আস্থা রাখাও বিপদ, না রাখাও সমস্যা। দারগীন পর্যন্ত পৌঁছার পথে প্রয়োজনে যে ধরনের যুদ্ধ লড়তে হবে, তার জন্য কাস্‌ক বাহিনীর একান্ত আবশ্যক।

ইমাম শামিলের একজন দু:সাহসী মুজাহিদ রুশ বাহিনীকে একজন দক্ষ

সেনাপতি থেকেই বঞ্চিত করেনি, হাজার হাজার কাস্‌ক সিপাহীর অফাদারীকে সংশয়গ্রস্থ করে অরনেস্টভকে বিরাট এক সমস্যায়ও ফেলে দিয়েছে। একজন কমান্ডারের জন্য সেই মুহূর্তটি অত্যন্ত নাজুক ও বিব্রতকর বলে বিবেচিত হয়, যখন তার বাহিনীতে দুশমনের লোকও আছে বলে সন্দেহ জাগে, অথচ জানা থাকে না, লোকটি কে।

সংবাদ পেয়ে অরনেস্টভ সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যান এবং বাহিনীর অগ্রগামী ইউনিটের নিকট পৌঁছে অন্যান্য সেনাপতি ও অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হয়, এ পরিস্থিতিতে সকল কাস্‌ক সিপাহীর উপর সন্দেহ করা হলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। এতে যেসব সিপাহী অফাদার, তারাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠবে, বিগড়ে যাবে। পক্ষান্তরে আস্থা বজায় রেখে কাজ করলে তারা তাদের অফাদারীর প্রমাণ দেয়ার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবে।

অরনেস্টভ নিহত পাস্ক-এর স্থলে সেনাপতি ভিভ্রিভকে কমান্ডার নিযুক্ত করেন এবং তৎক্ষণাৎ সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। সেনাপতি পাস্ক-এর মৃত্যুতে মন ভেঙে যায় রুশ বাহিনীর। কিন্তু এ বিষয়টিকেই তাদের সাহস বৃদ্ধির জন্য কাজে লাগান নতুন কমান্ডার ভিভ্রিভ। তিনি বললেন–

'এখন আমাদের আসমানের খোদা ও যমীনের খোদার সন্তুষ্টি ছাড়া পাস্ক হত্যারও প্রতিশোধ নিতে হবে। তোমরা যদি সত্যিকার রুশী হয়ে থাকো, তাহলে প্রতিজ্ঞা করো, সেনাপতি পাস্ক হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে আমরা ক্ষান্ত হবোনা। আর তাহলো শামিলের পতন।'

সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করে রুশ বাহিনী। জীবনবাজি লড়াই করতে করতে ও জীবন দিতে দিতে এগুতে থাকে তারা। যেখানে প্রয়োজন একজন সিপাহীর, সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে দশজন। প্রতিটি বাঁধা, প্রতিটি সংঘাত জয় করে অগ্রসর হচ্ছে তারা। এভাবে তিনদিনে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে দারগীন পৌঁছে যায় রুশ বাহিনী।

দারগীন প্রবেশ করেই সেনাপতি ভিভ্রিভ বুঝতে পারলেন, রুশ বাহিনীর সব পরিশ্রম, সকল ত্যাগ ছাই হয়ে গেছে। ইমাম শামিল সসৈন্যে দারগীন ত্যাগ করে নদীর ওপারে চলে গেছেন। দারগীনের প্রতিটি গৃহ পুড়ে ছাই। ভিভ্রিভ আরো বুঝতে পারলেন, ইমাম শামিলের যদি দারগীন রক্ষা করার পরিকল্পনা থাকতো, তাহলে পথে রুশ বাহিনীকে আরো সংঘাতের মুখোমুখি হতে হতো।

কমান্ডার ইন চীফ অরনেস্টভ দারগীন পৌঁছে যান। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে তিনি করবেনটা কী? দুশমন নদীর ওপারে। এতোগুলো সৈন্য নিয়ে নদী পার হওয়া কঠিন ব্যাপার। রসদ-সরঞ্জামও এখনো অনেক দূরে। সিদ্ধান্ত হলো, আগে রসদ-সরঞ্জাম দারগীন এসে পৌঁছুক, তারপর ভেবে-চিন্তে কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে।

কিন্তু রসদ-সরঞ্জাম দারগীন নিয়ে আসা অসম্ভবকে সম্ভব করার নামান্তর। সংকীর্ণ উঁচু-নীচু পথের ঘোর-প্যাচ কেটে অতিক্রম করা সহজ নয়। তাছাড়া মুসলিম কমান্ডোদের আক্রমণে পথে ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়েছে বিপুল রসদ-সরঞ্জাম। তিন সপ্তাহের টানা প্রচেষ্টা ও ভয়াবহ যুদ্ধের পর ফল এই দাঁড়ালো যে, রুশ বাহিনীর অধিকাংশ রসদ-সরঞ্জাম পথেই ধ্বংস হয়ে গেছে। হাজার হাজার রসদবাহী গাড়ি উল্টে উল্টে গভীর খাদে পড়ে গেছে।

ইমাম শামিলের মনে কোনো উদ্বেগ নেই। কারণ, এই যুদ্ধে তাঁর মুজাহিদদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে খুবই কম। রুশ বাহিনীর পাদ্রীগণ মৃতদের জন্য প্রার্থনা ও মুমূর্ষুদের জবানবন্দি শ্রবণে এতোই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, একের পর এক কয়েক রাত জেগে কাটাতে হয় তাদের। একটানা রাত্রি-জাগরণে কয়েকজন পাদ্রী অসুস্থ হয়ে নিজেরাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাহস হারিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন তিনজন। বুড়ো শিয়াল এবার টের পায়, তারা দুশমনের ফাঁদে আটকা পড়েছে। রসদ-সরঞ্জাম ছাড়া দারগীন অবস্থান করা আত্মহত্যার সমার্থক। রসদ-সরঞ্জাম নিয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে, সেই সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। সেনাপতি ভিট্রেভ-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন অরনেস্টভ। ভিট্রেভ বললেন, আমাদের এখান থেকে ফিরে যাওয়া মুশকিল। পথে আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য দুশমন পূর্ণ শক্তি ব্যয় করবে। বেটা শামিলের কৌশলই এমন।

রুশ সাম্রাজ্যের মহান এক ব্যক্তিত্ব কমান্ডার ইনচীফ অরনেস্টভ অসহায় দারগীনে বসে কপালে হাত ঠেকিয়ে ভাবছেন। দীর্ঘক্ষণ পর চেচনিয়ার উত্তরাঞ্চলে মোতায়েন রুশ বাহিনীর কমান্ডারদের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে পত্র লিখেন। পত্র নিয়ে রওনা হয়ে যায় ২০ জন কাসৃক স্বেচ্ছাসেবী। তিনি সাহায্য এসে পৌঁছার অপেক্ষা করতে থাকেন।

রাতের বেলা রুশ বাহিনীর কোনো না কোনো অংশে কমাণ্ডো আক্রমণ চালিয়ে তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে নিরাপদে ফিরে যাচ্ছে মুজাহিদরা। যারা মুজাহিদদের ধাওয়া করতে যাচ্ছে, তাদেরও অধিকাংশ মারা পড়ছে মুজাহিদদের হাতে।

ইমাম শামিল ও তার নায়েবদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ যুদ্ধে আক্রমণকারী সব রুশ সৈন্যকে ধ্বংস করায় তারা সফল হবেন। দক্ষিণ চেচনিয়ার দিক থেকে সাহায্য এসে পৌঁছুবে বলে আশা করছেন অরনেস্টভ। কিন্তু এ সাহায্য কবে আসবে, তা বলতে পারেন না তিনি।

রুশীদের সৌভাগ্য, অরনেস্টভের বার্তাবাহকদের কয়েকজন উত্তর চেচনিয়ার সেনাপতি ফ্রেতাগ পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে। পত্র পেয়ে ফ্রেতাগ সঙ্গে সঙ্গে দারগীন অভিমুখে রওনা দেয়। ফ্রেতাগ-এর অধীন সৈন্যদের মধ্যে

কাস্‌ক এবং তাতারী পাহাড়িও ছিলো। জর্জিয়ার সৈন্যদের রেজিমেন্ট ও দু'টি ডিভিশন হলো রুশসেনা।

সেনাপতি ফ্রেতাগ কাস্‌ক ও তাতারী বাহিনী এবং জর্জিয়ার রেজিমেন্টগুলোকে পশ্চিম দিক থেকে দারগীন অভিমুখে রওনা করান এবং নিজে রুশ বাহিনীকে নিয়ে আন্‌ধীর দিক থেকে যাত্রা করেন। সেনাপতি ফ্রেতাগ তার এই নকল-হরকতকে রুটিন মাফিক তৎপরতা বলে প্রকাশ করেন এবং নিজের আসল পরিকল্পনা গোপন রাখেন।

ঠিক এ সময়ে ইমাম শামিল তার পুত্র গাজী মোহাম্মদের অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পান। ইমাম ঠাণ্ডা মাথায় সংবাদটা শুনলেন এবং বললেন– 'ঠিক আছে, আল্লাহর যা ইচ্ছা তা-ই হবে।'

নায়েবদের ধারণা ছিলো, সংবাদ পাওয়ামাত্র ইমাম দেদীন রওনা হয়ে যাবেন, যেখানে গাজী মোহাম্মদ অবস্থান করছে। ইমামের বড় পুত্র জামালুদ্দীন জারের হাতে জিম্মি। স্ত্রী ফাতেমা মারা গেছেন। গাজী মোহাম্মদের অসুস্থতার মূল কারণ মা ফাতেমার মৃত্যু।

কিন্তু এই নাজুক পরিস্থিতিতে দারগীনের রণাঙ্গনে নিজের উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক মনে করছেন ইমাম। দশ ডিভিশন রুশ সৈন্য তার মোকাবেলায় উপস্থিত। মুজাহিদদের সামান্য অবহেলার সুযোগে এই বাহিনী যদি কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে একে তারা তাদের বিরাট কৃতিত্ব ভেবে বসবে।

তথাপি নায়েবদের জোর অনুরোধ, আপনি গাজী মোহাম্মদের খবরা-খবর নেয়ার জন্য দেদীন চলে যান। জাতীয় কর্তব্য ও পিতৃস্নেহের মাঝে সংঘাত চলতে থাকে। অবশেষে কর্তব্যবোধ পিতৃস্নেহের উপর জয়লাভ করে। ইমাম শামিল দৃপ্তকণ্ঠে বললেন– 'আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করছি। তিনি যদি আমার আরো পরীক্ষা নিতে চান, তো আমি প্রার্থনা করছি, যেনো তিনি আমাকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফীক দান করেন। এই পরিস্থিতিতে আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়বো না।'

মুজাহিদ ও সিপাহসালার শামিল পরাজিত করেন পিতা শামিলকে।

দশদিন পর। দারগীনের পশ্চিম দিক থেকে একটি রুশ বাহিনীর এগিয়ে আসার সংবাদ পান ইমাম শামিল। ইমাম মনে করলেন, পেছন দিক থেকে তাঁদের অবরোধ করার পরিকল্পনা এঁটেছেন অরনেস্টভ। তাই অর্ধেক সৈন্যকে দারগীনের মুখে রেখে অবশিষ্টদের নিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যান। কাস্‌ক, তাতারী এবং জর্জিয়ার সৈন্যরাও পাহাড়-জঙ্গলে যুদ্ধ করতে পারঙ্গম। তোপও আছে তাদের কাছে। তথাপি তাদের মুখোমুখী হয়ে যান ইমাম শামিল। ওদিকে আন্‌ধীর দিক

থেকেও সৈন্য আসার সংবাদ পাওয়া যায়। ভাবে মনে হচ্ছে, রুশরা দারগীন অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে। ইমাম শামিলের নায়েব নূর এলাহী ও মোহাম্মদ আমীন নদীর দক্ষিণ তীরে তাদের মোর্চাগুলো আরো সংহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন অরনেস্টভ। দারগীনে অবস্থানরত রুশ সৈন্যদের ফেরত রওনা হওয়ার আদেশ দেন তিনি। রাতের অন্ধকারে দারগীন শূন্য করে ফেলে এই বাহিনী।

নূর এলাহী ও মোহাম্মদ আমীন যখন বিষয়টা টের পান, ততোক্ষণে রুশ বাহিনী দারগীন ত্যাগ করে চলে গেছে পাঁচ মাইল দূরে। হারানো সুযোগের সন্ধানে নেমে পড়ে মুজাহিদরা। মনোবল হারিয়ে ফেলেছে রুশ বাহিনী। এখন পায়ে পায়ে লড়াই চলছে।

দশ মাইলের সফরে সেনাপতি ভিক্টভসহ তিনজন গুরুত্বপূর্ণ রুশ সেনাপতি, পঁচিশজন অফিসার এবং নয়শ পঞ্চাশজন সৈনিক নিহত হয়। আহত হয় আড়াইশ। কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে অসংখ্য। ছিঁড়ে টুকরো হয়ে যায় কমান্ডার ইন চীফ-এর সাদা-কালো পতাকা। মহামূল্যবান তাঁবুটিও ধ্বংস হয়ে যায় তার।

আনধীর দিক থেকে আগত রুশ বাহিনীর ষাট শতাংশ ধ্বংস হয়ে যায় এ যুদ্ধে। দারগীনের পশ্চিমে সেনাপতি ফ্রেতাগ-এর বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে তোপের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে জবরদস্ত গেরিলা লড়াই লড়ে যাচ্ছেন ইমাম শামিল।

সেনাপতি ফ্রেতাগ যখন সংবাদ পান, অরনেস্টভ দারগীন থেকে ফেরত রওনা হয়েছেন, তখন তিনিও সুসংহত হয়ে পেছনে ফিরে যেতে শুরু করেন। ফ্রেতাগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যদের মধ্যে জর্জিয়ার রেজিমেন্টগুলোর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে সবচে' বেশি। ঘোরতর এক সংঘাতে সব ক'জন অফিসার মারা যায় তাদের। যখন আদেশ দেয়ার মতো একজন লোকও অবশিষ্ট রইলো না, তখন তাদের মাঝে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়।

পিছপা হয়ে ফ্রেতাগ একটি খোলা মাঠে পৌঁছে সেখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ঠিক তখন কবারদায় বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছে তার কাছে। সৈন্যদের নিয়ে মোড় ঘুরিয়ে কবারদা অভিমুখে রওনা হয়ে যান তিনি।

দারগীন অভিযান রুশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহান ব্যক্তিত্ব, মহান সেনাপতি ও বুড়ো শিয়াল অরনেস্টভের প্রথম অভিযান। যার ফল বের হলো তার আশার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ অঞ্চলে তার প্রধান লক্ষ্য ছিলো ইমাম শামিলকে ঘিরে ফেলে হত্যা

করা। কিন্তু ফল যা পেলেন, তা হলো– আক্রমণকারী বাহিনীর অধিকাংশ পথেই ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা রক্ষা পেলো, ইমাম শামিলের ফাঁদ ছিঁড়ে বের হওয়ার জন্য তাদের সেনাপতি ফ্রেতাগ-এর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলো।

যুদ্ধে রুশ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ বেশ ক'জন সেনাপতি ও অফিসার মারা যায়। সেনাপতি পাস্ক-এর মৃত্যুকে জার নিজেই 'বিরাট ক্ষতি' বলে আখ্যা দেন। এ অভিযানের ফলাফল ভেঙে চুরমার করে দেয় অরনেস্টভের মনোবল।

ইমাম শামিলের দৃষ্টিতেও এ অভিযানের ফলাফল তার আশানুরূপ ফলেনি। আন্‌ধী থেকে দারগীন পর্যন্ত এলাকার প্রতিটি লোকালয়কে শূন্য করে জ্বালিয়ে ভস্ম করে সরে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনা ছিলো, আক্রমণকারী একজন সৈন্য যাতে প্রাণ নিয়ে সরে যেতে না পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চল্লিশ শতাংশ সৈনিক জীবন নিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উনিশ.

দাগেস্তান, চেচনিয়া ও আশেপাশের এলাকাসমূহে ইমাম শামিলের জিহাদের ডংকা বাজছে। কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহেও স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতা লাভ করছে। কিন্তু অস্তিয়া, কবারদা ও সার্কাশিয়ায় কোনো তৎপরতা নেই। অস্তিয়ার অধিবাসীরা অধিকাংশ খৃস্টান। তারা 'মোহাফেযে কালিসা'র সমর্থক।

সার্কাশিয়ার অবস্থান একেবারে উত্তর-পশ্চিমে। এর কিছু কিছু গোত্র মাঝে-মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে রুশীদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছিলো। কিন্তু এ মুহূর্তে তারাও খামুশ। কবারদার সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলমান। নকশবন্দিয়া তরীকার বুযুর্গদের দাওয়াত-তাবলীগের ফলে দাগেস্তানের সব ক'টি গোত্র সুন্নী মুসলমান। চেচনিয়ার কিছু মানুষ এছনাআশারী শিয়া, বাকিরা সুন্নী। সংখ্যার দিক থেকে খৃস্টানদের অবস্থান দ্বিতীয়।

কবারদা তুলনামূলক উর্বর ও বৃহৎ ভূ-খণ্ড, যার অধিকাংশ ভূমি সমতল। দক্ষিণ-পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে এ ভূখণ্ডটি। কবারদায় রুশ আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে মুজাহিদরা কাজবীন উপসাগরের কূল (দাগেস্তান) থেকে শুরু করে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য মানবন্ধন দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে। রুশ রাজা পিটার আজমের কবারদার ভৌগোলিক গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি ছিলেন। তাই সর্বাগ্রে তিনি কবারদার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। রাণী ক্যাথেরেই-এর আমলে রুশ বাহিনী কবারদার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আরো শক্ত করে নিয়েছিলো।

কিন্তু এ ভূখণ্ডটি কাফকাজের অংশ। এখানকার খান-বেগরাও সুযোগ পেলেই রুশ-নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন হয়ে যেতো। ১৮২২ সালে জার রুশ ও

কবারদার বিভিন্ন খানের মধ্যে এই চুক্তি হয় যে, কবারদার খান ও বেগরা এখন থেকে নিরপেক্ষ থাকবেন; রুশ ও স্থানীয় শাসকদের লড়াইয়ে তারা কারো পক্ষ নেবেন না। রুশ সৈন্যরা অবস্থান করবে কবারদার খৃস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে। কিন্তু পরে যখন আশপাশের এলাকায় খৃস্টানদের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন রাশিয়ানরা চুক্তি ভঙ্গ করতে শুরু করে। তারা কবারদার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় লোকদের উপর, বিশেষত মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। রুশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে কবারদার মুসলিম অধিবাসীরা। কিন্তু কিছুই করতে পারছিলো না তারা।

সেই কবারদার পূর্বে চেচনিয়া ও দাগেস্তান এখন স্বাধীন। পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতেও স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতা লাভ করেছে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় কবারদার খান ও বেগরা। সিদ্ধান্ত নেয়, ইমাম শামিলের সাহায্য নিয়ে রুশ আগ্রাসন থেকে মুক্তি অর্জন করবে তারাও।

১৮৪৬ সালের শুরুর দিক। ইমাম শামিলের কাছে এরাগলের পীর মোল্লা আহমদের পয়গাম আসে– আমার শিষ্যরা কবারদা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে দীনের খেদমত করছে। তাদের বক্তব্য হলো– 'মানুষের চিন্তা-চেতনার শস্য পেকে গেছে। এখন তা কাটার উপযুক্ত সময়।' কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার আগে নিজের লোকদের দ্বারা সেখানকার পরিস্থিতি যাচাই করে নেবেন। আমার কাজ মানুষের মনে সঠিক চিন্তা ও চেতনা সৃষ্টি করা। সিপাহসালার ও ইমাম হিসেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। কবারদার অধিবাসীদের মতি-গতি ও কর্মধারা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারবো না।'

দারগীনের লড়াই চলাকালে কবারদার পরিস্থিতির কারণেই সেনাপতি ফ্রেতাগকে তড়িঘড়ি ফিরে যেতে হয়েছিলো। আর এখন সরাসরি কবারদার উপর আক্রমণ করার দাওয়াতও পেয়ে গেলেন ইমাম শামিল।

কবারদাকে যদি রুশ দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করা যায়, তাহলে দাগেস্তান থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সমগ্র এলাকা স্বাধীনতাকামীদের কব্জায় চলে আসবে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে উভয় ভূখণ্ডের মুজাহিদদের মধ্যে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও কর্মসূচিতে অজেয় এক শক্তিতে পরিণত হতে পারে তারা। রাশিয়ানদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণের সুযোগও হাতে এসে যাবে তখন।

ইমাম শামিল কবারদার ভৌগলিক গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। কবারদা স্বাধীন হয়ে গেলে খৃস্টান প্রদেশগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তাও তিনি জানেন। অস্তিয়া ও সার্কাশিয়ার অবস্থান কবারদার উত্তরে আর আমরেতিয়া ও মংগ্রোলিয়া প্রভৃতি দক্ষিণে। এমতাবস্থায় কবারদা দখল করা মানে মাঝখানের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূখণ্ড মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসা।

১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে ইমাম শামিল তার বাহিনী নিয়ে তমীরখানশুরা অভিমুখে রওনা হন। অরনেস্টভ তৎক্ষণাৎ ইমামের অগ্রযাত্রার সংবাদ পেয়ে যান। কিন্তু ইমাম শামিল আক্রমণটা কোথায় করবেন, সে তথ্য পাননি তিনি। তার ধারণা, ইমাম শামিলের লক্ষ্য তমীরখানশুরা। তাই তমীরখানশুরার প্রতিরক্ষা আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অরনেস্টভ।

ইমাম শামিল কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ তমীরখানশুরাগামী রাস্তা ছেড়ে মোড় নেন পশ্চিমে। এবার রুশ কমান্ডার বুঝতে পারেন, ইমামের উদ্দেশ্য তো কবারদা আক্রমণ।

রুশ সেনাপতি ফ্রেতাগ পূর্ব থেকেই কবারদায় অবস্থান করছিলেন। তিনি ভালোভাবেই বুঝতেন, স্থানীয় বাসিন্দারা বিদ্রোহ করে বসলে পরিস্থিতি সামাল দেয়া রুশ সেনাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ফ্রেতাগ তার অধীন অফিসারদের আদেশ করেন, তোমরা এক হাজার করে সৈন্য ও তোপ নিয়ে সমগ্র কবারদায় ছড়িয়ে পড়ো এবং অতি দ্রুতগতিতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে বেড়াও। একটি ইউনিট উত্তরাঞ্চল থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণাঞ্চলে পৌঁছে সেখান থেকে পূর্বদিকে মোড় নেবে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে রওনা হওয়া ইউনিটটি গন্তব্যে পৌঁছে আবার উত্তরে রওনা হবে। এভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবে যে, এ প্রদেশে বিপুলসংখ্যক রুশ সৈন্য ঢুকে পড়েছে। ফলে আর তারা বিদ্রোহ করার সাহস পাবে না।

অন্যদিকে কমান্ডার ইন চীফ অরনেস্টভ দু' ডিভিশন সৈন্য নিয়ে কবারদা পৌঁছে যান এবং ইমাম শামিলের বাহিনীর মাঝে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মহড়া শুরু করেন।

ইমাম শামিলের ধারণা, তার কবারদা পৌঁছামাত্র সেখানকার জনসাধারণ জিহাদ শুরু করে দেবে। এভাবে কবারদার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানরত রুশ বাহিনী একত্রিত হওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই তিনি তাদের পতন ঘটাবেন। তারপর অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। ইমাম শামিলের আশা, কবারদার জনগণ তার সঙ্গ দিলে অতি দুর্ধর্ষ রুশ সেনারাও মুজাহিদদের কাছে হার মানতে বাধ্য হবে।

ইমাম শামিল কবারদা পৌঁছে স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপের অপেক্ষা করছেন। কিন্তু পা ফেলছে না একজনও। তাদের কোনো তৎপরতাই দেখতে পেলেন না তিনি। নায়েব নূর এলাহীর মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের সাথে যোগাযোগ করেন ইমাম শামিল। কিন্তু যারা ইমাম শামিলকে কবারদা আক্রমণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, এখন মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা সবাই। যেনো তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। মোল্লা আহমদের এক ঘনিষ্ঠ শিষ্য ইমাম

শামিলকে নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং বলে–

'মহামান্য ইমাম! এরা কাফকাজের ঋতুর মতো হঠাৎ বদলে যায়। এদের মন এখনও আপনার সাথে। কিন্তু তরবারী এদের রাশিয়ানদের সঙ্গে।'

ঃ নূর এলাহী! যুদ্ধের ময়দানে প্রয়োজন হয় তরবারীর। এখন দেখছি, তোপ-বন্দুকেরও প্রয়োজন। যাদের অন্তর একদিকে আর অস্ত্র আরেক দিকে, এমন লোক আমাদের প্রয়োজন নেই। এই কাপুরুষদের এতোটুকু সাহসই যখন ছিলো না, তো আমাদেরকে এখানে আসবার জন্য বারবার আবেদন করলো কেনো?

ঃ তার কারণ বোধ হয় তারা রাশিয়ানদের পক্ষ থেকে এতো তীব্র প্রতিরোধের আশংকা করেনি।

ঃ নূর এলাহী! আসলে এরা চায়, এদের যুদ্ধটা আমরাই করে দিই এবং স্বাধীনতার উপঢৌকনটা বরতনে রেখে এদের সামনে পেশ করি। কিন্তু এমনটি না কখনো হয়েছে, না হতে পারে। যারা চায়, তাদের অধিকারের জন্য অন্যরা লড়াই করুক, তারা আজীবন নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিতই থাকে। যে জাতি নিজেদের মুক্তির লড়াই নিজেরা লড়ে না, যারা চায় তাদের মুক্তির লড়াইটা অন্যরা করে দিক, তারা আত্মমর্যাদাহীন অপদার্থ জাতি। এমন জাতি না পারে কখনো মুক্তি অর্জন করতে, না পারে নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ধরে রাখতে। শোন নূর এলাহী! এদের বারবার পীড়াপীড়ির কারণে আমরা একটা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। অন্যথায় আমরা আগেও জানতাম, এরা কেমন চরিত্রের মানুষ। অতীতে কি এরা এদের বোন-কন্যাদেরকে রাশিয়ার শাহজাদাদের কাছে বিয়ে দেয়নি? এরা কুফী– কুফী। আমি কুফীদের জন্য নিজে এবং আমার সৈন্যদের জীবন নষ্ট করতে পারবো না।

ঃ তাহলে এ পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য আপনার আদেশ কী?

ঃ এরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। যেহেতু এরা এ ভূখণ্ডেরই বাসিন্দা, তাই এদের ওয়াদা খেলাফী গাদ্দারীর নামান্তর। আমাদেরকে এখানে ডেকে এরা আমাদের সময় ও শক্তি নষ্ট করেছে। কাজেই এরা আমাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। এই ভূখণ্ডে যদি রাশিয়ানদের সাথে আমাদের লড়াই বেঁধে যায়, তাহলে কবারদাবাসীদের তরবারী রাশিয়ানদের সঙ্গ দেবে। রুশ সৈন্যদের সংঘাত এড়িয়ে আমি এদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ফিরে যেতে চাই। যারা আমাদেরকে বারংবার আসতে পয়গাম পাঠিয়েছিলো, তাদের একজনকেও আমি জ্যান্ত ছেড়ে যাব না। শাহাদাতের ঈর্ষণীয় মৃত্যুকে যদি এরা ভয়-ই করে থাকে, তো এদের যিল্লতির মৃত্যু মরতে হবে। মরে তো সব মানুষই। কিন্তু কেউ মরে ইজ্জতের মরণ, কেউ মরে যিল্লতির।

গাদ্দারদের একটি তালিকা হাতে দিয়ে ইমাম শামিল তার ঝটিকা বাহিনীকে

আদেশ করেন, এদের উপর ঈগলের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ো। অত্র অঞ্চলের রুশদের সাথে সংঘাত এড়িয়ে গাদ্দারদের পরিণতির চূড়ান্তে পৌছিয়ে দাও। তারপর দ্রুত পৌঁছে যাও নিজ এলাকায়।

রুশ সেনাপতি ফ্রেতাগেরও আপ্রাণ চেষ্টা ছিলো, ইমাম শামিলের সাথে এখানে তার সংঘাত না বাঁধুক। সে কারণে বোধ হয় মুজাহিদরা যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী খানদের শাস্তি দিলো, তখন তাদের রক্ষা করার জন্য রুশ সেনাপতি কোনো পদক্ষেপই নিলেন না। এই খানরা ছিলো রুশদের দোসর। রুশীদের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এদের রক্ষা করা রুশ শাসকদের কর্তব্য ছিলো।

কবারদার খানদের কাপুরুষতার কারণে যদিও ইমাম শামিল তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলেন না; তবু ইমামের হাতে কতিপয় খানের শাস্তিতে রুশদের মর্যাদায় আঘাত লেগে যায়। ইমাম শামিলের ঝটিকা বাহিনী কবারদার বিভিন্ন এলাকায় এতো দ্রুত ছুটে বেড়ায় যে, দেখে রুশী সেনাপতিরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

কবারদার কুফীদের জন্য নিজের শক্তি নষ্ট করলেন না ইমাম শামিল। এর জন্য তার কোনো দু:খবোধ নেই। রুশ সেনাপতিদের মনেও আনন্দ যে, চালাকি করে তিনি নিজের দুর্বলতাও গোপন করে রাখলেন এবং কবারদাও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেলো। শাহেনশাহ কমান্ডার ইন চীফ অরনেস্টভ ও সেনাপতি ফ্রেতাগ দু'জনকেই ধন্যবাদ জানান।

বিশ.

অত্যন্ত নির্ভীক, দুঃসাহসী, দৃঢ় প্রত্যয়ী, গোঁয়ার, আত্মপরায়ণ, আত্মপূজারী, জেদী, হঠকারী, আত্মম্ভর ও উগ্র। মোটকথা কাফকাজের সকল বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র একত্রিত হয়েছে হাজী মুরাদের মধ্যে। এই ভালো এই মন্দ, এই শান্ত এই উগ্র। এই ত্যাগী এই ভোগী, এই অনুগত এই বিদ্রোহী। এই নিবেদিত মুসলমান, এই কাফেরের দোসর– এমন চরিত্র যার, তার নাম হাজী মুরাদ। সাহস তার পাহাড়ের মতো উঁচু, প্রত্যয় পাথরের মতো শক্ত। ঈগলের ন্যায় প্রখরদৃষ্টি, চিতার ন্যায় সাহসী– অথচ কাফকাজের ঋতুর ন্যায় বহুরূপী।

লোকটি যদি স্বতন্ত্র ও স্থির চরিত্রের অধিকারী হতেন, যদি নিজের সব শক্তি জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ব্যয় করতেন; তাহলে ইতিহাসে তিনি এক মহান ব্যক্তি হিসেবে বেঁচে থাকতেন। হাজী মুরাদ নিয়ম পালন করাকে মনে করতেন অপমান। তিনি শত্রুর কয়েদি হয়েও বাতাসের ন্যায় স্বাধীন থাকতে চাইতেন। মনোমালিন্য হলে নিজের স্বার্থে এমন কিছু করে বসতেন, যা স্তম্ভিত করে তুলতো যে কোনো

বিবেকবানকে। কখনো আপনদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুশমনকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিতেন, ঈগলের ন্যায় শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন, সিংহের ন্যায় লড়াই করতেন। আবার কখনো তরবারীর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতেন সেই আপনদেরই। এমনই বীর যে, যমের চোখে চোখ রেখে মুখ টিপে হাসতেন, আবার এতোই স্বার্থপর যে, ব্যক্তি স্বার্থের খাতিরে একান্ত আপনজনেরও জীবন নিয়ে তামাশা করতেন অকুণ্ঠ চিত্তে।

১৮৩৪ সালে তিনি তার মুখডাকা মা, খোনজাকের রাণী খানমের হত্যার প্রতিশোধে দাগেস্তানের দ্বিতীয় ইমাম হামজা বেগকে খোনজাকের মসজিদে খুন করেছিলেন। তার জানা ছিলো, মুখডাকা মায়ের হত্যায় মাগতুলীর সরদার আহমদ খানের হাত আছে এবং আহমদ খান রাশিয়ানদের দোসর। খানমের গর্ভজাত পুত্রও বোধ হয় আহমদ খান থেকে এর প্রতিশোধ নিতে পারতো না, কিংবা ক্ষমা করে দিতো। কিন্তু শত্রুকে ক্ষমা করতে শেখেননি হাজী মুরাদ।

আহমদ খান থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পন্থা দু'টি। প্রথমত ইমাম শামিলের হাতে বায়আত করে রাশিয়ানদের দোসর আহমদ খানের উপর আক্রমণ করা। দ্বিতীয়ত নিজেও রুশীদের দোসর হয়ে আহমদ খানের মত মর্যাদার অংশীদার হওয়া।

হামজা বেগের শাহাদাতের পর ইমাম শামিল দাগেস্তানের ইমামের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং অসামান্য বীরত্ব, সাহসিকতা ও জিহাদী স্পৃহার বদৌলতে সমগ্র দাগেস্তানের সর্বজনস্বীকৃত জননেতায় পরিণত হন। কিন্তু হাজী মুরাদ ইমাম শামিলের অধীনে দ্বিতীয় স্তরের লোক হিসেবে কাজ করতে পারলেন না; অবলম্বন করলেন ভিন্ন এক পথ। তিনি তিবলীসে অবস্থানরত রুশী ভাইসরয়কে লিখলেন- 'খানমের পুত্র হিসেবে আমি সেই চুক্তি পালন করে যাবো, যা উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিলো।' নিজের কথার সত্যতার প্রমাণ দেয়ার জন্য তিনি খোনজাক ও তার আশপাশের এলাকা থেকে ইমাম শামিলের সমর্থকদের তাড়িয়ে দেন।

হাজী মুরাদ ও রুশীদের মধ্যে কোনো সমঝোতা হয়ে যাক, আহমদ খান তা চায় না। সে জানে, হাজী মুরাদ সাহসী ও কঠিনপ্রাণ মানুষ। রুশীরা যদি তাকে বরণ করেই নেয়, তাহলে নিজের যোগ্যতার বলে সে তাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে। আহমদ খান এ-ও জানত যে, হাজী মুরাদ তাকে ক্ষমা করবে না এবং সুযোগ পেলে অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে। তাই আহমদ খান রুশীদের মনে হাজী মুরাদের ব্যাপারে অনাস্থা সৃষ্টি করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। সে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য খানকে রুশ ভাইসরয়ের নিকট প্রেরণ করে। তারা ভাইসরয়কে বুঝাবার চেষ্টা করে, হাজী মুরাদ তলে তলে ইমাম শামিলের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছে; মূলত তিনি শামিলেরই লোক। তাছাড়া লোকটি বড় ভয়ংকর; কোনো অবস্থাতেই তার উপর ভরসা করা উচিত হবে না।

আহমদ খান নিজেও ভাইসরয়ের নিকট গিয়ে বললো– 'বিষধর সাপকে আপনি যতোই দুধ পান করান না কেনো, কখনো সে দংশন থেকে বিরত হবে না। হাজী মুরাদ ইমাম শামিলের বিশ্বস্ত গুপ্তচর ও খাস নায়েব। আপনি শাহেনশাহ জার রুশের প্রতিনিধি। কাজেই আপনি সহযোগীদের সৎপরামর্শগুলো অবমূল্যায়ন করবেন না বলে আশা করি। প্রয়োজনে আমাদের কথাগুলো আপনি শাহেনশাহ পর্যন্ত পৌছিয়ে দিন।'

পরামর্শটা ভেবে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আহমদ খানকে বিদায় করে দেন ভাইসরয়। আহমদ খান নিজ এলাকায় গিয়ে নানা সূত্রে রুশীদের কাছে হাজী মুরাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পৌছাতে শুরু করে। সে পরিকল্পিতভাবে কয়েকটি বিদ্রোহের ঘটনা ঘটিয়ে তার দায়-দায়িত্ব হাজী মুরাদের উপর চাপিয়ে দেয়।

খোনজাকের সন্নিকটে অবস্থানরত রুশ সেনা কমান্ডার মেজর লাজরাফের কানও ভারী করতে থাকে আহমদ খানের লোকেরা। মেজর লাজরাফ পূর্ব থেকেই হাজী মুরাদকে ভয়ংকর মানুষ বলে মনে করতেন। যে কারণে তিনি বারবার উর্ধ্বতন অফিসারকে লিখেছিলেন, অবিলম্বে হাজী মুরাদের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। অবশেষে ভাইসরয় সিদ্ধান্ত নেন, আলোচনার নাম করে হাজী মুরাদকে তমীরখানশুরা নিয়ে আসবো এবং সেখানে তাকে বন্দি করে তিবলীসে নিয়ে আটকে রাখবো।

হাজী মুরাদের নিকট বার্তা প্রেরণ করা হয়, আপনি তমীরখানশুরা এসে আদিরিয়ার খানম ও রুশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নবায়ন করুন। হাজী মুরাদ সরল বিশ্বাসে তমীরখানশুরা এসে পৌছান। সেখানে তাকে মেহমানখানায় বসতে দেয়া হয়। সাদর আপ্যায়নও করা হয়। খাওয়ানো হয় মদ। নেশাগ্রস্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লে অস্ত্র খুলে নেয়া হয় তার দেহ থেকে। যখন চৈতন্য ফিরে পান, তখন তিনি নিরস্ত্র এবং আহমদ খান ও তার সশস্ত্র লোকদের দ্বারা অবরুদ্ধ।

হাজী মুরাদ বললেন, তার মানে রুশ ভাইসরয় আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

আহমদ খান বললো, তুমি বন্দি। ভাইসরয়ের উল্লেখ শ্রদ্ধার সাথে করা উচিত। রুশ শাসকরা যদি তোমার মতো হঠকারী লোকদেরকে আমাদের ন্যায় সম্মানিত সরদারদের উপর প্রাধান্য দিতে শুরু করেন, তাহলে তাদের আর রাজ্য শাসন করতে হবে না।

ঃ তোমরা প্রতারণার মাধ্যমে আমাকে নিরস্ত্র করেছো; আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে কথা বলবো।

ঃ ভাইসরয়ের হাতে তোমার মতো লোকদের কথা শুনার সময় নেই। আমি তোমাকে গ্রেফতার করেছি। এই বলে আহমদ খান তার বাহিনীকে ইশারা করে।

তারা হাজী মুরাদের হাত-পা বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। তারপর পায়ে শিকল পরিয়ে একটি তোপের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

আহমদ খান রুশ শাসকদের পরামর্শ দেয়, হাজী মুরাদের মত ভয়ংকর লোককে এক্ষুনি গুলি করে মেরে ফেলা দরকার। কিন্তু অফিসারদের প্রতি ভাইসরয়ের আদেশ, হাজী মুরাদকে তিবলীস পাঠিয়ে দাও। আহমদ খান বললো, ঠিক আছে; তবে পথে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেনো করা হয়।

শীতের মওসুম। পঞ্চাশজন সশস্ত্র রুশ সৈন্য এক অফিসারের নেতৃত্বে হাজী মুরাদকে নিয়ে তিবলীস অভিমুখে রওনা হয়। প্রচণ্ড বরফপাতের কারণে এ সময়ে এ পথে পায়ে হেঁটে সফর করতে হয়। হাজী মুরাদের দু'হাতে হাতকড়া, কোমরে বাঁধা কয়েক ফুট দীর্ঘ শিকল শক্তিশালী সুঠামদেহী এক রুশ সেনার কোমরের সঙ্গে বাঁধা। বারজন সিপাহী তার সামনে। বারজন পিছনে। অবশিষ্টরা ডানে ও বাঁয়ে। কমান্ডারের সতর্ক দৃষ্টি একনিষ্ঠভাবে আসামির প্রতি নিবদ্ধ। তাকে জানানো হয়েছে, আসামী অত্যন্ত ভয়ংকর; পথে পালাবার চেষ্টা করতে পারে। পালাবার চেষ্টা করলে অফিসারকে গুলি করার অধিকার দেয়া আছে। রুশ অফিসার আসামী হাজী মুরাদকে তার ক্ষমতার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং বলছে– 'শোন জংলী! রাস্তা থেকে এক ইঞ্চিও এদিক-ওদিক সরবার চেষ্টা করো না কিন্তু। অন্যথায় আমার গুলি খেয়ে সাধের জীবনটা তোমাকে এখানেই হারাতে হবে।'

হাতকড়া পরিহিত হাজী মুরাদ কোনো কথা বলছেন না; কিন্তু তিনি বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে হাঁটছেন।

পথে একস্থানে একটি নালার উপর ছিলো কাঠের একটি সাঁকো। বরফের ভারে ভেঙে গেছে সাঁকোটি। সাঁকোর স্থান থেকে এক ফার্লং দূরে একটি পাহাড়ের উপরে গিয়ে নালাটি এতো চিকন হয়ে গেছে যে, সেখান দিয়ে লাফ দিয়েই নালা পার হওয়া যায়। এখন নালাটি অতিক্রম করতে হলে পাহাড়ে চড়ে সেখান দিয়েই পার হতে হবে। কিন্তু পাহাড়ে আরোহণের পথটা অত্যন্ত সংকীর্ণ; দু'জন লোক এ পথে পাশাপাশি চলতে পারে না। তাই রুশ অফিসারদের নির্দেশে সিপাহীরা এক সারিতে দাঁড়িয়ে যায়। হাজী মুরাদ সারির মধ্যখানে। ধীরে ধীরে পাহাড়ে আরোহণ করতে শুরু করে সিপাহীরা। চূড়ার ঠিক নিকটে গিয়ে সরু এক প্রাচীরের রূপ ধারণ করেছে রাস্তাটি। অতি সাবধানতার সাথে অতিক্রম করতে হয় প্রাচীর।

এ স্থানে পৌঁছে হাজী মুরাদ হাতকড়ার শিকলটি দু' হাতে ধরে সজোরে ঝটকা এক টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে সিপাহী দু'টিকে নিয়ে আসে দু' বাহুর মাঝে। ওদের ঝাপটে ধরে লাফ দেয় সোজা নীচে। হাজী মুরাদ এক সিপাহীকে এমনভাবে কাবু করে রাখেন; যাতে নীচে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর মাটিতে আগে পড়ে সে। হয়েছেও তা-ই। রুশ সিপাহী যখন কয়েকশ ফুট নীচে গভীর এক গর্তে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়,

তখন হাজী মুরাদ তার উপরে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় রুশীর দেহ। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় হাজী মুরাদের একটি পা। ভেঙ্গে যায় পাজরের তিনটি হাড়। রুশ অফিসার মনে করে, সিপাহী পা পিছলে নীচে পড়ে গেছে আর আসামীও তার সঙ্গে যমের মুখে পতিত হয়েছে।

অফিসারের ধারণায় দু'জনের একজনেরও জীবনে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এতো উপর থেকে পাথরও যদি নীচে গড়িয়ে পড়ে, তো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আবার এদের লাশও উপরে তুলে আনা সম্ভব নয়। অগত্যা অফিসার সিপাহীদের বলে, ঐ মোটা সিপাহীটাকে ধন্যবাদ জানানো দরকার, লোকটা আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছে। তারা দু'জনই শেষ হয়ে গেছে। ভালোই হয়েছে। এবার আমরা নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পারি; তবে সাবধানে কিন্তু।'

অফিসার তমীরখানশুরা ফিরে গিয়ে দুর্ঘটনার সংবাদ জানায় এবং সরকারী ফাইলে 'হাজী মুরাদ মৃত্যুবরণ করেছে' বলে রিপোর্ট হয়ে যায়।

এদিকে গর্তে নিক্ষিপ্ত হাজী মুরাদ পা ও বুকে প্রচণ্ড ব্যথা পাওয়া সত্ত্বেও চুপচাপ শুয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী এক লোকালয়ে গিয়ে ওঠেন। এলাকার সরদার জখমীকে চিনে ফেলেন। তিনি হাজী মুরাদকে একটি পশুর খোয়াড়ে লুকিয়ে রেখে সেবা-চিকিৎসা করাতে শুরু করেন। দিন কয়েকের মধ্যেই হাজী মুরাদ সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু তার ভাঙা পা-টা সামান্য বাঁকা হয়ে গেছে। আজীবনের জন্য খোড়া হয়ে যান তিনি।

❁ ❁ ❁

একরাত। কক্ষে বসে দীপের আলোতে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করছেন মেজর লাজরাফ। কক্ষের বাইরে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে। হঠাৎ শাঁ শাঁ করে দু'টি ছায়ামূর্তি ধেয়ে আসে প্রহরীদের দিকে। আত্মসংবরণ করতে না করতেই লাশে পরিণত করে তাদের। কক্ষে প্রবেশ করে ছায়া দু'টো। মেজর লাজরাফকে উদ্দেশ করে একজন বলে– 'লাজরাফ! চিনেছো আমাকে? আমি হাজী মুরাদ। প্রতারণা করে তুমি আমাকে গ্রেফতার করেছিলে। ভেবেছিলে, হাজী মুরাদকে লাঞ্ছিত করে তুমি বেঁচে থাকবে!'

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যান লাজরাফ। বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। টের পেয়ে হাজী মুরাদ বললেন– 'বাইরে দেখছো কী? ওসব ঝামেলা আমরা সেরে এসেছি। তোমার কুকুররা আমার পথ রোধ করতে পারলে তো আমি এ পর্যন্ত আসতেই পারতাম না।'

একথা বলেই হাজী মুরাদ লাজরাফের উপর চিতার ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যে তার দেহ থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে যায়। বিলম্ব না করে কর্তিত মাথাটা হাতে করে বেরিয়ে পড়েন যেভাবে এসেছিলেন ঠিক সেভাবে।

ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ঘাতককে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে রুশ সেনারা। কিন্তু তারা জানে, ধাওয়া করে হাজী মুরাদকে ধরা অতো সহজ নয়।

তমীরখানশুরায় মেজর লাজরাফের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছুলে রুশ সেনা ছাউনীতে হুলস্থূল শুরু হয়ে যায়। রুশ অফিসার হাজী মুরাদকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করেছিলো। কিন্তু সেই 'মৃত হাজী' এখন শুধু জীবিত-ই নয়– মেজর লাজরাফকে হত্যা করে নিজের অপমানের প্রতিশোধও নিয়ে ফেলেছে! এখন যে সে ইমাম শামিলের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবে, তা-ও রুশীদের কাছে স্পষ্ট। তাই রুশ কমান্ডার ইনচীফ সিদ্ধান্ত নেন,হাজী মুরাদকে কাছে ভেড়াবার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার নির্দেশে খোনজাকের একদল লোকের মাধ্যমে হাজী মুরাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার শুরু হয়ে যায়।

মেজর লাজরাফের বিচ্ছিন্ন মাথাটা নিয়ে গিয়ে ইমাম শামিলের পায়ে নিক্ষেপ করেন হাজী মুরাদ। বলেন– 'মহামান্য ইমাম! এই মাথাটা আমি নিজ হাতে কেটে এনেছি। বুঝতেই পারছেন, রুশীদের সঙ্গে আমার আপোস-রফার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। আমার মস্তবড় ভুল ছিলো যে, আমি বাবলা গাছ থেকে মিষ্টি ফলের আশা করেছিলাম। আমি রুশীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু তারা প্রতারণার মাধ্যমে আমাকে বন্দী করে ফেলে। যাদেরকে সহযোগিতা দিয়ে আমি শক্তিশালী বানিয়েছি, তারা আমাকে পথের কাটা মনে করে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। আমি এখন নিজ দেশে পরবাসী। যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লড়াই করছে, তাদের সঙ্গ দেবার পরিবর্তে শ্বেত শয়তানদের সঙ্গ দিয়েছিলাম বলেই আল্লাহ আমার সম্মানজনক জীবনের সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি চাই, এবার আমার তরবারী আল্লাহওয়ালাদের তরবারীর সঙ্গে মিলে ক্ষমতা প্রদর্শন করুক।'

ইমাম শামিল বললেন, তাওবার দ্বার সব সময়ই উন্মুক্ত। প্রভাতের পথভোলা ব্যক্তি যদি সন্ধ্যায় ফিরে আসে, তাহলে তাকে দেউলে বলা যায় না। আল্লাহর শোকর, তিনি আলোর ন্যায় তোমায় পথ-প্রদর্শন করেছেন। এতোদিন তুমি অন্ধকারে ঘুরে মরছিলে। তুমি আমার শত্রুতে পরিণত হওয়ার কারণ, তুমি হামজা বেগের নায়েব ছিলে। বিষয়টিকে এতোদিন তুমি খানমের মুখঢাকা পুত্রের দৃষ্টিতে দেখছিলে। এখন কিছু সময়ের জন্য একজন মুজাহিদের মাথা দিয়ে চিন্তা করে দেখো, খোনজাকের খান ও খানম কওমের গাদ্দার ছিলো কিনা। একজন কাফের মন থেকে ইসলাম গ্রহণ করে সাচ্চা মুসলমান হতে পারে। কিন্তু গাদ্দার-মুনাফিক কোনোদিন বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। আমি তোমাকে খোশ আমদেদ জানাই। আজ থেকে তুমি আমার এক নম্বর নায়েব।

একথা বলে-ই ইমাম শামিল হাজী মুরাদকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন, আজ থেকে তুমি খোনজাকের গবর্নর। তোমার এলাকাকে তুমি রাশিয়ার অবৈধ দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করবে। আমি তোমাকে তার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবো। নিজ এলাকায় গিয়ে তুমি লোকদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করো। অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠলে আমাকে সংবাদ দিও। আমি ওখান থেকে হানাদার রুশদের বের করেই ছাড়বো।

হাজী মুরাদ নিজ এলাকায় পৌছে যান। রাস্তার দু'পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জনতা তাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানায়। তাকে ধোঁকা দিয়ে গ্রেফতার করে হত্যা করার পরিকল্পনা এঁটেছিলো রুশরা। কিন্তু অলৌকিকভাবে তিনি জীবনে রক্ষা পেয়ে যান। হাতে হাতকড়া পরা ছিলো তার। একান্নজন রুশ রক্ষীসেনার কঠিন পাহারাদারীর মধ্য থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন তিনি। ইমাম শামিলের পর একমাত্র এই হাজী মুরাদই এমনি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। যা হোক, খোনজাক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের গোত্রগুলো সমবেত হয় হাজী মুরাদের পতাকাতলে।

ইমাম শামিল এমন কিছু কমান্ডো বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা শত্রুর উপর ঝড়ের মতো আক্রমণ করে বিদ্যুদ্বেগে ফিরে আসতে সক্ষম। কিন্তু এতোকাল ইমাম শামিলের অবর্তমানে তাঁর কোনো নায়েবকেও এসব অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এবার ইমাম শামিলের সে অভাব পূরণ করলেন হাজী মুরাদ। হাজী মুরাদের শামিল বাহিনীতে যোগদানের পর অরক্ষিত হয়ে পড়েছে রুশ বাহিনীর দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ। গুটিকতক জানবাজ নিয়ে তিনি এমন আকস্মিক ও দ্রুত আক্রমণ চালাতে শুরু করেন যে, রুশ বাহিনীর সব আয়োজন-শৃংখলা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। হাজী মুরাদের গোত্রের স্বতন্ত্র প্রতীক হলো লাল বর্ণের পাগড়ি। গোত্রের মহিলারা ব্যবহার করে লাল ওড়না। তিনি যে ঘোড়াটি ব্যবহার করেন, তার রংও লাল। তিনি বারবার ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে অসংখ্য রুশ সেনাকে হত্যা করেন।

এক সন্ধ্যা। তমীরখানশুরায় এক রুশ সেনাছাউনীতে নাচ-গানের আসর চলছে। এমন সময়ে একশ অশ্বারোহী নিয়ে তীরবেগে ছুটে আসেন হাজী মুরাদ। আক্রমণ করেন ছাউনিতে। হুলস্থুল শুরু হয়ে যায় ছাউনীর সেনাদের মধ্যে। হাতের কাছে যাকে পেলেন, তাকেই হত্যা করতে শুরু করেন। রুশ বাহিনী নিজেদের সামলে নিয়ে আক্রমণকারীদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে না দাঁড়াতে উধাও হয়ে যায় হাজী মুরাদ ও তার বাহিনী।

এ অভিযানে আপাদমস্তক লাল পোশাকে আবৃত হয়ে এসেছিলেন হাজী মুরাদ। লালে লাল করে দিয়ে যান তমীরখানশুরার মাটিকে। রুশ বাহিনীর রাঙা রক্ত থেকে এদিন বঞ্চিত রাখেননি তিনি তমীরখানশুরা ভূখন্ডটিকে।

হাজী মুরাদের দুশমন আহমদ খান যখন জানতে পারে, হাজী মুরাদ রুশদের শৃংখল ছিন্ন করে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছে এবং মেজর লাজরাফের মাথা কেটে নিয়ে ইমাম শামিলের পায়ে রেখেছে, তখন থেকেই সে অস্থির-বেকারার। আহমদ খান জানে, হাজী মুরাদ তার থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। রুশরা হাজী মুরাদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না, তাও তার অজানা নয়। তাই সে নানা ছলছুতা দেখিয়ে তমীরখানশুরায়ই সময় অতিবাহিত করতে থাকে।

যেদিন হাজী মুরাদ তমীরখানশুরায় রুশ ছাউনীতে আক্রমণ করলেন, সেদিন আহমদ খানের খবর হয়ে গেলো, এখন আর রুশ ছাউনীতেও তার নিরাপত্তা নেই। ফলে হঠাৎ তার জংলী মানসিকতা জেগে ওঠে। মনে মনে স্থির করে, যা হওয়ার হবে, নিজের এলাকায় গিয়েই অবস্থান করবো এবং হাজী মুরাদের মোকাবেলা করে চলবো।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আহমদ খান। কিছুদিন বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে একদিন মারা যায়। হাজী মুরাদের প্রতিশোধ নেয়ার সাধ পূর্ণ হলো না তার। আহমদ খানের বয়স্ক কোন সন্তান নেই। তাই সিদ্ধান্ত হলো, তার স্ত্রী হবে তার স্থলাভিষিক্ত।

আহমদ খানের স্ত্রীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। জমকালো অনুষ্ঠান চলছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে বেশ ক'জন রুশ অফিসার ও হাজার হাজার সৈন্য। আহমদ খানের বিধবা মহলে মেহমানদের তদারকি করছে। কিন্তু অজানা এক আতংকের ছাপ পরিস্ফুট তার চেহারায়। তাকে চাকর-চাকরানিরা বারংবার এই ভীতির কারণ জিজ্ঞেস করছে। প্রতিবারই সে জবাব দিচ্ছে, আজ কিছু একটা অঘটন ঘটবে মনে হচ্ছে। জানিনা কী ঘটবে। আমার মনটা কেনো যেনো দুরু দুরু করছে।

স্থলাভিষিক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আর অল্প মাত্র বাকি। মেহমানগণ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। হঠাৎ জঙ্গুতায়ীর অলি-গলি ধাবমান ঘোড়ার পদশব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ডজন ডজন গুলির শব্দ ভেসে আসতে শুরু করে কানে। প্রকম্পিত হয়ে ওঠে সমগ্র এলাকা।

আহমদ খানের মহলের রাস্তা চারটি। হাজী মুরাদের ঈগল বাহিনীর পঁচিশ জনের চারটি ইউনিট মহলের চার পার্শ্বে এতো দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ধেয়ে আসে যে, মানবচক্ষু এমন দৃশ্য কমই দেখেছে। সবক'টি রাস্তায় অবস্থানরত সিপাহী ও আম জনতা যেনো সেই পশুপাল, যার মধ্যে ব্যাঘ্র ঢুকে পড়েছে। চারজন জানবাজ নিয়ে হাজী মুরাদ এসেছেন পঞ্চম পথে। খানমের মহলের একটি দরজা নগরীর পেছনমুখী। এই দরজাটি অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। দরজার ভেতর দিক থেকে একটি সুড়ঙ্গ পথ চলে গেছে এক ফার্লং দূর পর্যন্ত। সুড়ঙ্গ পথের শেষ সীমান্তে

ছোট্ট একটি পাকা ঘর। বিপদের সময় মহলের অধিবাসীরা ব্যবহার করতো সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে বের হওয়ার এই গোপন পথ। হাজী মুরাদ এ সুড়ঙ্গ পথের সব তথ্য নিয়ে রেখেছেন আগেই।

হাজী মুরাদের চার বাহিনী মহলের নিকটে পৌঁছে যায়। মাখতুলীর পুলিশ ও রুশ বাহিনী মহলের নিরাপত্তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। রুশ সেনারা মহলের দরজাগুলোর নিকটে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে হাজী মুরাদ আহমদ খানের বিধবাকে তুলে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে যান এবং তাঁর সৈনিকদের ফিরে আসার নির্দেশসূচক পরিকল্পনা অনুসারে ফাঁকা গুলি ছোঁড়েন।

হাজী মুরাদের সৈন্যরা নিরাপদে ফিরে আসার জন্য নতুন এক কৌশল অবলম্বন করে। তারা মহল থেকে বের হওয়ার চারটি পথে দু'টি করে আরোহীবিহীন ঘোড়া হাঁকিয়ে দেয়। রাস্তায় অবস্থানরত সৈনিকরা দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে বেয়াড়া ঘোড়া মনে করে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এদিক-ওদিক দৌড়াতে শুরু করে। এই সুযোগে তীরবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে যায় হাজী মুরাদের সৈন্যরা।

রুশ অফিসারগণ সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, তারা নতুন খানমের মহলকে রক্ষা করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই পুনরায় মহলে প্রবেশ করে তারা কয়েকজন ভৃত্যের লাশের সঙ্গে একটি চিরকুট দেখতে পায়। তাতে লেখা আছে–

'হাজী মুরাদ তার বধূকে নিয়ে গেছে।'

এ ঘটনায় রুশদের মর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত হানে। এরপর থেকে নিরপেক্ষ গোত্রগুলো ইমাম শামিলের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করে। আর যারা এতোদিন রাশিয়ার পক্ষপাতিত্ব করে আসছিলো, তারা সমর্থন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়।

বুড়ো শিয়াল অরনেস্টভ-এর উপর বেশ আশাবাদী ছিলেন জার রুশ। কিন্তু কাফকাজের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দিন দিন জোরদার হচ্ছে মুক্তিকামীদের আন্দোলন। আর মনোবল হারিয়ে ফেলছে রুশ বাহিনী। তবে হাজী মুরাদের এই অপহরণ ঘটনা থেকে ফায়দা হাসিল করতে চায় অরনেস্টভ।

কমান্ডার ইন চীফ-এর কক্ষে বসে কথা বলছে গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার ও কমান্ডার।

কমান্ডার বললো, আমি জঙ্গুতাই'র ঘটনা থেকে এক্ষুনি ফায়দা হাসিল করতে চাই। এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

অফিসার বললো, আহমদ খানের বিধবা স্ত্রী দানিয়েল বেগের স্ত্রীর সতালো মা। এ সূত্রে ভদ্র মহিলা দানিয়েল বেগের শাশুড়ি। হাজী মুরাদ তাকে অপহরণ করেছে এবং সম্ভবত সে তাকে বিয়ে করে ফেলবে। দানিয়েল বেগ বিষয়টি মেনে নেবে না। আমরা যদি দানিয়েল বেগের গোত্রের লোকদেরকে উত্তেজিত করতে

পারি, তাহলে হয়তো দানিয়েল বেগ ইমাম শামিলের দল ত্যাগ করবে, নতুবা শামিলকে বাধ্য করবে খানমকে উদ্ধার করে দিতে। উভয় অবস্থাতেই হাজী মুরাদ কোণঠাসা হয়ে পড়বে। এই উভয় পদ্ধতিই আমাদের জন্য কল্যাণকর।

কমান্ডার ইন চীফ বললেন, বেশ! বেশ! আমাদের পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, এই বিধর্মীদের (মুসলমানদের) পরাজিত করার কার্যকর পন্থা দু'টি। এক. নারী। দুই. স্বজাতির কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি। আমি আশা করি, হাজী মুরাদের এই অপহরণ ট্রাজেডির সূত্রে আমরা মুসলমানদের পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত করাতে সক্ষম হবো।

অফিসার বললো, দানিয়েল বেগ কিংবা হাজী মুরাদ– দু'জনের যে-ই শামিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তার সঙ্গে আমাদের খাতির পাততে হবে এবং শামিলের পতন হওয়া পর্যন্ত তার পূর্বের অপরাধগুলো ক্ষমার চোখে দেখতে হবে।

কমান্ডার ইন চীফ বললেন, যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব। যে কেউ শামিলের সঙ্গ ত্যাগ করবে, আমরা তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবো। টাকার শক্তি অনেক। আমি তোমাকে এ কাজে প্রয়োজন অনুপাতে অর্থ ব্যয় করার অনুমতি দিয়ে দিলাম। শাহেনশাহ্ আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন।

অল্প ক'দিনের মধ্যে দানিয়েল বেগের প্রদেশে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়, 'সুলতান আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। আমাদের সুলতান হাজী মুরাদকে শ্বশুর তথা পিতা হিসেবে বরণ করেছেন।'

ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয় রুশ গোমস্তাদের পরিকল্পনা। প্রজাদের ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য শুনে শুনে দানিয়েল বেগ তিক্ত-উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং এ ব্যাপারে ইমাম শামিলের সঙ্গে কথা বলেন।

ইমাম শামিল তাঁর নায়েবদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। নায়েবগণ সর্বসম্মতিক্রমে অভিমত প্রদান করেন যে, হাজী মুরাদের ব্যক্তিস্বার্থের উপর জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। তার উচিত আহমদ খানের বিধবা স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেয়া এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা, যা রাশিয়ান এবং স্বজাতীয় গাদ্দারদের ব্যতীত আপনদের ওপরও আঘাত হানে।

হাজী মুরাদের নিকট ইমাম শামিলের সিদ্ধান্ত পৌছিয়ে দেয়া হয়। হাজী মুরাদ বিনা আপত্তিতে আহমদ খানের অপহৃতা স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেন।

দুশমনের যেসব চর এতোদিন দানিয়েল বেগকে উস্কানি দিয়ে আসছিলো, এবার তারা বোল বদল করে হাজী মুরাদকে উত্তেজিত করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে জেগে ওঠে হাজী মুরাদের আত্মমর্যাদাবোধ। জনাপাঁচেক অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে ইমাম শামিলের দরবারে উপস্থিত হন এবং কোনো ভূমিকা ছাড়াই উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন–

'আমি আপনার সঙ্গে চূড়ান্ত কথা বলতে এসেছি।'

ঃ আমার নায়েব হিসেবে, নাকি হাজী মুরাদ হিসেবে?

ঃ প্রথমে আমি আপনার নায়েব হিসেবে বলতে চাই যে, আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিন। আহমদ খান ছিলো আমার দুশমন। আমার একটা বংশকে সে ধ্বংস করেছে। তার থেকে প্রতিশোধ নেয়া ছিলো আমার ন্যায্য অধিকার। তার বিধবা স্ত্রী যদি সম্পর্কে দানিয়েল বেগের শাশুড়ি হয়ে থাকে, তাতে আমার কি? মহিলা আমার শত্রুর স্ত্রী।

ঃ শোন নায়েব! খাল-নদী যদি সমুদ্রে মিলিত হয়ে লীন হয়ে যায়, তাহলে খাল নদীর নিজস্ব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর সমুদ্র যদি শুকিয়ে খাল-নদীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাহলে সমুদ্র আর সমুদ্র থাকে না। মনে করবে আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আজাদীর লড়াই লড়ছি। আমাদের দুশমন জার রুশ, যারা আমাদের গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ করতে চায়। এমতাবস্থায় আমরা নিজেরাই যদি পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ি, তাহলে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করার শক্তি হারিয়ে ফেলবো। তুমি তো জানো, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ শুরু করার পর দুশমন এখন থর থর করে কাঁপছে। আমি তোমাকে আহমদ খানের বিধবা স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিতে এজন্য বলিনি যে, সে দানিয়েল বেগের শাশুড়ি। নির্দেশটা আমি তোমাকে এজন্য দিয়েছিলাম যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক যুদ্ধ করার রীতি আমরা বিলুপ্ত করে দিয়েছি। তুমি যদি অপহরণের পর বিধবাকে হত্যা করে ফেলতে, তাহলে আমি মনে করতাম, তুমি এক গাদ্দারের গাদ্দার উত্তরসূরীকে হত্যা করে ভালো কাজই করেছ। কিন্তু তুমি তো নিছক ব্যক্তিস্বার্থে তাকে তোমার ঘরে স্থান দিয়েছো!

ঃ আমি শুধু এতোটুকু জানি যে, খানমকে আমি তরবারীর মাধ্যমে অর্জন করেছি। আপনি যদি আপনার আদেশ প্রত্যাহার না-ও করেন, তবু পুনরায় যে করে হোক তাকে আমি দানিয়েল বেগ-এর হাত থেকে ছিনিয়ে আনবো।

ঃ হাজী মুরাদ! এমন সুরেই যদি তোমার কথা বলতে হয়, তাহলে আগে ঘোষণা দাও, তুমি এখন আর আমার নায়েব নও। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে কেউ ক্ষেপিয়ে তুলে থাকবে। আমি চাই, তুমি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করো। কিন্তু সত্য হলো, তোমার দৃষ্টি অধঃপাতে নিবদ্ধ। আমার আকাঙ্ক্ষা, তুমি সম্মুখে অগ্রসর হও। কিন্তু তুমি যেতে চাও পেছনের দিকে। আমি বলছি, তুমি মুসলমান হয়ে জীবন কাটাও। কিন্তু তুমি একজন কাবায়েলী পরিচয়ে বেঁচে থাকতে জিদ ধরেছো। হাজী মুরাদ! তুমি ষড়যন্ত্রের শিকার। তোমাকে আসলে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে। তুমি যাও, বিশ্রাম করো। আমি তোমাকে তিনদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে তুমি ঠাণ্ডা মাথায় এ বিষয়ে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিও।

ঃ আপনি এক্ষুনি যদি আমার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত না দেন, তবে আপনার পথ এক, আমার পথ আরেক।

ঃ হাজী মুরাদ! তুমি হয়তো জানোনা, তোমার-আমার পথ অভিন্ন— একই। যাকে তুমি আমার পথ আখ্যা দিচ্ছো, তা কাফকাজের সমুন্নতির পথ— ইসলামের পথ। এটি দুশমনের ষড়যন্ত্র, যারা তোমাকে ভিন্ন পথে চলার পাঠ শিক্ষা দিচ্ছে। এই তুমি যা বললে, যদি অন্য কেউ এমন কথা বলতো, তাহলে আমি তার মাথা ছিন্ন করে দিতাম। কিন্তু আমি তোমার মতো একজন সাহসী ব্যক্তিকে হারাতে চাই না।

কোনো প্রত্যুত্তর না করেই মোড় ঘুরান হাজী মুরাদ। সোজা চলে যান খোনজাক। সুযোগ বেড়ে যায় দুশমনের গোমস্তাদের। হাজী মুরাদকে তারা বুঝাতে চেষ্টা করে, ইমাম শামিল এবার গুপ্তঘাতক দিয়ে তোমাকে খুন করাবে।

হাজী মুরাদকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পথে ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠান ইমাম শামিল। কিন্তু দুর্মতি পেয়ে বসেছে তাকে। সংশয়াপন্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। তিনি ইমাম শামিলের প্রেরিত লোকদের সাফ জবাব দিয়ে ফিরিয়ে দেন। অবশেষে একদিন তিনি পুনরায় পাঁচজন খাস খাদেম নিয়ে রুশ ছাউনীতে চলে যান।

সংবাদ পেয়ে ইমাম শামিল বললেন— 'আল্লাহ মানুষকে বিবেক দিয়েছেন। যারা নিজের বিবেক দ্বারা সিদ্ধান্ত না নিয়ে অন্যের বুদ্ধি অনুসারে চলে, তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না। এই সাহসী অথচ সংকীর্ণমনা লোকটা বুঝছে না, রুশদের না আন্তরিকতা আছে হাজী মুরাদের সাথে, না আছে দানিয়েল বেগের সাথে, না আমার সাথে। তাদের উদ্দেশ্য, আমাদের একজনকে অপরজনের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত করিয়ে শেষে সকলকে গোলামে পরিণত করা। একটি সময় এমন আসবে, যখন হাজী মুরাদের বংশধরও রুশদের গোলামী করবে, দানিয়েল বেগের বংশধরও এবং তাদের বংশধরও, যারা হীনস্বার্থের জন্য, ব্যক্তিগত সুখের জন্য জাতীয় স্বার্থে আঘাত হানছে। কিন্তু ইমাম শামিলের বংশধরকে কেউ গোলাম বলবে না। আমি যদি নিজে দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করে যেতে না পারি, তাহলে আমার ভবিষ্যত বংশধরকেও এ উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করে যাবো। আল্লাহ যদি আমার শাহাদাত মঞ্জুর না করে থাকেন, তাহলেও আমি কোনো অপশক্তির তাবেদার হয়ে থাকবো না ইনশাআল্লাহ।'

নায়েব মোহাম্মদ আমীন বললেন, মাননীয় ইমাম! সংবাদ পেয়েছি, হাজী মুরাদ স্ত্রী-সন্তানদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাননি। এদেরকে নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে নিলে বোধ হয় ভালো হবে, যাতে তার এই অনুভূতি জাগে যে, তিনি যদি সীমালংঘন করেন, তাহলে তাদের বিপদ ঘটতে পারে।

ঃ আমার প্রশ্ন হলো, তার থেকে এই ভুলটা হলো কীভাবে?

ঃ দুশমন তাকে উস্কানী দিয়েছে। আমাদেরকে ত্যাগ করে তার ধারণামতে তিনি জীবন নিয়ে পালিয়েছেন। দুশমন তাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছে, তোমার

জীবন হুমকির সম্মুখীন এবং কালবিলম্ব না করে তুমি খোনজাক ত্যাগ করো।

ঃ তার স্ত্রী-সন্তানদের স্বসম্মানে রাখো। তবে তাদের প্রতি নজরদারিও রাখতে হবে, যাতে সে এদেরকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে না পারে।

বস্তুত এটিও দুশমনের একটি চাপ, যেনো হাজী মুরাদ সন্তানদের সঙ্গে করে না নেয়, যাতে পরবর্তীতে এদের অমর্যাদা করা হয়েছে কিংবা এদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে বলে ইমাম শামিলের উপর অভিযোগ উত্থাপন করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করা যায়।

এবার রুশ সেনা অফিসার হাজী মুরাদকে এমনভাবে স্বাগত জানায়, যেনো তিনি এই দেশের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাকে মহাসমারোহে তিবলীস পৌছিয়ে দেয়া হয়। সেখানে হাজী মুরাদকে স্বাগত জানান কমান্ডার ইন চীফ ও ভাইসরয় অরনেষ্টোত স্বয়ং।

ভাইসরয়-এর মহলের মনোরম এক কক্ষে থাকতে দেয়া হয় হাজী মুরাদকে। সর্বপ্রকার আরামের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য। সেবার জন্য কয়েকজন খাদেম এক পায়ে খাড়া থাকছে সারাক্ষণ। তিনি প্রতি রাতে নাচ-গানের আসরে আমন্ত্রণ পাচ্ছেন।

কিন্তু এসবের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই যেনো হাজী মুরাদের। অন্যমনস্ক ভাব তার চোখে-মুখে। তার উপমা সেই পাখির ন্যায়, যাকে একটি সোনার খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে। যার উড়াল দেয়ার স্বাধীনতা ছাড়া সব কিছুই আছে। নিজের ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণ-বিনোদন করার আকাংখা ব্যক্ত করলে তাকে শত শত প্রহরীর বেষ্টনীতে ভ্রমণ করার অনুমতি দেয়া হয়। যখন সে প্রহরী ছাড়া একাকি ভ্রমণ করার জন্য জিদ ধরে, তখন তাকে বলা হয়– 'তোমার মূল্যবান জীবনের জন্য পাহারাদারের উপস্থিতি একান্ত জরুরি। বড়রা কখনো দেহরক্ষী ছাড়া বের হয় না।'

হাজী মুরাদ ইমাম শামিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সৈন্য প্রার্থনা করেন। জবাবে বলা হলো– 'অপেক্ষা করুন। যথাসময়ে আপনাকে সৈন্য দেয়া হবে।' হাজী মুরাদ যখন বলে, আমার এলাকা ও গোত্রের লোকদেরকে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি দিন; তখন তাকে বলা হয়– 'এটি সম্ভব নয়। দুশমনের লোকেরা আপনার আপনজনদের বেশ ধরে এসে আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে।'

হাজী মুরাদ স্ত্রী-সন্তানদের চিন্তায় বেশি অস্থির। তিনি বারবার বলছেন, আমার পরিবার-পরিজনকে দুশমনের কবল থেকে মুক্ত করে আমার কাছে এনে দিন। নতুবা আমাকে এই অনুমতি দিন, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে গোত্রের লোকদের সহযোগিতা নিয়ে তাদেরকে দুশমনের কবল থেকে মুক্ত করিয়ে আনি।

জবাবে রুশরা বলে, তোমার স্ত্রী-সন্তানদের যদি কোনো অপমান বা ক্ষতি করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তার প্রতিশোধ নেবো। তবে তা হবে সময়মত।

আসল কথা হলো, হাজী মুরাদের উপর রুশদের আস্থা নেই। হাওয়ার ন্যায় লোকটা কখন কোন্ দিকে ছুটে যায়, তার ঠিক নেই। রুশদের নিকট হাজী মুরাদ একটি দাবার ঘুঁটি মাত্র। এই ঘুঁটিটি তারা তাদের মর্জিমাফিক ব্যবহার করতে চায় শুধু। এ মুহূর্তে এটাই তাদের পরম পাওয়া যে, হাজী মুরাদ ইমাম শামিলের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে এসেছেন এবং তাতে স্বাধীনতাকামীদের ঐক্যে ফাটল ধরে গেছে।

একের পর এক বাহানা-অজুহাত দেখিয়ে তিবলীসে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করা হচ্ছে হাজী মুরাদের অবস্থানকে। হাজী মুরাদ অসহায়। তিনি নিরুপায় হয়ে সাময়িকের জন্য পরিস্থিতির করুণার উপর নিজেকে ছেড়ে দেন।

একুশ.

জার রুশ, তার মন্ত্রীবর্গ ও লাখ লাখ রুশ সেনার নিকট 'শামিল' একটি ভয়ংকর নাম। কাফকাজে মুজাহিদদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেসব রুশ সৈনিক আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করেছে, তাদের নিকট শামিল একজন অস্বাভাবিক মানুষ।

রাশিয়ার এমন কোনো পরিবার নেই, যাদের কেউ না কেউ কাফকাজে লড়াই করে নিহত বা আহত হয়নি কিংবা কাফকাজে যুদ্ধরত নেই। এই সুবাদে রাশিয়ার প্রতিটি ঘরে শামিল একটি আলোচিত নাম। ইমাম শামিল একদিকে যেমন সেনাপতি, অন্যদিকে গণমানুষের নেতাও। তাঁর নায়েবদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীও মানুষের মুখে মুখে।

ধীরে ধীরে রাশিয়ার সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য 'কাফকাজ' একটি আকর্ষণীয় ভূখণ্ডে পরিণত হয়। সেনাবাহিনীতে চাকুরি করা রুশ নাগরিকদের সবচে' সম্মানজনক পেশা। তাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিটি যুবক সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে জার রুশের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। সাইবেরিয়া থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত এলাকাগুলোতে সাবেক শাসকমণ্ডলীর সন্তানরা রুশ সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসার।

রুশ বাহিনীকে পৃথিবীর শক্তিধর বাহিনীতে পরিণত করতে চান জার নেকুলাই। বিজিত অঞ্চলের শাহজাদা, নওয়াবজাদাগণ জার-এর সন্তুষ্টি অর্জন করেই গবর্নর, ভাইসরয় কিংবা কমান্ডার-এর পদ লাভ করতে পারে। দক্ষ সেনা-অফিসার তৈরি করার জন্য ক্যাডেট কলেজ ও সামরিক একাডেমী ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন জার। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপনের পর যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য ক্ষেত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। তার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয় কাফকাজকে। তাই সেনা অফিসারদের পরিভাষায় কাফকাজ 'বাস্তব যুদ্ধের প্রশিক্ষণালয়'।

রুশ জনসাধারণের কাছে কাফকাজ একটি কিংবদন্তীর ভূখন্ড। তারা শুধু এতোটুকু জানে, দূরে– অনেক দূরে এমন একটি ভূখণ্ড আছে, যেখানে অসংখ্য উঁচু-নীচু পাহাড়, গহীন অরণ্য ও বিপুল খাল-নদীর সমাহার। সেখানকার মানুষ রাজাধিরাজ জার রুশকে তাদের রাজা বলে স্বীকার করে না, বরং শাহী ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেড়ায়।

রুশ জনসাধারণের জীবন ক্রীতদাসের জীবন। জারের জুলুম-নির্যাতনের ভয়ে সদা তটস্থ থাকে তারা। শাহেনশাহ'র শত্রু ও বিদ্রোহীদেরকে যদিও তারা তাদের শত্রু ভাবতে বাধ্য, কিন্তু যারা জারের শক্তিধর বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, মনে মনে তারা তাদেরকে বাহবা দিচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে কাফকাজের স্বাধীনতাকামীরা হয়তো আকাশ থেকে নেমে আসা অদ্ভুত এক প্রাণী, নয়তো এমন এক জংলী জাতি, যারা রাজকীয় আদব-কায়দা কিছুই জানে না। রুশ জনতার অব্যক্ত আকাংখা, কাফকাজে জার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে লোকগুলো লড়াই করছে, তারা যদি আক্রমণ করে রাশিয়াটা দখল করে নিতো! যদি তারা সেই সব রুশ অফিসার ও নেতাদের মেরে শেষ করে ফেলতো, যারা আমাদেরকে বিনাদোষে ধরে ধরে জেলে পুরছে এবং জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে বাধ্য করছে। কিন্তু দু'ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে বাইরে বেরুতে পারে না তাদের এই আকাঙ্ক্ষার কথা।

পৃথিবীর কবি-সাহিত্যিক ও চিত্রকররা কাফকাজের প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেখানকার জানবাজ লড়াকু, সেখানকার হাওয়া-মৌসুম, পাহাড়-পর্বত ও নদী-সাগর সম্পর্কে শুনছে অনেক কিছু। কাফকাজকে কাছে থেকে এক নজর দেখার আকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনের সবচে' বড় আরজু।

কাফকাজে আজাদীর লড়াই শুরু হওয়ার আগে যার উপর জারের অসন্তোষ নিপতিত হতো, তাকে হয়তো ফাঁসিতে ঝুলানো হতো, নতুবা সাইবেরিয়া পাঠিয়ে দেয়া হতো। তারপর যখন মুসলমানদের মুক্তির লড়াই শুরু হলো, তখন রাজরোষ ধারণ করলো তৃতীয় এক আকার। অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধের আসামীদের কাফকাজেই ফৌজি খেদমত আঞ্জাম দেয়ার শাস্তি দিতে শুরু করলেন জার।

কাফকাজ দেখার আগ্রহ নিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে ইমাম শামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে রাশিয়ার কয়েকজন সাহিত্যিক। কাফকাজের হৃদয়কাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি ও রহস্যময় মানবসমাজ জয় করে ফেলে তাদের হৃদয়। প্রকৃতির দৃশ্য আর মানুষের চরিত্র নেশা ধরিয়ে দেয় তাদের মনে। তারপর এসব দৃশ্য আর চরিত্রাবলিকে ভাষায় রূপ দিয়ে বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকে পরিণত হয় তারা। এর আগে তাদের নিকট জীবনের মর্ম ছিল সীমাবদ্ধ। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত শস্যক্ষেত। ক্ষেতে-খামারে পশুর ন্যায় খাটুনি খাটা গোলাম আর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বরফ– এসব ছিলো রুশ জীবনের মর্ম।

রুশ জীবনের তৃতীয় ও প্রকৃত অর্থ ছিলো জার শাহী। এ অর্থ ভোগ-বিলাসের। এ অর্থ শাসন ও নির্যাতনের।

এই কবি-সাহিত্যিকগণ যখন কাফকাজ পৌঁছেন, দেখতে পান এক ভিন্ন চিত্র। এখানকার মানুষ আকাশে উড়ন্ত পাখির ন্যায় স্বাধীন। এখানকার মানুষের মনোবল গগনস্পর্শী পাহাড়ের মতো উঁচু। চেতনা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় উর্মিমুখর।

জার ও ক্রুশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী কবি-সাহিত্যিকগণ যখন তাদের স্বদেশি ভাইদের গাজর-মুলার মতো টুকরো টুকরো হতে এবং কাফকাজের রূপ-সৌন্দর্য্য আগুন ও গোলায় ধ্বংস হতে দেখলেন, তখন তাদের নিকট তাদের এ লড়াইয়ের অনর্থকতা ও অযৌক্তিকতার অনুভূতি জাগ্রত হয়। পরবর্তীতে তাদের কেউ 'কাফকাজের কয়েদি' গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত সাহিত্যিকে পরিণত হন। কেউ কাব্য রচনা করে কাফকাজের কবি আখ্যা পান।

❁ ❁ ❁

১৮৫০ সালের গ্রীষ্মকালের এক সন্ধ্যা। মস্কোতে নিজ ঘরে ভগ্নমনে বসে আছেন লিও টলষ্টয় নামক এক রুশ কবি। তাস খেলায় হেরে হেরে কয়েকশ রোবল ঋণ দাঁড়িয়েছে লোকটার। তার খালা এসে তাকে বুঝায়-

'কবিগিরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ ধরো বাবা! তোমার বন্ধু-বান্ধব ও সম বয়সীরা সবাই নিজ নিজ ভাগ্য গড়ে নিয়েছে। তুমিও কাফকাজে যাও, যুদ্ধ কর। সম্ভ্রান্ত বংশের সব ছেলেরা ওখানে আপন আপন ভাগ্য গড়ছে। তোমার ভাই সাইবেরিয়ায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে। জানি না, কী হালে আছে ছেলেটা। কাফকাজে গিয়ে যদি তুমি কিছু করে দেখাতে পারো, তাহলে হয়তো শাহেনশাহ খুশী হয়ে তোমার ভাইকে ক্ষমা করে দেবেন আর আমার আরজুও পূরণ হবে।'

ঃ আপনার আরজুটা কী খালাম্মা!

ঃ 'বৎস! তুমি যদি কাফকাজে গিয়ে যুদ্ধ করো, তাহলে হয়তো শামিলকে দেখতে পাবে। পরে যখন তুমি ফিরে আসবে, তখন আমি তোমার নিকট তার কাহিনী শুনতে পাবো। আর আমি গৌরবের সাথে বলতে পারবো, আমার ভাগিনা ইমাম শামিলকে দেখে এসেছে, আমি ওর কাছে তাঁর গল্প শুনেছি। জানো, দেশের সবখানে, সব ঘরে কেবল শামিলের কথাই আলোচিত হচ্ছে। কাহিনী শুনে তো মনে হচ্ছে, লোকটা মানুষ নয়- অন্য কিছু।'

ঃ কিন্তু খালাম্মা! আমার মতো একটি দুর্বল ছেলেকে সেনাবাহিনীতে নেবেন কে?

ঃ আরে বেটা! তুমি ভুলে গেছো মনে হয়। তুমি নিজে নবাব নও ঠিক, নবাব বংশের ছেলে তো বটে। শাহেনশাহ'র লোকের বড় প্রয়োজন। তুমি হ্যাঁ বলো, আমি সেনাপ্রধানের স্ত্রীর বোনকে বলে কালই তোমাকে সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে দিতে পারবো। উনি আমার বান্ধবী।

মাত্র এক বছর পর কাফকাজের একটি কাসৃক ইউনিটের কমান্ড বুঝে নেয় টলষ্টয়। দায়িত্ব বুঝে পেয়ে অধীন সিপাহীদের প্রথম প্রশ্ন করে–

'তোমরা কি কেউ শামিলকে দেখেছো?'

'না জনাব! আমরা দেখিওনি, দেখতে চাইওনা।' সমস্বরে জবাব দেয় সকলে।

ঃ কেন?

এক সিপাহী বললো, তাকে দেখার অর্থ মৃত্যুকে দেখা।

ঃ তাকে দেখা কি একেবারেই অসম্ভব?

ঃ এমনই মনে করুন।

ঃ কেনো, তিনি কি নিজে ময়দানে আসেন না?

ঃ না জনাব, ঘটনা এমন নয়। অধিকাংশ সময়ই তিনি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু অবস্থান করেন সৈনিকদের মধ্যখানে। চারদিকে থাকে তার নায়েবগণ। তারপর থাকে মুরীদগণ। আমাদের কোনো সিপাহী আজ পর্যন্ত এই মুরীদ নায়েবদের ব্যূহ ভেদ করে তার নিকটে যেতে পারেনি। আমাদের সেনাপতি পর্যন্ত তার কাছে যেতে আগ্রহী নন!

ঃ কেন?

ঃ এ পর্যন্ত রুশ সেনাপতি যতোবার তার কাছে গিয়েছেন, গিয়েছেন সন্ধি কিংবা যুদ্ধ বিরতির আলোচনা করার জন্য। কিন্তু তিনি কারোও কোনো শর্ত মেনে নেননি। অবশেষে আমাদের সেনাপতিকেই চাকুরিচ্যুত হতে হয়েছে।

ঃ ও, এই কথা!

সেদিনের সন্ধ্যায় অফিসে বসে তিনি তার ডাইরীর প্রথম পাতায় লিখলেন, 'জীবন সবেমাত্র শুরু হলো'।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। এক ভিনদেশি অচেনা চিত্রাংকনকারীকে রুশ ক্যাম্পের সন্নিকটে বসে একটি ছবি অংকন করতে দেখে টলষ্টয়। ছবিতে দীর্ঘকায় এক কোহেস্তানী পুরুষ। মাথায় সাদা পাগড়ি। পরনে কালো আবা। বুকে বিদ্ধ একটি সঙ্গীন। কালো আবায় দেহ থেকে নির্গত রক্তের বেশ ক'টি লাল রেখা। চিত্রটি দেখে টলষ্টয় লোকটাকে জিজ্ঞেস করে– 'মিস্টার! আপনি কে? এটি কার চিত্র অংকন করছেন?'

ঃ আমি ফরাসী। নাম মাইকেল ব্রাউন্ট। আমার মা রাশিয়ান। অংকন শিখেছি প্যারিসে। এটি শামিলের ছবি। আশা করি, কমান্ডার ইন চীফ ছবিটি পছন্দ করবেন।

ঃ আসল শামিলকে কখনো দেখেছেন?

ঃ না জনাব, দেখতে চাই-ও না। আমি কেবল এটুকু জানি, রুশ অফিসার ছবিটি অবশ্যই পছন্দ করবেন এবং আমাকে পুরস্কার দেবেন।

এর ঠিক তিনদিন পর চিত্রকারের কর্তিত মস্তকটা উক্ত স্থানে পড়ে থাকতে দেখা গেলো। চিত্রটি উধাও। দেখে টলষ্টয় বললো– 'এবার বেটার নিশ্চয়ই প্যারিস আর কাফকাজের পার্থক্য বুঝে এসেছে।'

১৮৫১ সালের গ্রীষ্মকাল। একজন সেনা অফিসারের মর্যাদা নিয়ে তিবলীস পৌছে টলষ্টয়। এক সঙ্গী অফিসারকে জিজ্ঞেস করে–

'কয়েকজন লোকের কাছে আমি হাজী মুরাদের কথা শুনেছিলাম। আমি কি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি।'

ঃ উপরে উপরে তিনি আমাদের মেহমান। কিন্তু আসলে বন্দি। আমি এতোটুকু জানি, লোকটা অতিশয় সাহসী। তোমাদের কবি-সাহিত্যিকদের ভাষায় সিংহ কিংবা বাজ। তোমার যখন ইচ্ছে হয়, ভাইসরয় থেকে অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারো।

কয়েকদিন পর। দোভাষীর মাধ্যমে হাজী মুরাদের সঙ্গে কথা বলে টলষ্টয়–

'আমার নাম টলষ্টয়। আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আগ্রহী ছিলাম।'

হাজী মুরাদ ঃ টলষ্টয়-নেকুলাই-আতারিদভ- কী সব অদ্ভুদ তোমাদের নাম। কোনো নামের শেষে 'য়', কোনটির শেষ 'ভ'। একই রকম নাম একই ধরনের মানুষ। যাক গে ওসব! তা তুমি আমার সঙ্গে কেনো সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলে?

ঃ আমি আপনার ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছি। আপনি একজন নির্ভীক, দুঃসাহসী যোদ্ধা। আমার বন্ধুরা আপনাকে 'লাল শয়তান' নামে স্মরণ করে থাকেন। কেনো, আপনি শামিলের নায়েব হিসেবে লাল পোশাক পরতেন নাকি?

ঃ হ্যাঁ, লাল পোশাক আর এই (দাড়ি স্পর্শ করে) লাল দাড়ির কারণেই বোধ হয় রুশরা আমাকে 'লাল' বলে।

ঃ আফসোস, শামিলের জন্য আপনি এতোকিছু করলেন আর তিনি আপনার সঙ্গে ভালো আচরণ করলেন না!

ঃ (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) তোমাদের সহানুভূতির আমার প্রয়োজন নেই। আমার সমস্যার সমাধান আমি নিজেই করতে পারবো।

ঃ (মুচকি হেসে) জানেন তো আমি কবি। আমি আপনার ব্যাপারে কিছু লিখবো।

ঃ কী লিখবে?

ঃ আপনার কাহিনী লিখবো।

ঃ (খিলখিল করে হাসি দিয়ে) আমার তোমাদের কাহিনীর প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাহিনীর জন্যই বরং আমাকে প্রয়োজন পড়বে। তুমি তো তা-ই লিখবে, যা তোমার স্বদেশিরা পছন্দ করবে। যাক, যা মনে চায় লেখো গিয়ে।

যাওয়ার জন্য বসা থেকে উঠে পেছন দিকে মোড় ঘুরায় টলষ্টয়। ঠিক এমন সময়ে একটি ছায়া ছুটে আসে হাজী মুরাদের প্রতি। সম্মুখে এক খণ্ড

কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে যায় ছায়াটি। তড়িঘড়ি কাগজটি তুলে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলেন হাজী মুরাদ। কিন্তু টলষ্টয়ের দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না তিনি। মুখ ফিরিয়ে আবার ফিরে এসে হাজী মুরাদকে। জিজ্ঞেস করে– 'এটি কি? দিয়ে গেলো কে?'

ঃ এটি চিঠি। একটি কবুতর ছুঁড়ে ফেলে গেলো।

টলষ্টয় চলে গিয়ে সঙ্গী অফিসারদের পত্রটির কথা জানায়। অফিসাররা ভাইসরয়কে ঘটনাটি অবহিত করে। চিঠির রহস্য উদঘাটনের জন্য নির্দেশ জারী করেন ভাইসরয়।

রাতে পানির সঙ্গে মিশিয়ে নেশা খাওয়ানো হল হাজী মুরাদকে। অল্প সময়ের মধ্যে চেতনা হারিয়ে ফেলেন তিনি। তার কক্ষে তল্লাশী নেয়া হলো। পোশাক পরীক্ষা করা হলো। পকেটে পাওয়া গেলো এক টুকরো কাগজ। তাতে আরবীতে লিখা–

'হাজী মুরাদ! আল্লাহ তোমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করুন। আমার উপর আস্থা রেখে তুমি ফিরে আসো। শয়তান তোমাকে বিভ্রান্ত করেছে। মনে রেখো, দাগেস্তানের আযাদীর দুশমনরা তোমার বন্ধু হতে পারে না। তোমার পরিজন আমার হেফাজতে আছে, ভালো আছে।

–ইতি

ইমাম শামিল।'

ভাইসরয়-এর নির্দেশে পত্রটি পুনরায় হাজী মুরাদের পকেটে রেখে দেয়া হলো এবং পাহারা আরো কঠোর করা হলো।

পরদিন সকালে দফতরে এসেই ভাইসর হাজী মুরাদকে ডেকে পাঠান এবং দোভাষীর মাধ্যমে তার সঙ্গে কথা বলেন। ভাইসর বললেন–

'আমি গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছি, শামিল তোমাকে ধোঁকা দিয়ে ডেকে নিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। বিশেষ লোক মারফত সে তোমার কাছে পত্রও প্রেরণ করেছে। তাতে সে লিখেছে, যেনো তুমি তার উপর আস্থা রাখো এবং তার কাছে ফিরে যাও। তাছাড়া আমার গুপ্তচররা আমাকে জানিয়েছে, তোমার পুত্রকে সে অন্ধকার এক জিন্দানখানায় কয়েদ করে রেখেছে।'

ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তার একটি পত্র আমি পেয়েছি। আমি আর তার কাছে যাচ্ছি না। তবে আপনিও আমার কোনো উপকার করতে পারবেন না। আমি কতোবার বললাম, আপনি আমার স্ত্রী-সন্তানদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। আপনি যদি সৈন্য দিতে না পারেন, তাহলে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি আমার লোকদের দিয়েই শামিলের সঙ্গে বুঝা-পড়া করতে পারি।

ঃ আমি এতোদিন শাহেনশাহ'র নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তোমার

স্ত্রী-সন্তানরা যেহেতু আশংকাজনক অবস্থায় রয়েছে, সেহেতু আর অপেক্ষা না করে নিজ দায়িত্বে আমি তোমাকে তোমার ভাগ্য পরীক্ষা করার অনুমতি দিতে প্রস্তুত। স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাপার না হলে আমি তোমাকে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতাম না।

হাজী মুরাদ ঃ ঝুঁকি! ঝুঁকি আর বিপদই তো আমার প্রিয়। আপনার লক্ষ সৈনিকও যে কাজ করতে পারবে না, আমি একা আপনাকে সে কাজ করে দেখাব।

ঃ তোমার বীরত্বে কার সন্দেহ! আচ্ছা, তুমি প্রস্তুত হও।

সেদিনই ভাইসরয় অরনেস্টভ-এর কাছে শাহেনশাহ'র পয়গাম এসে পৌঁছে–

'হাজী মুরাদের উপর কখনো আস্থা রাখবে না। ঠিক নেই, লোকটা কখন গিয়ে শামিলের সঙ্গে যোগ দেয়। তার মনোরঞ্জন করবে বটে; তবে পালাবার সুযোগ যেনো না পায়।'

ভাইসরয় হাজী মুরাদের সঙ্গে ওয়াদা করে এসেছিলেন, তিনি তাকে শামিলের সঙ্গে ভাগ্য পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করবেন। কিন্তু শাহেনশাহ'র এই স্পষ্ট নির্দেশের পর এখন ওয়াদা রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে আসার পথ খুঁজতে শুরু করেন তিনি।

পরদিন সকালে হাজী মুরাদকে পুনরায় ভাইসরয়-এর দফতরে হাজির করা হয়। ভাইসরয় বললেন–

'তোমার সৌভাগ্য যে, রাজাধিরাজ জার নেকুলাই তোমাকে ভুলেননি। শাহেনশাহ নির্দেশ পাঠিয়েছেন, যেনো তোমার পায়ের চিকিৎসা করিয়ে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিয়ে তুলি, যাতে যুদ্ধের ময়দানে তুমি পূর্ণ যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারো।'

ঃ ভাইসরয় সাহেব! আমার খোড়া পা কখনো আমার চলাচলে বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। যুদ্ধে দক্ষতা প্রদর্শন করে তরবারী, খঞ্জর কিংবা বন্দুক-রাইফেল। এসব অস্ত্র ব্যবহৃত হয় হাত দ্বারা– পা দ্বারা নয়। আর আমার হাত দু'টো সম্পূর্ণ অক্ষত। আমি আমার জীবনে বড় বড় যুদ্ধ এই খোড়া পা দিয়েই জয় করেছি।

ঃ তোমার কথা ঠিক। কিন্তু ব্যাপার হলো, শাহেনশাহ নিজে একটি যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। তাতে তোমাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করবেন বলে স্থির করেছেন। সেজন্যই তিনি বলে পাঠিয়েছেন, তুমি চাইলে পরিকল্পনা সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত চিকিৎসা করিয়ে তোমার পা-টা সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়ে তোলার ব্যবস্থা করবো।

ঃ কাল আপনি আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলেন, সে ব্যাপারে আপনি কী বলতে চান?

ঃ শাহেনশাহ'র আদেশের সামনে আমার মর্জি কীভাবে চলতে পারে?

খোদাওন্দে আলম তো তোমার হীত কামনাই করছেন।

ঃ কে বলবে এটি হীত কামনা নাকি অনিষ্ট চিন্তা? (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) আপনি যদি আপনার ওয়াদা থেকে সরে গিয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে নোখায় গিয়ে থাকার অনুমতি দিন। নোখা এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে একটি মুসলিম বসতি। সেখানে আমি একাগ্রতার সাথে ইবাদত-রিয়াজত করতে পারবো। আপনার এখানকার আসর-অনুষ্ঠান, নাচ-গান আমার ভালো লাগে না।

ঃ শাহেনশাহ'র সাম্রাজ্যে তুমি যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারো। তুমি রাজাধিরাজের সম্মানিত মেহমান। তোমার কিসমত যে, শাহেনশাহ'র একজন সেনাপতিও তোমার প্রতি ঈর্ষান্বিত। এ কারণেই শাহেনশাহ তোমাকে শামিলের ন্যায় ভয়ংকর লোকটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দানে ইতস্তত করছেন।

ঃ আমি আজই রওনা করতে চাই।

ঃ শাহেনশাহ'র মেহমানকে আমার পূর্ণ ইজ্জতের সাথে বিদায় দিতে হবে। প্রস্তুতির জন্য আমার কিছু সময়ের প্রয়োজন। তুমি আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

পরদিন পঞ্চাশজন কাস্‌ক সৈনিকের প্রহরায় হাজী মুরাদকে নোখা রওনা করার আদেশ হয়। হাজী মুরাদ ও তার পাঁচজন খাদেম নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কাস্‌ক সৈন্যদের হেফাজতে রওনা হন। নোখায় রুশ সৈন্যদের একটি চৌকি আছে। এখানে নিয়োজিত পাঁচশ সৈনিক। ভাইসরয় অরনেস্টভ-এর পক্ষ থেকে চৌকির ইনচার্জ-এর কাছে পয়গাম প্রেরণ করা হয়–

'হাজী মুরাদ– যে একজন ভয়ংকর মানুষ এবং বাহ্যত আমাদের মেহমান ও সমর্থক– নোখায় অবস্থান করবে। লোকটা যাতে পালাতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। তবে সে যেনো বুঝতে না পারে, সে আমাদের কয়েদি।'

পরদিন সঙ্গীসহ নোখা গিয়ে পৌছান হাজী মুরাদ। একটি ভবনে থাকতে দেয়া হয় তাকে। ভবনের তিনদিকে উঁচু প্রাচীর। সামনের দরজার দু'দিকে কতোগুলো কক্ষ। সেই কক্ষগুলোতে হাজী মুরাদের কাসৃক প্রহরীদের সতর্ক প্রহরায় নিয়োজিত রাখা হয়। হাজী মুরাদ নোখা পৌছে ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। দেখাদেখি সঙ্গীরাও ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যায়।

এভাবে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়। এবার ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন হাজী মুরাদ। আবেদন মঞ্জুর হয়। কাস্‌ক বাহিনীর প্রহরায় তাকে ও তার সঙ্গীদের ভ্রমণে পাঠিয়ে দেয়া হয়। নোখা থেকে বিভিন্ন দিকে বের হওয়ার পথ-ঘাট ভালোভাবে দেখে নেন হাজী মুরাদ। প্রহরীদের বুঝতে দেন না কিছুই। ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে লিপ্ত হয়ে পড়েন ইবাদতে। তিনি এভাবে ক'দিন পর পর ভ্রমণে বের হচ্ছেন। নির্ধারিত দিনে সকাল সকাল হাজী মুরাদ ও তার সঙ্গীদের

জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করতে হচ্ছে প্রহরীদের। সঙ্গেও যেতে হচ্ছে তার। এতে বিরক্তি বোধ করছে প্রহরীরা। কিন্তু না পারছে কিছু করতে, না পারছে বলতে।

১৮৫২ সালের ২১ এপ্রিল সন্ধ্যা বেলা। হাজী মুরাদ তার স্থানীয় ভাষায় সঙ্গীদের বললেন– 'আগামীকাল সকালে যা ঘটবার একটা কিছু ঘটে যাবে। আধা স্বাধীনতা আর আধা বন্দিত্বে আমি অতিষ্ঠ। এরা জানে না, আমরা কোহেস্তানী, আমরা স্বাধীনচেতা মানুষ। পায়ে শিকল পরিয়েই কেবল আমাদের আটকে রাখা যায়। এদের খাতিরে আমি ইমাম শামিলের সঙ্গে গাদ্দারী করলাম। কিন্তু তারপরও এরা আমাকে বিশ্বাস করছে না। তোমরা যার যার খঞ্জরে ধার দিয়ে নাও। তরবারী প্রস্তুত করো। পিস্তল ঘষে-মেজে পরিষ্কার করো। আগামী সকালের ভ্রমণ হবে আযাদী কিংবা মৃত্যুর ভ্রমণ। রুশ অফিসারকে জানিয়ে দাও, ফজর নামাযের পরপরই যেনো আমার ঘোড়া প্রস্তুত পাই।'

হাজী মুরাদ ও তার সঙ্গীরা সারাটা রাত ইবাদতে কাটান। নোখার মসজিদের মুয়াজ্জিন ফজর নামাযের আযান দেন। হাজী মুরাদ সঙ্গীদের নিয়ে নামায আদায় করেন। তারপর ভ্রমণে যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাইরে একজন রুশ অফিসার চারজন সিপাহীসহ তাদের জন্য অপেক্ষমান। হাজী মুরাদ ও তার নায়েব নিজ ঘোড়ায় চড়ে বসেন। রুশ অফিসার ও সিপাহীগণ অস্ত্র সংবরণ করে নিজ নিজ ঘোড়া হাঁকায়।

অশ্বের খুরধ্বনিতে কেঁপে ওঠে নোখার মাটি। হাজী মুরাদ ও তার সঙ্গীরা ঘোড়ার গতি অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেন। এক সিপাহী অফিসারকে বললো– 'স্যার ঘোড়া তো আজ খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছে দেখছি। লোকটার পালাবার মতলব নেই তো আবার!' অফিসার বললো– 'ওদের ধাওয়া করো'– বলেই সে নিজের ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়।

হাজী মুরাদের যে নায়েব সকলের পেছনে, তার একেবারে কাছে চলে যায় অফিসার। এক মুহূর্তের জন্য ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন নায়েব। পরবর্তী মুহূর্তেই গুলি চালান রুশ অফিসারের বুকে। বুকটা ফুটো হয়ে যায় অফিসারের। এমন সময়ে দৌড়ে আসে আরো তিনজন সিপাহী। নায়েব গুলির নিশানায় পরিণত করেন দু'জনকে। খঞ্জরের আঘাতে লাশ বানিয়ে দেন অপরজনকে। পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে ঘোড়ার মোড় ঘুরায় চতুর্থ সিপাহী। তীব্রগতিতে ছুটে গিয়ে নোখায় পৌঁছে ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দেয় সংশ্লিষ্ট অফিসারকে। উর্দি না পরেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে অফিসার। ছুটে যায় চৌকি অভিমুখে। দ্রুত প্রস্তুত হয়ে হাজী মুরাদকে ধাওয়া করার আদেশ দেয় চৌকির পাঁচশ অশ্বারোহী সৈনিককে।

সাধারণ পথ ত্যাগ করে শস্যক্ষেত ও বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেন হাজী মুরাদ ও তার সঙ্গীগণ। দুর্ভাগ্যবশত বিশাল বিস্তৃত একটি ধান ক্ষেতে গিয়ে

পৌছেন তারা। ক্ষেতে ঘোড়ার হাঁটু পরিমাণ পানি। এই ধান ক্ষেত অতিক্রম করে ওপারে চলে যেতেও সক্ষম হয় তারা। কিন্তু নিদারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো। সামনে বিশাল এক জঙ্গল। জঙ্গলে ঢুকে পড়ে হাজী মুরাদ সঙ্গীদের বললেন– 'সাধারণ রাস্তাগুলোতে রুশ সৈন্যরা অবস্থান নিয়ে আছে। অন্য পথও ঝুঁকিপূর্ণ। রাত পর্যন্ত আমরা এখানেই অবস্থান করি। অন্ধকার ছেয়ে গেলে সাধারণ পথেই বেরিয়ে যাবো।'

রুশ সেনারা পথচারি ও কৃষাণদের পাঁচজন কাবায়েলী অশ্বারোহীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে করতে জঙ্গলের নিকটে এসে পৌছে। তখন বেলা দ্বি-প্রহর। তারা জঙ্গলের ভেতরে শিকারী কুকুর ছেড়ে দেয়। হাজী মুরাদের ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি তুলে বিপদ সংকেত দেয় মালিককে। কিন্তু মালিকের সতর্ক হওয়ার আগেই এই ধ্বনি পলায়নকারীদের উপস্থিতির সংবাদ দেয় রুশ সেনাদের। জঙ্গলটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে রুশ সৈন্যরা। হাজী মুরাদের এক নায়েব হামাগুড়ি দিয়ে কতোটুকু এগিয়ে গিয়ে সংখ্যা আন্দাজ করেন সৈন্যদের। ফিরে এসে জানান– 'দুশমন ছয়-সাতশ'র কম নয়। পালাবার সুযোগ নেই।'

কোনো প্রত্যুত্তর না করে উঠে দাঁড়ান হাজী মুরাদ। হাতের খঞ্জর দ্বারা ধমনীটা কেটে দেন নিজের ঘোড়ার। মাটিতে পড়ে যায় ঘোড়াটা। এবার মৃত ঘোড়ার আড়ালে বসে পড়েন তিনি। পিস্তলটা হাতে নেন। তার অনুসরণে একই কাজ করে নায়েবগণও। এমন সময়ে শুরু হয় গুলিবৃষ্টি। খানিক পর এক রুশ অফিসার একটি গাছের আড়াল থেকে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে– 'অস্ত্র ফেলে দাও। আজ তোমাদের রক্ষা নেই।' কিন্তু কোনো জবাব আসে না হাজী মুরাদের পক্ষ থেকে। সৈনিকদের সংকেত দেয় অফিসার। ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে আসতে শুরু করে ঘেরাও।

প্রথম সৈনিক পিস্তলের আয়ত্বে চলে আসামাত্র একটি গুলি বেরিয়ে যায় হাজী মুরাদের পিস্তল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে সৈনিকটি। তারপর দ্বিতীয়জন, তারপর তৃতীয়জন।

পনের-বিশজন সৈনিককে যমের হাতে তুলে দেয়ার পর রুশ অফিসার আদেশ দেয়– 'আমার সৈনিকগণ! তোমরা খানিক পেছনে সরে যাও, বৃষ্টির মত গুলি ছোঁড়।'

আবার শুরু হয় গুলিবৃষ্টি। ঘোড়ার লাশগুলো ক্রমান্বয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। হাজী মুরাদের সঙ্গীরা খঞ্জর দ্বারা ছোট ছোট কতোগুলো গর্ত খুঁড়ে নেয়।

দু'ঘন্টা পর রুশ অফিসার আবার তার বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এবারও তাদের একই পরিণতি ঘটে। রুশ সৈনিকদের নির্দিষ্ট এক সীমানা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না হাজী মুরাদ ও তার সঙ্গীরা। আবারও সৈনিকদের পেছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় অফিসার। তারপর কাস্‌ক

সিপাহীদের গাছে উঠে উপর থেকে ফায়ারিং করার আদেশ দেয় সে। ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয় এ কৌশলটি। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাছের উপর থেকে নিক্ষিপ্ত গুলিতে ঝাঝরা হয়ে যায় হাজী মুরাদের দু' নায়েব।

কৌশল পরিবর্তন করেন হাজী মুরাদ ও তার অবশিষ্ট সঙ্গীরা। নিহত দু'সঙ্গীর লাশ দু'টোকে গর্তের পার্শ্বে এমনভাবে রেখে দেন, দেখতে ঠিক বাংকারের মত মনে হয়। তারপর নিজেরা গর্তের ভেতরে এমনভাবে বসে পড়েন, যাতে গুলির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বিকাল পাঁচটার সময় রুশ অফিসার আবার তার বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয় এবং বলে– 'দুশমনের উপর ঝাপিয়ে পড়ো।' হাজী মুরাদ ও তার অবশিষ্ট দু' নায়েব অগ্রসরমান রুশ সেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করতে গিয়ে গুলির ভাণ্ডার উজাড় করে ফেলে। তবে একটি গুলিও নষ্ট হয়নি তাদের। ব্যর্থ হয়নি কারো একটি নিশানাও। কিন্তু একদিকে তিনটি মাত্র প্রাণী আর অন্যদিকে পাঁচশ সৈনিক।

সন্নিকটে এসে পড়ে রুশ বাহিনী। হঠাৎ গর্ত থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে হাজী মুরাদের নায়েবদ্বয়। ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে রুশ সৈনিকদের উপর।

এবার তাদের হাতে পিস্তল নয়– ঐতিহ্যবাহী আদুরে অস্ত্র খঞ্জর। রুশ বাহিনীর সারির মধ্যে ঢুকে পড়ে নায়েবদ্বয়। এতো কাছে থেকে তাদের উপর গুলি চালানো সম্ভব হচ্ছে না রুশ সৈনিকদের। সঙ্গীন হাতে তুলে নেয় দু' সৈনিক। নায়েবদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে তারা। ত্রিশজন রুশ সৈনিককে জাহান্নামে প্রেরণ করে নিজেরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে হাজী মুরাদের অবশিষ্ট নায়েবদ্বয়।

পশ্চিম আকাশে সূর্যটা অস্ত যাবে একটু পরে। রুশ অফিসার গর্তের দিকে তাকিয়ে বলে– 'হাজী মুরাদ! যদি জীবিত থাক, অস্ত্র ফেলে দাও। আমি জানি তোমার গুলি শেষ হয়ে গেছে।'

নিহত দু' সঙ্গীর লাশের মাঝে নিশ্চুপ পড়ে আছেন হাজী মুরাদ। দেহে পাঁচটি গুলি বিদ্ধ হয়ে আছে তার। হাজী মুরাদ মরে গেছে মনে করে রুশ অফিসার তার সৈনিকদের বললো– 'বেটার কান ধরে টেনে এখানে নিয়ে আসো।'

দু'জন সৈনিক এগিয়ে যায় হাজী মুরাদের দিকে। অমনি বিদ্যুদ্গতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে হাজী মুরাদের হাত দু'টো। দেখতে না দেখতে আহ! শব্দ করে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে সৈনিকদ্বয়। হাজী মুরাদ চিতার ন্যায় লাফিয়ে ওঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে রুশ অফিসারের উপর। অফিসারের হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ হয়ে যায় হাজী মুরাদের খঞ্জর। এবার এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ শুরু হয় হাজী মুরাদের উপর।

আকাশের সূর্য ডুবে গেছে। ডুবে যায় হাজী মুরাদের জীবন-সূর্যও। অপর এক রুশ অফিসার গাদ্দার আহমদ খানের পুত্র নোতজালকে সঙ্গে করে হাজী

মুরাদের লাশের নিকটে আসে এবং বলে– 'নোতজাল! তুমি তোমার দুশমনের মাথাটা কেটে আনো।'

আহমদ খানের পুত্র হাজী মুরাদের মৃত দেহ থেকে মাথাটা কেটে ফেলে। এই মাথা পৌঁছে যায় তিবলিস। সেখানে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে তাজা রাখা হয় মাথাটিকে। কয়েক সপ্তাহ পর হাজী মুরাদের কর্তিত মাথা পেশ করা হয় জার রুশ-এর সামনে। জার তার সম্মানিত মেহমান ও সমর্থক-এর মাথার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'এটি সংরক্ষণ করে রাখো। বড় মূল্যবান সম্পদ।'

কাফকাজ থেকে দেশে ফিরে টলস্টয় তার দেশবাসীকে 'দি কাস্ক,' 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'জীবন মাত্র শুরু হলো' ও 'হাজী মুরাদ' গ্রন্থ উপহার দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু খালাকে সন্তুষ্টকারী বাক্য 'আমি শামিলকে দেখেছি' শোনাতে ব্যর্থ হয়।

বাইশ.

রুশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তগুলোর প্রতিরোধ অভিযান বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সেনাভর্তির গতি তীব্রতর করে তোলা হয়েছে। জার নেকুলাই সিংহাসনে সমাসীন হয়েই সর্বপ্রথম সামরিক প্রশিক্ষণালয় প্রতিষ্ঠা, নতুন অস্ত্র তৈরি ও সেনাভর্তির কাজ তীব্র করে তোলেন। এখন রুশ সৈন্যসংখ্যা এত বেশি যে, তারা প্রতিটি রণাঙ্গনে পর্যাপ্ত সৈন্য প্রেরণ করতে পারছে। জার নেকুলাই দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডারকে লিখে পাঠান–

'লক্ষ্য অর্জনে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত আছি। তবু বলতে হচ্ছে, যুদ্ধ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, চতুর্দিক থেকে অধিক থেকে অধিকতর সৈন্য নিয়ে হামলা করে কাফকাজের দাপট খতম করে দেয়া দরকার। তবু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে আমি তোমার মতামত শোনা আবশ্যক মনে করি।'

বুড়ো শিয়াল অরনেস্টভ জবাব দেয়–

'শাহেনশাহ'র নির্দেশনা মোতাবেক বিদ্রোহী গোত্রগুলোতে অপারেশন পরিচালনা এবং শামিলের লোকদেরকে দলে ভেড়ানোর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফলাফল শীঘ্র প্রকাশ পাবে বলে আশা করি। এ কারণে আমি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছি। ক্ষয়-ক্ষতি এড়িয়ে যদি আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হই, তাহলে শাহেনশাহ অবশ্যই খুশি হবেন। অধমের অভিমত হলো, আপাতত চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হোক। এক্ষুনি বড় ধরনের আক্রমণ গোত্রগুলোকে আরেকবার ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে। আমরা যে বীজ বপন করেছি, তা অংকুরিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা জরুরি।'

ঠিক এমন সময়ে কারিমিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। রাশিয়ানদের সেখানে বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করতে হয়। স্বাধীনতাকামীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ করার জন্য যে পরিমাণ সৈন্যের প্রয়োজন, ঠিক সে পরিমাণ সৈন্য-ই বহাল রাখা হয় কাফকাজে।

রাশিয়ার নতুন এলাকা জর্জিয়ার সর্বশেষ সম্রাট জর্জ বারো-এর কন্যা ইনা। ইনা তার স্বামী কর্নেল শাহাজাদা ডিউড-এর সঙ্গে তিবলিসে বাস করে। তিবলিস থেকে সামান্য দূরে সান্ডালী নামক স্থানে শাহাজাদার জমিদারী। শাহাজাদা সেখানে ছোট অথচ সুদর্শন একটি মহল নির্মাণ করে রেখেছে।

১৮৫৪ সালের গ্রীষ্মকাল। কাফকাজে স্বাধীনতাকামীদের তৎপরতা তীব্র আকার ধারণ করে। রণাঙ্গনে চলে যাওয়ার নির্দেশ পায় শাহজাদা ডিউড। শাহজাদী ইনা স্বামীকে বলে, আমার মন চায়, এই গরম কালটা সান্ডালীতে গিয়ে কাটাই। আপনিও ময়দানে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমার সান্ডালী যাওয়া অধিক প্রয়োজন।

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে তো অবশ্যই। তোমার ছোট বোন নিনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। ও আমাদের জমিদারীটা কখনো দেখেনি।

ঃ ঠিক আছে, ভ্রমণ-বিহারে ও বড় আগ্রহী। এই প্রথমবার ও আমাদের বাড়িতে এসেছে। ও বড় আনন্দ পাবে।

কিছুদিন পর শাহজাদী ইনা তার বোন নিনা, বাচ্চাদের ফরাসী আয়া মাদাম ড্রান্সী ও চাকর-বাকরদের নিয়ে সান্ডালী পৌঁছে যায়। একমাস পর স্বামী ডিউড দু'দিনের ছুটিতে জমিদারীতে আসে এবং স্ত্রী-সন্তানদের খোঁজ-খবর নিয়ে কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষী নিযুক্ত করে দিয়ে ফিরে যায়।

সান্ডালীর দক্ষিণে পাঁচ মাইল দূরে দরিয়া এলাজান প্রবাহমান। সান্ডালী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে গিয়ে সংকীর্ণ হয়ে গেছে নদীটি। এখান দিয়ে নদী পার হয়ে রুশ বাহিনীর চৌকিগুলোর উপর আক্রমণ চালায় স্বাধীনতাকামীরা। শাহাজাদা ডিউড এখানকার রুশ সৈন্যদের কমান্ডার।

জুলাই মাসের বিশ তারিখ রাত। সান্ডালীতে শাহাজাদা ডিউডের মহলের প্রধান ফটকে পাহারায় নিয়োজিত দু'জন সশস্ত্র রক্ষী। রাত প্রায় ন'টা। এক অশ্বারোহী ফটকের কাছে এসে থামে এবং বলে– 'আমি কর্নেল শাহাজাদা ডিউড-এর লোক। এ এলাকায় কোহেস্তানী বিদ্রোহীদের হামলার আশংকা বেড়ে গিয়েছে। কর্নেলের স্ত্রী শাহাজাদী ইনাকে একটি জরুরি পয়গাম পৌঁছাতে হবে। রক্ষীদের একজন সংবাদ দেয়ার জন্য ভেতরে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকের খঞ্জর বিদ্যুতের গতিতে অপর রক্ষীর পেটে বিদ্ধ হয়ে যায়। কণ্ঠনালী অতিক্রম করে একটি শব্দ বের হওয়ার আগেই লোকটা লাশে পরিণত হয়। আগন্তুক লাশটা

টেনে একদিকে সরিয়ে ফেলে। খানিক পর ফিরে আসে প্রথম রক্ষী। কিছু বলার আগেই আগন্তুক তাকেও চিরতরে শেষ করে দেয়।

তারপর আগন্তুক ফটকটা পুরোপুরি খুলে নেয়। ঘোড়ার নিকটে গিয়ে হাতে নেয় যিনের সঙ্গে বাঁধা বন্দুকটা। একটা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ফটকের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। গুলির শব্দ শুনে মহলের ভেতর নিয়োজিত রক্ষীরা ছুটে আসে বাইরে। এই সুযোগে মহলের বাইরে অপেক্ষমান কয়েকজন কমান্ডো ঢুকে পড়ে ভেতরে। চারদিকে অন্ধকার। পরিস্থিতি আঁচ করার আগেই লাশে পরিণত হয়ে যায় মহলের সব ক'জন রক্ষী।

প্রদীপ জ্বালিয়ে কমান্ডোরা ঢুকে পড়ে মহলের ভেতরে। তারা শাহাজাদী ইনা, বোন নিনা, দু' শিশু সন্তান, আয়া মাদাম দ্রান্সী ও চাকর-বাকর সব ক'জনকে ধরে ফেলে।

বন্দিদেরকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে যায় কমান্ডোরা। রাতের ঘোর অন্ধকারেও ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলে সুশিক্ষিত ঘোড়াগুলো। এলাজানের তীরে পৌছে তারা উত্তর দিকে মোড় নেয়। মাইল কয়েক অগ্রসর হয়ে থেমে যায় এক স্থানে। নদী তীরের একটি ঝোপের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে আসে একটি নৌকা। নৌকায় করে বন্দিদের নিয়ে যায় নদীর ওপারে। বন্দিদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি তাজাদম ঘোড়া। তাদের এখানে রেখে আরেক অভিযানে রওনা হয়ে যায় কমান্ডোরা।

সান্ডালীতে রাতের বেলা বন্দুকের গুলির শব্দ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। প্রত্যেক জমিদারের সশস্ত্র প্রহরীরা তাদের উপস্থিতির জানান দেয়ার উদ্দেশ্যে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে প্রায়ই। শাহাজাদা ডিউডের মহলে রাতে যে ক'টি ফায়ার হল, সেগুলোকেও তেমনি স্বাভাবিক গুলির শব্দ মনে করেছিলো মানুষ। সান্ডালীর অধিবাসীরা আসল ঘটনা জানতে পারে পরদিন। তা-ও এক জখমী প্রহরীর মুখে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায় শাহাজাদা ডিউড। হুলস্থুল পড়ে যায় রাজধানী তিবলিসে। তিবলিসের উপকণ্ঠে মুক্তিকামীদের সফল আক্রমণ এবং জর্জিয়ার শাহাজাদীদের গ্রেফতারী আগেই প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত বসিয়ে রেখেছিলো জার-এর মুখে। বছর কয়েক আগ পর্যন্ত জার বলে বেড়াতেন– 'এক হাজার শাহাজাদা-শাহজাদীর বিনিময়েও জামালুদ্দীনকে মুক্তি দেয়া হবে না।'

কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। বর্তমানে কৌশলের দাবি হলো, জর্জিয়ার শাহজাদীদেরকে শামিলের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা হোক। অন্যথায় সব ক'টি বিজিত প্রদেশের প্রজারা জারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠবে। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে জনমত উপেক্ষা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

খাস কামরায় অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছেন জার নেকুলাই। এক পর্যায়ে তিনি

স্বগতোক্তি শুরু করেন, যেনো স্বপ্নে বিড় বিড় করছেন–

'উখলগু– সে তার সব পরাজয়ের বদলা নিয়ে নিলো। আমাদের বিরাট সমরশক্তি– আমাদের আধুনিক ব্যবস্থাপনা– আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেল– এখন তার দাবি আমাকে মানতেই হবে– জামালুদ্দীনকে ফেরত দিতেই হবে। লোকটা আসলেই বড় চালাক ও সাহসী যোদ্ধা।'

রাশিয়ার সর্বত্র জর্জিয়ার শাহজাদীগণ ও শাহাজাদা কর্নেল ভিউড-এর স্ত্রী-সন্তানদের গ্রেফতারীর বিষয়টি একমাত্র আলোচ্য বিষয়। অব্যক্ত এক আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে অধিকৃত জর্জিয়া, মংগ্রেলিয়া ও পোল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলগুলোর সাধারণ মানুষের মনে।

কারো দুঃশাসনে যদি জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তার উপর কোন বিপদ দেখা দিলে মানুষ আনন্দ পায়। রুশ অধিকৃত এলাকাগুলোর আমীর, রইস, প্রাক্তন শাসকবর্গ এবং সাধারণ মানুষ ঠেকায় পড়ে জার-এর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। তবে মন তাদের কাঁদছে। তাদের ঐকান্তিক কামনা, কোনো অদৃশ্য শক্তি এসে জার-এর উদ্যত মাথাটা অবনমিত করে দিক। কিন্তু কোনো দেশ বা কোনো সরকারের এতোটুকু সাহস নেই, তারা জার-শাসিত কোন ভূখণ্ডে পা রাখে। কেউ যদি হামলা করেও, ভৌগলিক দূরত্ব তার দুশমন হয়ে যায়। যখনই কোনো লড়াই হয়, হয় রাশিয়ার সীমান্ত এলাকায় কিংবা সীমান্তের বাইরে। এসব লড়াইয়ে যদি রাশিয়া পরাজয়ও বরণ করে, তবু তাতে তাদের কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না।

অধিকৃত এলাকাগুলোতে এতো পরিমাণ রুশ সৈন্য থাকে যে, কেউ বিদ্রোহ করার সাহস পায় না। কেবল ইমাম শামিলই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি মুষ্টিমেয় মুক্তিকামী মুজাহিদ নিয়ে মহান জার-এর শক্তিধর বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। অধিকৃত অঞ্চলের মানুষ এ জন্যও আনন্দিত, জার একটি পরীক্ষার মুখোমুখী। তিনি যদি জর্জিয়ার শাহজাদীদের মুক্তির জন্য কিছু না করেন, তাহলে মানুষ বলবে, জার প্রাক্তন শাসকমণ্ডলী ও নিজের সমর্থক-সহযোগীদের ভাল-মন্দের কোনো তোয়াক্কা করেন না। এতে এসব লোকদের অফাদারী হ্রাস পাবে, নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি জাগ্রত হবে তাদের মনে। আর যদি জর্জিয়ার শাহজাদীদের মুক্ত করে আনেন, তাহলে তার অর্থ হবে, নিজ হাতে নিজের পরিকল্পনার সেই প্রাসাদটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া, যার নির্মাণে তার ব্যয় করতে হয়েছে পনেরটি বছর। তিনি তো অপেক্ষা করছিলেন ইমাম শামিলের পতনের। যুদ্ধে তার সৈন্যদের হাতে নিহত হোক কিংবা গ্রেফতার হয়ে তার হাতে চলে আসুক বা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক– যে কোনো প্রকারে ইমাম শামিলের পতন হলে তারই পুত্র জামালুদ্দীনকে নিজের নায়েব হিসেবে ভাইসরয় বানিয়ে কাফকাজ প্রেরণ করবেন এই ছিলো জার নেকুলাই'র স্বপ্ন। তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে,

কাফকাজের সবক'টি গোত্র বাহাদুর শামিলের বড় পুত্রের আনুগত্য বরণ করে নেবে এবং ইমাম শামিলের এই পুত্র আজীবন তার অফাদারী করে যাবে।

শাহেনশাহে রুশ জার নেকুলাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রাক্তন শাসকমণ্ডলীর সন্তান, জর্জিয়ার আমীর, রইস ও সামরিক কর্মকর্তাগণ– সকলের দৃষ্টি জারের প্রতি নিবদ্ধ। জার কিছু একটা ভাবছেন। তবে সেই ভাবনার আড়ালে মূলত অন্যরা কে কী ভাবছে খবর নিচ্ছেন তিনি। সর্বপ্রথম তিনি শাহজাদা ডিউড-এর মতামত জানার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। শাহজাদা ডিউড মনের বিরুদ্ধে জবাব লিখেন–

'আমার সবকিছু– এমনকি আমার নিজের জীবনটাও শাহেনশাহ'র জন্য নিবেদিত। সর্বাবস্থায় শাহেনশাহ'র সন্তুষ্টিই অধমের একমাত্র কাম্য। আমি চাই না, আমার স্ত্রী-সন্তানদের খাতিরে মহান শাহেনশাহ জংলী বিদ্রোহীদের দাবি মেনে নিন।'

দরবারের মন্ত্রীবর্গের এই একই পরামর্শ যে, শাহজাদীদের মুক্তির জন্য বিদ্রোহীদের শর্তাবলী মেনে নেয়া জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। বিদ্রোহীরা একে শাহেনশাহ'র দুর্বলতা বলে ধরে নেবে এবং এতে তাদের মনোবল বেড়ে যাবে।

জার সকলের মতামত শ্রবণ করেন। নিজে সম্পূর্ণ নীরব। অবশেষে একদিন সুযোগ পেয়ে মহারাণী বললেন– 'রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এতো বিলম্ব করা ঠিক হচ্ছে না। শাহেনশাহকে এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।'

ঃ এ ব্যাপারে রাণীর মতামত কী?

ঃ আমার অভিমত হলো, শাহজাদীদের দ্রুত মুক্ত করে আনুন। বিদ্রোহীরা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। আপনি যদি শাহজাদীদের মুক্ত না করেন এবং বিদ্রোহীরা যদি তাদের সম্ভ্রমে হাত দেয়, তাহলে সাধারণ মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

ঃ নারীর প্রতি নারীর সহানুভূতি থাকাই উচিত।

ঃ শাহেনশাহ ঠিকই বলছেন। কিন্তু যে করে হোক শাহজাদীদের মুক্ত করা চাই। যদি বিদ্রোহীদের দাবি মেনে নিতে না পারেন, তাহলে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিন। তবু মেয়েগুলোকে এভাবে ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

ঃ আমার বড় আনন্দ লাগছে যে, রাণী আমাকে একটি সঠিক পরামর্শ দিয়েছে। আমি আমার অধীনদের মতামতের উপর ভরসা করছি না। আমি জামালুদ্দীনকে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

ঃ আমিও আনন্দিত যে, শাহেনশাহ'র আমার অভিমত মনো:পুত হয়েছে। তবে জামালুদ্দীনকে ফেরত দেয়া আপনার দুর্বলতা বলে বিবেচিত হবে। এ বিষয়টি নিয়ে আরেকটু চিন্তা করা ভালো হবে মনে করি।

ঃ কাফকাজ জয় হয়নি। শাহজাদীদের মুক্ত করে এনে আমরা বিজিত

অঞ্চলগুলোর সাধারণ মানুষের মন জয় করে ফেলবো। তারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আমরা আমাদের সহযোগী, শাসকবর্গ ও তাদের সন্তানদের খাতিরে আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হই না। জামালুদ্দীনকে জিম্মি করা যদিও আমাদের দূরদর্শিতার পরিচয় ছিলো বটে। কিন্তু এখন তাকে ফিরিয়ে দেয়াই হবে বিচক্ষণতার প্রমাণ। এ মুহূর্তে শাহজাদীদের মুক্ত করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। বিদ্রোহীরা বড় চতুর। হামলা করলে নিজেরা শেষ হওয়ার আগেই তারা শাহজাদীদের খতম করে ফেলবে।

❁ ❁ ❁

রুশ অধিকৃত পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারেসায় অবস্থান নিয়ে আছে রুশ বাহিনীর কয়েকটি কাসৃক ইউনিট। আমোদ চলছে সেনা অফিসারদের ক্লাবে। সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে দীর্ঘকায় সুদর্শন এক লেফটেন্যান্ট-এর প্রতি। সেনা অফিসারদের স্ত্রী-কন্যা ও বোনরা কাকে ডিঙ্গিয়ে কে আগে যুবকের সাথে কথা বলবে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে রীতিমত। দৃশ্যটি আপত্তিকর ঠেকে উর্ধ্বতন এক অফিসারের চোখে। কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারছেন না। অবশেষে এক অফিসার এগিয়ে আসে এবং বলে, সম্মানিত মহিলাগণ! সকল অফিসার নিজ নিজ সমর অভিযান ও কারগুজারীর কাহিনী শুনিয়ে শেষ করেছেন। এবার আপনারা আমাদেরকে এই অফিসারের মুখ থেকেও কিছু শুনতে দিন।

লাল হয়ে যায় যুবক অফিসারের মুখমণ্ডল। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে ওঠে, সিংহ পিঞ্জিরায় আবদ্ধ। আপনারা আমাকে যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি নিয়ে দিন। তারপর আমাকে আপনাদের কারগুজারী শোনাতে হবে না। আপনারা স্বচক্ষেই সব দেখতে পাবেন এবং অন্যের মুখেই সব শুনতে পাবেন।

লজ্জা পেয়ে যায় অফিসার। দু'হাতে যুবকের দু'কাঁধে চাপড় মেরে বললো, লেফটেন্যান্ট জামালুদ্দীন! আমি জানি, তুমি শেরে দাগেস্তানের পুত্র। আমি এও জানি, শাহেনশাহ এখনো তোমাকে যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি দেননি। আমি একটু রসিকতা করলাম মাত্র। আমি ক্ষমা চাই।

লেফটেন্যান্ট জামালুদ্দীন দেখতে অন্যসব অফিসারদের তুলনায় সুশ্রী, একহারা ও দীর্ঘকায়। তিনিই একমাত্র অফিসার, যার রুশ সামরিক উর্দির নীচে কাফকাজের খঞ্জর থাকে সব সময়। অনর্গল রুশ ভাষা-ই যে বলতে পারেন, তা নয়– সবদিক থেকেই জামালুদ্দীন এখন একজন পরিপূর্ণ রাশিয়ান। চিন্তা, মন-মানসিকতা ও চাল-চলন সবই এখন তার রুশী। দেহটা শুধু কোহেস্তানী। বড় পরিশ্রম করে জার ইমাম শামিলের এই পুত্রটাকে রুশী বানিয়েছেন। মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন শাহেনশাহ।

কিন্তু শাহেনশাহ এখনো জামালুদ্দীনকে তিনটি কাজের অনুমতি দেননি। এক

বিবাহ করা। শাহেনশাহ জামালুদ্দীনকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, মনোরঞ্জনের জন্য তোমার যে ক'জন নারীর প্রয়োজন রাখতে পারো। কিন্তু তোমার নিয়মতান্ত্রিক বিবাহ হবে কাফকাজের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মেয়ের সাথে। তাও আমি যখন প্রয়োজন মনে করবো, তখন।

দুই. মদপান করা। জারের আদেশ ছিল, জামালুদ্দীনকে মদ ছাড়া দুনিয়ার যে কোন মূল্যবান পানীয়র ব্যবস্থা করে দেবে। জামালুদ্দীন একবার এর কারণ জানতে চাইলে জার বলেছিলেন– 'ভবিষ্যতে তুমি কাফকাজের শাসনকর্তা হবে। তুমি ইমাম শামিলের পুত্র। কাফকাজের মানুষ কখনো একজন মদ্যপের আনুগত্য মেনে নেবে না। ইমাম শামিলের পুত্র মদ পান করতে পারে, তা তারা কল্পনাও করতে পারে না।'

তিন. যুদ্ধে অংশ নেয়া। জার শামিল পুত্র জামালুদ্দীনকে কোনো যুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবন হুমকির মধ্যে ঠেলে দেয়ার অনুমতি দেননি। তিনি জামালুদ্দীনকে কাফকাজে নিজের নায়েব নিযুক্ত করার জন্য তৈরি করছেন। জার জানতেন, যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হলে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে কম করবে না জামালুদ্দীন। কিন্তু একজন সৈনিক যতো বীরই হোক না কেনো, যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয়টিই ঘটতে পারে। যে কোনো বীর যোদ্ধার মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

এখনো ক্লাবেই অবস্থান করছেন জামালুদ্দীন। তার তলবীর নির্দেশ এসে পৌছে রাজ দরবার থেকে। পরদিন সকালে একটি স্পেশাল ঘোড়াগাড়ি সেন্টপিটার্সবার্গ অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। এক রুশ সেনা অফিসার গাড়ীর নিকট দণ্ডায়মান। চারপাশে এসে ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য নারী ও হাজার হাজার স্থানীয় বাসিন্দা। লেফটেন্যান্ট জামালুদ্দীন সকলের উদ্দেশে আল্লাহ হাফেজ বলে গাড়িতে ওঠে বসেন। সেন্টপিটার্সবার্গ অভিমুখে ছুটে চলে গাড়ি।

সেন্ট পিটার্সবার্গ গিয়ে পৌছেন জামালুদ্দীন। দু'দিন বিশ্রাম নেয়ার পর তিনি দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ পান। কেটে যায় দু'দিন। জামালুদ্দীন এখন দরবারে উপবিষ্ট। জার নেকুলাই এসে উপবেশন করেন নিজ আসনে। পার্শ্বে এনে বসান জামালুদ্দীনকে। বলেন, বৎস! তোমার হয়তো জানা হয়ে গেছে, আমি তোমাকে কেনো তলব করেছি?

জামালুদ্দীন ঃ জ্বি বাদশাহ নামদার। হুকুম তামিল করার জন্য আমি উপস্থিত।

ঃ আমি চাই, সিদ্ধান্তটা তুমি নিজেই গ্রহণ করো, আমার মনের ইচ্ছাকে তুমি নির্দেশ বা বাধ্য-বাধকতা না ভাব। এ ব্যাপারে তুমি দিনকয়েক চিন্তা-ভাবনা কর, তারপর আমাকে সিদ্ধান্ত জানাও।

ঃ এ ব্যাপারে আমার চিন্তা করার জন্য সময়ের প্রয়োজন নেই। সিদ্ধান্ত আমি আগেই নিয়ে রেখেছি। শাহেনশাহ'র ইচ্ছে হলে আমি আজই রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।

ঃ আমার ইচ্ছাও এমনই যে, প্রস্তুত থাকলে তুমি তিনদিন পর রওনা হয়ে যাও। এই ফাঁকে বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ সেরে ফেলো। আমি আশা করছি, স্বজনদের মাঝে চলে গিয়ে তুমি আমাদেরকে ভুলে যাবে না। আমার পক্ষ থেকে তোমার পিতাকে বুঝাতে চেষ্টা করবে, তিনি যদি আমাদের আপন ও অনুগত হয়ে যান, তাহলে আমরা তার পদমর্যাদা বহাল রাখবো, অন্তর থেকে তাকে ইজ্জত করবো। এবার তুমি উঠতে পারো।

জামালুদ্দীন বসা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, আমি আপনার হুকুম তামিল করবো। বলেই মাথা নুইয়ে জারকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে দরবার থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসের এক সকাল। জামালুদ্দীনের ঘোড়াগাড়ি রওনা হয় দক্ষিণ দিকে। সাথে রুশ কাসৃক বাহিনীর একটি ইউনিট। বরফে জমাট হয়ে আছে চারদিক। কিন্তু ধুক ধুক করছে জামালুদ্দীনের মনটা। গাড়ি রওনা হওয়ার পর থেকে মনটা ছটফট করতে শুরু করেছে তার।

নিজ জন্মভূমি ও পিতা-মাতা ছেড়ে জামালুদ্দীন চলে এসেছে আজ পনেরটি বছর হলো। উখলগু থেকে যখন তিনি রাজধানী অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন, তখন তার বয়স ছিলো আট বছর। এখন কাফকাজের ঝাপসা মতো দৃশ্য ভাসছে তার চোখের সামনে। তবে সেই ঝাপসা দৃশ্যের মাঝে দু'টি মুখাবয়ব স্পষ্ট মনে পড়ছে তার। একটি পিতা শামিলের, অপরটি মা ফাতেমার। জামালুদ্দীন এখনো জানেন না, মমতাময়ী মায়ের চেহারা তিনি আর কোনোদিন দেখতে পাবেন না। কলিজার টুকরার বিরহ শোকে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে তিনি একদিন চলেই গেছেন দুনিয়া ছেড়ে।

অশ্বঘোটক থেকে কল্পনার ঘোড়ায় চড়ে পনের বছরের ব্যবধান অতিক্রম করে মুহূর্ত মধ্যে উখলগু চলে এসেছেন জামালুদ্দীন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, মা ফাতেমা তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বিদায় দিচ্ছেন আর বলছেন– 'বাছা আমার! তুমি ইমামে দাগেস্তানের পুত্র। তোমার পিতাকে মানুষ সিংহ বলে। সিংহশাবক কখনো ভয়ও পায় না, কাঁদেও না বাবা!'

জামালুদ্দীন দেখতে পাচ্ছেন, তিনি পিতা-মাতার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে রুশ কমান্ডারের তাঁবুর নিকট পৌঁছে গেছেন। দূরে সোজা দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তার প্রতি চেয়ে আছেন পিতা শামিল। এমনি সময়ে অকস্মাৎ গাড়োয়ান পেছন দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে– 'জনাব! চা পান করতে চাইলে বলুন, গাড়ি থামাই।' হঠাৎ চমকে ওঠেন জামালুদ্দীন। সম্বিৎ ফিরে আসে তার। কল্পনার জগত থেকে চলে আসেন বাস্তব জগতে। বললেন, ঠিক আছে, গাড়ি থামাও। গাড়োয়ান মাথা তুলে পেছনে ফিরে উচ্চকণ্ঠে সিপাহীদের হাঁক দিয়ে থেমে যেতে বলে।

খানিক পর জামালুদ্দীন শাহী সরাইখানায় চায়ের কাপে চুমুক দেন। পথে প্রতিটি শহরে-জনপদে জনতা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানায় জামালুদ্দীনকে। সবখানে দাগেস্তানের সিংহ ইমাম শামিলের পুত্রকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমায় মানুষ— নারী, পুরুষ, শিশু সকলে।

ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে জামালুদ্দীন তিবলিস পৌঁছেন। তার সম্মানার্থে সাড়ম্বর আপ্যায়নের আয়োজন করেন গবর্নর। তিনি জামালুদ্দীনকে জানান, কর্নেল ডিউড ইমাম শামিলের সাথে আলোচনা করার জন্য তমীরখানশুরা চলে গেছেন। চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি এখানেই অবস্থান করবেন।

শাহজাদা ডিউড তার হয়ে ইমাম শামিলের সাথে কথা বলার জন্য কর্নেল গ্রামোভকে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর উভয়পক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ১১ মার্চ সকালে মাজ্জিক নদীর কূলে বন্দি বিনিময়ের পরিকল্পনা কার্যকর হবে। উভয়পক্ষের সৈন্যদের মাঝে দু' ফার্লং পথের দূরত্ব থাকবে। উভয় পক্ষের তিন তিনজন অফিসার ও পঁয়ত্রিশজন করে সৈন্য বন্দিদের নিয়ে চালগুজা বৃক্ষের নিকটে চলে আসবে। এক পক্ষের সৈন্যরা বৃক্ষের একদিকে এক মাইল দূরে এবং অপরপক্ষ তার বিপরীত দিকে সমান দূরত্বে অবস্থান নেবে। এই দু মাইলের ভেতরে কোন পক্ষ একটি ফাঁকা গুলিও ছুঁড়বে না, যাতে কোনো রকম ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।

১০ মার্চ রাতে কর্নেল গ্রামোভ ইমাম শামিলের খেদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি পেয়ে গ্রামোভ ইমাম শামিলের তাঁবুসম অস্থায়ী বাসগৃহে উপস্থিত হন।

চারপাইর উপর অর্ধমুদ্রিত চোখে শুয়ে আছেন শেরে দাগেস্তান ইমাম শামিল। হাতে তার কালো দানার তাসবীহ। পেছনে অস্ত্র হাতে দণ্ডায়মান নায়েব বার আফেন্দী। ভেতরে প্রবেশ করে ইমাম শামিলকে সালাম করেন গ্রামোভ। নিজে শোয়া থেকে উঠে বসে একটা চৌকি দেখিয়ে দিয়ে গ্রামোভকে বসতে বললেন ইমাম। গ্রামোভ কিছু বলার আগেই ইমাম শামিল তাকে উদ্দেশ করে বললেন—

'তোমাদের শাহেনশাহ'র মৃত্যুতে আমার বড় আফসোস হয়। তোমার কমান্ডার ইন চীফকে আমার পক্ষ থেকে শোক জানিও।'

বিস্মিত কণ্ঠে গ্রামোভ বললেন— 'জনাব তা হলে সংবাদটা পেয়ে গেছেন!'

ঃ মৃত্যু তো সকল প্রাণীর অবধারিত লিখন। কিন্তু তোমাদের জার নেকুলাই'র মৃত্যু আমার কাছে রহস্যময় বলে ঠেকছে। এত্তো বড় সম্রাট! এমন বিস্ময়কর মৃত্যু!

ঃ বিশ্বাস করুন জনাব! ঘটনাটি এতো বিস্তারিত আমারও জানা নেই। কমান্ডার ইন চীফ সব খবর পেয়ে থাকবেন হয়তো।

ঃ মানুষ ভাবে কী আর ঘটে কী! তোমার এই শাহেনশাহও কাফকাজ জয়ের অনুশোচনা বুকে নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। যা হোক এখন তুমি হয়তো একথা বলতে এসেছো, জার-এর মৃত্যুর কারণে কাল বন্দী বিনিময়ের অনুষ্ঠান মুলতবি রাখা প্রয়োজন।

ঃ না জনাব! বাহ্যত এরূপ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু কমান্ডার ইন চীফ-এর একান্ত ইচ্ছা, চুক্তি অনুযায়ী কালই বন্দি বিনিময়ের কাজটা সম্পন্ন হয়ে যাক।

ঃ আমাদের পক্ষ থেকে সব আয়োজন সম্পন্ন। আমরা প্রস্তুত।

ঃ ইমাম সাহেব! আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছিলাম। বন্দি বিনিময় অনুষ্ঠানে আমাদের পক্ষ থেকে কমান্ডার ইন চীফ ব্যারন নেকুলাই স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন। তিনি চাচ্ছেন আপনাদের পক্ষ থেকে আপনি নিজে তদারকি করবেন, যাতে ঠিক সময়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না পারে এবং কোনো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ না ঘটে।

ঃ দেখুন, অবস্থা স্বাভাবিক হলে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে নিতে আমার আপত্তি থাকতো না। কিন্তু এখানে একদিকে আমার পুত্র। এমতাবস্থায় আমার সেখানে যাওয়ার অর্থ হবে, আমি আমার পুত্রকে স্বাগত জানানোর জন্য গিয়েছি। আমাদের সমাজে পুত্র পিতাকে স্বাগত জানায়– পিতা পুত্রকে নয়।

ঃ আপনাদের প্রথা-প্রচলন আমার কিছু কিছু জানা আছে। কিন্তু আপনার পরিচয় তো দু'টি। প্রথমত আপনি জামালুদ্দীনের পিতা। দ্বিতীয়ত আপনি ইমাম ও সেনাপতি। পিতা হিসেবে নয়– আপনি সেনাপতি হিসেবে যাবেন। আপনাকে এই আবেদন জানানোর আরো একটি কারণ, বন্দিরাও সকলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আপনার কোন দুশমন– শাহজাদা ডিউডের কোনো অমঙ্গলকামী সামান্য একটু উল্টা-পাল্টা করে ফেললে সব ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। কমান্ডার ইন চীফ ব্যারন নেকুলাই এ কারণেই নিজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ঃ ঠিক আছে, আমি এমন এক স্থানে অবস্থান করবো, যেখান থেকে কার্যক্রম তদারক করতে পারি।

বার আফেন্দী বললেন, মহামান্য ইমাম! যদি গোস্তাখী না হয়, তাহলে আরজ করব যে, আপনি এই আবেদন মঞ্জুর করবেন না। অন্যথায় মানুষ এটাই বলবে যে, পিতা তার পুত্রকে স্বাগত জানাতে গিয়েছে।

ঃ আমি পরিস্থিতির নাজুকতা বুঝি আফেন্দী! থাকবো তো খানিক দূরে। আর জামালুদ্দীন আমাদের বাহিনীতে এসে পৌঁছার আগেই আমি ফিরে আসবো। গ্রামোভ যে আশংকা দেখিয়েছে, তা ভিত্তিহীন নয়। আমি উপস্থিত থাকলে সব রকম বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। ইমাম শামিলের মঞ্জুরি পেয়ে খুশি মনে ফিরে যান গ্রামোভ।

● ● ●

১৮৫৫ সালের ১১ মার্চের সকাল বেলা। মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্য বিরাজ করছে চেচনিয়ার মাজিক দরিয়ার তীরে। দরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে আধা মাইল বিস্তৃত একটি পাহাড়। সম্মুখে খোলা ময়দান। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সামান্য দূরে ডাল-পালাবিশিষ্ট চেলগুজা বৃক্ষ। এ মুহূর্তে পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে পত পত করে উড়ছে হাজার হাজার কালো পতাকা। ইমাম শামিলের কালো পোশাক পরিহিত সৈন্যদের সারির সর্বসম্মুখে বাছাবাছা পঁয়ত্রিশজন সশস্ত্র জানবাজ দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান আরো দু'টি অশ্ব। তাতে সওয়ার হয়ে আছেন নায়েব মোহাম্মদ আলী ও বার আফেন্দী। এ দু' ঘোড়ার সামনে একটি সাদা ঘোড়ায় বসে আছেন গাজী মোহাম্মদ। পেছনের পাঁচ হাজার সৈন্যের সারির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি কোহেস্তানী গাড়ি। জর্জিয়ার বন্দি শাহজাদী ও তাদের সেবিকাগণ এসব গাড়ির আরোহী।

চেলগুজা বৃক্ষ থেকে এক ফার্লং দূরে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে রুশ বাহিনী। সর্বাগ্রে কর্নেল গ্রামোভ। তার পেছনে দু' মেজর। মেজরদের পেছনে পঁয়ত্রিশজন কাসৃক সৈন্য। সকলের পেছনে সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান পাঁচ হাজার রুশসেনা। সূর্যের আলোতে ঝকমক করছে রুশ সিপাহীদের সঙ্গীনগুলো। পাঁচ হাজার সিপাহীর সারি থেকে সামান্য দূরে অধীন অফিসারদের সঙ্গে অবস্থান করছেন কমান্ডার ইন চীফ ব্যারন নেকুলাই।

হঠাৎ 'ইমাম শামিল জিন্দাবাদ'-এর আকাশফাটা ধ্বনিতে গর্জে ওঠে সমস্ত এলাকা। পাহাড়ের চূড়া থেকে আত্মপ্রকাশ করে তিনটি ঘোড়া। মাঝেরটাতে সাওয়ার ইমাম শামিল। তাঁর ডানে দানিয়েল বেগ আর বাঁয়ে মোল্লা জামালুদ্দীন।

দৃশ্যটা অবলোকন করলেন কমান্ডার ইন চীফ ব্যারন নেকুলাই। তারপর অধীন অফিসারদের বললেন, দেখেছো, লোকটা কেমন হুঁশিয়ার। এমন একটা জায়গা বেছে নিলো যে, আমাদের পক্ষ থেকে কোনো আক্রমণের সুযোগই রাখলো না। তাছাড়া আমাদের সৈনিকদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে বেটা।

'ইমাম শামিল' ধ্বনি গুঞ্জরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে দূরবীন স্থাপন করে নেয় কয়েকজন রুশ অফিসার। এদিকে ইমাম শামিল স্বয়ং এবং তাঁর দু' নায়েব দানিয়েল ও মোল্লা জামালুদ্দীন ইমাম শামিলকে উদ্দেশ করে বললেন- 'ওদের পাঁচ হাজার সৈনিকের পেছনে তোপ-গোলাও আছে। গাছের ঝোপের ওপারে দেখা যাচ্ছে বিপুল সৈন্য। তাদের অফিসার আমাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে।

ঃ চিন্তা করো না জামালুদ্দীন! এ মুহূর্তে ওরা সবাই আমাদেরকে দেখার চেষ্টা করছে।

নিজ নিজ ঘড়ির প্রতি তাকায় গাজী মোহাম্মদ ও গ্রামোভ। বেলা ন'টা বাজে। সাদা পতাকা উড়িয়ে পাহাড়ের দিক থেকে নড়ে ওঠে তিনটি কোহেস্তানী গাড়ি। গাজী মোহাম্মদ-এর নেতৃত্বে সেনাবেষ্টিত হয়ে গাড়িগুলো অগ্রসর হতে শুরু করে চেলগুজা বৃক্ষের দিকে। অপরদিক থেকে শামিলপুত্র জামালুদ্দীনকে নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে কর্নেল গ্রামোভ।

গাড়িতে উপবিষ্ট শাহজাদীদের মুখমণ্ডল নেকাবে ঢাকা। চেলগুজা বৃক্ষের তলে এসে থেমে যায় উভয় দল। গাজী মোহাম্মদ রুশ অফিসার ও সিপাহীদের উদ্দেশে উচ্চস্বরে বললেন, শাহজাদা ডিউড যদি এখানে থেকে থাকে, তাহলে তাকে সম্মুখে আসতে বলুন। তার নিকট একটা জরুরি পয়গাম পৌঁছাতে হবে।

তাকে নিয়ে আসার জন্য সিপাহী পাঠিয়ে দেন কর্নেল গ্রামোভ। অল্পক্ষণ পর সাদা ঘোড়া হাঁকিয়ে কর্নেল গ্রামোভের নিকট এসে পৌঁছায় শাহজাদা ডিউড। গাজী মোহাম্মদ শাহজাদা ডিউডকে উদ্দেশ করে বললেন–

'আপনাদের যেসব নারী আমাদের হাতে বন্দি ছিলো, তারা সকলে কুমারীর ন্যায় পবিত্র আছে। আমরা তাদের যথাসাধ্য যত্ন করেছি। যদি তাদের কোনো প্রকার কষ্ট হয়ে থাকে, তার কারণ বোধ হয় এই হবে যে, আমরা নিজেরা সরল জীবন যাপন করি। হতে পারে, আমাদের বন্দিরা যেরূপ জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সে অনুপাতে আমরা তাদের যত্ন-আপ্যায়ন করতে পারিনি।'

শাহজাদা ডিউড বোবার মত দাঁড়িয়ে আছেন। যেনো তিনি কিছুই শুনতে পাননি, কিছুই বলতে খুঁজে পাচ্ছেন না। সকলের ধারণা; উত্তরে তিনিও কিছু বলবেন।

গাজী মুহাম্মদ এক মুহূর্ত নীরব থেকে তার সিপাহীদের আদেশ দেন, গাড়িগুলো আরো একটু সামনে নিয়ে যাও এবং রাজকুমারীদের রুশ কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দাও। তৎক্ষণাৎ কর্নেল গ্রামোভও বলে ওঠলেন, লেফটেন্যান্ট জামালুদ্দীন! আপনিও এগিয়ে যান। জামালুদ্দীন ঘোড়া থেকে নেমে সামনে অগ্রসর হন। জামালুদ্দীন যখন কোহেস্তানী গাড়িগুলোর পার্শ্ব দিয়ে এগুতে শুরু করেন, দেখে গাড়িতে উপবিষ্ট শাহজাদীদের মুখের নেকাব খসে পড়ে যায়। নিজ স্ত্রীর দিকে এগিয়ে যায় শাহজাদা ডিউড। কিন্তু শাহজাদী ইনার পলকহীন চোখ দু'টো যেনো জামালুদ্দীনের মুখাবয়বে আটকে আছে। শাহজাদা ডিউড স্ত্রীর কাছে এসে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কিছুক্ষণ তার মুখপানে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বলল– 'আমার দিকেও একটু তাকাওনা প্রিয়া!'

হঠাৎ চমকে ওঠে ইনা। হতচকিত নয়নে তাকায় স্বামীর প্রতি। বলে– 'ও তুমি! মনে কিছু নিওনা। যে লোকটার বদৌলতে এ শুভ মুহূর্তটি আসলো, তাকে একটু দেখছিলাম আর কি! এ লোকটি না হলে আমরা জীবনে কখনো একত্রিত হতে পারতাম কিনা সন্দেহ!'

এ মুহূর্তে অপর প্রান্তে জামালুদ্দীন বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন গাজী মোহাম্মদকে।

কিছুক্ষণ পর উভয় পক্ষের সৈন্যরা ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়। এমন সময় কর্নেল গ্রামোভ গাজী মোহাম্মদের নিকটে এসে একটি খাম সম্মুখে এগিয়ে ধরেন এবং বলেন– 'এটি মেজর লাজরাফের পত্র– অত্যন্ত জরুরি।'

সেনা প্রহরায় ইমাম শামিল ফিরে যান তাঁর অস্থায়ী বাসগৃহে। একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী লাজরাফের পত্রটি নিয়ে পৌছিয়ে দেন ইমামের হাতে। পত্রে মেজর লাজরাফ লিখেছেন–

'প্রকৃতির কিছু কিছু সিদ্ধান্ত বড় বিস্ময়কর হয়ে থাকে। জামালুদ্দীন যখন আট বছর বয়সের বালক, তখন সে আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। ছেলেটা যৌবন পেয়েছে এক ভিন্ন পরিবেশে। এখন সে না পুরো কোহেস্তানী না পুরো রুশী। এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রেখেই আপনি তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন।'

ইমাম শামিল পত্রখানা পাঠ করে বললেন, সব সম্প্রদায়েই কিছু কিছু ভালো মানুষ থাকে। মেজর লাজরাফও তেমনি একজন ভালো মানুষ। তিনি বড় সত্য কথা বলেছেন।

তথাপি ইমাম শামিলের আদেশ, জামালুদ্দীন আমার কাছে রুশী উর্দি খুলে আমাদের স্থানীয় পোশাক পরে যেন আসে।

জামালুদ্দীনের জন্য নতুন পোশাক আনা হলো। বড় একটি পাথরের আড়ালে গিয়ে জামালুদ্দীন পোশাক পরিবর্তন করেন। তারপর গাজী মোহাম্মদ ও ইমাম শামিলের অন্যান্য নায়েবদের সঙ্গে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রওনা হন।

অস্থায়ী বাসগৃহে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে নায়েবদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে মত বিনিময় করছেন ইমাম শামিল। দীর্ঘ বিরহের পর পুত্রকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে জ্বল জ্বল করছে তাঁর চেহারা। হৃদয়-সমুদ্রে বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের ন্যায় উথলে ওঠা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন তিনি।

এমন সময়ে ইমামের খাস খাদেম এসে সংবাদ দেয়, জামাল ভাই এসেছেন। ভেতরে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করছেন। ইমাম শামিল 'নিয়ে আসো' বলে নিজেকে সামলে নিয়ে ওঠে বসেন। জামালুদ্দীন ভেতরে পা রেখেই 'আব্বা' বলে দৌড়ে গিয়ে পিতার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েন। ইমাম শামিল 'আমার জামাল!' বলে উঠে দাঁড়ান এবং দু'বাহু ধরে টেনে পুত্রকে দাঁড় করিয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেন। দু'জনেরই চোখ মুদিত, যেনো অলক্ষে কাঁদছেন পিতা-পুত্র। গাজী মোহাম্মদ, মোহাম্মদ শফী ও অন্যান্য নায়েবগণের চোখেও অশ্রু নেমে আসে।

এভাবে কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপর পুত্রের জিম্মিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসার জন্য নায়েবগণ ইমাম শামিলকে মোবারকবাদ দিতে শুরু করেন।

জামালুদ্দীন নিজেকে খানিকটা সংবরণ করে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'মা কোথায় আব্বাজান!'

প্রশ্ন শুনে ইমাম শামিল অশ্রু ঝর ঝর পলকহীন নেত্রে গাজী মোহাম্মদের দিকে তাকান। গাজী মোহাম্মদ চোখ নীচু করে ফেলেন। জামালুদ্দীন পিতার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাকান গাজী মোহাম্মদের প্রতি। তারপর একে একে দৃষ্টিপাত করেন অন্যান্য নায়েবদের প্রতি। সকলেরই চোখ অবনত, অশ্রুসজল। সকলেই নীরব। এক পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে কক্ষে। প্রশ্নের জবাব বুঝে ফেলেন জামালুদ্দীন। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় কান্না বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন জামালুদ্দীন।

জামালুদ্দীনের কান্না দেখে কেঁদে ফেলেন ইমাম শামিল ছাড়া সকলে। ইমাম শামিল পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– 'ধৈর্য ধরো বেটা! তোমার মা তোমার অনেক অপেক্ষা করেছে। কিন্তু অপেক্ষা যে মৃত্যু অপেক্ষা কঠিন! অবশেষে তোমার মা তোমার বিরহে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে একদিন চলে গেলো দুনিয়া ছেড়ে। আবারো ডুকরে কেঁদে ওঠেন জামালুদ্দীন।

❁ ❁ ❁

ইমাম শামিলের পুত্র জামালুদ্দীনের প্রত্যাবর্তনে ইমামের মুরীদদের মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। জামালুদ্দীনকে এক নজর দেখার জন্য দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। কিছুদিন পর ইমাম শামিল তাঁর পুত্র গাজী মোহাম্মদকে ডেকে বললেন–

'আমার মনে হচ্ছে, জামালুদ্দীনের কোন কাজে মন বসছে না। তোমার মা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে হয়তো অল্প সময়ে ওর সব ঠিক হয়ে যেতো। ছেলেটা বড় হয়েছে রুশীদের মাঝে। শিক্ষা-দীক্ষাও পেয়েছে তাদের মত করে। এ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ওর একটু সময় লাগবে। আমার ভয় হচ্ছে, রাশিয়ানদের ন্যায় এখানকার আবহাওয়ায় ওর অসুখ হয়ে যায় কিনা। কাজেই তুমি ওর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখো। এক এক সময় এক এক এলাকায় নিয়ে ওকে ভ্রমণ করাও। ঘোড়সওয়ারী ও পায়ে হাঁটার ধারা বজায় রাখলে আশা করি মারাত্মক কোন অসুখ-বিসুখ হবে না।'

ঃ আপনার আদেশ শিরোধার্য আব্বাজান! তবে আমার মনে হয়, ভাইয়ার মানসিক সুস্থতার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। তার কথা-বার্তায় মনে হচ্ছে, তিনি আমাদের যুদ্ধ করা পসন্দ করেন না। অনেক সময় নিজের অলক্ষ্যে হঠাৎ বলে ফেলেন– 'আব্বাজান জার-এর সঙ্গে সন্ধি করে নিচ্ছেন না কেনো?'

ঃ বেটা! আমি তো তোমাকে এ কথাটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে, ছেলেটা মানসিক দিক থেকে রুশী হয়ে গেছে। মানুষ সাহচর্যে প্রভাবিত হয়ে থাকে। ওর লালন-

পালনই তো হয়েছে রুশ সমাজে। ওকে আমাদের বুঝাতে হবে, রাশিয়া যদি বাস্তবিকই 'বিশাল সাম্রাজ্য' হয়ে থাকে, তাহলে জার-এর কাফকাজ পদানত করার প্রয়োজন পড়লো কেনো? জার যদি সত্যিই মহান হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রদানে প্রস্তুত নয় কেনো? ক্ষুধার্ত যদি কাউকে লুটে খায়, তাহলে তার কারণ পরিষ্কার। কিন্তু যার সম্পদের অভাব নেই, সে লুট করতে রাস্তায় নামে কেনো? এসব কথা তাকে বোঝাতে থাকো। দেখবে ধীরে ধীরে তার বুঝ পাল্টে যাবে। তবে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। তুমি যাও, একটা ভ্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে প্রস্তুত হও।

পিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গাজী মোহাম্মদ জামালুদ্দীনের নিকট চলে যায় এবং তাকে দেশ ভ্রমণের জন্য উৎসাহ প্রদান করে।

তেইশ.

রাশিয়ার জার নেকুলাই প্রথম-এর মৃত্যুশোক পালনের পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর এখন জার আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয়-এর মুকুট পরিধানের উৎসব পালিত হচ্ছে। জার আলেকজাণ্ডার দুনিয়ার রীতি অনুযায়ী নিজের পছন্দনীয় লোকদের প্রমোশন দিচ্ছেন, তাদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত করছেন এবং সাবেক জার-এর ভক্ত-অনুগতদেরকে বিভিন্ন ছলছুতায় বরখাস্ত কিংবা বদলী করছেন।

নিজ দরবারে জরুরি রদ-বদলের পর জার আলেকজাণ্ডার কাফকাজের প্রতি মনোনিবেশ করেন। পিতৃপুরুষ ও পূর্বসূরীদের ন্যায় কাফকাজ জয়ের বিলম্বে তার মনেও অন্তহীন উৎকণ্ঠা। তারও ঐকান্তিক বাসনা, কাফকাজ অনতিবিলম্বে পদানত হয়ে যাক। দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ সেনাপতি অরনেস্টোভ জার নেকুলাই'র সাথে কৃত ওয়াদা মোতাবেক কাফকাজ জয় করতে পারেননি। এ অজুহাতে তাকে পদচ্যুত করা কঠিন নয়। কিন্তু তার স্থলাভিষিক্তির বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। অরনেস্টোভ-এর পদে যাকে নিয়োগ দেয়া হবে, তিনি এমন হতে হবে যে, বাস্তবিকই তিনি কাফকাজ জয় করতে পারবেন, যাতে রুশ বাহিনী পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে।

জার আলেকজাণ্ডার তার কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ও বিচক্ষণ সেনাপতির প্রতি গোপনে এই নির্দেশ প্রেরণ করেন, যেনো তারা অনতিবিলম্বে কাফকাজ জয় করার পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নিয়ে আসে।

সেনাপতিগণ নিজ নিজ পরিকল্পনা নিয়ে জার-এর দরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু নতুন জার-এর নিকট সেনাপতি বেরিয়া তানস্কীর পরিকল্পনা সঠিক ও বাস্তবধর্মী মনে হলো। বেরিয়া তানস্কী তিন সপ্তাহ পর্যন্ত দিন-রাত খেটেখুটে এই পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করেছেন। পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ–

১. কাফকাজের গোত্রগুলোকে ক্রয় করার জন্য তাদের চাহিদা অনুসারে টাকা-পয়সা, সোনা-দানা ব্যয় করতে হবে। কাফকাজের বেশিরভাগ মানুষ হতদরিদ্র। যারা জার-এর আনুগত্য ও যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, তাদেরকে দাবি অনুপাতে অর্থ দিয়ে হলেও পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। আমরা প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ যুদ্ধে ব্যয় করে থাকি, তার অর্ধেকও যদি কাবায়েলীদের ক্রয় করার কাজে ব্যয় করি, তাহলে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। কাবায়েলী সরদারদেরকে এই অর্থ উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করতে হবে। ক্রুশের পরিবর্তে চাঁদ-তারাখচিত স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া দিলে তারা তা সাদরে গ্রহণ করবে।

২. কঠোরতার পরিবর্তে ক্ষমা প্রদর্শন ও সদয় আচরণের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বিজিত এলাকাগুলোতে বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার জ্বালিয়ে দেয়া ও কাউকে খুন করার কর্মধারা বর্জন করতে হবে এবং এলাকাবাসীদের এই বুঝ দিতে হবে যে, যারা অস্ত্র ত্যাগ করবে কিংবা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকবে, তারা আমাদের বন্ধু। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ ধ্বংসাত্মক নীতি অবলম্বন করে আসছি। আমাদের এই কর্মনীতির ফলে কাবায়েলীরা ধরে নিয়েছে, আমাদের পদানত হয়ে ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে লড়াই করতে করতে জীবন বিলিয়ে দেয়াই শ্রেয়। অবাধ্যতার শিক্ষণীয় শাস্তি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয় তখন, যখন সমগ্র অঞ্চল ও সকল মানুষের উপর আমাদের শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন একজন বিদ্রোহীকে শাস্তি দিলে অন্যরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তখন আমরা তাদেরকে বুঝ দিতে পারি যে, তোমরা যদি শামিলের সঙ্গ ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও কিংবা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করো, তাহলে তোমরা লাভবান হবে। তখন তারা বুঝবে, এতে আর্থিক লাভও আছে আবার ধ্বংসের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস, আমরা যদি আমাদের এই নতুন কর্মনীতির কথা প্রচার করে দিতে পারি, তাহলে কাবায়েলীরা ময়দানে আমাদের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করার প্রতিজ্ঞার পরিবর্তে অস্ত্র ত্যাগ করে আমাদের আশ্রয়ে চলে আসা শ্রেয় মনে করবে। এভাবে যদি আমরা তাদের ব্যক্তিসত্তার উপর আঘাত না করে তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ দেখাই, তাহলে অবশ্যই তারা শামিলের সঙ্গ ত্যাগ করবে।

৩. উল্লিখিত পরিকল্পনা দু'টোর চূড়ান্ত সফলতা নির্ভর করে যুদ্ধের ময়দানে আমাদের সাফল্যের উপর। পূর্ব প্রস্তুতির পর একযোগে সর্বাত্মক আক্রমণ চালাতে হবে এবং আক্রমণের তীব্রতা পরিকল্পনা দু'টো সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বহাল রাখতে হবে। অতীতে আমাদের ব্যর্থতাগুলোর বড় কারণ এই ছিলো যে, আমরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে লড়াই করে আসছি। কাফকাজের পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গল আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। অত্র অঞ্চলের প্রতিটি

পাথর, প্রতিটি বৃক্ষ আমাদের বিপক্ষে কাজ করছে। অতীতে সেনাপতিগণ এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেননি। কাফকাজে আমাদের আসল দুশমন পাহাড়ের গুহা আর বৃক্ষরাজি। আমাদের বারুদের অভাব নেই। আছে বিপুল জনশক্তি। আমার প্রস্তাব হলো, এখন থেকে আমরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাহাড়সমূহ উড়িয়ে দেয়ার অভিযান শুরু করবো। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সময় আমাদের কিছু ত্যাগ দিতে হবে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে যে যে এলাকা আমাদের দখলে আসবে, তা কখনো হাতছাড়া হবে না। কাবায়েলী বিদ্রোহীরা কখনো খোলা ময়দানে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়নি, হতে পারেও না। আমাদের পাহাড়-জঙ্গলে সৈন্য প্রেরণের পদ্ধতি পরিবর্তন করা উচিত। আমাদের হাতে লাখ লাখ সৈন্য আছে। আমরা যদি তাদের একটা অংশকে জঙ্গল পরিষ্কার করা এবং দুশমনের আশ্রয়স্থলগুলোকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহার করি, তাহলে বিস্ময়কর ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করি। দুশমন যখন বুঝতে পারবে, ক'দিন পর পাহাড়-জঙ্গল আর তাদের সাহায্য করবে না, তখন তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে। ফলে ভবিষ্যতে তারা আর কিছুই করতে পারবে না।

বেরিয়া তানস্কীর এই প্রস্তাবনা জার আলেকজান্ডারের মনো:পূত হয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য তিনি তাকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠান। বেরিয়া তানস্কী শাহেনশাহ'র খেদমতে হাজির হয়ে তার পরিকল্পনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বিবরণ শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে জার বললেন, তোমার পরিকল্পনাটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এর সফলতা-ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে। তুমি ইচ্ছে করলে যে কোনো সময় দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফের দায়িত্ব হাতে নিতে পারো।

ঃ মহান শাহেনশাহ! খোদাওন্দের আদেশ শিরোধার্য। আমি কাফকাজে এমনভাবে যেতে চাই যে, আমার সঙ্গে থাকবে বিপুল ধন-ভাণ্ডার। আর আমি যখন যতো ইচ্ছা সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ব্যয় করা প্রয়োজন মনে করবো, ব্যয় করার অধিকার সংরক্ষণ করবো। শামিল সব সময় তার জল্লাদকে সাথে রাখে। আমি সাথে রাখবো আমার ধন-ভাণ্ডার।

ঃ তুমি কাফকাজ রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেয়ার দায়িত্ব আমার। আর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব তোমার।

ঃ আমি যদি আমার পরিকল্পনায় সফলতা অর্জন করতে না পারি, তাহলে আমি জাহাপনাকে আর কখনো মুখ দেখাবো না।

ঃ আমি নিশ্চিত যে, তোমার পরিকল্পনা সফল হবে। আমি শাহী খাজাঞ্চীকে তোমার সাথে একজন লোক দিয়ে দেয়ার এবং তোমার প্রয়োজন

অনুপাতে অর্থ-সম্পদ সরবরাহ করে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।

সেনাপতি অরনেস্টোভকে বরখাস্ত করা হলো। অরনেস্টোভ কাফকাজের বিজেতা হওয়ার স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার দুঃখ নিয়ে কাফকাজ ত্যাগ করেন। নতুন জার-এর ক্ষমতা লাভের পর পর নতুন কমান্ডার ইন চীফ বেরিয়া তানস্কী কাফকাজের দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করেন। নতুন কমান্ডার ইন চীফ আদেশ জারি করেন, কাফকাজে অবস্থানরত সৈন্যরা যথারীতি যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং বিদ্রোহীদের অস্থির করে রাখবে। এই নির্দেশ জারি করেই তিনি কাফকাজের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করার এবং পাহাড়-পর্বতকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

চব্বিশ.

মানুষের সব প্রচেষ্টা সফল হয় না। সব আশাও পূরণ হয় না। আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও লক্ষ্য যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে তাকদীরের লিখনই মনে করা উচিত। জামালুদ্দীন রাশিয়ায় লালিত-পালিত হয়েছে। ইমাম শামিলের শত চেষ্টা সত্ত্বেও দাগেস্তানের আবহাওয়া তাকে ঘুণের ন্যায় খেয়ে ফেলতে শুরু করেছে। অল্প ক'দিন পরই জামালুদ্দীন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। দাগেস্তানের অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ তার চিকিৎসায় নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু তার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে চলেছে। রোগ তেমন কিছুই ধরা পড়ছে না। মাঝে-মধ্যে সামান্য জ্বর দেখা দেয়– এ-ই যা। কিন্তু তার গায়ের রং হলুদ বর্ণ আর শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। যেনো অদৃশ্য কোনো শক্তি তার দেহ থেকে রক্ত চুষে নিচ্ছে।

জামালুদ্দীন ইমাম শামিলের পুত্র। কিন্তু মানুষের মুখ বন্ধ রাখবে কে? মানুষ বলাবলি করছে– জামালুদ্দীন দাগেস্তানে থাকতে চায় না, সে রাশিয়া ফিরে যেতে চায়। এসব মন্তব্য ইমামের কানেও পৌঁছছে। মনে তার ব্যথা জাগে। পুত্র গাজী মুহাম্মদ ইমামকে জানায়, ভাইয়া কখনো এমনটি বলেননি যে, তিনি এখানে থাকতে চান না বা রাশিয়া ফিরে যেতে চান। তবে তিনি মাঝে-মধ্যে যুদ্ধের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছেন এবং বলছেন, যুদ্ধ পরিহার করে আমাদের শান্তির পথ অবলম্বন করা উচিত।

ইমাম শামিল বললেন, যুদ্ধের প্রতি তার অনীহার কারণ আমি বুঝি। জার রুশ তাকে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে গড়ে তুলেছিলেন। জামালুদ্দীনকে যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন ও বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন। জার-এর পরিকল্পনা ছিলো, আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্র জামালুদ্দীনকে এখানকার ভাইসরয় নিযুক্ত করবেন এবং জামালুদ্দীন তার অফাদারীর ঘোষণা দিয়ে তার সব ইচ্ছা পূরণ করবে।

কমান্ডার ইন চীফ বেরিয়া তানস্কী কাফকাজে পৌছেই পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম শুরু করে দেয়। অল্প ক'দিনের মধ্যেই কয়েকজন কাবায়েলী সরদার রাশিয়ানদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং বেরিয়া তানস্কীর নিকট থেকে চাহিদা মাফিক পুরস্কার গ্রহণ করে।

অন্যদিকে শুরু হয়ে যায় জঙ্গল পরিষ্কার করার অভিযান। হাজার হাজার রুশ সিপাহী রাইফেল ফেলে দিয়ে হাতে কুড়াল তুলে নেয়। মুজাহিদরা বৃক্ষ কর্তনকারী রুশ সৈন্যদের মোকাবেলায় নেমে পড়ে। তারা তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধনও করছে। কিন্তু বাঁধা অতিক্রম করে রুশ সৈন্যরা প্রতিদিন জঙ্গলের কিছু না কিছু অংশ পরিষ্কার করে ফেলতে সক্ষম হতে চলেছে। যেদিন জঙ্গলের যে অংশটুকু পরিষ্কার হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাতে তারা নিজেদের শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। সে স্থানে তোপ পৌছে যাচ্ছে এবং সৈন্য মোতায়েন হচ্ছে। এমনি পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য ইমাম শামিল স্বয়ং এখন ময়দানে।

১৮৫৮ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়। কয়েক হাজার রুশ সিপাহী গাছ কাটার অভিযানে লিপ্ত। স্বাধীনতাকামীরা দেশের বন-জঙ্গলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জীবনবাজি লড়াই করছে। তোপের গর্জনে জঙ্গল থর থর করে কাঁপছে। ইমাম শামিল পায়ে পায়ে মোকাবেলা করার কৌশল পরিবর্তন করে দুশমনের উপর কমান্ডো আক্রমণ পরিচালনা করার সম্ভাবনা যাচাই করে দেখার কাজে ব্যস্ত। ঠিক এমন সময়ে তার কাছে জামালুদ্দীনের গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার সংবাদ আসে। সংবাদ শুনে ইমাম বললেন, দাওয়াও হয়েছে, দু'আও হয়েছে; এবার আল্লাহর যা মর্জি।

রুশ কমান্ডার ইন চীফের কানেও জামালুদ্দীনের অসুস্থতার সংবাদ পৌছে গেছে। সে তার এক দূতকে ইমাম শামিলের নিকট প্রেরণ করে। এই দূত সাদা পতাকা উঁচিয়ে মুজাহিদদের এলাকায় যায়। মুজাহিদরা রীতি অনুসারে তার দু'চোখে পট্টি বেঁধে দিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে সরু গলিপথে ইমামের কাছে নিয়ে যায়।

এবার তার চোখের পট্টি খুলে দেয়া হয়। দূত রীতি মাফিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলে, কমান্ডার ইন চীফ বেরিয়া তানস্কী আপনার পুত্র জামালুদ্দীনের মারাত্মক অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ভীষণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তার চিকিৎসা করার প্রস্তাব করেছেন। আমাদের কাছে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও উন্নত মানের ওষুধ আছে।

ঃ তোমাদের কমান্ডার ইন চীফকে ধন্যবাদ। তা চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে তার শর্ত কী?

ঃ রোগীকে আমাদের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

ঃ নামঞ্জুর। আমি পূর্ব থেকেই তোমাদের প্রতারণার শিকার।

ঃ এই শর্ত যদি মঞ্জুর না করেন, তাহলে আপনি আপনার পুত্রের জীবনের

স্বার্থে আমাদের সাথে সন্ধি করে ফেলুন- যুদ্ধ বন্ধ করুন। তাহলে আমাদের ডাক্তার জামালুদ্দীনের নিকট গিয়ে তার চিকিৎসা করবে।

ঃ কমান্ডার ইন চীফকে বলবে, যুদ্ধ আমরা করছি না। আমরা আক্রমণ প্রতিরোধ করছি মাত্র। তাছাড়া এই যুদ্ধ যদি আমার পুত্রের জন্য হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধ বন্ধ করে দিতাম।

ঃ সম্ভবত পুত্রের চিকিৎসা হোক, আপনি তা চান না?

ঃ তোমার কমান্ডার ইন চীফকে বলবে, একজন পিতার বিপদ থেকে স্বার্থ হাসিল করা বাহাদুরদের চরিত্র নয়। আমাদের মায়েরা পুত্রদের এই জন্য লালন-পালন করে যে, তারা হয়তো যুদ্ধ করে গাজী হয়ে ফিরে আসবে কিংবা শাহাদতবরণ করবে। জামালুদ্দীন যদি সুস্থ থাকতো, তাহলে এ মুহূর্তে সে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করতো। মৃত্যু যখন যেভাবে আসবে বলে লেখা আছে, ঠিক সে সময়ে সেভাবে এসে হাজির হবেই। মৃত্যু একদিন সকলকেই বরণ করতে হবে। তবে বাহাদুর মরে একবার। আর কাপুরুষ মরে বারবার।

ঃ কমান্ডার ইন চীফের পক্ষ থেকে সর্বশেষ শর্ত হলো, আপনি যদি গাজী মোহাম্মদকে জামানতস্বরূপ আমাদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে জামালুদ্দীনের চিকিৎসার জন্য আমরা একজন ডাক্তার আপনার হাওয়ালা করে দেব।

ঃ এক পুত্রের জীবন রক্ষার ক্ষীণ আশায় আরেক পুত্রের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া যায় না। তোমার কমান্ডারের শর্ত যদি এ-ই হয়, তাহলে এবার তুমি যেতে পারো। আমি তোমাদের কোনো শর্তই মানতে পারলাম না।

দূত ফিরে যায়।

জামালুদ্দীনের অবস্থার উত্তোরত্তর অবনতি ঘটছে। একের পর এক সংবাদ আসছে ইমাম শামিলের নিকট। কিন্তু ইমাম শামিল আল্লাহর উপর ভরসা করে জাতীয় কর্তব্য পালনে ব্যস্ত।

জুলাই মাসের শুরুর দিকে জামালুদ্দীনের অবস্থা আরো সংকটাপন্ন হয়ে যায়। নায়েবগণ ইমামের কাছে আবেদন জানান, জামালুদ্দীনকে এক নজর দেখার জন্য একবার হলেও আপনার যাওয়া উচিত। আমরা দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ যুদ্ধ করছি। জয়-পরাজয়, অগ্রসরতা-পিছুহটা যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়ম। ময়দানে আপনার অনুপস্থিতির সময়ও আপনার জানবাজ মুজাহিদরা আপনার নির্দেশমত দায়িত্ব পালন করে আসছে। এখনও তার ব্যতিক্রম হবে না। আপনি যান, মুমূর্ষু ছেলেটাকে অন্তত এক নজর দেখে আসুন।

ইমাম শামিল মারাত্মক এক সমস্যায় পড়ে গেলেন। একদিকে পুত্র মৃত্যু শয্যায় শায়িত। অপরদিকে যুদ্ধের ময়দানে দেশ-জাতির জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন। অভিজ্ঞতা বলছে, ইমাম যখনই নাজুক কোন পরিস্থিতিতে ময়দান থেকে একটু

এদিক-ওদিক হয়েছেন, তখনই ফলাফল উল্টো দিকে মোড় নিয়েছে। এ ক'দিনে তিনি কমান্ডো হামলা পরিচালনা করে জঙ্গল পরিষ্কারকারী রুশ সৈন্যদেরকে হেস্তনেস্ত করে ফেলেছেন এবং তাদের অগ্রাভিযানের গতি বাঁধাগ্রস্ত করে দিয়েছেন। এ অঞ্চলে আরো কয়েক মাইল বন-জঙ্গল অক্ষত রয়েছে। রুশ বাহিনী যদি এগুলোও কেটে পরিষ্কার করে ফেলতে সক্ষম হয়, তাহলে পরবর্তী ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পর্যন্ত তাদের হামলা প্রতিহত করা যাবে না। এ জঙ্গলের পরে সম্মুখে খোলা ময়দান এবং তার পরবর্তী জঙ্গল অনেক দূর। সবদিক ভেবে-চিন্তে ইমাম শামিল পিতার কর্তব্যকে মুজাহিদের কর্তব্যের উপর কুরবান করে দেন।

তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাঁর বাহিনীকে আরো উৎসাহিত করে তোলে। তারা নতুন এক জযবায় উদ্দীপ্ত হয়ে নবউদ্যমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাফকাজের কঙ্গলের মোকাবেলায় রাশিয়ার তোপগুলো অসহায় হয়ে পড়ে।

মুজাহিদদের এই নতুন আক্রমণে যে লোকটিকে সকলের সামনে দেখা যাচ্ছে, সে হলো ইমাম শামিলের পুত্র গাজী মুহাম্মদ। গাজী মুহাম্মদ পিতার মনের অবস্থা বুঝে। এ মুহূর্তে তার পিতার মনো জগতে কী ঝড় বইছে, গাজী মুহাম্মদ তা বুঝতে পারছে। ভাই মৃতকল্প। কিন্তু তার পিতা ভাইয়ের খোঁজ নেয়ার জন্য ততোক্ষণ পর্যন্ত যাবেন না, যতোক্ষণ না এ যুদ্ধে মুজাহিদরা রুশ সেনাদের পেছনে হটিয়ে দেয়।

এ মুহূর্তে মুষ্টিমেয় মুজাহিদ বিশাল রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যে সাহসিকতা ও প্রত্যয়ের সাথে লড়াই করছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা কষ্টকর। বীরত্ব-বাহাদুরী, নির্ভীকতা ইত্যাকার শব্দমালা সে যুদ্ধের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম, যা এ মুহূর্তে কাফকাজের পাহাড়-পর্বত ও বৃক্ষরাজি প্রত্যক্ষ করছে। হাজার হাজার মুজাহিদ পৃথক পৃথক বিভিন্ন দিক থেকে রুশ বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

তাদের এ অভিযানে রুশ বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক মুজাহিদ নিজে শহীদ হওয়ার আগে ডজন ডজন রুশ সৈন্যকে হত্যা বা জখম করছে। এই রণাঙ্গনে অবস্থানরত রুশ সৈন্যদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এখন মুজাহিদদের উপর চাপ বহাল রাখতে হলে এ মুহূর্তে তাজাদম সৈন্য প্রয়োজন। আর তাজাদম সৈন্য এখানে এসে পৌঁছুতে কয়েক দিন সময় প্রয়োজন। মুজাহিদরা চাচ্ছেও এটাই। ইমাম শামিলের নায়েবগণ ইমামের নিকট আরজি পেশ করেন, এবার আপনি জামালুদ্দীনকে এক নজর দেখে আসুন। রণাঙ্গনের পরিস্থিতি এ মুহূর্তে সন্তোষজনক।

ইমাম শামিল আন্‌দী অভিমুখে রওনা হয়ে যান। বেরিয়া তানস্কীও পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করছে। সে একদিকে নতুন সৈন্য তলব করেছে, অপরদিক উপস্থিত সৈন্যদের আদেশ দিয়েছে– 'আক্রমণ চালাও– সকল সৈন্য নিহত হলেও হামলা চালিয়ে যাও।'

জামালুদ্দীন আন্‌ধীর উপকণ্ঠে এক লোকালয়ে শয্যাগত। এলাকাটি রণাঙ্গন থেকে বেশ দূরে। জামালুদ্দীন এখানে রোগ-ব্যাধি ছাড়া সব আশংকা থেকে নিরাপদ। ইমাম শামিল একটানা সফর করে ১২ই জুলাই বিকেল বেলা এখানে এসে পৌঁছেন।

জামালুদ্দীন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। অচেতন পড়ে আছেন বিছানায়। ভক্ত-আপনজনরা তার শিয়র ও কক্ষের চারদিকে আগরবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। আগরের সুগন্ধিতে মৌ মৌ করছে পরিবেশ। ইমাম শামিলের আগমন সংবাদ মুহূর্ত মধ্যে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ এই মহান ব্যক্তিটিকে এক নজর দেখার জন্য চারদিক থেকে রাস্তায় নেমে পড়ে। ইমাম শামিল তার নিকটে পৌঁছলে তারা শ্রদ্ধাবনত মস্তকে ইমামকে সালাম করে।

ইমাম শামিল জামালুদ্দীনের কক্ষে প্রবেশ করেন। পুত্রের অবস্থা দেখামাত্র তার হৃদয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগে। তার মনটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ইমামের অপলক দৃষ্টি জামালুদ্দীনের মুখমণ্ডলের উপর নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত পর ইমাম ঝুঁকে পুত্রের মাথায় হাত বুলান। ইমামের খাস খাদেম একটি মোড়া এনে ইমামকে বসতে বলে। ইমাম শামিল মোড়ায় বসে জামালুদ্দীনের হাত দু'টো নিজের মুঠোয় নেন। পিতার হাতের পরশক্রিয়ায় নাকি অন্য কোনো কারণে জানি না জামালুদ্দীন ধীরে ধীরে চোখ খুলতে শুরু করে। পিতাকে পার্শ্বে দেখে সে পিতার সম্মানার্থে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু জামালুদ্দীনের দেহে দাঁড়াবার শক্তি নেই। ইমাম শামিল তার মুখ পুত্রের মুখের কাছে নিয়ে বললেন– 'বেটা! আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি ঠিকমত তোমার খোঁজ-খবর নিতে পারিনি। আমি অপারগ ছিলাম।'

জামালুদ্দীন পিতার কথা শুনলো কি শুনলো না, শুনে থাকলেও বুঝলো কি-না, তা বুঝা গেলো না। সে তার ডান হাতটা বড় কষ্টে সামান্য নেড়ে কী যেনো ইঙ্গিত করলো। ইমামের খাদেম ইশারার মর্ম বুঝে বিছানার চাদরটি ডান দিক থেকে তুললে নীচ থেকে এক টুকরা কাগজ বেরিয়ে আসে। খাদেম কাগজটি ইমামের দিকে এগিয়ে দেয়। ইমাম কাগজের ভাঁজ খুলেন। এটি জামালুদ্দীনের হাতের লেখা একটি পত্র। পত্রে লিখা আছে–

'আব্বাজান! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি আপনার কোনো কাজে আসলাম না। আমার অস্তিত্ব আজীবন আপনার পেরেশানীরই কারণ হয়ে রইলো।'

ইমাম শামিল চিরকুটটি দ্রুত পকেটে রেখে দিয়ে পুত্রের শিয়রে বসে পড়েন। জামালুদ্দীনের মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলে নেন। জামালুদ্দীন পুনরায় চোখ খুলে পিতার মুখের প্রতি তাকায়। পরক্ষণেই তার সমস্ত শরীরে একটা কম্পন অনুভূত হয়। ঘাড়টা কাঁৎ হয়ে ঢলে পড়ে একদিকে। ইমাম শামিল ইন্নালিল্লাহি

ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে পুত্রের নিষ্প্রাণ দেহটা শেষবারের মতো বুকের সাথে মিলিয়ে নেন। চারদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়। ইমাম শামিল চির নিদ্রায় শায়িত পুত্রকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজে উঠে দাঁড়ান। ইমামের দু' চোখের পাতা ভিজে গেছে। দু' গণ্ড বেয়ে বেদনার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে চাইছে যেনো। কিন্তু ইমামের সহনশক্তি তাতে বাঁধ সাজছে।

পুত্রের কাফন-দাফনের পর ইমাম শামিল ১৭ই জুলাই সন্ধ্যায় যখন ময়দানে ফিরে আসেন, তখন রুশ বাহিনীর জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ আর মাত্র এক মাইল বাকি। এই এক মাইল এলাকার পূর্ব ও পশ্চিমে তোপের গোলা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে বেড়াচ্ছে। পশ্চিম ও উত্তর দিকের গাছগুলো এক এক করে মাটিতে শুয়ে পড়ছে। ইমাম শামিলের যে অশ্রু জামালুদ্দীনের মৃত্যুতে প্রবাহিত হতে পারেনি, এবার তা টপ টপ করে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তিনি তার পরিবার-পরিজন ও মুজাহিদদেরকে পেছনে সরে আসার নির্দেশ দেন।

পঁচিশ.

জার নেকুলাই প্রথম-এর স্থলাভিষিক্ত জার আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয়-এর আগমনের ঘোষণা হয়ে গেছে। পুনর্বার নববধূর ন্যায় সাজান হয়েছে তিবলিসকে। সাজসজ্জা ও রূপচর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন শাহজাদী ও বেগমগণ। দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার ও দক্ষিণ রাশিয়ার ভাইসরয় ফিল্ড মার্শাল বেরিয়া তানস্কী তার অধীনদেরকে অদ্ভুত এক নির্দেশ জারি করেন– কাফকাজে আমাদের সকল কবরস্তান পরিষ্কার করো, প্রতিটি কবরস্তানের রাস্তাগুলো মেরামত করো। যেসব কবরস্তানের দৈন্য ঘুচানো সম্ভব নয়, সেগুলোও মেরামত করো।

অল্প সময়ের মধ্যে ভাইসরয়-এর এই হুকুম তামিল হয়ে যায়।

জার আলেকজাণ্ডার তিবলিস এসে পৌঁছান। রুশ সেনাপতি-কমান্ডার-সিপাহীরা তাকে বর্ণাঢ্য স্বাগত জানায়। জার আলেকজাণ্ডার মুচকি হাসি দিয়ে তাদের অভিনন্দনের জবাব দেন, হাত নেড়ে নেড়ে জনতার স্লোগানের প্রতিউত্তর জানান। প্রত্যেক শাহজাদী ও বেগমদেরকে হস্ত চুম্বনের মাধ্যমে ধন্য করেন। তুর্কী গোসলখানায় গোসল করে স্বস্তিবোধ করেন জার। কিন্তু পরদিনই তিনি তার সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান মুলতবী ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়ে নিহত রুশ সৈনিকদের সমাধি দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

জর্জিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে বেশকিছু পথ সামনে কবারদার পশ্চিম সীমান্তের সন্নিকটে প্রশস্ত একটি মাঠ। এই মাঠে সমবেত হয়েছে পাঁচ হাজার রুশসেনা। পদমর্যাদা অনুসারে সারিবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত দাঁড়িয়ে আছে তারা। সকলের সামনে বিশ ফুট উঁচু একটি মঞ্চ। একটি পাথরখণ্ড ভেঙে তৈরি করা হয়েছে এটি। মঞ্চের

উপর লাল বর্ণের মূল্যবান কার্পেট বিছানো।

হঠাৎ সামনের দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করে একটি পতাকাধারী অশ্বারোহী দল। তার পেছনে শাহী ঘোটকযান। ঘোটকযানের পেছনে ও দু'পার্শ্বে সশস্ত্র অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনী।

ঘোটকযান মঞ্চের সন্নিকটে এসে থেমে যায়। গাড়ির পেছনের আসন থেকে ফিল্ড মার্শাল বেরিয়া তানস্কী নেমে পড়ে শাহেনশাহ'র প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন। জার আলেকজাণ্ডার তার হাত ধরে গাড়ি থেকে নেমে আসেন এবং হেঁটে মঞ্চে গিয়ে আসন গ্রহণ করেন। ফিল্ড মার্শাল বেরিয়া তানস্কী মঞ্চের সিঁড়ির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন। সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান অফিসার-সৈনিকগণ শাহেনশাহকে রাজকীয় কায়দায় সালাম করে। শাহেনশাহ তাদের সালামের জবাব দিয়ে অফিসার-সিপাহীদের উদ্দেশে বললেন–

'রুশ ফৌজের অফিসারগণ! আমি দু'দিনে এক লাখ কবর দেখেছি– এক লাখ– একশ' হাজার। এগুলো আমাদের সেসব অফিসারদের কবর, যারা কাফকাজের পাহাড়ে-জঙ্গলে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছে। এখান থেকে সামনের এলাকাগুলোতেও বেশ ক'টি কবরস্তান আছে। কাফকাজের যুদ্ধে নিহত রুশ সিপাহী ও অফিসারদের সংখ্যা গণনার অতীত। হাজার হাজার নিহত অফিসার-সৈনিক এমনও আছে, যাদের সমাধির কোন চিহ্ন নেই।'

'(হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে) তোমরা কি চাও যে, তোমাদের কবরও এখানেই রচিত হোক? আমি যেসব কবরস্তান দেখে এসেছি, সেগুলো এক একটা অনেক প্রশস্ত– সেগুলোতে আরো অনেক লাশ দাফন করার মত জায়গা খালি আছে। যে ক'টি বিদ্রোহী গোত্র আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা আমাদের সেনাসংখ্যার তুলনায় কম। বিপুলসংখ্যক তোপ আছে আমাদের কাছে– আছে পর্যাপ্ত বারুদ ও নতুন নতুন বন্দুক-রাইফেল। আর বিদ্রোহীদের কাছে কী আছে? পুরাতন ভাঙা বন্দুক আর লোহার তরবারী– এই তো! তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ, লাজ-শরম থাকা উচিত। শুনে রাখো, দ্রুত– অতিদ্রুত যদি তোমরা বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করতে না পারো, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের কবর এখানেই রচিত হবে- আমার নির্দেশে। অল্প সময়ের মধ্যে যদি তোমরা বিদ্রোহীদের দমন করতে না পারো, তাহলে তোমাদের বেঁচে থাকা নিরর্থক বলে মনে করবো। আমি ফিল্ড মার্শাল বেরিয়া তানস্কীকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করেছি। অযোগ্য-ভীরু অফিসারদের যে কোনো প্রকার শাস্তি দেয়ার, গুলী করে উড়িয়ে দেয়ার সব রকম ক্ষমতা আমি তাকে দিয়ে রেখেছি। আমি আমার সকল প্রজাকে কাফকাজে কবর দিতে চাই না। তোমরা শুধু সিপাহীদের দিয়েই যুদ্ধ করিও না– নিজেরাও যুদ্ধ করো। তোমরা যদি সম্মুখে লড়াই করো, তাহলে সাধারণ সৈনিকরা অধিক বীরত্বের

সাথে লড়াই করবে। আমার এই আকাঙ্ক্ষা, আমার এই নির্দেশ তোমরা সেইসব অফিসারদের নিকটও পৌঁছিয়ে দাও, যারা এ মুহূর্তে এখানে উপস্থিত নেই।'

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর জার আলেকজাণ্ডার গাড়িতে চড়ে বসেন এবং তিবলিস ফিরে যান। তিবলিসে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর তিনি রাজধানীর সেন্টপিটার্সবার্গ অভিমুখে রওনা হন। নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সেনা অফিসারগণ।

কারিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে সমস্ত রুশ সৈনিককে কাফকাজ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ফিল্ড মার্শাল বেরিয়া তানস্কী যে চূড়ান্ত পরিকল্পনা স্থির করেছেন, তাহলো–

১. কাফকাজে রুশ সৈনিকদের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।

২. সমস্ত সৈনিককে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতে হবে। এই পাঁচ ভাগের প্রতিটি অংশ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাহিনীর ন্যায় দায়িত্ব পালন করবে। এক ভাগ চেচনিয়ায় বিদ্রোহীদের নির্মূল করবে। তার কমান্ড থাকবে সেনাপতি ইগদু কিমুভের হাতে। দ্বিতীয় ভাগ শাহজাদা গ্রেগুরি আরিলিয়ানীর সেনাপতিত্বে দাগেস্তান অভিমুখে এগিয়ে যাবে। তৃতীয় ভাগ বেরন দারেস্কীর কমান্ডে লাক্জ গোত্রের দিক থেকে আক্রমণ চালাবে। অবশিষ্ট দু'-বাহিনীর একটি বাঁ দিক থেকে এবং অপর বাহিনী ডান দিক থেকে হামলা করবে, যাতে বিদ্রোহীরা কোনদিক থেকে কোনো প্রকার সাহায্য লাভ করতে না পারে।

৩. বিদ্রোহীদের উপর তিনদিক থেকে আক্রমণকারী সৈনিকরা জঙ্গল পরিষ্কার করতে করতে সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৪. যেসব গোত্র নিরপেক্ষ থাকার কথা ঘোষণা করবে, তাদেরকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে এবং তাদের এলাকায় কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে যেসব গোত্র বা ব্যক্তি যুদ্ধের সময় আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে, তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বরণ করা হবে। তাদের নেতাদেরকে আপন আপন পদমর্যাদায় বহাল রাখা হবে এবং তাদেরকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করা হবে।

৫. নিজস্ব লোকদের মাধ্যমে কারায়েলী অঞ্চলগুলোতে প্রচার করাতে হবে, নতুন শাহেনশাহ নির্দেশ দিয়েছেন, যেনো যুদ্ধবন্দিদের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় এবং যাঁরা যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র সমর্পণ করবে, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে যেনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করে ছেড়ে দেয়া হয়। যাতে এলাকায় গিয়ে তারা একথা বলে, অস্ত্র ত্যাগ করাই আমাদের জন্য কল্যাণকর।

✿ ✿ ✿

ইমাম শামিল দারগীন থেকে খানিক দূরে দেদীনে বসে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছেন। পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে নাজুক থেকে নাজুকতর রূপ লাভ করছে। মুজাহিদরা তিনটি রণাঙ্গনে জীবনপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। চেচনিয়ার রণাঙ্গনে ইমাম পুত্র গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফী মুজাহিদদের সেনাপতিত্ব করছেন। দাগেস্তানের দায়িত্বে রয়েছেন নায়েব সুরখাই খান। লাক্জ গোত্রের অঞ্চলে নায়েব আমীন মোহাম্মদ মুজাহিদদের সালার। ইমাম শামিল একবার এ ময়দানের প্রতি, আবার অন্য ময়দানের প্রতি মনোনিবেশ করছেন।

পরিস্থিতি উত্তরোত্তর স্পর্শকাতর হয়ে ওঠছে। সবক'টি ময়দান থেকে ইমামের কাছে একই রকম সংবাদ আসছে– 'রুশ সেনাসংখ্যা দু' লাখেরও বেশি। তারা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে চলেছে। আমরা পায়ে পায়ে মোকাবেলা করে যাচ্ছি। কিন্তু জনগণের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে। রুশদের গোমস্তারা সোনা-রূপা বন্টন করে ফিরছে। মানুষ কানাঘুষা করছে, অনেক দিন ধরে যুদ্ধ হচ্ছে। আমরা ত্রিশটি বছর ধরে লড়াই করছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা কোনোদিক থেকে না কোনো সাহায্য পেয়েছি, না পাওয়ার আশা আছে। নতুন রুশ রাজা পূর্বেকার সব রাজা অপেক্ষা ভিন্ন চরিত্রের। তার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, গোত্রের খান ও আমীরগণ যদি তার আনুগত্যের ঘোষণা দেয়, তাহলে তাদেরকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখা হবে এবং তাদের শাসনকার্যে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। উপরন্তু তাদেরকে আর্থিক সাহায্যে ধন্য করা হবে।'

স্থানীয় লোকদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, সেনাপতি বেরিয়া তানস্কী শত শত খচ্চর, গাধা ও ঘোড়া বোঝাই সোনা-রূপা নিয়ে আসছেন। তিনি অনুগতদের পুরস্কার ও অর্থ সাহায্যের বৃষ্টি বর্ষণ করছেন। যে গোত্র বা যে ব্যক্তি শামিলের সঙ্গ না দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তাকেই অর্থ দিয়ে লাল করে দিচ্ছেন।

চেচনিয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে- 'এটি নকশবন্দীদের যুদ্ধ। এছনা আশারীদের এতে অংশ নেয়া ঠিক হবে না। শাহেনশাহ'র আকাঙ্ক্ষা, তিনি নকশবন্দীদের মূলোচ্ছেদ করে চেচনিয়ায় এছনাআশারী গোত্রগুলোর হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেবেন।'

দাগেস্তানের মানুষ বলতে শুরু করেছে- 'ইমাম শামিল এছনা আশারীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। যুদ্ধে বেশি ত্যাগ স্বীকার করছে নকশবন্দীরা। কিন্তু ইমাম শামিল এছনা আশারীদেরকে নকশবন্দীদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন।'

লাক্জ গোত্রের মানুষ বলছে- 'রুশ রাজা শুধু আওয়ার গোত্রকেই তার শত্রু মনে করেন। তার কারণ, সেই গোত্রের সরদার ইমাম শামিল রুশ বাহিনীর অনেক ক্ষতি করেছেন। রুশ শাহেনশাহ অন্যান্য সব গোত্রের স্বায়ত্ত্বশাসন বহাল রেখে তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছেন।'

সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়েছে, রুশরা তাদের সকল সৈনিককে কাফকাজের রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছে। কাফকাজের চারদিকে পায়ে পায়ে রুশ সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক লাখ রুশসেনা ঘেরাও সংকীর্ণ করতে করতে ইমাম শামিলের অবস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে।

❁ ❁ ❁

ইমাম শামিল এরাগলে এস্তেখারা করবেন বলে ঘোষণা দেন। কয়েকজন খাদেম সাথে নিয়ে তিনি দ্রুত এরাগল গিয়ে পৌছান। তিনি রাতের বেলা এরাগলের খানকায় পৌছে খাদেমদেরকে মসজিদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে নিজে শায়খে দাগেস্তানের হুজরায় প্রবেশ করেন। হঠাৎ বিস্ময়কর এক দৃশ্য চোখে পড়ে তাঁর। দেখতে পেলেন, শায়খে দাগেস্তান তাঁর তরবারী পরিষ্কার করছেন। তাঁর পার্শ্বেই পড়ে আছে কিতাবের স্তূপ। ইমাম শামিল 'আসসালামু আলাইকুম পীর ও মুরশিদ! বলে শায়খের হাত থেকে তরবারীটা কেড়ে নিয়ে বললেন– 'একি হযরত? শামিল বেঁচে থাকতে আপনি তরবারী হাতে তুলে নিলেন যে!'

ঃ ওয়ালাইকুমুস সালাম গাজী শামিল! এসো, আমার কাছে এসে বস। আল্লাহ তোমার হায়াত বাড়িয়ে দিন। বলো, কেনো এসেছো?

ঃ পরিস্থিতি তো আপনার চোখের সামনে। কিতাবের খাদেমই যখন তরবারী হাতে তুলে নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করছেন, তখন আমার এখানে এসে উপস্থিত হওয়ার কারণ আপনার অজানা নয়।

ঃ আমি তরবারী হাতে তুলে নেয়ার প্রয়োজন এজন্য অনুভব করছি যে, এগুলো (কিতাবের স্তূপের প্রতি ইশারা করে) অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে কিংবা আমার মুখের কথার তাছীর নষ্ট হয়ে গেছে। মরহুম আব্বাজান জাতিকে যে আশংকা সম্পর্কে সতর্ক করতেন, তা এখন আমাদের মাথার উপর এসে উপস্থিত। কিন্তু আফসোস! মানুষ এখনো শিয়া-সুন্নী, চেচেন-আওয়ার-লাক্জ কিংবা দাগেস্তানীই রয়ে গেছে। এখনো তারা 'মুসলমান' হতে পারেনি। মানুষ এখনো স্বাধীনতার অর্থ বুঝতে পারেনি। যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমার পাল্লা ভারী ছিলো, ততোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বলতো, আমরা মুসলমান– আমরা কাবায়েলী আঞ্চলিকতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু এখন যখন জারের পাল্লা ভারী দেখছে, বলতে শুরু করেছে, আমরা আলাদা আলাদা গোত্র, ভিন্ন ভিন্ন বংশ।

ঃ পীর ও মুরশিদ! আপনি তাহলে দেশবাসীর মানবিক দুর্বলতা সম্পর্কে অনবহিত নন। এটি আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষের শিক্ষার ফসল যে, আমরা সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এতো বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে আসছি। যাক, আমি আপনার খেদমতে এ জন্য হাজির হয়েছি যে, আপনি আমার রাহনুমায়ী করবেন।

ঃ 'তোমরা সকলে আল্লাহর রশি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো'– মানুষের যদি ইসলামের এই সবক স্মরণ থাকতো, তাহলে আজ আমাদের শুনতে হতো না, আমরা নকশবন্দী, আমরা সুন্নী, আমরা শিয়া, অমুক লাক্‌জ বা অমুক আওয়ার। আল্লাহ পাকের এই নির্দেশ যদি আমরা মান্য করতাম, তাহলে আজ আমাদের সকলের একটি মাত্র পরিচয় হতো, আমরা মুসলমান। যারা সমবেতভাবে আল্লাহর রশি আঁকড়ে ধরে না, তাদের পরিণতি কল্যাণকর হতে পারে না। এমনি পরিস্থিতিতে যার কর্তব্যের অনুভূতি আছে, তার উচিত অন্যের দিকে না তাকিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। আমি এতোদিন মুখের জিহাদ করে আসছিলাম। এখন তরবারীর জিহাদের সময় এসে গেছে। আমাদের যখন এই বিশ্বাস আছে যে, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমরা বিশ্বাস করি, দুনিয়ার এই জীবনের পরে চিরস্থায়ী এক জীবন আছে। তাহলে কিসের শংকা, কিসের চিন্তা? তোমার আমল তোমার সঙ্গে যাবে। আমার আমল আমার সঙ্গে যাবে। যার আমল তার সঙ্গে যাবে।

ঃ পীর ও মুরশিদ! আপনি বিভ্রান্ত দেশবাসীকে সঠিক পথে তুলে আনার চেষ্টা চালিয়ে যান। এখনও সেই সময় আসেনি যে, আপনি দাওয়াতের কাজ বন্ধ করে হাতে তরবারী তুলে নেবেন।

ঃ গাজী শামিল! তরবারী হাতে তুলে নেয়ার অর্থ এই নয় যে, আমি দাওয়াত-তাবলীগ বন্ধ করে দিচ্ছি। রুশ অফিসার আমাকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেছে। তুমি নিশ্চয় জানো, আব্বাজান মরহুমকেও তারাই শহীদ করিয়েছিলো। আমি সর্বদা প্রস্তুত থাকতে চাই। আমি আমার গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলো নিরাপদ একস্থানে রেখে দিয়েছি। কখনো যদি তোমার নিকট আমার শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছে, তখন ঘোষণা করিয়ে দিও, যার যার নিকট আমার কিতাব আছে, তারা যেনো সেসব তোমাকে দিয়ে দেয়। আর তুমি কিতাবগুলো সংগ্রহ করে তুরস্ক পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।

ঃ আপনার খানকার নিরাপত্তার জন্য আমি একদল মুজাহিদকে নিয়োজিত করছি। আমি বেঁচে থাকতে আপনার কোনো ক্ষতি হতে দিতে পারি না। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন, এখন আমি কী করতে পারি।

ঃ আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নিতে চান। আমাদের দোয়া ও চেষ্টা করা উচিত, যাতে আমরা পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পারি। আমাদের কাছে যদি সোনা-দানা, টাকা-কড়ি থাকতো, তাহলে দুনিয়ার গোলামরা আমাদেরকে ত্যাগ করে রুশদের সাথে যোগ দিতো না। এখন সেসব লোকই আমাদের সঙ্গ দেবে, যারা কেবল আল্লাহর জন্য জিহাদ করছে। তুর্কী রাজা নীরব কেনো? ইরানের বাদশাহ চুপ করে আছেন কেনো? তুমি চেষ্টা করে দেখো, কোনোদিক থেকে কোনো সাহায্য পাও কিনা।

ঃ উভয় সম্রাটকেই এমন কিছু লোক বেষ্টন করে রেখেছে, যারা আমাদের ব্যাপারে সঠিক সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছতে দেয় না। মোসাহেবরা ইরানের শাহেনশাহকে ধারণা দিয়ে রেখেছে, এটি নকশবন্দীদের যুদ্ধ। তাদের সাহায্য করার অর্থ তুরস্ককে শক্তিশালী করা। তুরস্কের সুলতানকে জানানো হয়েছে, ইরানের বাদশাহ্ জার রুশদের সাথে যোগ দিয়ে তুরস্ককে এ যুদ্ধে জড়াতে চায়। তাই তুরস্ককে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ঃ অধ:পতন একেই বলে। এতো বিশাল দেশ, এতোবড় রাজা, অথচ এমন অসহায়! কোনো জাতির রাজা যখন পরিস্থিতিকে অন্যের চোখে দেখতে এবং পরের কানে শুনতে শুরু করে, তখন নিশ্চিত ধরে নেয়া যায়, না তার কপালে কল্যাণ আছে, না তার জাতির।

ঃ পীর ও মুরশিদ! কিছুদিন পর তাদের স্থান হবে কবরে। আমাদের এবং আমাদের বর্তমান দুশমনদের স্থানও। তারাও একদিন দুনিয়াতে থাকবে না, যারা আজ সামান্য স্বার্থের জন্য দুশমনের পক্ষে কাজ করছে। আল্লাহ্র নিকট কে কী পুরস্কার পাবে, ইতিহাস কাকে কীভাবে স্মরণ করবে, তা আল্লাহপাকই ভালো জানেন।

ঃ আল্লাহ্র নীতি অটল। তিনি তাকেই সম্মান দান করেন, যে তার প্রাপ্য। তবে সম্পদ ও ক্ষমতার বিষয়টা ভিন্ন। সম্পদ-ক্ষমতার সাথে মর্যাদার কোন সম্পর্ক নেই। নিতান্ত নিচ-হীন লোককেও আল্লাহ্ সম্পদ-ক্ষমতা দান করেন। এ দু'টি বস্তুর মধ্যে এমন রস আছে, যা স্বার্থপরতারই পিপাসা নিবারণ করে। এ কারণে সব সম্পদশালী, সব ক্ষমতাবান সম্মানিত হয় না। মর্যাদার সম্পর্ক আমলের সাথে। যা হোক, আসল কথা হলো, আমার তরবারীতে জং ধরে গেছে।

ঃ আমার আবেদন, আপনি তরবারী কোষবদ্ধ করে রাখুন। পরিস্থিতি বেশি কঠিন হয়ে গেলে আপনি তুরস্ক চলে যাবেন। একটি জাতি তখনই নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, যখন তার হেদায়েতের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। আপনি যেখানেই অবস্থান করবেন, মানুষকে 'ইজ্জতের জীবন কিংবা ইজ্জতের মৃত্যু'র দীক্ষা দান করবেন, এ-ই আমার অনুরোধ।

ইমাম শামিল এখনো তার বক্তব্য শেষ করতে পারেননি। এমন সময়ে এক দূত চেচনিয়ার রণাঙ্গনের পরিস্থিতি আরো খারাপ হওয়ার সংবাদ নিয়ে আসে। ইমাম তৎক্ষণাৎ রণাঙ্গন অভিমুখে রওনা হয়ে যান। ইমামের উপস্থিতিতে ময়দানের অবস্থা পাল্টে যায়। ইমাম তার পুত্র গাজী মুহাম্মদকে দাগেস্তানের রণাঙ্গনে প্রেরণ করেন এবং নিজে চেচনিয়ার রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুজাহিদদের সেনাপতির দায়িত্ব হাতে তুলে নেন।

ছাব্বিশ.

দাগেস্তানে কর্মরত রুশ সেনা কমান্ডার অধীন অফিসারদের উদ্দেশ করে বলে– 'আমি চাই, কাজী মোহাম্মদকে (গাজী মোহাম্মদ) জীবিত গ্রেফতার করা হোক– যে কোনো মূল্যে– যে কোনো অবস্থায়। এটা কি অসম্ভব?'

এক অধীন অফিসার বললো, অসম্ভব নয় ঠিক; কিন্তু কঠিন বটে। ঐ জংলীদের একটি নারীকেও তো কখনো গ্রেফতার করা গেলো না। ওরা লড়াই করে জীবনের বাজি রেখে।

আরেক অফিসার বললো, আপনি এমনটি চান কেনো?

কমান্ডার বললো, যুদ্ধ দ্রুত বন্ধ হওয়ার একটিই পন্থা যে, হয়তো শামিল নিহত হবে কিংবা কাজী মোহাম্মদ জীবিত গ্রেফতার হবে। কাজী মোহাম্মদকে গ্রেফতার করতে পারলে এখানকার যুদ্ধের পট পাল্টে যাবে।

তৃতীয় এক অফিসার বললো, আচ্ছা, জামালুদ্দীন আমাদের আয়ত্ত্বে চলে আসার পর কি শামিল যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছিল? উল্টো বরং সে যুদ্ধের তীব্রতা আগের চে' বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

কমান্ডার বললো, পরিস্থিতি এখন পাল্টে গেছে। শামিল বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। আসল লোক এখন কাজী মোহাম্মদ। সে নিহত হলে শামিলের কোমর ভেঙে যাবে বটে; কিন্তু তার অনুসারীদের প্রতিশোধের আগুন আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠবে। কিন্তু কাজী মোহাম্মদ যদি জীবিত গ্রেফতার হয়ে যায়, তাহলে শামিল ও তার অনুসারীরা জীবিতই মরে যাবে। শামিলের পুত্র জীবিত গ্রেফতার হওয়ার অর্থ শামিলের মৃত্যু, যা হবে আমাদের জন্য বড় এক বিজয়।

প্রথম অফিসার বললো, কিন্তু বিষয়টা বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার ন্যায়। কাজী মুহাম্মদকে জীবিত গ্রেফতার কে করবে? কিভাবে করবে? কোথায় করবে?

কমান্ডার বললো, লোকটা এখন রণাঙ্গনে। আমাদের সকল সৈন্যকে মাঠে নামাও। কাজী মোহাম্মদকে ঘিরে ফেলো। তাতে আমাদের যতো ক্ষতি হয় হোক, যতো জীবন নষ্ট হয় হোক। লোকটা এখান থেকে যেনো বেরিয়ে যেতে না পারে, সে ব্যবস্থা করো। তাকে গ্রেফতার করতে পারলে আমাদের মহান শাহেনশাহ খুশী হবেন, আমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। আর মারা পড়লেও আমাদের জন্য গনীমত– শামিলের কোমর ভেঙে যাবে। আজ থেকেই তোমরা এলাকাটা ঘিরে ফেলো। ধীরে ধীরে ঘেরাও সংকীর্ণ করতে থাকো। আমাদের সৈনিকের অভাব নেই। আমি কমান্ডার ইন চীফ থেকেও অনুমতি নিয়ে এসেছি। এখনই– এ মুহূর্তেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দাও।

দাগেস্তানে গমরী এবং উঁচু বস্তির মধ্যখানে চার বর্গমাইল জায়গা উঁচু উঁচু বৃক্ষরাজি আচ্ছাদিত পার্বত্য এলাকা। তার সামান্য আগে এমন একটি

উপত্যকা, যা কোথাও পৌনে এক মাইল, কোথাও এক মাইল চওড়া। উপত্যকার অপরদিকে উঁচু বস্তি, যার অবস্থান একটি উঁচু পাহাড়ের উপর। দাগেস্তানের সিংহ ইমাম শামিলের সিংহহৃদয় পুত্র গাজী মোহাম্মদ তার মুষ্টিমেয় জানবাজ মুজাহিদ নিয়ে সেই গমরী ও উঁচু বস্তির মধ্যবর্তী অঞ্চলে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত।

জঙ্গল ও দুর্গম পার্বত্য এলাকা মুজাহিদদের আশ্রয়ের কাজ দিচ্ছে। মুজাহিদরা আচম্বিত জঙ্গল থেকে আত্মপ্রকাশ করে রুশ সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং কার্যকর আঘাত হেনে পলকের মধ্যে আবার আশ্রয়স্থলে ফিরে যাচ্ছে। রাশিয়ান তোপগুলো জঙ্গলের উপর এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ করছে ঠিক; কিন্তু রুশ সেনারা জঙ্গলে ঢুকতে পারছে না। সেখানকার এক একটি গাছ, এক একটি পাথর রুশদের জন্য মৃত্যুফাঁদ। রুশ বাহিনীর আগুনের বৃষ্টিতে জঙ্গল জ্বলতে শুরু করেছে। কিন্তু মুজাহিদদের তেমন ক্ষতি করছে না। রুশ কমান্ডারের পরিকল্পনা মোতাবেক দু' ডিভিশন রুশসেনা জঙ্গল ঘিরে ফেলে।

ঘেরাও সম্পূর্ণ হয়ে গেলে কাস্‌ক ও তাতারী রেজিমেন্টগুলোর চারটি ইউনিটকে জঙ্গলে ঢুকে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কমান্ডার সৈনিকদের উদ্দেশ করে বললো, তোমাদের আজ সেই কাজ করতে হবে, যা শিকারী কুকুর করে থাকে। শিকার অনুসন্ধান করো– ঝোপ-ঝাড়ের ভেতরে, গর্তে, গুহায়, পাথরের আড়ালে, গাছের ডালে, সবখানে তল্লাশি চালাও। তোমরা যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন তোমাদের প্রত্যেকের হাতে অন্তত একটি করে দুশমনের কর্তিত মাথা থাকে যেনো।

যে সময়ে রুশ কমান্ডার কাস্‌ক ও তাতারী সিপাহীদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছিলো, ঠিক তখন গাজী মোহাম্মদ তার সৈনিকদের বলছিলেন, মাত্র একশ সৈনিক আমার সাথে থাকো; অন্যরা সকলে ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যাও। রাতের আঁধার আমাদের উত্তম বন্ধু। জঙ্গলের বাইরে গিয়ে নিরাপদ অবস্থান খুঁজে নাও এবং অবরোধকারী রুশ বাহিনীর উপর পেছনে থেকে আক্রমণ করো। আমি পরশু সন্ধ্যার সময় খুনিঘাঁটির দিককার সেনা অবরোধ ভেঙে ফেলবো। তোমাদের পঞ্চাশজন লোক সে সময়ে ঘাঁটির অপরদিকে উপস্থিত থাকবে।

খুনিঘাঁটি চার বর্গমাইল জঙ্গলের উত্তর-পশ্চিম দিকে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। হাজার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর বিশাল আকৃতির একটি পাথর। পাথরটি অতিক্রম করে কিছুদূর এগিয়ে গেলে পঞ্চাশ ফুট চওড়া এবং অতিশয় গভীর একটি গর্ত। পাহাড়ের চূড়া থেকে এই গর্তে যে-ই নিক্ষিপ্ত হবে, তার হাড়-পাঁজর এক হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। গর্তের পরে আবার তেমন উঁচু পর্বত। এখানে আছে বিশাল বিশাল গাছ। গাছের ডালপালা গর্তের এই নীচু ভূমিটিকে আচ্ছাদিত

করে রেখেছে। ফলে নিম্ন ভূমিটি এমন অন্ধকার কূপের রূপ ধারণ করেছে, যার মুখ ঘাস-পাতা, খড়কুটো দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

রাতে জঙ্গলের উত্তর ও পশ্চিম অংশে মুজাহিদ ও অবরোধকারী রুশ সেনাদের মধ্যে ঘোরতর লড়াই হয়। রুশ সেনারা স্থানে স্থানে আগুন জ্বালিয়ে আলোকিত করে রেখেছে। কিন্তু আগুনের আলো তাদের কোনো সাহায্য করছে না। মাটি অসমতল। মুজাহিদরা পাথরের আড়ালে নিকটে এসে পড়ছে এবং দ্রুত দৌড়ে গিয়ে রুশ সেনাদের সারির ভেতরে ঢুকে পড়ছে। তাদের উপর গুলি ছোঁড়ার কোনো সুযোগই পাচ্ছে না রুশ সেনারা। মুজাহিদদের কঞ্জল-দাশ্না রুশ সেনাদের সঙ্গীনগুলোকে কাবু করে ফেলছে।

সারাটা রাত এভাবেই কাটে। মুজাহিদরা চার চারজন ও ছয় ছয়জনের দলে বিভক্ত হয়ে জঙ্গলের বাইরে চলে আসছে এবং রুশ সেনাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে বেষ্টনী অতিক্রম করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার পর দেখা গেলো জঙ্গলের উত্তর ও পশ্চিম দিকে নিয়োজিত রুশ বাহিনীর হাজার হাজার সৈনিকের লাশ ও ক্ষত-বিক্ষত দেহ পড়ে আছে। কিন্তু মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন মাত্র চৌদ্দজন। রুশ অফিসারও এখন দিশেহারা। গাজী মোহাম্মদ অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে গেলেন, নাকি এখনো বেষ্টনীতে আটকে আছেন, তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। ওদিকে জঙ্গলের ভেতরে মুজাহিদ ও কাস্‌ক-তাতারী সৈন্যদের মধ্যে এমন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে, যা মানুষ কখনো দেখেনি। মুজাহিদরা জঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঘ্রের ন্যায় ওঁৎ পেতে বসে আছে। কাস্‌ক ও তাতারী সৈন্যরা যেই মাত্র তাদের সন্ধান করতে করতে নিকটে চলে আসছে, অমনি অতর্কিত হামলা করে তাদের লাশে পরিণত করে দিচ্ছে।

কাস্‌ক ও তাতারী বাহিনী জঙ্গলে প্রবেশ করলো বিশ ঘন্টা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো তারা একজন দুশমনের মাথাও কাটতে পারেনি। অথচ তার বিপরীতে হাজার হাজার কাস্‌ক-তাতারী সৈন্য মুজাহিদদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।

রুশ কমান্ডার মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অধীন অফিসারদেরকে বলে দেয়, জঙ্গল থেকে যে বিদ্রোহী সবশেষে বের হবে, সে-ই কাজী মোহাম্মদ। যতোক্ষণ পর্যন্ত জঙ্গলে একজন বিদ্রোহীও অবশিষ্ট থাকবে, বুঝতে হবে, সে কাজী মোহাম্মদ। কাজী মোহাম্মদ শামিলের পুত্র। এমনটা হতে পারে না যে, সে তার সঙ্গীদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে নিজে জীবন নিয়ে পালিয়ে যাবে। তোমরা উত্তর ও পশ্চিম দিককার অবরোধ আরো শক্ত করো। ঘাঁটির পেছনে বাহিনী নিয়োজিত করো। অধিকাংশ বিদ্রোহী ওদিক দিয়ে পালিয়েছে।

রুশ কমান্ডারের নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত হয়।

তৃতীয় দিন আসরের সময়। রাশিয়ানদের ঢোলের শব্দ শোনা যাচ্ছে, যা ভেসে আসছে পশ্চিম দিক থেকে। আওয়াজ জঙ্গলের ভেতরেও শোনা যায়। এটি গাজী মোহাম্মদের জন্য একটি পয়গাম যে, খুনিঘাঁটির অপর প্রান্তেও দুশমন প্রস্তুত আছে। গাজী মোহাম্মদ তার সঙ্গীদেরকে সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার নির্দেশ দেন, যার অর্থ হবে, প্রত্যেক মুজাহিদ যেনো বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের সাথে দুশমনের অবরোধ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং খুনিঘাঁটির দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত রহিত মনে করে। গাজী মোহাম্মদ তার রক্ষীদের বললেন, কিন্তু আমি সেই পথেই যাব। তাতে যা হবে হোক।

এখন সন্ধ্যা। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে গেছে। জঙ্গলের আঁধার রাতের আঁধারের সাথে মিশে ঘোর অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। জঙ্গলের চারদিকে রুশ বাহিনী প্রস্তুত দণ্ডায়মান। খানিক পরপর জঙ্গলের কোনো না কোনো প্রান্ত থেকে একটি না একটি ছায়ামূর্তি তীব্র বেগে বাইরে লাফিয়ে পড়ছে এবং চোখের পলকে রুশ সিপাহীদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। শুরু হয়ে যাচ্ছে কঞ্জল-সঙ্গীনের সংঘর্ষ। এসব ছায়ামূর্তি হলো আল্লাহর সিপাহী– গাজী মোহাম্মদের সৈনিক। এতে কেউ শহীদ হয়ে যাচ্ছে, কেউ জখমী, কেউবা বেরিয়ে যাচ্ছে রুশ সেনাদের সারি ভেদ করে।

রাতের এক প্রহর কেটে যায়। খুনিঘাঁটির নিকট থেকে আওয়াজ আসে, 'আমি গাজী মোহাম্মদ– গাজী মোহাম্মদ ইবনে শামিল। আমি যাচ্ছি– সম্ভব হলে তোমরা আমাকে গ্রেফতার কর।'

গাজী মোহাম্মদ পাহাড়ের সেই স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন, যেখান থেকে কয়েক পা এগুলেই নিম্নভূমি। সঙ্গেই ডালপালাবিশিষ্ট একটি গাছ। গাছের ডালের সাথে বাঁধা একটি রশির এক প্রান্ত তার হাতে। এটি তার এক নায়েবের কৃতিত্ব যে, তিনি জীবন বাজি রেখে কোনো প্রকারে ঘাঁটির অপর প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে গাছের ডালের সাথে একটি রশি বেঁধে তার এক মাথা গাজী মোহাম্মদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন।

শব্দ শোনামাত্র পাহাড়ে অবস্থিত শত শত রুশসেনা গাজী মোহাম্মদের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু রাতের আঁধারে দৌড়ের মুখেই তারা সকলে গর্তসম নিম্নভূমিতে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। গাজী মোহাম্মদ রশির সাহায্যে গর্তের ওপারে চলে যান। কিন্তু সেখানেই রুশ সেনাদের অবস্থান। তারা সঙ্গীন উঁচিয়ে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। গাজী মোহাম্মদ দ্রুত দৌড়ে রুশ সেনাদের নিকটে গিয়ে লাফিয়ে রুশ সেনাদের মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে বেরিয়ে যান। অফিসার নির্দেশ দেন– 'ফায়ার'। মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার রাইফেল আগুন ছুঁড়তে শুরু করে। গুলী বর্ষিত হচ্ছে বৃষ্টির মতো। অফিসারের দ্বিতীয় নির্দেশ– 'ওকে ধাওয়া করো, খবরদার পালাতে পারে না যেনো।'

হাজার হাজার রুশসেনা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গাজী মোহাম্মদের পেছনে ছুটে। সামনে ঘোর অন্ধকার। রুশ সিপাহীরা মশাল জ্বালিয়ে নেয়।

রুশ অফিসার নিশ্চিত, গাজী মোহাম্মদ অন্তত আহত হয়েছেন। তার সৈনিকরা এমনভাবে গুলি ছুঁড়েছে যে, এই গুলি শূন্যে উড়ন্ত পাখির পায়ে ছোঁড়া হলেও রক্ষা পেতো না। অফিসার এ ব্যাপারেও নিশ্চিত যে, গাজী মোহাম্মদ আর জীবনে রক্ষা পাবে না। তার ধারণা মতে, এখন গাজী মোহাম্মদের লাশ অনুসন্ধান করার পালা। অফিসারের নির্দেশে হাজার হাজার রুশ সিপাহী গাজী মোহাম্মদের লাশের সন্ধানে নেমে পড়ে।

❁ ❁ ❁

উঁচু বস্তির উত্তর-পশ্চিমে তিন মাইল দূরে একটি পাহাড়ের অবস্থান। এই পাহাড়ে ছোট্ট একটি ঘরে স্ত্রী, এক কন্যা ও দু' পুত্রসন্তানসহ বাস করেন ডাক্তার আবদুল আজিজের ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহীম। আবদুর রহীমের বড় ছেলে একবার রুশীদের নিকট ইমাম শামিলের এক নায়েব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছিলো। রুশীরা নায়েবকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে তার এলাকা অবরোধ করে ফেলে। নায়েব দুশমনের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

উঁচু বস্তির বাসিন্দারা আবদুর রহীমের পরিবারকে বয়কট করে। আঞ্চলিক রীতি অনুযায়ী আবদুর রহীম এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পুত্রের এক ভুল আবদুর রহীমকে জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়। আবদুর রহীম শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আবদুর রহীমের অনুতপ্ত পুত্রদ্বয় কৃতকর্মের প্রতিবিধানের নিমিত্তে মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়ে রুশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে যারপরনাই বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। ইমাম শামিল খুশি হয়ে বয়কট প্রত্যাহার করে নেন। এলাকায় তার সম্মানের সাথে ফিরে আসার জন্য একটি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। কিন্তু পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর হতে চলেছে। অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগই মিলছে না।

রাতের শেষ প্রহর। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত আব্দুর রহীমের ঘরের দরজায় করাঘাত পড়ে। আবদুর রহীম মেয়েকে ডেকে বলে, তোমার মাকে জাগিয়ে তোলো, দেখো বাইরে কে এসেছে। দেখো, তোমার ভাই এসেছে কিনা। মনে হয় না, ও তো ময়দানে।

আবদুর রহীমের কন্যা ও স্ত্রী দরজার কাছে যায়। স্ত্রী উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কে? কোনো জবাব নেই। তবে কারো কোঁকানীর শব্দ কানে আসছে। মেয়ে সাহস করে দরজা খুলে। অমনি দরজার সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক জখমী ধড়াম করে ঘরের ভেতরে লুটিয়ে পড়ে। আঙিনা রক্তে ভিজে গেছে। মা-মেয়ের কণ্ঠ চিরে চিৎকার বেরিয়ে আসে। চিৎকার শুনে আবদুর রহীম বিছানা থেকে ওঠার

চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে মেয়ে দৌড়ে এসে বলে, বাবা, জখমী– মুজাহিদ! রক্ত আর রক্ত– আমরা করি কী?

আবদুর রহীম বললেন, জখমী যেই হোক, সে আমাদের আশ্রয়প্রার্থী। তাকে ভেতরে নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি দুধ গরম করে পান করাও। জখম দেখো। দ্রুত ওষুধ লাগাও। কিন্তু আগে মাটির রক্ত পরিষ্কার করে ফেলো। আঙিনায়-দরজায় কোথাও এক ফোঁটাও রক্তের দাগ যেনো না থাকে।

মা-মেয়ে জখমীকে টেনে ভেতরে নিয়ে যান। মা জখমীকে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন আর মেয়ে আঙ্গিনা থেকে রক্ত পরিষ্কার করতে চলে যায়। আবদুর রহীম স্ত্রীকে বললেন, তুমি আমাকে ধরে জখমীর নিকট নিয়ে যাও। স্ত্রী আবদুর রহীমকে জখমীর নিকট নিয়ে যায়। জখমীকে দেখামাত্র আবদুর রহীম চমকে ওঠেন। মুহূর্ত মধ্যে তার দেহে যেনো পূর্ণ শক্তি ফিরে আসে। স্ত্রীকে গরম দুধ নিয়ে আসার আদেশ দিয়ে আবদুর রহীম নিজেই জখমীর ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করেন। স্ত্রী যেমন আনন্দিত, তেমনি বিস্মিত।

খানিক পর আবদুর রহীমের মেষ রাখাল সংবাদ নিয়ে আসে, ইমাম শামিল তার ঝটিকা বাহিনী নিয়ে রুশীদের উপর জোরদার আক্রমণ চালিয়েছেন এবং রুশীরা জঙ্গল ত্যাগ করে ময়দানের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। আবদুর রহীম এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, রুশীরা জখমীর অনুসন্ধানে তার ঘর পর্যন্ত আসবে না। স্ত্রী-কন্যাকে জখমীর সেবা-চিকিৎসার নির্দেশ দিয়ে তিনি বায়ু সেবনের জন্য বাইরে বেরিয়ে যান। স্ত্রী জখমীর সেবা-চিকিৎসায় ব্যস্ত। মেয়ে জখমীর শিয়রে বসে আছে।

কিছুক্ষণ পর জখমী চোখ খুলে। কাছে বসা মেয়েটির প্রতি তাকায় এবং জিজ্ঞেস করে, তুমি– তুমি কে?

ঃ আমি আবদুর রহীমের কন্যা হাবীবা।

ঃ আমি কোথায়? এটা কোন জায়গা? তুমি এখানে কেনো এসেছো?

ঃ সব কথা একবারেই জিজ্ঞেস করবেন?

ঃ কোনো পুরুষকে ডেকে আনো। খাদেম কোথায় গেলো? রক্ষীরা কোথায়?

মেয়ে মাকে ডাক দেয়। বলে, মা মা জলদি আসো। লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

মা দৌড়ে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে?

মেয়ে বলে, শুনুন, ইনি কীসব বলছেন! কথায় মনে হচ্ছে, ইনি ইমাম শামিলের পুত্র। খাদেম... রক্ষী... এসব বলছেন। তুমিই তাকে বলে দাও, তিনি আমাদের ঘরের আঙিনায় অচেতন পড়ে ছিলেন।

এমন সময়ে ঘরের বাইরে অনেকগুলো মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। আবদুর

রহীম হাঁক দিয়ে বললেন, হাবীবা! দরজা খোলো।

দরজা খুলে যায়। আবদুর রহীম স্ত্রী-কন্যাকে সরে যেতে বলেন। তারা কক্ষ ছেড়ে চলে যায়। ইমাম শামিলের খাস নায়েব সুরখাই খান দশজন সৈন্যসহ কক্ষে প্রবেশ করেন এবং জখমীকে বাঁশ ও খেজুর পাতার তৈরি স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে যান।

সুরখাই খানকে বিদায় দিয়ে আবদুর রহীম ঘরে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে বললেন, গাট্টি বাঁধো, এক্ষুনি রওনা হতে হবে। কন্যা ছুটে এসে বলে, কিছু বলবে তো বাবা! কী সব ঘটছে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

ঃ আমার দুলালী! দুঃখের দিন আমাদের শেষ হয়ে গেছে। এই জখমী দাগেস্তানের সিংহ ইমাম শামিলের পুত্র গাজী মোহাম্মদ। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সেবা-চিকিৎসা করার সৌভাগ্য দান করেছেন। তোমার ভাই যে ভুল করেছিলো, তার প্রতিকার তো আগেই হয়ে গেছে। ভুল যেহেতু আমার ছিলো না– ছিল আমার পুত্রের, তাই আল্লাহ আমার আর্জি কবুল করেছেন। আজ আমি গৌরবান্বিত। আমাদের বস্তিতে এমন একটি পরিবারও নেই, যাদের ইমাম শামিলের পুত্রের আতিথেয়তা ও সেবা-চিকিৎসা করার গৌরব কপালে জুটেছে।

❁ ❁ ❁

ইমাম শামিল গাজী মোহাম্মদের মুখ থেকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শোনেন। পরক্ষণেই আবদুর রহীম ও তার পরিবারবর্গকে সসম্মানে বস্তিতে নিয়ে আসার জন্য একটি বিশেষ বাহিনী প্রেরণ করেন। আবদুর রহীমের মুজাহিদ পুত্রকেও বাহিনীর সঙ্গে প্রেরণ করেন। আবদুর রহীম এমনভাবে বস্তিতে ফিরে আসেন যে, বস্তির সব বাসিন্দা তাকে স্বাগত জানানোর জন্য রাস্তার দু'পাশে দণ্ডায়মান। তার এসে পৌঁছানোর আগেই তার পুরাতন ঘর মেরামত হয়ে গেছে।

দু'দিন পর ইমাম শামিল স্বয়ং আবদুর রহীমের ঘরে আসেন। আবদুর রহীম অনুভব করেন, তিনি তার যৌবন ফিরে পেয়েছেন। সময়ের একটি চক্র চরম নিন্দিত এক ব্যক্তিকে পরম নন্দিত ও মহাসম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত করে দিলো।

ইমাম শামিল আবদুর রহীমের সঙ্গে নির্জনে কথা বলেন। বললেন, গাজী মোহাম্মদ সেরে ওঠবে। জখম শুকাচ্ছে। আমি হাবীবাকে আমার কন্যা বানাতে চাই। তবে এটি আমার নির্দেশ নয়– নিবেদন। তুমি স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে বুঝে সিদ্ধান্ত নাও।

ঃ ইমামে মোহতারাম! এ মর্যাদা আমার কল্পনার অতীত। এ আমার মেয়ের খোশনসীব। আর মেয়ের সৌভাগ্যে মা দ্বিমত করতে পারে না।

ঃ শোনো আবদুর রহীম! বিষয়টা শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট। মেয়ের মতামত জেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত দাও। হাবীবা যদি এ সম্বন্ধে রাজি না হয়, তাতে আমার দুঃখ থাকবে না।

আবদুর রহীম ইমাম শামিলের অনুমতি নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে যান। স্ত্রী ও কন্যা তাদের আলোচনা শুনে ফেলেছে আগেই। স্ত্রীর মুখমণ্ডল খুশিতে জ্বল জ্বল করছে। মেয়ের পা তো মাটির নাগাল পাচ্ছে না। এ জীবনের পরম এক পাওয়া। পিতা তেমন কিছু বলার আগেই 'আমার সৌভাগ্য বাবা' বলেই পিতাকে জড়িয়ে ধরে কন্যা হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে। এ কান্না আনন্দের, এ কান্না সুখের। ন আবদুর রহীম কন্যার পিঠে চাপড় দিয়ে আদর জানান। কন্যাকে ছাড়িয়ে রেখে পেছনপানে পা বাড়া।

আবদুর রহীম ইমাম শামিলকে জানান, হাবীবা আপনার কন্যা– যখন ইচ্ছে হয় নিয়ে যাবেন।

ঃ এ কর্তব্য আমি শীঘ্রই সম্পাদন করতে চাই। গাজী মোহাম্মদ মোটামুটি সুস্থ হওয়ামাত্রই আক্‌দ হয়ে যাওয়া চাই। হাতে সময় কম। কাজ অনেক। এবার উঠি। আল্লাহ্ হাফেজ।

অল্প ক'দিন পর গাজী মোহাম্মদ ও হাবীবার বিয়ে হয়ে যায়।

সাতাশ.

ইমাম শামিল একাধিকবার তার নায়েবদের নিকট আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, আমি তুরস্ক থেকে সাহায্য পাবো। বাস্তবিকই যদি তুরস্ক কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্র থেকে দাগেস্তানের মুজাহিদরা সাহায্য পেতো, তাহলে তাদের রুশ আগ্রাসন বিরোধী যুদ্ধের গতি পাল্টে যেতো। কিন্তু না, ইমাম শামিল কোনো দিক থেকে সাহায্য পেলেন না। কিন্তু কেনো? তুরস্ক তার সেই মুসলিম ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসলো না কেনো, যারা নিজেদের অপেক্ষা শতগুণ বড় শক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে বুকটান করে দাঁড়িয়েছিলো?

আসল ঘটনা হলো, সে সময়ে সালতানাতে ওসমানিয়া লাগাতার বিপদ ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েছিলো। আফ্রিকা ও ইউরোপসহ বেশক'টি অধিকৃত এলাকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র চলছিলো। জার রুশ, ইংল্যান্ডের আমীর-ব্যবসায়ী ও ফরাসী নওয়াবদের অর্থানুকূল্যে গ্রীসে (যা সে সময়ে সালতানাতে ওসমানিয়ার অংশ ছিলো) 'ফায়েলীগ হিথরিয়া' নামে একটি বিদ্রোহী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছিলো। ১৮২০ সালে যার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো দু' লাখে। এই সংগঠনে যোগদানকারী প্রতিজন সদস্য থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেয়া হয় যে, আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার ক্ষতিসাধন ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমার জান-মাল, চিন্তা-চেতনা সর্বস্ব ত্যাগ করবো। এই সংগঠনের স্লোগান ছিলো, নিজের ধর্ম ও দেশের জন্য যুদ্ধ করো। নিজ ধর্ম ও মাতৃভূমির শত্রুদের ঘৃণা করো এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করো। এই সংগঠনের সদস্যদের বলা হতো

মুবাল্লিগ বা ধর্মপ্রচারক। যেহেতু সালতানাতে ওসমানিয়ায় খৃস্টানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিলো, সেই সুবাদে মুবাল্লিগ ধর্মপ্রচারের আড়ালে সালতানাতের যে কোনো অঞ্চলে যাওয়া-আসা করতে পারত। তারা ধর্মপ্রচারের নামে ব্যাপকহারে প্রোপাগাণ্ডা চালাতে শুরু করে।

গ্রীসে বিদ্রোহ সফল করার জন্য প্রথমে আলবেনিয়া, মলদুনিয়া ও মেরিয়ায় বিদ্রোহ করানো হয়। ওসমানী সেনাবাহিনী যখন সেসব বিদ্রোহ দমন করার অভিযান শুরু করে, তখন গ্রীসে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। সালতানাতে ওসমানিয়ার মূলোৎপাটনে ইউরোপে ভয়ানক এক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। জনৈক ইংরেজ কবি বাইরন ১৮২৪ সালে গ্রীসে এসে বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগ দেয়। ফরাসী কবি ভিক্টর হিউগো গ্রীসিয় বিদ্রোহীদের সহায়তাদানের জন্য ফ্রান্সে একটি সংগঠন দাঁড় করায়। কোনো কোনো এলাকায় সমস্ত তুর্কীকে হত্যা করা হয়।

এই বিদ্রোহ যখন ব্যাপক রূপ লাভ করে, ঠিক তখন সালতানাতে ওসমানিয়ার সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপও বিদ্রোহ করে বসে। সালতানাতে ওসমানিয়ার দুর্বলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো এই ওসমানী বাহিনী, যারা ছিলো সংশোধন নীতির বিরোধী। ওসমানীয় সুলতান সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এই সেনাবিদ্রোহ দমন করে ওসমানী বাহিনীকে নতুন আঙ্গিকে বিন্যাস করতে শুরু করেন। সালতানাতে ওসমানিয়ার বিরোধী শক্তিগুলোর এই অনুভূতি ছিলো যে, তুর্কী বাহিনী যদি নতুন আঙ্গিকে বিন্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তার মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তারা তুরস্কের উপর একজোট হয়ে আঘাত হানার সুযোগের সন্ধান করতে শুরু করে।

১৮২৭ সালে রাশিয় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌবহর আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে নূরানিউ উপসাগরে ওসমানী নৌবহরকে ধ্বংস করে ফেলে এবং সম্মিলিত বাহিনীর হাজার হাজার সৈনিক গ্রীসিয় বিদ্রোহীদের পোশাকে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৮২৮ সালের মে মাসে রুশ বাহিনী পার্থ নদী পার হয়ে সালতানাতে ওসমানিয়ার উপর আক্রমণ করে। এক লাখ রুশসেনা সালতানাতে ওসমানিয়ার ইউরোপিয়ান প্রদেশগুলোর উপর এবং ত্রিশ হাজার সৈন্য এশীয় প্রদেশগুলোর উপর হামলা চালায়। রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে পেছনে প্রস্তুত থাকে বত্রিশ হাজার সৈনিক।

নূরানিউতে রাশিয়ার সামরিক বহর ছাড়াও ষোলটি যুদ্ধ জাহাজ কৃষ্ণসাগরে অবস্থান নেয়। তুর্কীরা প্রতিটি পয়েন্টে কঠোরভাবে হামলাকারীদের মোকাবেলা করে। কিন্তু রাশিয়া কয়েকটি এলাকা হাত করে নিতে সক্ষম হয়। রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটার পর ১৮৩০ সালে ফ্রান্স হামলা করে আলজেরিয়ার উপর। গ্রীসের পক্ষ থেকেও তুরস্কের উপর হামলা হয়। মিসরের গবর্নর মোহাম্মদ

আলী পাশাও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করে তুলে এবং তিনি ইয়াফতা, গাজা, বাইতুল মোকাদ্দাস, দামেশ্ক এবং তারাবলিসেও চড়াও হন। মোহাম্মদ আলী পাশা ওসমানী বাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে পরোক্ষভাবে দলে ভিড়িয়ে নেন। ফলে প্রতিটি সংঘর্ষে তার বাহিনীই জয়লাভ করে।

১৮৩৪ সালে সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয়-এর মৃত্যুর পর সুলতান আবদুল মজিদ ষোল বছর বয়সে সালতানাতের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ আলী পাশা এই সুযোগে তার বিদ্রোহের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ মধ্যস্থতাকারী রূপে ওসমানী সালতানাতের দু' অংশের বিরোধ থেকে ব্যাপক স্বার্থ উদ্ধার করতে শুরু করে। ফ্রান্স মোহাম্মদ আলী পাশাকে সমর্থন দেয়। রাশিয়া সমর্থন দেয় সুলতান আবদুল মজীদকে। বৃটেন কখনো একজনের পিঠে চাপড় মারে; কখনো অন্যকে বাহবা দেয়। এভাবে মুসলমানদের শক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার হওয়ার সুবাদে দুশমনের শক্তি বাড়তে থাকে। জার রুশ নেকুলাই ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ড সফর করেন এবং বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে সালতানাতে ইসলামিয়াকে ভাগাভাগি করে নেয়া সম্পর্কে আলোচনা করে। বৃটেন নীতিগতভাবে এ পরিকল্পনায় একমত পোষণ করে। কিন্তু কার্যত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করার জন্য জোর দেন।

১৮৫৩ সালে সেন্টপিটার্সবার্গে অবস্থানরত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হেমিলটনের সাথে পুনরায় এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন, ইউরোপের রুগ্ন লোকটি বেশি দিন আর বাঁচবে না। তাই ওসমানী সাম্রাজ্যের বিভক্তির নীতিমালা এখনই চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। মিসর ও ক্রেটের উপর বৃটেন দখল নেবে। মালদুবিয়া, বেলাচিয়া, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া পাবে রাশিয়া। তুরস্কের বাদ বাকি অংশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে পরে।

বৃটেন হিন্দুস্তানসহ আরো কয়েকটি এলাকায় 'জরুরী সেনাঅভিযান পরিচালনার অজুহাতে সালতানাতে ওসমানিয়ার উপর এখনই আক্রমণ করতে সম্মত হয়নি। মূলত বৃটেন সালতানাতে ওসমানিয়ার উপর একাকি দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলো।

জার রুশ সালতানাতে ওসমানিয়ার উপর আক্রমণ করে বসেন। ফ্রান্স এবং বৃটেনকেও বিভিন্ন কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হয়। এভাবেই কারিমিয়ার যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। রাশিয়া যে উদ্দেশ্যে সালতানাতে ওসমানিয়া আক্রমণ করে, তাতে ষোল আনা সফল হতে পারেনি। অবশেষে যুদ্ধরত শক্তিগুলোর মধ্যে আপস হয়ে যায়। ঠিক এ সময়ে জার নেকুলাইর মৃত্যু ঘটে। তার স্থলাভিষিক্ত জার আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয় তার সমুদয় সামরিক শক্তি কাফকাজের রণাঙ্গনে নিয়োজিত করেন। তুর্কী সুলতান ক্রেট সার্বিয়া

মোন্টিনেগরো, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা ও বুলগেরিয়াসহ আরো কতিপয় এলাকায় একের পর এক উদ্ভূত সংঘাত দমনে ব্যস্ত। একাধিকবার তুর্কী সুলতানের দরবারে কাফকাজে রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলমানদের সাহায্য করার প্রসঙ্গ উত্থাপিতও হয়। কিন্তু দরবারী উপদেষ্টাগণ সুলতানকে ভয় দেখিয়ে তা থেকে বিরত রাখে। তুর্কী সেনাপতি ওমর পাশা মনে করতেন, যদি কাফকাজের মুজাহিদদেরকে তোপ দিয়ে সাহায্য করা হয়, তাহলে তারা রুশ বাহিনীর শক্তির মোকাবেলা করতে পারবে। কিন্তু উপদেষ্টাগণ সুলতানকে তা থেকেও বিরত রাখেন। বৃটেন এবং ফরাসী দূতও ওসমানী শাসকমণ্ডলীকে পরামর্শ প্রদান করে, একটি অসংগঠিত ভূখণ্ডের খাতিরে রাশিয়ার মতো শক্তির শত্রুতা ক্রয় করা সুলতানের পক্ষে ঠিক হবে না।

রাশিয়া ও বৃটেন সালতানাতে ওসমানিয়াকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার ব্যাপারে বেশ ক'বার পরস্পর মতবিনিময়ও করেছে। সম্ভবত তাদের মাঝে এই সমঝোতাও হয়ে গেছে যে, রাশিয়া কাফকাজ ও মধ্য এশিয়ার ইসলামী প্রজাতন্ত্রগুলোকে দখল করে নেবে এবং বৃটেন ওসমানী সালতানাতের আফ্রিকী প্রদেশে তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তবে তুরস্কের ইউরোপীয় প্রদেশগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উভয় শক্তির মধ্যে মতানৈক্য রয়ে যায়।

যখন দাগেস্তান ও চেচনিয়ায় দু'পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই চলছিলো এবং যখন মুজাহিদদের সাহায্যের সীমাহীন প্রয়োজন ছিলো, তখন গোটা সালতানাতে ওসমানিয়া ষড়যন্ত্রের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিলো। ১৮৫৮ সালে ক্রেট, সার্বিয়া মোন্টিনেগরো, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা ও বুলগেরিয়া নতুন করে বিদ্রোহ দানা বেঁধেছিলো। ওসমানী বাহিনী যখন বিদ্রোহ দমন করার জন্য অভিযান শুরু করে, তখন বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরাও মোকাবেলায় নেমে পড়ে। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ ও ফরাসী নৌবহর জেদ্দার সন্নিকটে নোঙ্গর করা ছিলো এবং একজন মুসলমানের হাতে এক ফরাসী কর্মকর্তার আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলাগুলির সূত্রপাত করার হুমকি দিচ্ছিলো। সুলতান আবদুল মজীদ আশংকা করছিলেন, ইংরেজ ও ফরাসীরা মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহের উপর চড়াও হওয়ার জন্য অজুহাত খুঁজছে। সে কারণে ওসমানী বাহিনী এবং নৌবহরের অধিকাংশ জেদ্দার আশপাশে অবস্থান গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রাশিয়া তার অধিকাংশ সৈন্যকে কাফকাজে মোতায়েন করে।

❁ ❁ ❁

দাগেস্তানে যখন রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হয়, তখন ইরানও ভেতর ও বাইরের ষড়যন্ত্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলো। তুর্কী ও ইরানীদের পূর্বেকার

যুদ্ধসমূহের কারণে তখনো উভয় দেশের মাঝে খারাপ সম্পর্ক বিরাজ করছিলো। ইরানের বাদশাহ ফতেহ আলী শাহ কখনো ইংরেজদের প্রতি, কখনো ফরাসীদের প্রতি হাত প্রসারিত করছিলেন। ফতেহ আলী শাহ-এর হেরেমে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গোত্রের অসংখ্য নারী শোভা পাচ্ছিলো। এ কারণে তার সন্তানদের মধ্যে ছিলো চরম অনৈক্য। পুত্রদের কেউ ছিলো রাশিয়ার সমর্থক। কেউ ইংরেজদের পক্ষপাতি। রেজা কুলি হেদায়াত নামক এক ঐতিহাসিকের মতে, ফতেহ আলী শাহর হেরেমে চারশ নারী ছিলো। তাদের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলো ২৬০টি সন্তান। তন্মধ্যে ১৫০ জন পুত্র সন্তান। অবশিষ্ট ১১০টি কন্যা সন্তান। তাদের মধ্যে সেই পুত্র রাজা হিসেবে নিয়োগ লাভ করতো, যে বহিশক্তি রুশ, ইংরেজ কিংবা ফরাসীদের সাহায্য পেতো।

১৮৩৪ সালে ফতেহ আলী শাহর মৃত্যুর পর মসনদ নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটলে ইসমাঈলিয়া ফের্কার প্রধান খলীলুল্লাহর পুত্র আগা খান বিদ্রোহ করে বসে। এই বিদ্রোহ দমন হতে না হতে খোরাসান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তার পাশাপাশি কুচক্রীরা ইরানী ও তুর্কী মুসলমানদের বিশ্বাসের ভিন্নতার ইন্ধন যোগাতে শুরু করে। ফলে উভয় দেশের ওলামা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে শুরু করে এবং তারা দেশের মূল সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে আরম্ভ করে।

১৮৪৮ সালে মোহাম্মদ শাহ'র ওফাতের পর নাসীরুদ্দীন শাহ সিংহাসন লাভ করেন। সাথে সাথে ইরানের কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া আলী মোহাম্মদ বাব বাবিয়া নামক নতুন এক ধর্মমতের প্রবর্তন করে নতুন এক আন্দোলন শুরু করে। মুজাহিদগণ এই নতুন ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। ফলে দেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এই চেতনায় ডুবে থাকে।

আটাশ.

মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয়া এবং গোত্রীয় ভেদাভেদকে অধিকতর শাণিত করার তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আর রুশ-এর পক্ষ থেকে ছড়ানো টাকা-কড়ি, সোনা-দানা ফল প্রসব করে চলেছে। ধীরে ধীরে পরিবেশ পাল্টে যাচ্ছে। দাগেস্তান, চেচনিয়া এবং অন্যান্য প্রদেশের খানদের যে ঐক্য রাশিয়ার তোপ-কামান, বন্দুক-রাইফেল দুর্বল করতে পারেনি, আভ্যন্তরীণ দলাদলি আর গোত্রীয় সংকীর্ণতা তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। সত্যের জন্য জান কুরবান করার মতো লোকের সংখ্যা যেমন কম থাকে, তেমনি ধন-সম্পদের প্রস্তাবকে পায়ে পিষে লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকার মতো মানুষও হয় নগণ্য। বিচলিত হওয়ার কারণ এটা নয় যে, বেরিয়া তানস্কীর

লোকেরা গোত্রগুলোর অফাদারী ক্রয় করে নিচ্ছে এবং মুজাহিদদের সমর্থক-সহযোগীদের ঈমান নীলামে কিনে নিচ্ছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সোনা-দানা-রোবলের এতো ছড়াছড়ি সত্ত্বেও হাজার হাজার মুজাহিদ বড় দুঃসাহসিকতার সাথে আযাদীর লড়াই লড়ে যাচ্ছে। ইমাম শামিল প্রতিটি ময়দানে উপস্থিত হয়ে মুজাহিদদের উদ্দেশে বলছেন–

'যাদের ধারণা, তারা আমার জন্য লড়াই করছে, তারা আমাদের সারি থেকে বেরিয়ে কেটে পড়তে পারো। তোমরা কি জানো না, রাশিয়ার প্রতিটি জার কাফকাজ, জর্জিয়া এমনকি দক্ষিণ রাশিয়ার পর্যন্ত শাসনক্ষমতা তুলে দেয়ার প্রস্তাব করেছে? তারা এসব অঞ্চলের শাসনক্ষমতা আমার পুত্রদের হাতে পর্যন্ত তুলে দিতে প্রস্তুত ছিলো। শর্ত হলো, আমি জিহাদ ত্যাগ করবো এবং রুশ সেনাদেরকে এসব অঞ্চল দিয়ে নির্ভয়ে চলাচল করার গ্যারান্টি দেবো। এই যুদ্ধ যদি আমার লড়াই হতো, তাহলে আমি (একটি পাহাড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে) ওটার সমান সোনা হাসিল করে নিতাম। কিন্তু এ যুদ্ধ আমার নয়। এ হলো আমাদের আযাদীর লড়াই। আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের জন্য লড়াই করার নাম জিহাদ। জিহাদ হয় শুধু এবং শুধুই আল্লাহর জন্য। মালে গনীমত কিংবা ক্ষমতা দখল করার জন্য জিহাদ হয় না। মুজাহিদের পরিচয় হলো, জিহাদের ময়দানে মুজাহিদের অন্তরে জীবন নয়– শাহাদাতের তামান্না বিরাজ করে। সোনা-রূপা হাতে নিয়ে যারা হানাদার জালিমদের সাথে যোগ দিচ্ছে, তারা নাদান-নির্বোধ। তারা বুঝে না, যারা মরতে জানে না, তারা বাঁচতেও জানে না। সময় যখন রক্ত চায়, তখন রক্ত দিতে হয়। স্বেচ্ছায় না দিলে পরিস্থিতি জোর করে হলেও তোমার রক্ত চুষে নেবেই নেবে। তারা জানে না, তারা মূলত সোনা-রূপার শিকল গলায় ধারণ করছে। কিছুদিন পর এই সোনার শিকল লোহার জিঞ্জিরে রূপান্তরিত হবে। তখন তাদের করার কিছুই থাকবে না। এরা শুধু নিজেদেরকেই নয়– ভবিষ্যৎ বংশধরকেও গোলামে পরিণত করছে। দেশের সব মানুষও যদি আমার সঙ্গ ত্যাগ করে, তবু আমি লড়াই চালিয়ে যাবো– একা লড়বো। যারা নিজেদেরকে শামিলের সৈনিক মনে করছো, তারা অস্ত্র ফেলে ঘরে ফিরে যেতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সৈনিক আছো, যারা আযাদীর জীবন কিংবা ইজ্জতের মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখো, তারা আমার সঙ্গে থাকো। আল্লাহর সৈনিকরা ময়দানে জয়-পরাজয়ের তোয়াক্কা করে না। তাদের অন্তরে একটিই আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে– শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা, রক্ত দেয়ার আকাঙ্ক্ষা।

পরিস্থিতি দু'মুখো চরিত্র অবলম্বনের কৌশল গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। দু'মুখো এবং অবিশ্বস্ত গোত্র ও ব্যক্তিরা এককূল হয়ে যায়। মুজাহিদদের কাতারে শুধু তারাই থেকে যায়, যারা প্রকৃত অর্থেই জিহাদী জযবায় বলিয়ান।

সংখ্যায় এরা কম। কিন্তু প্রত্যয় এদের পাহাড়ের মতো উঁচু। এরা প্রায় নিরস্ত্র, উপায়-উপকরণ স্বল্প। কিন্তু এরা ঈমানের দৌলতে বলিয়ান। সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার ন্যায় ছুটে চলা রুশ বাহিনীর মোকাবেলায় এরা পাথরের পাহাড়।'

কিন্তু মার্শাল বেরিয়া তানস্কী পুনরায় সাধারণ অগ্রাভিযানের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে 'জঙ্গল পরিষ্কার করে সামনে অগ্রসর হও' নির্দেশ প্রদান করেন। তিনটি এলাকায় লাখ লাখ রুশ সিপাহী রাইফেল ত্যাগ করে হাতে কুড়াল তুলে নেয়। তোপখানা প্রস্তুত হয়ে যায়। তোপের গোলা বর্ষণের আড়ালে গাছ কাটার অভিযান জোরে-শোরে শুরু হয়ে যায়।

রুশ বাহিনী বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে পাহাড়-পর্বতকে ডিনামাইট দ্বারা উড়িয়ে দিয়ে প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করে করে ধীরে ধীরে সম্মুখে এগিয়ে চলছে। মুজাহিদরা পায়ে পায়ে তাদের মোকাবেলা করে যাচ্ছে। কিন্তু খোলা মাঠে তোপ-কামানের ভয়াবহ গোলাবর্ষণের সামনে স্থির থাকা কঠিন ব্যাপার। তাই মুজাহিদরা নতুন এক কৌশল পরীক্ষা করে। তারা তাদের একটি জনবসতির সবগুলো ঘরের ছাদ ভেঙে উপরে খড়কুটো বিছিয়ে দেয়। নীচে মেঝেতে বাঁশ ও বাঁশের কঞ্চি গেড়ে রাখে। আবার খোলা মাঠে পরিখা খনন করে তাতে বাঁশ পুঁতে রাখে এবং নিজেরাও সেখানে মোর্চা গড়ে অবস্থান গ্রহণ করে।

রুশ বাহিনী মুজাহিদদের ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে অভিযান চালায়। কিন্তু উক্ত লোকালয়ে আঘাত হানতে গিয়ে তারা ভাঙা ছাদ দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে চোখা বাঁশ ও বাঁশের কঞ্চির উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে আহত-নিহত হচ্ছে কিংবা মুজাহিদদের খননকৃত পরিখায় নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। কিন্তু রুশ বাহিনীর জনশক্তির বিপুলতা মুজাহিদদের এই কৌশলকেও ব্যর্থ প্রমাণিত করে।

গরখলিল নামক একটি জনবসতি। রুশ বাহিনী সারি সারি সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। মুজাহিদদের শেষ মোর্চা পর্যন্ত এগার সারি রুশ সেনা মুজাহিদদের পুঁতে রাখা বাঁশ ও কঞ্চিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে নিহত বা গুরুতর আহত হয়ে পড়ে। কিন্তু দ্বাদশ সারির সৈন্যরা মুজাহিদদের মোর্চা ভেদে করতে সক্ষম হয়। নিক্ষিপ্ত রুশ সেনাদের দ্বারা পরিখা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গীরা তাদেরই লাশ কিংবা আহতদের দেহ মাড়িয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

❖ ❖ ❖

ইমাম শামিল কোনো দিক থেকে তোপ-কামান সংগ্রহ করা যায় কিনা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তোপ পাওয়া গেলে যুদ্ধের চেহারা পাল্টিয়ে দেয়া যেত। প্রতিটি পাহাড়ে, প্রতিটি পর্বতে তোপ স্থাপন করে মুজাহিদরা রুশ বাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে সক্ষম। কিন্তু ইমাম শামিলের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি একাধিকবার আশা করেছিলেন, তুরস্ক থেকে তোপ পেয়ে যাবেন। কিন্তু

অজানা কারণে প্রতিবারই তার এই আশা নিরাশায় পরিণত হয়।

ইমাম শামিলের এক নায়েব মোহাম্মদ হেদায়েত আলী প্রস্তাব পেশ করেন, যদি কাঠের উপর লোহার পাত বসিয়ে তার উপর মহিষের চামড়া স্তরে স্তরে জড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে বোধ হয় তা থেকে তোপের কাজ নেয়া যেতে পারে। ইমাম শামিলের ধারণায় এই পদ্ধতি ফলদায়ক হবে না। কাঠ-চামড়া বিস্ফোরণের ধকল সামলাতে পারবে না। তথাপি ইমাম শামিল হেদায়াত আলীর পীড়াপীড়ি ও প্রয়োজনের তাগিদে বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু ফল দাঁড়ায় হতাশাব্যঞ্জক। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে তোপ ও পরীক্ষাকারীদের দেহ দু-ই তুলার মতো উড়ে যায়।

১৮৫৮ সালের শুরুর দিকে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। রুশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে।হ্রাস পাচ্ছে মুজাহিদদের সংখ্যা। কয়েকটি কাবায়েলী ইতিমধ্যে ইমাম শামিলের সঙ্গ ত্যাগ করেছে । এমন কোনো দিন যাচ্ছে না, যেদিন কিছু না কিছু মুজাহিদ শাহাদাতবরণ না করছে। ইমাম শামিল ঝড়-কবলিত এক বৃক্ষের রূপ ধারণ করেছেন। ঝড়োহাওয়া কখনো তীব্র আকার ধারণ করে। আবার কখনো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু ঝড়ের ঝাপটায় গাছের পাতা ঝরতে থাকে। একদিকে নতুন নতুন তোপ আসছে, অপরদিকে আছে তরবারী, যা ধীরে ধীরে ভেঙে ব্যবহারের অনুপযোগী হচ্ছে। আছে এমন কঞ্জল, যাতে শাণ দেয়ার ফুরসতটুকু মিলছে না, যার ফলা রুশীদের দেহ ছিন্ন করে করে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু পরিষ্কার করে ধার দিয়ে নেয়ার সুযোগ নেই। কালো পতাকা বাতাসের ঝাপটা খেয়ে খেয়ে ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু পরিবর্তন বা রিপু করে নেয়ার সময় নেই। পাহাড়ের পাথুরে এলাকায় দৌড়ে দৌড়ে ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু দানা-পানি খাইয়ে তাদেরকে চাঙ্গা করে তোলার সময় নেই। প্রতিকূলতা প্রতি মুহূর্তে কঠোর থেকে কঠোরতর রূপ ধারণ করে চলেছে।

জার আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয়-এর আকাঙ্ক্ষা, এই বর্ষবরণের উৎসব বিজয়োৎসবও হওয়া চাই। কিন্তু ইমাম শামিল তার আকাঙ্ক্ষাকে আরেকবারের মতো ব্যর্থ করে দেন। জারের এই ব্যর্থতার ক্ষোভ 'বড় হামলা', 'তীব্র হামলা'র নির্দেশ দানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

১৮৫৯ সালের শুরুতে আবার যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। ইমাম শামিল নতুন করে বেকায়দায় পড়ে যান। রুশ বাহিনী আগের চেয়ে অধিক শক্তি নিয়ে হামলা শুরু করে। মুজাহিদরা পায়ে পায়ে লড়ে যাচ্ছে ঠিক; কিন্তু তাদের এ লড়াই প্রতিরক্ষামূলক। সময়ের তালে তালে তাদের প্রতিরক্ষাও দুর্বল হতে থাকে।

রুশ বাহিনী এবার নতুন নতুন রাইফেল ও দূরে গুলি নিক্ষেপযোগ্য তোপসজ্জিত। জঙ্গল ও পাহাড় কর্তনকারী জনশক্তিও এখন তাদের যথেষ্ট। রুশ

কমান্ডার বেরিয়া তানস্কী তার সকল পূর্বসূরী অপেক্ষা অধিক সতর্ক ও বিচক্ষণ। তার সমর কৌশল অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি ভাবে বুঝান, অগ্রযাত্রা হবে পশ্চিম দিকে; কিন্তু হামলা করেন দক্ষিণ দিক থেকে। মুজাহিদরা এক ময়দানে প্রতিরোধ শক্তি নিবদ্ধ করলে তিনি সেনাসংখ্যার বলে একাধিক ময়দান চালু করেছেন। স্বয়ং রুশ সেনারাও বুঝতে পারে না, তাদের গন্তব্য কোথায়। কমান্ডাররা যখন যা নির্দেশ দেয়, তারা সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। ইমাম শামিল তার গুপ্তচরদের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিরোধ পরিকল্পনা ঠিক করছেন। কিন্তু বেরিয়া তানস্কী তার পদক্ষেপের কথা প্রকাশ কবছেন ঠিক শেষ মুহূর্তে। ফলে ইমাম শামিলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। ইমাম শামিল যদিও বুঝতে পারছেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তাঁর প্রতিকূলে, তবু তাঁর দৃঢ়তা ও মনোবলে এতোটুকুও ভাটা পড়েনি।

ইমাম শামিল পুনরায় গভীর মনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং তাঁর ঘাঁটি এমন এক জায়গায় স্থানান্তর করেন, যেখানে তিন তিনশ ফুট উঁচু ও চল্লিশ ফুট করে চওড়া অসংখ্য বৃক্ষ বিদ্যমান। ইমামের ধারণা, রুশরা এই গাছগুলো সহজে কাটতে পারবে না এবং মুজাহিদরা আরেকবার তাদের কুদরতী মদদগার গাছ-গাছালীর সহযোগিতায় দুশমনের উপর কার্যকর আঘাত হানতে সক্ষম হবেন। রুশ বাহিনী এই অঞ্চলে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে মুজাহিদদের হাতে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়। মুজাহিদরা অকস্মাৎ গাছ-গাছালির আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে কিংবা গাছের ডালের উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে মুহূর্ত মধ্যে রুশ সৈন্যদের লাশে পরিণত করে কেটে পড়ে। রুশ বাহিনী এই গাছগুলোও কেটে পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। কিন্তু গাছগুলো এতো বিরাট বিরাট যে, হাজার মানুষও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করার পরও দশ-পনেরটির বেশি গাছ কাটতে সক্ষম হচ্ছে না।

পরিস্থিতি দেখে বেরিয়া তানস্কী তার সৈনিকদেরকে জঙ্গল ত্যাগ করে খোলা মাঠে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এতে মুজাহিদরা ধারণা করে, রুশ সেনারা আর জঙ্গলে প্রবেশ করবে না।

ক'দিন পর কয়েকশ রুশগাড়ি জঙ্গলের সন্নিকটে খোলা ময়দানে এসে থেমে যায় এবং সৈন্যরা বোঝাই গাড়িগুলো থেকে কী যেনো খালাস করতে শুরু করে। আকাশচুম্বী বৃক্ষরাজীর চূড়া থেকে মুজাহিদরা সে দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে।

খানিক পর রুশ সৈন্যরা দ্রুত এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তারা প্রত্যেকেই হাতে করে কী যেনো নিয়ে যায় এবং সেগুলো বিশাল বিশাল গাছগুলোর নীচে রেখে ফিরে আসে। বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকে। তারপর কয়েকজন সৈনিক সামনে অগ্রসর হয়ে গাছের নিকট গিয়ে মাটির উপর

বসে পড়ে কিসে যেনো আগুন ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত পেছন দিকে ফিরে আসে। পরক্ষণেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করে এবং বিশাল বিশাল ডালপালাবিশিষ্ট গাছগুলো ধড়াম ধড়াম করে মাটিতে পড়ে যেতে শুরু করে। রুশ কমান্ডারের নির্দেশে গাছগুলোকে ডিনামাইট দ্বারা উড়িয়ে দেয়ার অভিযান শুরু হয়ে যায়।

১৮৫৯ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি দু'মাস এ ধারা অব্যাহত থাকে। অবশেষে রুশীরা ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলতে সক্ষম হয়। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ইমাম শামিল তাঁর ঘাঁটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নায়েবদের সমবেত করে বললেন, আজ রাত সব সামানপত্র পেছনের পাহাড়ে সরিয়ে নিতে হবে। এ পাহাড়টি দশ বর্গমাইল জঙ্গলের মাঝখানে অবস্থিত। এটিই অত্র এলাকার সবচে' উঁচু পাহাড়।

রাতে মুজাহিদরা সামানপত্র নিয়ে পাহাড় অভিমুখে রওনা হয়। ইমাম শামিল ঈশার নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দু'আ-কালামে নিমগ্ন থাকেন। কয়েকজন খাস নায়েব পার্শ্বে নির্দেশের অপেক্ষায় দন্ডায়মান।

আধা রাত অতিবাহিত হওয়ার পর ইমাম শামিল জায়নামায থেকে উঠে দাঁড়ান এবং অস্থায়ী বাসস্থানের আঙ্গিনায় পায়চারি করতে থাকেন। তিনি বারবার আকাশপানে দৃষ্টিপাত করছেন। খানিক পর বড় একটি পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে অস্ফুট শব্দে কী যেনো বলতে শুরু করেন। ইমাম করুণাময়ের দরবারে দু'আ করছেন–

'হে আল্লাহ! আমরা দুর্বল মানুষগুলো তোমার হেকমত বুঝতে অক্ষম। আমি ত্রিশটি বছর পর্যন্ত তোমার দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। সংখ্যায় তারা অনেক। তাদের কাছে এমন এমন মারাত্মক অস্ত্র আছে, যা আমাদের কাছে নেই। তোমার বান্দারা বিভিন্ন দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তারা কেউ আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে না।

হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টি পাহাড় ও গাছ-গাছালি এতোদিন আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। কিন্তু এখন দুশমনের অস্ত্র সেগুলোকেও কব্জা করে নিয়েছে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওফীক দাও, যেনো জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাকতে পারি। তুমি অধিক সংখ্যকের উপর স্বল্পসংখ্যককে বিজয় দিতে পারো। ইতিপূর্বে দুশমনের বিপুল সৈন্যের উপর আমাদের মুষ্টিমেয়কে বিজয় দান করেছো। কিন্তু বোধ হয় আমরা তোমার দয়া লাভ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি। তবে তুমি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

হে আল্লাহ! আমি স্বীকার করি, আমাদের আমল কম। আমরা উদাসীন। আমাদের দুশমনরা তোমারই প্রদত্ত জ্ঞান খরচ করে এমন এমন অস্ত্র তৈরি করে নিয়েছে, যার মোকাবেলা করার মতো অস্ত্র আমাদের হাতে নেই।

হে আল্লাহ! মানুষের জয়-পরাজয় তোমারই হাতে। তুমি আমাদের আর পরীক্ষা নিও না। তুমি আমাদের জন্য যা স্থির করে রেখেছো, তা আমাকে বুঝতে দাও।

হে আল্লাহ! তোমার যেসব বান্দা প্রথমে তোমার নামে আমার সঙ্গ দিতো, তাদের হৃদয়ে এখন দুনিয়া ও দৌলতের মহব্বত ঢুকে পড়েছে। তাদের এই পরিবর্তনে কী কল্যাণ রয়েছে, তা তুমিই জানো।

হে আল্লাহ! আমাকে তুমি এস্তেকামাত দান করো, আমাকে সাহায্য করো, আমাকে মদদ দাও।'

ইমাম শামিল ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে নায়েবগণ অস্থির হয়ে পড়েন। খাস নায়েব নিকটে এগিয়ে যান এবং আদবের সাথে বলেন, মহামান্য ইমাম! আপনি এমনভাবে কাঁদলে আমাদেরকে সাহস দেবে কে? আপনিই তো বলতেন, আমাদের কর্তব্য, সাধ্য পরিমাণ চেষ্টা করে যাওয়া এবং ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া। আমাদের জীবন উপস্থিত। আল্লাহর সন্তুষ্টিতেই আমরা সন্তুষ্ট। আমরা শাহাদাতকে সৌভাগ্য মনে করি।

ইমাম শামিল বললেন, আমার কান্নাকাটি তো সেই মহান সত্ত্বার উদ্দেশ্যে, যাঁর সমীপে সেজদাবনত হওয়া এবং নিজের দুর্বলতা স্বীকার করা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। যা হোক, এখন আমাদের রওনা হওয়া দরকার। চলো।

রাত কেটে ভোর এলো। ইমাম শামিল পাহাড়ে পৌঁছে প্রতিরোধ পরিকল্পনায় মগ্ন হয়ে পড়েন।

❁ ❁ ❁

ইমাম শামিল তার সর্বশেষ মোর্চাকে শক্ত করে গড়ে তুলছেন। এমন সময়ে নাজরান গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছে। দলনেতা বললো, ইমামের নিশ্চয় জানা আছে, আমরা সামরিক দুর্বলতার কারণে জিহাদের পথে দৃঢ়পদ থাকতে পারিনি এবং রুশীদের আনুগত্য মেনে নিয়েছি। এখন সেই রুশীরা আমাদেরকে আমাদের বসতি থেকে উৎখাত করে তাদের সেনা ছাউনীর সন্নিকট এলাকায় স্থানান্তর করতে চায়। নাজরানের সব মানুষ পুনরায় রুশীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। আপনি যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, তাহলে আমরা রুশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তুলতে পারি।

পরদিন ইমাম শামিল কয়েকশ ঘোড়সওয়ার মুজাহিদ নিয়ে নাজরান অভিমুখে রওনা হয়ে যান। মুজাহিদ ও নাজরানের অধিবাসীরা ইমাম শামিলের নেতৃত্বে রুশীদেরকে পরপর কয়েকবার পরাজিত করেছিলো। এবার তারা বলাবলি করতে শুরু করে– 'সিংহ বুড়ো হয়ে গেলেও সিংহই থাকে।

পরিস্থিতি দেখে আরো কয়েকটি গোত্রের পক্ষ থেকে নতুন করে বায়আত গ্রহণের প্রস্তাব আসে।

কিন্তু বেরিয়া তানস্কীও বসে নেই। পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য তিনি নতুন চাল শুরু করে দিয়েছেন। তার নির্দেশে দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনী সত্তর হাজার দক্ষ সৈনিক পুরো নাজরানকে ঘিরে ফেলেছে। ইমাম শামিল যখন নাজরানে সর্বশেষ রুশ ঘাঁটিটি জয় করেন, ঠিক সে সময়ে সংবাদ পান, বিপুলসংখ্যক রুশ সৈনিক নাজরানের চারদিকে অবস্থান নিয়ে আছে। নাজরান থেকে ইমাম শামিলের নতুন পাহাড়ি ঘাঁটিতে গমনাগমনের পথে অসংখ্য সেনা সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এই অবস্থা দেখে নাজরানের বহু লোক পাহাড়ি ঋতুর ন্যায় বদলে গেছে এবং রুশবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে মাত্র কয়েকশ মানুষ ইমাম শামিলের সাথে দৃঢ়পদ রয়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে ইমাম শামিল তার মুজাহিদদের সমবেত করে বললেন–

'তোমরা হয়তো জেনে ফেলেছো, ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। নাজরান আমাদের জন্য কুফা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ মুহূর্তে আমরা নাজরানের অধিবাসীদের সঙ্গে সেই আচরণও দেখাতে পারছি না, যা আমরা কবারদাবাসীদের সঙ্গে করেছিলাম। এখন সময় আমাদের প্রতিকূল। যারা আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য ডেকে এনেছিলো, রুশীদের ভয়ে তারা ঘরে চুপটি মেরে বসে আছে। এ মুহূর্তে রুশ কমান্ডার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে, যাতে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারি। তাই পাহাড়ি ঘাঁটিতে অবস্থান নিয়েই আমরা কার্যকর প্রতিরোধ অবলম্বন করতে পারি। এখন আমাদের কাজ হলো, রুশীদের ঘেরাও ভেঙে নিজ এলাকায় পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও। রাত নাগাদ আমরা রুশীদের সন্নিকটে পৌঁছে যাবো। একান্ত প্রয়োজন না হলে আমরা রুশীদের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো।'

রাতে নাজরানের সীমান্তে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। মুজাহিদরা রুশ সিপাহীদের সারি ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এ সংঘর্ষে অল্প ক'জন মুজাহিদ ও কয়েকটি ঘোড়া আহত হয় মাত্র। কিন্তু মুজাহিদদের ঘোড়া অসংখ্য রুশ সিপাহীকে পিষে মারে।

জার আলেকজাণ্ডার সেনাপতি ইয়াগদুমিবভকে বেরিয়া তানস্কীর সাহায্যে প্রেরণ করেন। ইয়াগদুমিবভ-এর কপালে বড় একটি গর্ত, যা মূলত একটি জখম। এ কারণে তাকে তিনচোখা বলা হয়। তার সামরিক দক্ষতাও প্রমাণ করেছে যে, লোকটি আসলেই তিন চোখওয়ালা বটে। যুদ্ধের ময়দানে তার পরিকল্পনা বিস্ময়কর। নাজরানের চার পার্শ্বে রুশী অবরোধ তারই পরিকল্পনার ফসল। কিন্তু মুজাহিদরা তার অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে গেছে।

ইমাম শামিল দারগীন উপনীত হয়ে সংবাদ পেলেন, কবারদার নিরপেক্ষ খানরা রুশীদের পক্ষাবলম্বনের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। শুনে ইমাম বললেন, প্রতিটি বস্তু নিজ নিজ মূলের দিকেই ফিরে যায়। গাদ্দারদের সন্তানরা গাদ্দারী

করলে অবাক্ হওয়ার কী আছে?

কিছুদিন পর আরো সংবাদ আসে, অস্তিয়ার খানরাও রুশীদের সমর্থন ঘোষণা করেছে এবং রুশীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তাব করেছে। তার প্রতিক্রিয়ায় ইমাম শামিল বললেন, খৃষ্টানরা খৃষ্টানদের সাহায্য-সহযোগিতা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার দেশে মুসলমান নামধারীরা কাফেরের সহযোগিতা দিচ্ছে। তবে এতেও তেমন বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, অচিরেই তোমরা এমন সংবাদ শুনতে পাবে, যা হবে সত্যিই বিস্ময়কর।

দু'পক্ষের সংঘাত-সংঘর্ষ এখন মামুলি ঘটনা। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে লড়াই চলছে। রুশরা গাছ কেটে পাহাড়-জঙ্গলকে খোলা ময়দানে পরিণত করছে। পাহাড়গুলোকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিচ্ছে। তোপ গর্জন করছে। গোলাগুলি চলছে অবিরাম। তিবলিস থেকে কাফকাজের বিভিন্ন অঞ্চলগামী পথে রুশ বাহিনীর আনাগোনা চলছে হরদম। রুশ বাহিনী যেনো বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গমালা। মুজাহিদরা একস্থানে কোণঠাসা এক অসহায় জনগোষ্ঠী।

ইমাম শামিলের সমস্যা এই নয় যে, তিনি চতুর্মুখী অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের শিকার। তিনি তো দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অধিক সময় দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াইকারী এক দুঃসাহসী যোদ্ধা। আসল সমস্যা হলো, তার সমর্থক-সহযোগী খান ও আমীর-রইসদের অর্থের মোহে পেয়ে বসেছে। তাদের কোনো আদর্শিক দৃঢ়তা নেই। তারা দেশ-জাতি ও দীন-ধর্মের স্বার্থে ইমাম শামিলের হাতকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে আপন আপন পদমর্যাদা ও ধন-সম্পদ রক্ষার চিন্তায় বিভোর।

ইমাম শামিল তার জানবাজদের একটি বাহিনী গঠন করে নির্দেশ দিলেন, কতিপয় কাবায়েলী সরদার রুশ বাহিনীর সংখ্যাধিক্য ও নতুন নতুন অস্ত্র দেখে মানসিকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। তাদের এই প্রভাব হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এমনি পরিস্থিতিতে আমাদের বড় ধরনের কিছু একটা করে দেখানো প্রয়োজন। ফিল্ড মার্শাল বেরিয়া তানস্কী দানিয়েল বেগ-এর অঞ্চল আয়েসুর উপকণ্ঠে অবস্থান করছে। আমরা তার অবস্থানে হামলা চালাবো। আমার সঙ্গে মাত্র দু'শ জানবাজ অংশ নেবে। তারাও আয়েসু পৌঁছুবে একজন একজন দু'জন দু'জন করে। সেখানে পৌঁছে তারা দানিয়েল বেগের লোকদের কাছে সমবেত হবে। আমি অকস্মাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবো। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দানিয়েল বেগের আমাদের সহযোগিতা করা আবশ্যক।

দানিয়েল বেগ ইমাম শামিলের কমান্ডোদের সাহায্যের আয়োজন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ এলাকায় চলে যান। এলাকায় পৌঁছে তিনি তার এলাকার উপকণ্ঠে রুশ কমান্ডার ইন চীফ-এর অবস্থান গ্রহণের হেতু কী হতে পারে চিন্তা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তার এলাকায় রুশীরা হামলা করতে যাচ্ছে।

দানিয়েল বেগের ঈমান নড়বড়ে হয়ে যায়। লোকটি রুশীদের সন্তুষ্টি অর্জন করে হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং উপায় হিসেবে রুশ কমান্ডার ইন চীফ-এর নিকট গিয়ে ইমাম শামিলের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেয়। রুশ কমান্ডার সন্তুষ্ট হয়ে তার পূর্বের 'বিচ্যুতিসমূহ' ক্ষমা করে দিয়ে তার পদমর্যাদা বহাল রাখার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ঘোষণা দেন, তুমি যদি ইমাম শামিলকে ধরিয়ে দিতে পারো, তাহলে তোমাকে দাগেস্তানের গবর্নর বানাবো।

এ ঘোষণা শুনে দানিয়েল বেগ বললেন, আমি আগে জার রুশদের সমর্থক ছিলাম। পরে ইমাম শামিলের পক্ষাবলম্বন করি। এবার আমি ইমাম শামিলের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দিয়ে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে নিলাম। কিন্তু আমি ইমামকে ধরিয়ে দেয়ার দুঃসাহস দেখাবার দায়িত্ব নিতে পারি না। তিনি আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সংবাদ অবশ্যই পেয়ে যাবেন এবং সতর্ক হয়ে যাবেন। অজান্তে যদি এখানে এসেও পড়েন, তবু তাকে গ্রেফতার করাতে পারবেন এমন নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি না। রুশ সেনাপতি বেষ্টনীতে ফেলেও তাকে গ্রেফতার করতে পারবেন না। এই অল্প ক'দিন আগেই তো তিনি নাজরান থেকে আপনার সেনাবাহিনীর কঠোর অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গমরীর লড়াইয়ে ও তিনি একাই জীবিত বেরিয়ে গিয়েছিলেন। উখলগুর অবরোধও তিনি ভেদ করে কেটে পড়েছিলেন। আমার সহযোগিতায় তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়ও যদি, তাহলে তার কমান্ডোরা আমার বংশের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলেই তবে ক্ষান্ত হবে। তখন আপনি তো ভালো, জার আলেকজাণ্ডারও আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না।

ঃ তোমার স্পষ্ট বক্তব্য আমার বেশ ভালো লাগলো। আমি তোমাকে বাধ্য করবো না। তবে বলো দেখি, তুমি যদি আমাকে সংবাদ না দিতে, তাহলে সত্যিই কি তিনি আমার ক্যাম্পে হামলা চালাতেন?

ঃ ইমাম শামিল মুখে যা বলেন, তা করে দেখান। বরং বলেন যা, করেন তার চেয়ে বেশি। আপনি তার অনেক সহযোগী-সমর্থককে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে নিয়েছেন, সে কথা ভিন্ন। কিন্তু তিনি একজন বীর পুরুষ। এখনো তার কাছে হাজার হাজার জানবাজ মুজাহিদ রয়েছে।

ঃ ওসব আমি জানি। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাকে মর্যাদা দেই। আমার যে পরিমাণ সৈনিক তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সে পরিমাণ সৈনিক নিয়ে আমি ইউরোপের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি ভূখণ্ড কব্জা করতে পারতাম। যা হোক, তুমি যাও, আমাদের পক্ষাবলম্বনের কথা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঘোষণা করে দাও।

ঃ আমার আরেকটি আবেদন আছে।

ঃ বলো।

ঃ আমাকে কিছুদিন শামিলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য করবেন না। এছাড়া আপনি যা বলবেন, আমি তা-ই করতে প্রস্তুত আছি।

ঃ দানিয়েল বেগ! এখন যুদ্ধের ময়দানে তোমার তরবারী আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি শামিল থেকে সরে এসেছো। আমি এ যুদ্ধকে তোপ, রাইফেল ও বারুদের যুদ্ধে পরিণত করেছি। আমি জানি, আমার বর্তমান সৈন্যের দশগুণ সৈন্যও বন্দুক-তলোয়ারের যুদ্ধে শামিলকে পরাজিত করতে পারবে না।

ইমাম শামিলের পরিকল্পনা মোতাবেক প্রথমে একশ জানবাজ আয়েসু পৌছে যায়। তারা দানিয়েল বেগ-এর রুশীদের সঙ্গে যোগ দেয়ার সংবাদ পায়। আয়েসুতে তারা তাদের নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। তাই তারা ফিরে গিয়ে ইমাম শামিলকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং জানায়, রুশ কমান্ডার ইন চীফ-এর তাঁবুর চারদিকে কঠোর প্রহরা বসান হয়েছে।

ইমাম শামিল এখনো নতুন পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছেন। এমন সময়ে তলিতল-এর খান কাবীত মোহাম্মদ রুশীদের আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। ফলে দারগীনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো পর্যন্ত রুশ বাহিনী ও তাদের অনুগতদের আয়ত্ত্বে চলে আসে। ইমাম শামিল নায়েব সুরখাই খানকে ডেকে পাঠান এবং বললেন–

'সুরখাই খান! শাহাদাতের তামান্না পূর্ণ হওয়ার সময় অতি নিকটে। কিন্তু আমি আমার পৈতৃক মাটিতে শহীদ হতে চাই। তুমি এক্ষুনি দাগেস্তান চলে যাও এবং গানীবের খানকে জিজ্ঞেস করো, উঁচু অঞ্চলটি সে কতো মূল্যে বিক্রি করবে। আমি শেষ যুদ্ধটা গানীবে লড়তে চাই। আর এলাকাটা ক্রয় করা এ কারণেও প্রয়োজন, যাতে কোনো গাদ্দার ইচ্ছে করলেই রুশীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদেরকে নিজেদের এলাকায় গ্রেফতার কিংবা শহীদ করাতে না পারে।

ঃ কিন্তু মহামান্য ইমাম! দারগীনের অবস্থা কী হবে? আমরা বড় পরিশ্রম করে এখানে মোর্চা বানিয়েছিলাম!

ঃ দারগীন অবস্থান করেও লড়াই করা যায়। কিন্তু গানীবে দূরপাল্লার তোপের গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও ভালো প্রতিরোধ করা যেতে পারে। ওখানে আমরা দুশমনের অধিকতর ক্ষতিসাধন করতে পারবো।

✿ ✿ ✿

সুরখান খান গানীরের উঁচু এলাকাটা চারশ স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করে ফিরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে চার ডিভিশন রুশসেনা তলিতল পৌছে দারগীন অবরোধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইমাম শামিলের নির্দেশে সুরখাই খান, নায়েব মোহাম্মদ আমীন, গাজী মুহাম্মদ, মোহাম্মদ শফী, ইমাম শামিলের স্ত্রী ও নায়েবদের সন্তানদের নিয়ে গানীব অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

রুশ বাহিনীর দারগীন অবরোধ সম্পন্ন হওয়ার আগেই ইমামের নির্দেশে চারশ মুজাহিদও গানীব পৌঁছে মোর্চা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে রুশ বাহিনী দারগীন অবরোধ সম্পন্ন করে ফেলে।

ইমাম শামিল, পনেরজন নায়েব, পঞ্চাশজন মুরীদ ও পনেরশ সৈন্য এখন দারগীনে রুশ বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ। দারগীনের চারদিকে দূর নিয়ন্ত্রিত তোপসমূহ প্রস্তুত। তোপখানা আগুন ও লোহার বৃষ্টিবর্ষণ করছে। তোপের গোলা যেখানে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, সেখানেই একটি কূপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কঠিন থেকে কঠিনতর পাথরগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। মুজাহিদগণ কঞ্জল হাতে মোর্চায় বসে আছে। তারা অপেক্ষা করছে, গোলাবর্ষণ শেষে দুশমনের সৈন্যরা কখন দারগীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু রুশ সৈন্যদের কমান্ড এখন তানস্কীর হাতে।

তার নির্দেশ, দারগীনের প্রতিটি ইট মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও। একটি ঘর, একটি পাথরও অক্ষত থাকতে দিও না। কিন্তু লোকালয়ে ততোক্ষণ পর্যন্ত পা দিও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত লাশের গন্ধ নাকে না প্রবেশ করে।

রুশ বাহিনী সাতদিন পর্যন্ত এলোপাতাড়ি তোপের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। সেনাপতি ইয়াগদুকিমভ পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ে উঠে দূরবীন দ্বারা দারগীনের ধ্বংসলীলা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আরো পাঁচদিন পর্যন্ত সেইসব পাথর, সেইসব দেয়াল ও ঝোঁপঝাড়ের উপর গোলাবর্ষণ করান, যার আড়ালে মুজাহিদদের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা আছে।

অবশেষে ২৪ জুন ১৮৫৯ ইয়াগদুকিমভ-এর নাকে লাশের গন্ধ আসতে শুরু করে। তিনি তার বাহিনীকে চারটি ইউনিটে বিভক্ত করে চারদিক থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। রুশ সৈন্যরা সঙ্গীন উঁচিয়ে পা পা অগ্রসর হতে শুরু করে। এগুতে এগুতে যখন তারা দারগীনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছে, অমনি কয়েক ডজন মুজাহিদ অতর্কিতভাবে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাগড়ি পরিহিত, দীর্ঘকায় মুজাহিদরা ক্ষুধার্ত ও আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় রুশ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফকাজের প্রিয় অস্ত্র কঞ্জল ও দাশ্‌নার কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে শুরু করে।

মুজাহিদরা রুশ সৈন্যদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। রুশীরা গুলি চালাতে পারছে না। তারা সঙ্গীন ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু রুশীদের সঙ্গীন মুজাহিদদের কঞ্জলের মোকাবেলায় পেরে ওঠছে না। দিশা হারিয়ে ফেলে রুশ সৈন্যরা। নিহত ও আহত মিলে ১৯৮ জন সৈনিককে অকুস্থলে ফেলে তারা পেছনে ফিরে যায়।

রাগে-ক্ষোভে পাগল হয়ে গেছে সেনাপতি ইয়াগদুকিমভ। লোকটি বারবার

বলছে, ওরা আসল কোত্থেকে? কবর থেকে বেরিয়ে এলো নাকি? লোকগুলো অত্যন্ত কঠিনপ্রাণ তো!

ইয়াগদুকিমভও এখন আর গোলাবর্ষণ করতে পারছেন না। কারণ, তাহলে তার আহত পড়ে থাকা সৈনিকরাও মারা পড়বে। আহতদের তুলেও আনতে পারছেন না। রুশীদের পিছপা হওয়ামাত্র মুজাহিদরা তাদের গোপন মোর্চায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। ইয়াগদুকিমভ কী যেনো ভাবে। তারপর সৈন্যদের আবার সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। হাজার হাজার রুশ সিপাহী পুনরায় চারদিক থেকে অগ্রাভিযান শুরু করে।

দিন শেষে সন্ধ্যা নামে। ধীরে ধীরে চারদিক আঁধারে ছেয়ে যায়। দারগীনের ধ্বংসস্তূপের উপর তিনশ মুজাহিদ দুশমনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই তিনশ মুজাহিদের একজনও এমন নয়, যে জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়ার আশা রাখে। একজনও এমন নয়, যে বাঁচতে চায়। সকলের একই প্রচেষ্টা, শাহাদাতের পেয়ালা পান করার আগে অধিক থেকে অধিকতর দুশমনকে যমের হাতে তুলে দেয়া। দশজন-বারজন রুশ সৈনিক একত্রিত হয়ে এক একজন মুজাহিদকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। প্রত্যেক মুজাহিদ যেনো শিকারীর বেষ্টনীতে আবদ্ধ এক একটি সিংহ, যার লাফ-ঝাপ, খঞ্জরাঘাত ও আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া দেখার মতো বিষয়। সেনাপতি ইয়াগদুকিমভ চোখ থেকে দূরবীন সরিয়ে অধীন অফিসারদের বললেন–

'অন্ধকার হয়ে আসছে; প্রত্যাবর্তনের সংকেত দাও। অন্ধকারে বিদ্রোহীরা আমাদের সব সিপাহীকে শেষ করে ফেলবে।'

খানিক নীরব থাকার পর সেনাপতি আবার বললেন–

'যারা মরার জন্য যুদ্ধ করে, তাদেরকে মারা বড় কঠিন কাজ!'

প্রত্যাবর্তনের বিউগল বেজে ওঠে। রুশ সৈন্যরা সুশৃঙ্খলভাবে পেছনে সরে যেতে শুরু করে। কিন্তু জীবন রক্ষা করার জন্য তাদের ফিরে যাওয়া অনেকের জন্য মৃত্যুর সফরে পরিণত হয়। পশ্চাৎমুখী দুশমনদের উপর মুজাহিদরা এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহ তার শিকারের উপর। রুশ সৈন্যরা তাদের আহতদের পথেই ফেলে পালিয়ে যায়।

পরদিন ভোরবেলা। রুশ সৈনিকরা আক্রমণ করার নির্দেশ পায়। সেনাপতি ইয়াগদুকিমভ জানে, মুজাহিদরা প্রত্যুষে নামায ও দু'আ-দরূদে মগ্ন থাকে। ছয় হাজার রুশ সৈন্য চারদিক থেকে সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করে। তারা দারগীনের মধ্যস্থলে অবস্থিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষের নিকট পৌঁছে যায়। এ পর্যন্ত পথে তাদের কারো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিছুক্ষণ পর সেনাপতি ইয়াগদুকিমভও যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যান লেফটেন্যান্টসহ। কিন্তু তাদের সব

অফিসারের মুখে একই প্রশ্ন, যাদেরকে আমরা অবরোধ করলাম, তারা গেল কোথায়? কীভাবে বেরিয়ে গেলো? দারগীনের ধ্বংসস্তূপের উপরে দু'শ এগারজন মুজাহিদ এবং সাতশ ন'জন রুশ সেনার মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে শুধু।

রুশ বাহিনী মুজাহিদদের লাশ শনাক্তকরণের কাজ শুরু করে দেয়। এ কাজে স্থানীয় অধিবাসীদের থেকেও সাহায্য নেয়া হয়। কিন্তু শনাক্তকারীদের একই কথা– এর মধ্যে শামিলের লাশ নেই। সুরখাই খানেরও নেই। গাজী মোহাম্মদ, মোহাম্মদ শফী, মোহাম্মদ আমীন কারুরই লাশ নেই।

সেনাপতি ইয়াগদুকিমভ ধ্বংসাবশেষ ঘুরে লাশ অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেন। হাজার হাজার রুশ সিপাহী সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কাজে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু না, ধ্বংসস্তূপের ভেতরে কোন লাশ পাওয়া গেলো না। সন্ধ্যার খানিক পর রুশীদের গুপ্তচর এসে সংবাদ জানায়, ইমাম শামিল তার কয়েকশ মুজাহিদসহ গানীব অবস্থান করছেন। তিনি রাতে দু'শরও বেশি মুরীদ নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে গানীব চলে গেছেন। রুশ সেনাপতি অবাক্ হয়ে যান যে, শামিল ও তার লোকেরা রাতে কোন্ পথে এখান থেকে বেরিয়ে গেলো!

উনত্রিশ.

ইমাম শামিলের বাহিনীতে এখন মুজাহিদ আছে সর্বমোট আট শ। চারশ গানীবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত। অবশিষ্ট চারশ মুজাহিদের প্রতি নির্দেশ, তারা যেনো একশ জনের এক একটি ইউনিট তৈরি করে গানীব থেকে কয়েক মাইল দূরে সুবিধাজনক স্থানে লুকিয়ে থাকে। রুশ সৈন্যরা যখন গানীব অবরোধ করবে, তারা তখন তাদের উপর আক্রমণ করবে।

সমুদ্রতল থেকে পাঁচ হাজার ফুট উপরে, আশপাশের উপত্যকাসমূহ থেকে এক হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত একটি পাহাড় গানীব। পাহাড়টি দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল, প্রস্তে তিন মাইল। পনের বর্গমাইলের এই ভূখণ্ডটি এখন আল্লাহর সৈনিকদের সর্বশেষ আশ্রয়, সর্বশেষ মোর্চা। প্রতিরক্ষার দিক থেকে গানীব একটি উত্তম জায়গা। অল্প ক'টি তোপ থাকলেও এখানে বসে বিশাল বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব হতো। দাগেস্তানের মুজাহিদ নেতার আশা, তিনি গানীবে তোপ ছাড়াও বেশ কিছুদিন প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ে যেতে পারবেন।

আশপাশের এলাকা থেকে গানীবের অবস্থানটা দেখতে মনে হয় একটি পেয়ালার মতো। এর প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজন কয়েক হাজার সৈন্যের। অথচ ইমাম শামিলের নিকট আছে মাত্র আটশ জানবাজ। তারা আবার ব্যস্ত মোর্চা তৈরির কাজে।

১৩ আগস্ট ১৮৫৯ সালের রাতটা অস্বাভাবিক অন্ধকার। কালো মেঘে ছেয়ে

আছে আকাশ। গানীব-এর চতুর্দিকটা ঘিরে রেখেছে রুশ সৈনিকেরা। জংলী প্রাণীদের ভয় প্রদর্শন এবং মুজাহিদদের আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে রুশ বাহিনী।

মধ্যরাতে ইমাম শামিলের দুই গুপ্তচর লুকিয়ে লুকিয়ে রুশ সৈন্যদের অবস্থানের রিপোর্ট নিয়ে গানীব এসে পৌঁছে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

ইমাম কক্ষসম একটি গুহায় ইবাদতে মগ্ন। গুহায় প্রদীপ জ্বলছে। ইমাম সালাম ফিরিয়ে গুপ্তচরদের প্রতি এক পলক দৃষ্টিপাত করেন। তারপর হাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন। চোখ তাঁর অশ্রুসজল। দু'আর পর তিনি গুপ্তচরদের উদ্দেশে বললেন– 'আমি জানি, তোমরা ভালো খবর নিয়ে আসোনি। ঈমান বিক্রেতারা আমাদের সৈনিকদের ধরিয়ে দিয়েছে, তাই না?

এক গুপ্তচর বললো, মহামান্য ইমাম! কাবীত-এর লোকেরা আমাদের সব গোপন পরিকল্পনা রুশীদের নিকট ফাঁস করে দিয়েছে। রুশীরা তাদেরকে ঘিরে ফেলে সবাইকে শহীদ করে ফেলেছে। একজনও জীবিত গ্রেফতার হয়নি।

ইমাম শামিল বললেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তোমরা আরাম করো। আল্লাহ জান্নাতে তাদেরকে উন্নত মর্যাদা দান করুন।

কয়েকজন নায়েব ইমাম শামিলকে পরামর্শ দেন, নারী ও শিশুদেরকে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া দরকার। কারণ, গানীব এখন শত্রুদের দ্বারা অবরুদ্ধ। ইমাম শামিল বললেন, তোমাদের এই পরামর্শে এখলাস আছে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদের নিজের আপনজনদের জীবন আল্লাহর রাহে কুরবান করার এখনই উপযুক্ত সময়। সময় আমাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমার আকাঙ্ক্ষা শাহাদাত। দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি লড়াই চালিয়ে যাবো। আমার স্ত্রী-কন্যারা আমারই সঙ্গে শহীদ হবে। অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিলেও তারা এক সময় শত্রুর হাতে গিয়ে পড়বেই। আমার এই ভূখণ্ডেরই মানুষ অর্থের লোভে তাদের অপমান করবে। সময় যখন কারো থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তখন আপনরাও পর হয়ে যায়। রাসূল (সা.)-এর দৌহিত্রের কাহিনী কি তোমাদের মনে নেই?

❁ ❁ ❁

জার আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয়-এর কক্ষে তার উপদেষ্টাগণ উপবিষ্ট। জার তাদের উদ্দেশে বলছেন, শামিল আমাদের সৈন্যদের ঘেরাওয়ে এসে গেছে। বেরিয়া তানস্কী লিখেছে, গানীব তার সর্বশেষ মোর্চা। আমাদের বীর সৈনিকরা অচিরেই তার সেই মোর্চা পদানত করে ফেলবে। বেরিয়া তানস্কী নিশ্চিত, শামিল পালাবার চেষ্টা করবে না। তোমাদের মতে তার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা উচিত?

উপদেষ্টাগণ সমস্বরে বললো, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। জীবিত গ্রেফতার করতে পারলে তো কঠোর সাজা দিতে হবে। আর যদি সংঘর্ষে মারা যায়, তাহলে খুবই ভালো হবে।

জার বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কক্ষে পায়চারি করতে শুরু করলেন। উপদেষ্টাগণ বুঝে ফেললো, শাহেনশাহ'র তাদের পরামর্শ মনোঃপুত হয়নি। মুহূর্ত কয়েক পর জার বললেন, তোমরা সালতানাতের হিতাকাঙ্ক্ষী। শামিলের ব্যাপারে তোমরা যে পরামর্শ দিয়েছো, তা যথার্থ। কিন্তু আমার অভিমত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। শামিলকে যে কোনো প্রকারে হোক জীবিত রাখতে হবে। কোহেস্তানীরা আমাদের সৈন্যদের চাপে পড়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু অন্তর তাদের শামিলেরই সঙ্গে। শামিল বাহাদুর, সম্ভ্রান্ত। দু'দিন আগ আর পর কাফকাজে আরেক শামিল জন্ম নেবে, তাতে সন্দেহ নেই। তখন তার বিরুদ্ধেও আমাদের আবার ত্রিশ বছর লড়াই করতে হবে। আর শামিলের মতো লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে লাখ লাখ মানুষের প্রাণ বিসর্জন দেয়া। আমরা যদি শামিলকে হত্যা করে ফেলি, তাহলে পাহাড়ের পাথরগুলো পর্যন্ত চিরদিনের জন্য আমাদের দুশমন হয়ে যাবে। আর যদি তাকে জীবিত গ্রেফতার করে শাস্তি দেই, তাহলে কোহেস্তানীরা যখনই সুযোগ পাবে, প্রতিশোধ নেবে। এই জংলীদের বশ করার একমাত্র পন্থা, আমরা শামিলকে বাঁচিয়ে রেখে কোহেস্তানীদেরকে বুঝাবো, শামিল স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে এবং আমরা তাকে সসম্মানে রেখেছি।

এক উপদেষ্টা বললো, কিন্তু জাহাপনা! শামিল আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের উপর মৃত্যুবরণকে প্রাধান্য দেবে।

জার আলেকজাণ্ডার বললেন, ঠিক বলেছো। সে এমনই করবে। কারণ সে বীর। বীরের বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা তাকে বাঁচিয়ে রেখে তার লোকদের সামনে তাকে সম্মান দেখাবো। পরে দেখবো, তার সঙ্গে কী আচরণ করা যায়।

জার আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয়-এর নির্দেশে কমাণ্ডার ইন চীফ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। তাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়– 'শামিলকে যে কোনো অবস্থায় যে কোনো মূল্যে জীবিত রাখতে হবে।'

❁ ❁ ❁

২৪ আগস্ট ১৮৫৯-এর সূর্য ডুবে গেছে। গানীব-এর পর্বতসমূহ আযানের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠেছে। আকাশে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত লালিমা ছেয়ে আছে। ইমাম শামিলের নায়েবগণ পরস্পর বলাবলি করছেন, এর আগে কখনো আকাশ এতো লাল হতে দেখিনি। আজ আকাশ রক্তের ন্যায় লাল দেখাচ্ছে। ইমাম শামিল

মুসল্লায় এসে দাঁড়ান। চারশ মুজাহিদ তার পেছনে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে যান। সবাই মাগরিবের নামায আদায় করেন। নামাযের পর ইমাম শামিল নায়েবদের নিয়ে গানীবের চূড়ায় উঠে দুশমনের সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন।

গানীবের চার পার্শ্বে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত রুশ বাহিনীর তাঁবু চোখে পড়ে। চারদিকে বড় বড় তোপ তাক করে স্থাপন করা। ইমাম শামিল এক স্থানে গিয়ে থেমে যান। ঠোঁটে তার বীরত্বমাখা মুচকি হাসি। নায়েবগণ ইমামের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ইমাম বললেন–

'আমাদের ন্যায় আমাদের ইতিহাসও যদি শহীদ হয়ে যায়, তাহলে তা ভিন্ন কথা। অন্যথায় দুনিয়া আমাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করবে। এ মুহূর্তে আমাদের এক একজনের সামনে কয়েকশ করে দুশমন। তারা অগণিত। অতীতে আমাদের এক একজন মুজাহিদ বিশ বিশজন শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করেছে। কিন্তু আজ তো একজনের মোকাবেলায় শত্রু সংখ্যা শয়ে, এমনকি হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমরা দুশমনের ব্যবস্থাপনাটা একটু দেখো; ওরা এখনো আমাদের ভয়ে ভীত।

এমন সময়ে একদিক থেকে হঠাৎ এক মুজাহিদ হামাগুড়ি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে ইমামের নিকট এসে বলে, মহামান্য ইমাম! কাল– আগামীকাল দুশমন হামলা করবে। কাল তাদের জার-এর জন্মবার্ষিকী। বেরিয়া তানস্কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জার-এর জন্মদিনে তিনি বিজয় উৎসব করবেন।

মুজাহিদগণ ২৫ আগস্টের ফজর নামায আদায় করেন। ইমাম শামিল দু'আর পর মুজাহিদদেরকে জরুরি নির্দেশনা প্রদান করেন। মুজাহিদগণ তাদের অস্ত্র হাতে নিজ নিজ পজিশন নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। নায়েব আলী কাজী একশ মুজাহিদ নিয়ে সেই পথটির নিরাপত্তার দায়িত্ব হাতে নেন, যা পাহাড়ের চূড়া থেকে দু'শ ফুট নীচে নেমে গেছে। রুশীরা সম্মুখে অগ্রসর হয়। মুজাহিদগণ নায়েবের নির্দেশের অপেক্ষায়। কিন্তু নায়েব কোনো নির্দেশ দিচ্ছেন না। যখন রুশীরা একেবারে নিকটে চলে আসে, তখন এক মুজাহিদ বললো, ভাইসব! আলী কাজী গাদ্দারী করেছে। এতোক্ষণে আমরা আমাদের দ্বিগুণ দুশমন খতম করতে পারতাম। আলী কাজী নীচের দিকে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুজাহিদদের খঞ্জর তার বুকে বিদ্ধ হয়ে যায়। একজন ইমাম শামিলকে সংবাদ দেয়ার জন্য ছুটে যায়। অন্যরা দুশমনের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। আধা ঘন্টার লড়াইয়ে বেশ ক'জন রুশ সিপাহী হতাহত হয়। মুজাহিদরাও এক এক করে সব ক'জন শহীদ হয়ে যান।

এবার রুশ বাহিনীর তোপসমূহের মুখ খুলে যায়। গানীবের চূড়ায় পায়ে পায়ে গুলি নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। গুলির আড়ালে রুশ সৈন্যরা সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। মুজাহিদদের গুলি নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু রুশ সৈন্যরা নিঃশেষ হচ্ছে না। একজন লুটিয়ে পড়ে তো চারজন সামনে এগিয়ে আসে। এবার মুজাহিদরা নিজ

নিজ মোর্চায় বসে দুশমনের নিকটে আসার অপেক্ষা করছে। রুশ সিপাহী সন্নিকটে আসামাত্র এক একজন মুজাহিদ মোর্চা থেকে লাফিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং লড়তে লড়তে শহীদ হচ্ছে। বেলা এগারটার সময় বেরিয়ে তানস্কী গোলাবর্ষণ ও ফায়ারিং বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং ইমাম শামিলের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। দূত ইমাম শামিলের নিকট বেরিয়া তানস্কীর পয়গাম পৌছায়–

'কমান্ডার ইন চীফ বলেছেন, আপনি অস্ত্র ফেলে আমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করুন। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, এখন এই পাহাড় চূড়ায় একটি পিপিলিকারও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে না গুলির অভাব আছে, না লোকের কমতি আছে।'

ইমাম শামিল জবাব দেন–

তুমি তোমার কমান্ডারকে গিয়ে বলো, তার আশা পূর্ণ হবে না। আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো।

দূত ফিরে যায়। অমনি পুনরায় গোলাবর্ষণ শুরু হয়। ভয়াবহ বিস্ফোরণে পাহাড় কেঁপে ওঠে। উড়ন্ত ধুলা-বালিতে আকাশ মেঘের ন্যায় ছেয়ে গেছে।

সন্ধ্যায় রুশ কমান্ডারের দূত পুনরায় সাদা পতাকা উঁচিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। রুশীদের তোপ থেমে যায়। দূতকে যথারীতি ইমামের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ইমাম শামিল আসর নামায আদায় করে বসে আছেন। গাজী মোহাম্মদ, মোহাম্মদ শফী, পাঁচজন নায়েব ও কয়েকজন খাদেম ইমামের সামনে উপবিষ্ট। ইমাম গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দূতকে জিজ্ঞেস করলেন– এবার কী পয়গাম নিয়ে এসেছো?

ঃ কমান্ডার ইন চীফ বেরিয়া তানস্কী বলেছেন, আপনি অস্ত্র সমর্পণ করুন, এখন আর সংঘাত অনর্থক।

ঃ আমার সেই একই জবাব। তোমার কমান্ডারকে গিয়ে বল, তার যা ইচ্ছে হয় করুক। আমি বিজয়কে কখনো আমার লক্ষ্য স্থির করিনি। লক্ষ্য আমার শাহাদাত।

ঃ কমান্ডার ইন চীফ বলেছেন, গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফী যদি অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তাদের স্ত্রী-সন্তান-খাদেম এবং আপনার স্ত্রীকে সসম্মানে রাখা হবে।

ইমাম শামিল গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফীর প্রতি তাকিয়ে বললেন– এ মুহূর্তে আমি না ইমাম, না সালার। নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। জীবন বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পারো।

গাজী মোহাম্মদ বললো, আমি আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) পর মহামান্য আব্বাজানের সন্তুষ্টিকে আমার জীবন অপেক্ষা হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ মনে করি। তুমি (দূতের প্রতি তাকিয়ে) তোমার কমান্ডারকে গিয়ে বলো, তিনি যেনো নিজেকে

সাহসী দুশমন প্রমাণিত করেন। তার মাথায় এ চিন্তাটা ঢুকলো কী করে যে, শেরে দাগেস্তানের পুত্ররা নিজেদের জীবনকে পিতার জীবন অপেক্ষা প্রিয় মনে করবে? ভবিষ্যতে (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) এ ধরনের প্রশ্নের জবাব আমার কঞ্জলই প্রদান করবে।

দূত ইমাম শামিলের প্রতি তাকায়। ইমামের মুখমণ্ডল আনন্দে ঝলমল করছে। তিনি দূতকে বললেন– যাও।

দূত ফিরে যায়। ইমাম শামিল পুত্র গাজী মোহাম্মদকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, বেটা! আমার মাথা গর্বে উঁচু হয়ে গেছে। মৃত্যুকে সামনে দেখে মানুষ আত্মীয়তা ভুলে যায়। তুমি যদি দূতের সামনে মানবিক দুর্বলতা প্রকাশ করতে, তাহলে আমি সীমাহীন কষ্ট পেতাম।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ইমাম জিজ্ঞেস করলেন, বর্তমানে রুশ সৈন্যদের সদস্য কতো?

গাজী মোহাম্মদ বললো, দু' লাখের কম হবে না আব্বাজান।

ইমাম শামিল বললেন, দু' লাখ! আর আমরা মাত্র একশ। তাতেও উনিশজন মহিলা ও শিশু। একত্রিশ জন নিরস্ত্র খাদেম। সত্যিই এখন পঞ্চাশজন মুজাহিদের মোকাবেলায় দু' লাখেরও বেশি সৈন্য আর কয়েকশ তোপ। এখন যে কোনো মুহূর্তে আমরা শহীদ হয়ে যেতে পারি। যে কোন মুহূর্তে আমাদের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাবা! এমনি কঠিন মুহূর্তেই মানুষের ঈমানী শক্তি ও নীতি-নৈতিকতার পরীক্ষা হয়ে থাকে। আমি অস্ত্র ফেলে জীবন রক্ষা করতে পারি। কিন্তু তারপরও আমাদের বাঁচতে হবে শাসিত ও গোলাম হয়ে। শোনো বৎস! মানুষের জীবনের কিছু কিছু মুহূর্ত মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক কঠিন হয়ে থাকে। আমরা যদি আমাদের আযাদী, ইজ্জত ও মাতৃভূমির হেফাজতের জন্য শহীদ হয়ে যাই, তাহলে মরেও আমরা জীবিত থাকবো। আমি একবার তোমাদেরকে হিন্দুস্তানের এক বীর যোদ্ধা শহীদ টিপুর কাহিনী শুনিয়েছিলাম। তার মতো সিংহের ন্যায় জীবন দেয়া উচিত। তথাপি যদি তোমরা নিজেদের জীবন রক্ষা করতে চাও, তাহলে আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। তোমরা বালেগ। নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ অধিকার আছে তোমাদের। তবে আমার নিজের ব্যাপারে আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবো।

গাজী মোহাম্মদ বললো, আব্বাজান! জার যদি আমাকে তার সিংহাসন দিয়ে দেয়ার প্রস্তাবও করে, তবু আমি আপনাকে এ অবস্থায় রেখে যাবো না। এখানে থেকে আমি আপনার আগে শহীদ হতে চাই। এবার আপনি আপনার ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন, তার ইচ্ছা কী?

মোহাম্মদ শফী বললো, আমি ভাইজানেরও আগে শহীদ হবো।

এবার ইমাম শামিল নায়েবদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন–

'আমার সঙ্গীগণ! মুজাহিদগণ! আল্লাহর সৈনিকগণ! তোমরা সত্যের পথে আমার সঙ্গ দিয়েছো। কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ তোমরা সহ্য করেছো। এখন নিজেদের ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নাও। ইচ্ছে হলে অস্ত্র সমর্পণ করে তোমরা জীবন রক্ষা করতে পারো।

প্রত্যেক নায়েব ও প্রতিটি খাদেমের স্পষ্ট জবাব– অস্ত্র সমর্পণ করে জীবন রক্ষা করা নয় মাননীয় ইমাম! সত্যের পথে এক জীবন নয়, থাকলে হাজার জীবনও কুরবান করতে আমরা প্রস্তুত আছি।

ইমাম শামিল পুত্র, নায়েব ও খাদেমদের সঙ্গে এসব কথাবার্তা বলছেন। এমন সময় কর্নেল লাজরাফ সাদা পতাকা উঁচিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। ইমাম শামিল লাজরাফকে পূর্ব থেকেই জানেন। লাজরাফ আর্মেনিয়ার বাসিন্দা এবং জার-এর শাহী ফৌজের কর্নেল। ইমামের সামনে উপস্থিত হয়ে লাজরাফ মাথা ঝুঁকিয়ে ইমামকে সালাম করেন এবং বললেন–

আমরা শাহেনশাহ'র নির্দেশ পেয়েছি, ইমাম শামিল যদি যুদ্ধ বন্ধ করে আমাদের বন্ধুত্ব বরণ করে নিতে সম্মত হয়, তাহলে তাকে আজীবন সম্মানের সাথে রাখা হবে এবং তাদের বংশের সকলকে নিরাপত্তা দেয়া হবে।

ঃ তুমি তো জানো, এ এক প্রতারণা। আর আমি কেমন মানুষ জানা থাকা সত্ত্বেও তুমি আমার নিকট এই কষ্টদায়ক প্রস্তাব নিয়ে এসেছো বলে আমার দুঃখ হয়।

ঃ ইমাম যদি গোস্তাখী মনে না করেন, তাহলে আমি নিবেদন করব, জনাবের সন্দেহ সঠিক নয়। রুশ কমান্ডার আমাকে এজন্য প্রেরণ করেছেন যে, আপনি আমাকে পূর্ব থেকেই চেনেন। যুদ্ধের ময়দানে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি ঠিক; কিন্তু আমি ভীরু বা মিথ্যুক নই। জারের নির্দেশ না থাকলে কমান্ডার আমাকে আপনার নিকট পাঠাতেন না। কারণ, তিনিও জানেন, আমার মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই। এ নির্দেশ যদি জার নেকুলাই'র পক্ষ থেকে আসতো, তাহলে আমিও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতাম না। কিন্তু এ নির্দেশ এসেছে নতুন জার-এর পক্ষ থেকে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি, তিনি আপনার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী। তিনি যদি তার পিতা জার নেকুলাই'র অসিয়ত পালনে বাধ্য না হতেন, তাহলে বহু আগেই তিনি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফেলতেন।

ঃ কিন্তু এই বন্ধুত্ব সম্মানজনক হবে না। সকলেই জানে, এখন জারের পাল্লা ভারী। বিজয় তার হাতে। আর আমি সকলকে জানাতে চাই, আমি আল্লাহর সৈনিক, বেঁচে থাকা অপেক্ষা শাহাদাত আমার অধিক প্রিয়। আমি হাজার হাজার শহীদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারবো না।

ঃ ইমাম শামিল! মহান ইমাম! আপনি কি খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে

পারবেন? খোদার সন্তুষ্টি যদি অন্য কিছুতে হতো, তাহলে পরিস্থিতি আজ এমনটি হত না।

ঃ হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো। আমি ত্রিশটি বছর জিহাদ করেছি। একাধিক যুদ্ধে আমি জয়ীও হয়েছিলাম। আবার পরাজয়ও বরণ করেছি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি আমার প্রতিকূল। কিন্তু লাজরাফ! আমার দায়িত্ব ছিলো চেষ্টা করে যাওয়া। এখনো আমার কাজ চেষ্টা করা। আমি জীবন থাকতে অস্ত্র ত্যাগ করবো না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার শেষ সময় এসে পড়েছে। আমি জানি, লড়াই করা এখন অর্থহীন। কিন্তু আমি আমার দেহের রক্তের শেষ ফোঁটাটি ঝরা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো। তুমি রুশ কমান্ডারকে বল গিয়ে, সে হামলা করুক।

খানিক দূরে রুশ কমান্ডার বেরিয়া তানস্কী চেলগুজা বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট। তার ডানে-বাঁয়ে অধীন অফিসারগণ দণ্ডায়মান। কাফকাজের বিশ্বাসঘাতক খানরাও উপস্থিত। তারা বারবার রুশ কমান্ডারকে বলছে, লোকটি আপনার প্রস্তাব কখনো মানবে না। শেষ পর্যন্ত আপনাকে ফায়ার করার নির্দেশ দিতেই হবে।

লাজরাফ ইমাম শামিলের নিকট থেকে ফিরে এসে বেরিয়া তানস্কীর নিকটে এসে বললেন– সেনাপতি! উনি অস্ত্র ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন।

বেরিয়া তানস্কী মূর্তির মতো নীরব। গাদ্দার খানরা হামলা করার জন্য পীড়াপীড়ি করছে।

বেরিয়া তানস্কী তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন–

হামলা! হামলা! কার উপর হামলা? বেরিয়া তানস্কী রুশ বাহিনীর উন্নততর ডিভিশনগুলো নিয়ে হামলা করবে এমন মুষ্টিমেয় লোকের উপর, যাদের কাছে তরবারী ও খঞ্জর ছাড়া আর কিছুই নেই! তোমরা বুঝতে পারছো না, সেই সব লোকদের হত্যা করা কতো কঠিন কাজ, যারা ময়দানে আসেই মৃত্যুবরণ করতে!

বেরিয়া তানস্কী এখনো কথাগুলো বলে শেষ করতে পারেননি, এমন সময়ে এক অশ্বারোহী রুশ দূত এসে হাজির হয় এবং খানিক দূরে ঘোড়া থেকে অবতরণ করে সামরিক কায়দায় এগিয়ে রুশ কমান্ডারের সামনে এসে সালাম করে দাঁড়িয়ে যায় এবং একটি খাম এগিয়ে দেয়।

এক অধীন অফিসার খামটি হাতে নিয়ে দেখে। তাতে লেখা আছে– সেনাপতি বেরিয়া তানস্কীর প্রতি তিবলিস থেকে এই পত্রখানা প্রেরণ করা হলো। এতে জার আলেকজাণ্ডার-এর বিশেষ পয়গাম রয়েছে।

বেরিয়া তানস্কী পত্রখানা হাতে নিয়ে চোখে লাগান, চুম্বন করেন। খাম ছিঁড়ে ভেতর থেকে চিরকুট বের করে পাঠ করেন–

...আমি সালতানাতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। শামিলের বন্ধুত্ব হত্যা থেকে উত্তম। আর তার গ্রেফতারী থেকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাসিল হবে না। শামিল যদি নিহত কিংবা বন্দি হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তারই মতো

অন্য লোক তৈরি হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি সে অস্ত্র ত্যাগ করে আমাদের বন্ধুত্ব বরণ করে নেয়, তাহলে তার গোত্রের মানুষ চিরদিনের জন্য বিদ্রোহের পথ বর্জন করবে এবং আমাদেরকে আপন ভাববে। যদি সে অস্ত্র ত্যাগ করতে সম্মত না হয়, তাহলে তাকে আপন বানিয়ে নেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও এবং দাগেস্তানে অবস্থান করা ব্যতীত তার যে কোনো প্রস্তাব মেনে নাও।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রখানা পাঠ করে বেরিয়া তানস্কী পুনরায় পাথরের উপর বসে পড়েন। অধীন অফিসার ও খানদের দৃষ্টি তার মুখের প্রতি নিবদ্ধ। তিনি লাজরাফের প্রতি তাকিয়ে বললেন–

তুমি আবার গিয়ে শামিলকে বলো, রুশ কমান্ডার স্বয়ং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আমি আমার নিরাপত্তা বাহিনী ছাড়াই গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবো। শুধু তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

লাজরাফ ফিরে গিয়ে ইমাম শামিলকে রুশ কমান্ডারের আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেন। ইমাম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন– তিনি আক্রমণ করতে ইতস্তত করছেন কেনো? ...আচ্ছা, তাকে আসতে বলুন।

কিছুক্ষণ পর বেরিয়া তানস্কী ও লাজরাফ ইমামের সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। ইমাম শামিল বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্মান জানান। রুশ কমান্ডার বললেন–

আমি শেরে দাগেস্তানকে সালাম করছি এবং শাহেনশাহ'র নির্দেশনা মোতাবেক নিবেদন করছি যে, আপনি শাহেনশাহ'র বন্ধুত্বের প্রস্তাব কবুল করুন।

ঃ আপনারা আক্রমণ চালাতে বিলম্ব করছেন কেনো? আমার জবাব আগে যা ছিলো, এখনও তা-ই। ভবিষ্যতেও তা-ই হবে। আমি শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি অস্ত্র ত্যাগ করবো না।

ঃ শাহেনশাহ না আপনাকে বন্দি করতে চান, না যুদ্ধ লড়ে আপনাকে হত্যা করতে চান।

ঃ শাহেনশাহ'র পক্ষ থেকে এই দুশমনকে এতো সুযোগ দেয়ার হেতু কী?

ঃ উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। শাহেনশাহ এই ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের অবসান পরাজিতদেরকে হত্যা করে এবং তাদের মহান নেতৃবর্গকে বন্দি করার মাধ্যমে করতে চাইছেন না। যুদ্ধে আপনি হেরে গেছেন। কিন্তু শাহেনশাহ'র নায়েব হয়ে আপনি কাফকাজ শাসন করতে পারেন।

ঃ সিংহ স্বাধীন থেকেই রাজত্ব করে– কারো অধীন হয়ে নয়।

ঃ আপনি শাহী মেহমান হয়ে রাশিয়ার যে কোনো অঞ্চলে ইচ্ছা বাস করতে পারেন। আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবার-পরিজন ও খাদেমদেরকে অত্যন্ত ইজ্জতের সাথে রাখবো।

ঃ আমি সোনার পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না।

ঃ তাহলে আপনি কী চান?

ঃ আমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করবো।

ঃ এখন আর আমি হামলা করবো না। আপনার কাছে না খাবার আছে, না পানি। আপনি যখন ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়বেন, তখন আমরা আপনাকে শানদার গাড়িতে বসিয়ে সম্মানের সাথে জারের নিকট নিয়ে যাব। তবে আপনার অন্য কোনো প্রস্তাব থাকলে বলতে পারেন।

ঃ আমি যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিয়ে পবিত্র মক্কা চলে যেতে চাই। শর্ত হলো, তোমার শাহেনশাহ্ আমাকে এই ওয়াদা দিতে হবে যে, পথে আমাকে বাঁধা দেয়া হবে না।

ঃ আপনাকে শাহেনশাহ'র একটি আবেদন কবুল করতে হবে।

ঃ কী আবেদন?

ঃ শাহেনশাহ'র আকাঙ্ক্ষা ও দরখাস্ত হলো, আপনি কিছুদিনের জন্য রাশিয়ায় তার মেহমান হবেন। তারপর যদি আপনি রাশিয়ায় থাকতে না চান, তাহলে দাগেস্তান ছাড়া অন্য যে কোনো দেশে চলে যেতে পারবেন।

ঃ শাহেনশাহ এই ওয়াদায় অটল থাকবেন, তার গ্যারান্টি কী?

ঃ আমার পক্ষ থেকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।

ঃ না, তোমার শাহেনশাহ নিজের পক্ষ থেকে আমার এই শর্ত মঞ্জুরীর ঘোষণা দেবেন। তবেই আমি আমার শেষ ঘাঁটি খালি করে এখান থেকে রওনা হয়ে যাবো। জারের এই বিশ্বাস থাকা উচিত, আমি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করি না। যখন আমি এই দেশেই থাকবো না, তখন আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোন শংকার কারণ নেই।

ঃ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শাহেনশাহ-ই নিতে পারেন। আমি যদি সর্বাধিক দ্রুতগামী দূতও প্রেরণ করি, তবু শাহেনশাহ'র নির্দেশ এসে পৌছুতে পনেরদিন সময় লেগে যাবে। আপনি কি চান, এই পনেরদিন রণাঙ্গন যেমনটা তেমনই থাকুক?

ঃ আমি আমার শেষ কথা বলে দিয়েছি। এবার আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। মনে চাইলে হামলা করুন; আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাবো।

ঃ শাহেনশাহ'র নির্দেশ আসা পর্যন্ত আমি এখানকার অবস্থা অপরিবর্তিত রাখতে প্রস্তুত আছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার খানাপিনার ব্যবস্থা করছি। আমাদের কাছ থেকে নিতে না চাইলে আপনি দু'জন লোক পাঠিয়ে যেখান থেকে খুশি সংগ্রহ করতে পারেন। তবে তাদের আসা-যাওয়ার পথে তল্লাশি নেয়া হবে।

ঃ আপনার প্রস্তাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার কাছে প্রয়োজনীয়

সবকিছুই মওজুদ আছে।

ঃ পনের-ষোলদিন পর আপনার সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হবে। এবার অনুমতি দিন, উঠি।

একথা বলেই বেরিয়া তানস্কী যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। ইমাম শামিলও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যান। বেরিয়া তানস্কী লাজরাফকে নিয়ে ক্যাম্পের দিকে রওনা হন। ইমাম শামিল তাঁর মোর্চায় চলে যান।

ত্রিশ.

জার নেকুলাই বেঁচে থাকলে ইমাম শামিলকে এমন শাস্তি দিতেন, যা হতো তার দৃষ্টিতে হত্যা অপেক্ষা ভয়ানক ও শিক্ষামূলক। কিন্তু তার পুত্র জার আলেকজান্ডার দ্বিতীয় পিতা অপেক্ষা অধিক সর্তক ও বিচক্ষণ। তার নীতি হলো, সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। তিনি ইমাম শামিলের সর্বশেষ পরিস্থিতির সংবাদ শুনে সীমাহীন আনন্দ প্রকাশ করেন। জার তার দুশমনকে কী শাস্তি দেন দেখার জন্য দরবারের লোকজন অধীর অপেক্ষমান। জারের হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাপ স্পষ্ট। দরবারীদের উদ্দেশ করে তিনি বললেন–

'আমি শামিলকে এমন শাস্তি দেবো, যা তোমাদের কল্পনার বাইরে। তাকে শাহী মেহমান বানিয়ে সম্মানের সাথে এখানে নিয়ে আসা হবে। তার পরিবারের সদস্যরাও তার সঙ্গে থাকবে। তাকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। আমার উদ্দেশ্য শামিল ও তার পরিবারের কেউ যেনো পালিয়ে যাওয়ার কিংবা পুনরায় বিদ্রোহ করার চিন্তা মাথায় না আনে, যাতে দাগেস্তানে আরেকজন শামিল জন্ম নিতে না পারে। আমি ওদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আমরা যদি শামিলের মনে এই অনুভূতি জাগাতে পারি যে, আমরা তাকে সম্মান করছি, তাকে বিশ্বাস করছি, তাহলে সে কখনো এমন পদক্ষেপ নেবে না, যা একজন বীর যোদ্ধার মর্যাদার অনুকূল নয়। আর দাগেস্তানের জনগণ যখন জানতে পারবে, তাদের ইমামকে সম্মানের সাথে রাখা হয়েছে, তাহলে তারা আর কখনো বিদ্রোহের প্রতি পা বাড়াবে না। শামিল বৃদ্ধ হয়ে গেছে। এখানকার আবহাওয়া তার ও তার পরিবারের লোকদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে। ফলে আমরা যা করতে চাই, তা আপনা আপনিই হয়ে যাবে। কাফকাজের জনগণ আমাদের অনুগত হয়ে যাবে।

এক দরবারী বললো, মহান জার! যদি গোস্তাখী মনে না করেন, তাহলে আমি নিবেদন করতে চাই, আমরা যদি শামিলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি, তাহলে ঐ সকল খান অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে, যারা আমাদের অফাদার ও সমর্থক। শামিলের হাতে তারাও অনেক নিপীড়ন ভোগ করেছে। তারা মনে করবে, রুশ প্রশাসন সেই ব্যক্তিরই অধিক সম্মান করে, যারা বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়।

ঃ তোমার ধারণা সঠিক। তারা আমাদের এ পদক্ষেপে অসন্তুষ্টই হবে। কিন্তু তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা চিন্তা করছ না। আমরা যা-ই সিদ্ধান্ত নেই না কেনো, কাফকাজের মানুষ সর্বাবস্থায় শামিলেরই সমর্থক। সে তাদের হিরো। শামিল মানুষের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করতো। সে কারণেই ত্রিশটি বছর পর্যন্ত সে আমাদের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে পেরেছে। কিছু খান আমাদের পক্ষে চলে আসার কারণ হলো, শামিলের সামনে তাদের বাতি জ্বলে না এবং তাদের জনসমর্থন ছিলো না। শামিলের ন্যায় তাদেরও যদি জানবাজ সৈনিক থাকতো, তাহলে পারতপক্ষে তারা আমাদের আনুগত্য মেনে নিতো না। কাজেই তাদের না-রাজি আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

ঃ শাহেনশাহ'র বুঝই সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত। আমি আমার নিবেদন প্রত্যাহার করে নিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে ইমাম শামিলের ব্যাপারে জার আলেকজান্ডার-এর সিদ্ধান্ত সম্বলিত পত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। তাতে তিনি লিখিয়েছেন–

আমি শামিলের শর্ত মঞ্জুর করলাম। কিন্তু ইমাম ও তার পরিবার-পরিজন কিছুদিনের জন্য অবশ্যই আমার মেহমান হতে হবে। তাদেরকে যথাসাধ্য সম্মানের সাথে রাজধানীতে নিয়ে আসবে। কমান্ডার ইন চীফ-এর কর্তব্য হলো, সে একজন সুসভ্য সদাচারী রুশ অফিসারকে ইমামের সেবার জন্য নিয়োজিত করবে। সেই অফিসার ও তার আমলারা ইমামের মর্যদা অনুপাতে তার ও তার সঙ্গীদের থাকা-খাওয়া ও সফরের ব্যবস্থা করবে। পথে ইমাম ও তার পরিবার-পরিজনের বিন্দুমাত্র কষ্ট যেনো না হয় সেদিক খেয়াল রাখবে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যথাসাধ্য মর্যাদার সাথে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর ব্যবস্থা করবে। মস্কোয় তাদেরকে গভর্নরের মহলে থাকতে দেবে। ইমামের সফরের সময় প্রতিটি প্রদেশের উর্ধ্বতন অফিসারগণ তার সকাশে উপস্থিত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করবে। আমার এই সিদ্ধান্ত যদি শামিল মেনে না নেয়, তাহলে কমান্ডার ইন চীফ অবস্থা অনুপাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

শাহী পত্র বেরিয়া তানস্কীর হাতে এসে পৌঁছায়। বেরিয়া তানস্কী তৎক্ষণাৎ ইমাম শামিলের নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূত ইমাম শামিলকে বেরিয়া তানস্কীর সাক্ষাতের প্রস্তাব দেন। ইমাম আসর নামাযের পর সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেন।

আসর নামাযের সময় হলো। দাগেস্তানের মুয়াজ্জিন যথারীতি আযান দেন। আযানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বেরিয়া তানস্কী মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে ফেলে চুপচাপ আযান শুনতে থাকেন। ইমাম শামিলের ইমামতিতে নামায আদায় হয়। নামাযের পর ইমাম প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী দু'আ-কালামে নিমগ্ন হন। আজ দু'আয় তিনি অতিরিক্ত কিছু শব্দ সংযোজন করেন–

হে আল্লাহ! তুমি সবকিছু জানো. সব-ই বুঝো। তোমার এই অধম বান্দা তোমার হুকুম অনুযায়ী তোমারি সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে যথাসাধ্য জিহাদ করেছে। কিন্তু তুমি-ই জানো, তোমার ইচ্ছা কী। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তাওফীক দান করো। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছি এবং দুশমনের মোকাবেলা করার মতো শক্তি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। এজন্য আমরা তোমার কাছে লজ্জিত। আমরা গুনাহগার– এ কারণে যে, আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তোমার রশি ধারণে ব্যর্থ হয়েছি। আমরা তোমার কাছে অপরাধী– এ কারণে যে, আমাদের অনেক মানুষ দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তুমি আমাদের নেক আমলগুলোর পুরস্কার দান করো এবং বদ আমলগুলো ক্ষমা করে দাও।

ইমাম শামিল কায়োমনোবাক্যে দু'আ করছেন আর মুক্তাদীগণ পেছনে বসে ইমামের প্রতিটি বাক্যের পর আমীন আমীন বলছে। চক্ষু তাদের অশ্রুসজল। কিন্তু প্রতিটি মানুষ যেনো ধৈর্য ও তুষ্টির মূর্তপ্রতীক।

দু'আ শেষ করে ইমাম শামিল দু'জন নায়েবসহ যথাস্থানে বসে থাকেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়া তানস্কী তার দোভাষী ও মেজর লাজরাফকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছেন এবং কুশল বিনিময়ের পর বললেন, আপনাকে মোবারকবাদ, শাহেনশাহ আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

ঃ শাহেনশাহ কি আমার এই আবেদন মঞ্জুরীর কথা ঘোষণা দিতে প্রস্তুত আছেন?

বেরিয়া তানস্কী ঃ শাহেনশাহ আমার এবং আপনার ধারণার চেয়েও বেশি দয়ালু। আমি তাঁর পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গে লিখিত চুক্তি করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু শাহেনশাহ আপনার কাছে এই আবেদনও করেছেন যে, কিছুদিনের জন্য আপনি তার মেহমান হবেন।

ঃ বোধ হয় তিনি তার প্রজাদেরকে এই কয়েদিটাকে দেখাতে চান।

ঃ না, বরং ঘটনা এর উল্টো। শাহেনশাহ'র প্রজাসাধারণ, মন্ত্রীবর্গ ও স্ত্রী-কন্যা প্রত্যেকে শেরে দাগেস্তানকে এক নজর দেখে ধন্য হতে চান। শুধু তা-ই নয়- স্বয়ং শাহেনশাহও সেই বীর যোদ্ধাকে কাছে থেকে দেখার প্রত্যাশী, যিনি বড় বড় রুশ জেনারেলদেরকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন এবং একাধিক রুশ শাহেনশাহ'র মনোবাঞ্ছাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।

রুশ কমান্ডার বেরিয়া তানস্কীর এই বক্তব্য ইমামকে ভাবিয়ে তোলে। ইমাম শামিল খানিক চিন্তা করে বললেন, তুমি বোধ হয় এমনও দাবি জানাবে যে, আমি যেনো অস্ত্র ত্যাগ করি।

ঃ না, তার প্রয়োজন নেই। আপনি সশস্ত্রই থাকবেন। আপনার কঞ্জল

আপনার দেহে সজ্জিত থাকবে। আপনি আমাকে সালাম করতে হবে না। আমিই বরং আপনাকে সালাম করে চলবো। এই মুহূর্ত থেকে আপনি শাহী মেহমান। এ-ও যদি আপনার মঞ্জুর না হয়, তাহলে আপনার যা মর্জি তা-ই হবে। শাহেনশাহ'র নির্দেশ, আপনার খাতিরে প্রয়োজন হলে কঠোর থেকে কঠোরতর আইনও যেনো রহিত করা হয়।

ঃ সেনাপতি! যুদ্ধে আমি পরাজয়বরণ করেছি। তুমি ইচ্ছে করলে তোমার নিয়মনীতি পুরোপুরি মেনে চলো, তাতে আমার কষ্ট হয় হোক।

ঃ আপনি এখান থেকে কখন রওনা হতে চান?

ঃ তুমি যখন বলবে। এখন আর আমি আমার মর্জির মালিক নই।

ঃ আমার নিবেদন, আপনি কাল ভোরে রওনা হবেন।

ঃ ঠিক আছে, আমি প্রস্তুত থাকবো।

সেদিন সন্ধ্যায়ই দাগেস্তানের সর্বত্র সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, ইমাম শামিল ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী দুশমনের বেষ্টনীতে আটকা পড়েছেন। অন্যরা সকলে শহীদ হয়ে গেছেন।

● ● ●

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে। চারদিক আঁধারে ছেয়ে গেছে। এরাগলের খানকার আঙিনায় কতিপয় মানুষ জড়ো হয়ে আছে। শায়খ মোল্লা আহমদ কিতাবের একটি গাট্টি কাঁধে তুলে হুজরা থেকে বেরিয়ে আসেন। তার পেছনে কয়েকজন শিষ্য। তাদের কাঁধে-মাথায় কিতাবের গাট্টি। মোল্লা আহমদ কাঁধ থেকে গাট্টিটা নামিয়ে নীচে রেখে বারান্দায় সমবেত লোকদের উদ্দেশে বললেন–

'বে-খবর লোক সকল! কাফকাজের কঞ্জল ভেঙে গেছে। দাগেস্তানী তরবারী ভোতা হয়ে গেছে। পাহাড়-পর্বতের রূপ পাল্টে গেছে। বীরত্বের দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। দেশ-প্রেমিকদের এখন আর এদেশে বসবাস করা সম্ভব নয়। স্বদেশ প্রেমিকরা যদি আপনা থেকে দেশ ত্যাগ না করে, তাহলে তাদেরকে অপমান করে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হবে। এদেশে এখন বাস করবে হানাদার গাদ্দার-বিশ্বাসঘাতকরা। গাদ্দারদের সঙ্গে জীবন কাটানোও একরকম গাদ্দারী। এদেশে এখন বাস করবে সেই সুবিধাবাদীরা, যারা খেয়ে-পরে বেঁচেই থাকতে পারে শুধু– বাঁচার লক্ষ্য জানে না। বিদায়! শেষবারের মতো বিদায়! হে খানকার দেয়ালসমূহ, হে ইট সকল! বিদায় হে পাথরকূল! এখন আর তোমরা আল্লাহর আওয়াজ, সত্যের আওয়াজ শুনতে পাবে না।

শায়খ মোল্লা আহমদ কিতাবের গাঠুরিটা মাথায় তুলে নেন। লাঠিটা হাতে নিয়ে অশ্রুসজল নয়নে পা টেনে টেনে সরু গলিপথে ঢুকে পড়েন, যেনো তিনি একান্ত আপন কাউকে কবরে দাফন করে বাড়ি ফিরছেন। ‧ ‧গলের এক বৃদ্ধ

এগিয়ে গিয়ে বললেন, পীর ও মুরশীদ! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এখান থেকে শুধু কিতাবগুলো নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী? মোল্লা আহমদ হাঁটার গতি অব্যাহত রেখেই বললেন, আমি কোনো স্বাধীন দেশে চলে যেতে চাই। আর এই কিতাবগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো, এগুলোর মধ্যে যা কিছু লিখা আছে, তা শুধু আযাদীর সৈনিকরাই বুঝতে পারবে– গোলাম জাতির জন্য এতে কোনো সবক নেই।

✿ ✿ ✿

রাশিয়ায় এমন কোন পরিবার নেই, যার কেউ না কেউ ইমাম শামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারায়নি। হাজার হাজার রুশ পরিবারে এমন পঙ্গু লোক রয়েছে, যাদেরকে ইমাম শামিলের মুজাহিদরা জীবনের তরে অক্ষম করে দিয়েছে। লাখ লাখ রাশিয়ান মা বছরের'পর বছর প্রার্থনা করে আসছে, হে ঈসা মসীহ! তুমি আমার পুত্রকে তাওফীক দাও, যেনো সে খৃষ্টবাদের মোহাফেজ রাজাধিরাজ শাহেনশাহে রুশ-এর দুশমন শামিলকে হত্যা করে শাহেনশাহ'র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আজ সেই শামিল রুশ বাহিনীর হাতে আবদ্ধ। কিন্তু কেনো জানি প্রতিটি রুশ সৈনিকই মনে মনে ইমাম শামিলের নিরাপত্তা কামনা করছে, প্রতিটি রুশ সৈনিকই সেই লোকটিকে কাছে থেকে এক নজর দেখতে আগ্রহী– যিনি ত্রিশ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক রুশ সম্রাটকে অস্থির করে রেখেছিলেন।

রুশ কমান্ডার যখন ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে সংবাদ দেন, ইমাম শামিল শাহেনশাহ'র সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন এবং কাল ভোরেই রুশ সেনা অফিসারদের সঙ্গে শাহেনশাহ'র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন, তখন রুশ সৈন্যদের মধ্যে স্বস্তি আর আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। তবে এই আনন্দ যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার, নাকি শেরে দাগেস্তানকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাওয়ার, তা বলা মুশকিল।

সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখ ভোর বেলা ইমাম শামিল, তাঁর পরিবার-পরিজন ও পঞ্চাশজন খাদেম নামাজ ও তিলাওয়াত থেকে অবসন্ন হন। ইমাম শামিল তাঁর সাদা ঘোড়ায় উপবেশন করেন। তাঁর পেছনে পঞ্চাশজন জানবাজ কালো পতাকা হাতে দণ্ডায়মান। ইমামের দেহরক্ষীদের পেছনে গাজী মোহাম্মদ, মোহাম্মদ শফী, বোরকা পরিহিতা মহিলাগণ ও তাদের রক্ষীগণ।

ইমাম শামিল রুশ বাহিনীর নিকটে এসে পৌছান। দেখামাত্র বাহিনীতে হুলস্থূল শুরু হয়ে যায়। হাজার হাজার সৈন্য ছুটাছুটি করে ইমামের কাছে আসতে চেষ্টা করে। একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মধ্যে হঠাৎ করে এমন বিশৃংখলা কেউ কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না।

এই পরিস্থিতি দেখে ইমাম শামিল ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন এবং তরবারী কোষমুক্ত করে উঁচু করে ধরেন। মেজর লাজরাফ দ্রুতবেগে ছুটে এসে বললেন,

জনাব! রুশ সৈন্যরা আপনাকে এক নজর দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। আপনার শংকিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

ঃ কিন্তু ওরা এমন হৈ হল্লা করছে কেনো? ওরা কী বলছে?

ঃ জনাব! ওরা বলাবলি করছে, শেরে দাগেস্তান আসছেন, সেই লোকটি আসছেন, যার বীরত্বের কাহিনী প্রতিটি রুশ শিশুরও মুখে মুখে। সেই বীর যোদ্ধার আগমন ঘটেছে, যাকে কোনো রুশ-ই কখনো কাছে থেকে দেখার সুযোগ পায়নি।

ঃ কলগনু দেখেছিলো।

ঃ হ্যাঁ, জনাব! ১৮৩৭ সালে। তবে রাশিয়ানদের মধ্যে একথাই প্রসিদ্ধ যে, আজ পর্যন্ত কোনো রুশই কখনো ইমাম শামিলকে কাছে থেকে দেখেনি। আপনাকে এক নজর দেখার আকাঙ্খা রাশিয়ার প্রতিজন মানুষের হৃদয়ে।

ইমামের ঘোড়া অগ্রসর হতে শুরু করে। হঠাৎ ইমামের দৃষ্টি গাদ্দার খানদের উপর নিপতিত হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোড়ার বাগ টেনে ধরেন। ঘোড়া থেমে যায়। মুহূর্ত কী যেনো চিন্তা করে পেছন দিকে মোড় ঘোরাতে উদ্যত হন। লাজরাফ পুনরায় ছুটে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন–

ঃ মহামান্য ইমাম, কী হলো?

ঃ (রুশ সমর্থক খানদের প্রতি ইংগিত করে) এই গাদ্দারদের বুঝি এই জন্য সমবেত করেছেন যে, ওদের দিয়ে আমাকে অপমান করাবেন?

ঃ জনাব! তারা এই দৃশ্য দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছে যে, আপনার মতো একজন বীরপুরুষকে চরম বিপদের মুহূর্তে কেমন দেখায় এবং আপনি কী করেন। আপনি তাদেরকে প্রমাণ দিন, সিংহ জয়ী হোক বা পরাজিত সর্বাবস্থায় সিংহ-ই থাকে।

লাজরাফের বক্তব্য ইমামের মনে রেখাপাত করে। ইমাম ঘোড়ায় মোড় ঘুরিয়ে দেন। কমান্ডারের নিকট গিয়ে ইমাম ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। রুশ কমান্ডার বেরিয়া তানস্কীর নির্দেশে রুশ সিপাহীদের একটি দল ইমামকে সালাম করে অভিবাদন জানায়। ইমাম সোজা হয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছেন।

খানিক পর একটি ঘোড়াগাড়ি এসে পৌঁছে। এক গাড়িতে ইমাম ও তাঁর দু'জন জানবাজ রক্ষী চড়ে বসেন। অপরগুলোতে মহিলা এবং শিশুরা সাওয়ার হয়। রুশ সৈন্যরা দেহরক্ষী হিসেবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম শামিল হঠাৎ লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন এবং ক্ষুব্ধ ও উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, বেরিয়া তানস্কী! আমরা কি তোমাদের বন্দি?

ঃ (সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে) জনাব! আপনি কী বলছেন? আপনি তো শাহী মেহমান! এরা আপনার নিরাপত্তা সৈনিক।

ঃ না, আমি আমারই নিরাপত্তায় পথ চলবো। রুশ সৈন্যদের এখান থেকে

সরিয়ে নাও। অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব তোমাদেরই বহন করতে হবে।

ঃ আপনার যা খুশি, তাই হবে। তবে এখন আপনি আমাদের মেহমান। আর মেহমানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আমাদের কর্তব্য। আপনার নিজ এলাকার কোনো দুশমন যদি সুযোগ পেয়ে আপনার উপর আঘাত করে বসে, তাহলে শাহেনশাহ আমাদের খুনই করে ফেলবেন।

ঃ যুদ্ধের ময়দানে আমি পরাজয় বরণ করেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি ভীরু গাদ্দারের হাতের পুতুল হয়ে গেছি।

❁ ❁ ❁

ইমাম শামিল এগিয়ে চলছেন। দাগেস্তান ও তার আশ-পাশের নারী-পুরুষ সবাই ইমাম শামিলকে এক নজর দেখার জন্য ও একটিবার সালাম করে ধন্য হওয়ার জন্য পিপিলিকার ন্যায় ছুটে আসছে। প্রতিটি রাস্তা-গলির দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত মানুষ আর মানুষ। সকলেই নিরস্ত্র। বেরিয়া তানস্কীর এদের পক্ষ থেকে কোনো আশংকা নেই। তিনি জানেন, ইমাম শামিল এখন যুদ্ধরত নন, তাঁর অনুসারীদের কেউই লড়াই করবে না। তথাপি তিনি ইমাম শামিলকে যতো দ্রুত সম্ভব নিজ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে পৌঁছুতে চান।

ইমাম ঘোড়াগাড়িতে বসে আছেন। চারদিকে তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী এবং রুশ বাহিনীর কাস্‌ক রেজিমেন্টের নিরাপত্তা কর্মী। ইমাম শামিল এখনো ইমাম। দীর্ঘকায় ইমামকে সকলের মাথার উপর দেখা যাচ্ছে। সকলের থেকে ব্যতিক্রম তিনি। কাস্‌ক রেজিমেন্টের সৈন্যদের চারপার্শ্বে দাগেস্তানী পুরুষ ও নারীরা ছুটাছুটি করছে, দৌড়াচ্ছে, লুটিয়ে পড়ছে। কয়েকশ রুশ সিপাহী শুধু রাস্তা পরিষ্কার করার কাজেই ব্যস্ত। বেরিয়া তানস্কী ইমাম শামিলকে দেখার জন্য ছুটে আসা নারী-পুরুষ-শিশুদের প্রতি বিস্ময়াভিভূত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। পথে এক স্থানে তিনি অধীন অফিসারদের বললেন, জারের সিদ্ধান্ত কতো বাস্তবসম্মত, কতো সঠিক, কতো বিচক্ষণতার পরিচায়ক। এই লোকটিকে খুন করলে বা অপদস্ত করলে প্রতিটি মানুষ চিরদিনের জন্য আমাদের দুশমন হয়ে যেতো। লোকটি এখনো তাঁর দেশের মানুষের হৃদয়ের রাজা। মানুষ এখনো তাঁর জন্য পাগল। জীবন দিতে প্রস্তুত। এ যাবত কোনো লোক বা একজন সাধারণ মানুষ আমার নিকট এসে শামিল বা তার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। এমন পরিস্থিতিতে পদানত এলাকার মানুষ প্রয়োজনেরও বেশি অফাদার হওয়ার চেষ্টা করে থাকে। অথচ পরিস্থিতি এর সম্পূর্ণ উল্টো। কী আশ্চার্য!

১৮৫৯ সালের এক সন্ধ্যায় ইমাম শামিলের কাফেলা দাগেস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে। পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যের কিরণ আকাশচুম্বী পর্বতকে

আলোকিত করছে। সূর্যের লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তে। ইমাম শামিলের মনে হলো, আকাশ যেনো দাগেস্তানের ভাগ্যের উপর রক্তের অশ্রু ঝরাচ্ছে।

ইমামের দৃষ্টি পাহাড়ের চূড়ায় আটকে থাকে। তিনি মনে মনে বলেন, বিদায়! আমার বন্ধুগণ বিদায়! ত্রিশটি বছর পর্যন্ত তোমরা আমার সঙ্গ দিয়েছো। কিন্তু আমি তোমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারিনি। সম্ভবত এ কারণেই তোমরা আমাকে তোমাদের পাদদেশে কবরের জায়গাটুকু দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত নও।

ইমামের আঁখিযুগল অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে।

ইমাম শামিলের এই অবস্থা দেখে রুশ অফিসার বুগোস্লোভচকি বলেন, আদেশ হলে গাড়ি থামিয়ে দিই, আপনি মন ভরে দৃশ্যটা উপভোগ করুন।

ইমাম শামিল বললেন, আদেশ তো করেন শাসকরা। শাসক শামিল গানিব-এর পাথরের নীচে চাপা পড়ে গেছে। এই শামিল অসহায় ও পরবাসী।

কর্নেল বুগোস্লোভচকি গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেন।

রাতের আঁধার অল্প সময়ের মধ্যেই দাগেস্তানের এই অদৃশ্যপূর্ব দৃশ্যের উপর পর্দা ফেলে দেয়। জনতার হৃদয়কাড়া দৃশ্যটা খানিকের মধ্যেই ইমাম শামিলের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায়। দাগেস্তানের গুটিকয়েক গাদ্দার ছাড়া সবাই কাঁদছে। এ মুহূর্তে রাতের আঁধার প্রকৃতিকে ছেয়ে ফেলেছে। আর তা-ই দাগেস্তানের ভাগ্যের লিখন হয়ে রইলো। ইমাম শামিলের দাগেস্তান অন্ধকার হয়ে গেলো– হয়তো চিরদিনের জন্য আঁধারে ছেয়ে গেলো।

একত্রিশ.

শেরে দাগেস্তানের আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে রাশিয়ার সর্বত্র। ইমাম শামিল যে পথে রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গ পৌঁছুবেন, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছে সে পথের দু'ধারে। এরা সেই সিংহপুরুষটিকে এক নজর দেখতে চায়,যিনি ত্রিশ বছর যাবত দাগেস্তানের পাহাড়-জঙ্গলে অস্ত্র হাতে ছুটে বেড়িয়েছেন, যিনি জার নেকুলাই'র মতো মহান ও শক্তিধর শাহেনশাহকে অস্থির করে রেখেছিলেন। রুশ জনগণের দৃষ্টিতে যা ছিলো এক কিংবদন্তীর উপাখ্যান। যে শিশুরা তাদের মায়েদের কাছে শুনেছিলো, তোমাদের পিতারা জার-এর সৈনিক হয়ে শেরে দাগেস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছেন, তারা এখন পরিণত যুবক। তারা ইমাম শামিলের যুদ্ধের কাহিনী শুনে শুনে বড় হয়েছে। তাদের চোখে ইমাম শামিল এমন একজন অস্বাভাবিক মানুষ, যাঁর বীরত্বের কাছে মহাশক্তিধর জার রুশদের সীমাহীন সমরশক্তি হার মানতে বাধ্য হয়েছিলো। এখন রাস্তার প্রতিটি মোড়ে, প্রতি ঘাটে হাজার হাজার রুশ জনতা শেরে দাগেস্তানকে এক নজর দেখার জন্য উদগ্রীব দণ্ডায়মান। জনতার ভিড়ের মধ্যে আছে সেই নারীরাও, যাদের

স্বামীরা দাগেস্তানের পাহাড়-জঙ্গলে ইমাম শামিলের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। আছে সেই মেয়েরা, যাদের পিতারা শেরে দাগেস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে পঙ্গু হয়ে গেছে। ইমাম শামিলকে দেখতে আসা জনতার চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ।

এক জায়গার ঘটনা। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার মানুষ। এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করে পা টেনে টেনে জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে এবং উচ্চস্বরে বলছে– 'তোমরা রাস্তা ছাড়ো, আমাকে এগুতে দাও। আমি সেই লোকটিকে দেখতে চাই, যাঁর জানবাজরা আমাকে পঙ্গু করে দিয়েছিলো এবং আমার দলের সব সিপাহীকে হত্যা করেছিলো। আমি দীর্ঘ দশ বছর তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি; কিন্তু একটিবারের জন্যও তাকে দেখতে পাইনি।

একটু পর পর থেমে থেমে গাড়ি সম্মুখপানে চলতে শুরু করে। হাজার হাজার মানুষ গাড়ির পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত থামছে না কেউ। প্রতি ঘাঁটিতে রুশ সৈন্যরা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে ইমাম শামিলকে অভ্যর্থনা এবং সামরিক কায়দায় সালাম জানাচ্ছে।

জায়গাটার নাম স্টোফরপোল। বিপুল জনতার বিশাল এক সমাবেশ এখানে। উৎফুল্ল জনতা নাচছে, গাইছে। অসংখ্য নারী ও পুরুষ ফুলের মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়ভরা চোখে তাদের প্রতি তাকান ইমাম শামিল। কর্নেল যুগোস্লোভচকি কাছে এসে বললেন, জনাবে আলী! এরা সবাই আপনার আগমনে উল্লাস করছে।

গাজী মোহাম্মাদ রসিকতা করে বললো, আব্বাজান! এখন তো আপনার এই বন্দিদশা অপছন্দ হওয়া উচিত নয়।

ইমাম শামিল গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– 'বোকা কোথাকার! মানুষ খাঁচায় বন্দি সিংহকে দেখতে তো চাইবেই।'

স্টোফরপোল থেকে রেললাইন শুরু। এখান থেকে ইমাম শামিল ও তাঁর সঙ্গীদের রেল গাড়িতে উঠতে হবে। রেলস্টেশনের খানিক দূরে ইমাম শামিলের স্ত্রী গাওহার বেগম-এর খ্রিস্টান চাচাতো ভাই আতারিদভ তার কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে ফিস ফিস্ করে কথা বলছে। একজন তাকে বললো– 'আতারিদভ! এইতো সুযোগ, এগিয়ে গিয়ে শেয়ানতের সঙ্গে দেখা করো। তাকে বলো, তুমি এখন একজন বন্দির স্ত্রী। সাহস করে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে আসো।

আতারিদভ রেল স্টেশনের অভিমুখে হাঁটা দেয়।

রেলগাড়ি রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। ইমাম শামিল তাতে সওয়ার হওয়ার আগে রেল গাড়ির কথা শুনেছিলেন শুধু, দেখেননি কখনো। ইমাম শামিলকে ইঞ্জিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ইমাম বিস্ময়ের সাথে রেল গাড়ির ইঞ্জিন অবলোকন করেন। তারপর নিজ ভাষায় সঙ্গীদের বললেন– 'এই যন্ত্রগুলোই আমাদেরকে পরাজিত করলো।'

কিছুক্ষণ পর ইমাম শামিল গাড়িতে আরোহণ করার উদ্দেশ্যে গাড়ির সেই বগির দিকে এগিয়ে যান, যেটি একান্তভাবে তাঁরই জন্য নির্ধারিত। ইমাম শামিল যখন দরজার নিকটে এসে পৌছান, ঠিক তখন আতারিদভ চীৎকার করতে করতে দৌড়ে আসে– 'শেয়ানত-শেয়ানত তুমি কোথায়? তুমি এখন মুক্ত। দোহাই তোমার, ওর সাথে যেও না।'

লোকটা পাগলের মতো দৌড়ে এসেই পর্দাবৃতা মহিলার প্রতি হাত বাড়ায়। গাওহার বেগমও অন্যান্য মহিলার ন্যায় বোরকা পরিহিতা। রুশ কর্নেল উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে, ধরো ধরো, পাগলটাকে ধরে ফেলো।

মহিলাদের নিরাপত্তাকর্মীদের দু'জনের হাত বিদ্যুতের ন্যায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। একজন রক্ষীর তরবারী আতারিদভের ডান হাতটা কেটে দ্বি-খন্ডিত করে ফেলে। অপরজনের খঞ্জর লোকটার বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়। পরক্ষণেই কর্নেল যুগোস্লোভচকির শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যায়। তিনি শক্তি সঞ্চয় করে বললেন, মহামান্য ইমাম! ঈসা মসীহের কসম, এটা পাগলের কাণ্ড। এতে আমার কোনো ত্রুটি নেই। আমি ওর বংশের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবো। আমি মনে করেছিলাম, সেও বুঝি অন্যদের ন্যায় আপনাকে কাছে থেকে দেখার জন্য ছুটে আসছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

ইমাম শামিল নীরব বসে আছেন। গাজী মোহাম্মাদ কর্নেল যুগোস্লোভস্কিকে উদ্দেশ করে বললো– 'কর্নেল! লোকটার অপবিত্র হাত যদি মোহতারামা আম্মাজান কিংবা অন্য কোন শ্রদ্ধেয়া মহিলার গা স্পর্শ করতো, তাহলে তার সঙ্গে তুমিও রক্তাক্ত হয়ে যেতে। তুমি তো জানো আমরা কারা। তোমার জারও যদি আমাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করে, তাহলে এটি (খঞ্জরের হাতলে হাত রেখে) তার পেটটাও ছিঁড়ে ফেলবে।'

কর্নেল যুগোস্লাভস্কি বললেন, জনাব, আমি তা জানি। আমাদের শাহেনশাহ আপনাদের সঙ্গে কোনো গোস্তাখী করবেন না, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। এই পাগলটা নাকি ইমামের সম্মানিতা স্ত্রীর দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ছিলো।

ইমাম শামিল বললেন, শোনো কর্নেল! এই অনাকাংখিত ঘটনার মধ্যেও কোনো না কোনো রহস্য লুকায়িত আছে। আমি তোমাদের প্রত্যেককে সাক্ষী রেখে গাওহার বেগমকে বলছি, গাওহার! আমি এখন নিছক একজন বন্দি। আমাব এখন আর কিছুই নেই। তোমাকে অনুমতি দিলাম, ইচ্ছে হলে তুমি তোমার স্বজনদের কাছে ফিরে যেতে পারো।'

গাওহার বেগম প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, আপনি যে অবস্থায় থাকুন না কেনো, আমি আপনার সঙ্গ লাভেই ধন্য থাকতে চাই। আপনার দাসীদের দাসী হয়ে থাকতে পারলেও আমি কোনো রাজ্যের রাণী হওয়া অপেক্ষা হাজার গুণ উত্তম

মনে করবো। আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় বুঝে-শুনে মুসলমান হয়েছি এবং মহামান্য ইমামের সহধর্মীনীর মর্যাদা লাভে ধন্য হয়ে নিজেকে জগতের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী নারী মনে করছি। আপনার একটি কুকুরের যে মর্যাদা, আমার দৃষ্টিতে আতারিদভের সেটুকুও মর্যাদা নেই।

রুশ অফিসার ও সিপাহীরা তন্ময় হয়ে শুনছে ইমাম শামিলের স্ত্রী গাওহার বেগমের কথাগুলো। ইমাম, গাজী মোহাম্মাদ, মোহাম্মাদ শফী, নায়েব ও খাদেমগণের চেহারায় আনন্দের এমন এক দ্যুতি খেলছে, যা চোখে দেখা যায় না, বলেও বুঝানো যায় না।

ইমাম শামিল বললেন, শোন কর্নেল! এই মহিলা আমার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে তোমার ধর্মের অনুসারী ছিলো। আমি পুরো দৃশ্যটা নীরবে অবলোকন করেছি এ জন্যে যে, বিষয়টি খোলাসা হয়ে যাক। আমার নিরাপত্তাকর্মীরা বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। তবে তারা কর্তব্য পালনের তাগিদে বাধ্যও ছিলো। যা হোক এখন আমরা রওনা হই।

হাজার হাজার মানুষ আতারিদভের লাশের উপর দিয়ে রেলগাড়ির সেই বগিটির নিকটে যাওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে ইমাম শামিল চড়ে বসে আছেন। একজন মানুষও এমন নেই, আতারিদভের মৃত্যুতে যার মনে কিঞ্চিত দুঃখ আছে। যারা আতারিদভের উপর ইমাম শামিলের নিরাপত্তাকর্মীদের তরবারী ও খঞ্জরের আঘাত হানতে দেখেছে, তারা উৎফুল্ল, তাদের চোখে এটি এমন এক দৃশ্য, যা দেখার জন্য মানুষ কাফকাজে গিয়ে থাকে।

রেলগাড়ি ছুটে চলছে। ইমাম শামিল তাঁর পুত্র ও নায়েবদের বলছেন, এই যন্ত্র আর এ গুলোর তীব্র গতিই আমাদের পরাজিত করলো। এদের তোপ আমাদের পাহাড়-জঙ্গলসমূহকে জয় করে ফেললো। আমাদের তরবারীর মোকাবেলায় যদি এদের হাতে তরবারীই হতো, তাহলে এক হাজার জারও আমাদের পরাস্ত করতে পারতো না। ত্রুটি আসলে আমাদেরই। আমরা সময়ের গতি সম্পর্কে উদাসীন। আমাদের দুশমনরা আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা পুরোপুরি কাজ উসুল করছে। তরবারী তোপের মোকাবেলা করতে পারে না। পায়ে হেঁটে এইসব গাড়ির তালে পথচলা যায় না। সময় অনেক এগিয়ে গেছে আর আমরা রয়েছি পিছিয়ে।

ইমাম শামিলকে বহনকারী গাড়িটি এখন খারকেভ স্টেশনে দণ্ডায়মান। এখানে জার আলেকজান্ডারের এক বিশেষ প্রতিনিধি ইমাম শামিলের জন্য অপেক্ষমান। গাড়ি থামার পর জারের প্রতিনিধি ইমামের কক্ষে প্রবেশ করে এবং দোভাষীর মাধ্যমে বলে– জনাব! আপনি নীচে নেমে আসুন। এখান থেকে খানিক দূরে জার রুশ অবস্থান করছেন। বিশেষ পরিভ্রমণে তিনি এখানে এসেছেন। অতিসত্বর তিনি আপনার সঙ্গে মোলাকাত করতে চান।

ইমাম শামিল আসন থেকে উঠে নীচে নেমে আসেন। তাঁর সফর সঙ্গীরাও তাঁর পেছনে পেছনে নেমে পড়ে। প্লাটফর্মের সন্নিকটেই একটি ঘোড়াগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রুশ বাহিনীর কাস্ক রেজিমেন্টের একটি ইউনিট ইমামকে সালাম করার জন্য অস্থির বে-কারার। সালামের পর ইমাম ও তার সঙ্গীরা গাড়িতে চড়ে বসেন। মহিলাদেরকে মেহমানখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জারের প্রতিনিধি ও কর্নেল যুগোস্লোভস্কি ইমামের গাড়ির পেছনের আসনে বসে পড়ে। গাড়ি ছুটতে শুরু করে। রাস্তার দু'ধারে দন্ডায়মান জনতা ইমামকে এক নজর দেখে নিজেদের ধন্য করছে।

এক ঘন্টা পর ঘোড়াগাড়ি বিশাল বিস্তৃত এক ময়দানে গিয়ে পৌছে। ময়দান নয় যেনো তাঁবুর শহর। ইমাম শামিলকে বড়-সড় সুসজ্জিত একটি তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। জার আলেকজান্ডার পূর্ব থেকে সেই তাঁবুতে স্বর্ণখচিত চেয়ারে বসা। ইমাম শামিল প্রবেশ করামাত্র জার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা অগ্রসর হয়ে ইমামকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং নিজের পাশের চেয়ারে বসার জন্য ইঙ্গিত করে দোভাষীর মাধ্যমে কথোপকথন শুরু করেন। জার বললেন, আপনাকে এখানে পেয়ে আমি আনন্দিত। আহ, যদি অনেক আগেই এমনটা হতো! আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এখানে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। আমাকে আপনি আপনার বন্ধুরূপেই পাবেন।

ইমাম শামিল কোন কথা বলছেন না। জার দীর্ঘ সময় ধরে ইমামের বীরত্বের আলোচনা করতে থাকেন। তারপর আধুনিক অস্ত্র সম্পর্কে কথা তোলেন। জার বললেন– 'বর্তমানে বীরত্ব আর শক্তি আলাদা বিষয়। একজন দুর্বল মানুষ তোপের গোলা ছুঁড়ে মজবুত দুর্গকে মিসমার করে দিতে পারে। তবে আমি তরবারী দ্বারা তোপের মোকাবেলাকারীদের বীরত্বও স্বীকার করি।'

ইমাম শামিল জারের সঙ্গে সামরিক মহড়া পরিদর্শন করেন। মহড়া পরিদর্শনের পর জার বললেন, এরপর আপনার সঙ্গে আমার সেন্টপিটার্সবার্গে সাক্ষাৎ হবে। আমার অনেক জরুরি রাষ্ট্রীয় কাজ আছে। সেগুলো সমাধা করে আমি রাজধানীতে আপনার অপেক্ষা করবো। এখন আপনি ঘুরেফিরে দেখুন। আপনার মস্কো ভ্রমণের আয়োজনও করা আছে। আপনাকে বহনকারী গাড়ি আপনার অপেক্ষা করছে।

ইমাম শামিল বললেন, আমি এখানে এসে আমার ওয়াদা পূরণ করেছি। এবার পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হতে চাই।

জার আলেকজান্ডার বললেন, আমি আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা আমার স্মরণ আছে। তবে আমাকে সুযোগ দিতে হবে। আপনি আমার রাজধানী না দেখে যাবেন না। আমি আপনাকে তোপ তৈরির কারখানা দেখাবো।

ইমাম শামিল সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

মস্কোয় ইমাম শামিল ও তার সঙ্গীদের জন্য শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলের একটি তলা সম্পূর্ণ খালি করে দেয়া হয়। ইমাম শামিলের সেবায় সেখানে হোটেলের কর্মচারিবৃন্দ ছাড়াও বেশকিছু সরকারি লোকও নিয়োজিত করা হয়। হোটেলের বাইরে চারপার্শ্বে হাজার হাজার জনতা ইমাম শামিলকে এক নজর দেখার জন্য উদগ্রীব দাঁড়িয়ে আছে।

ইমাম শামিলকে বহনকারী গাড়ি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। ইমাম গাড়ী থেকে নীচে নেমে আসেন। পরনে তার ঐতিহ্যবাহী জাতীয় পোশাক। জগতজোড়া ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইমামকে দেখে জনতা অভিভূত। গাড়ি থেকে নেমে তিনি দোভাষীর সঙ্গে হোটেলে তার জন্য নির্ধারিত কক্ষে চলে যান। বাইরে জনতা ইমামের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে।

প্রবীণ রুশ সৈন্যরা জনতাকে বলছে, তোমরা দেখেছো আর কী? এই লোকটাকে সঠিক অর্থে দেখতে হলে তাকে বিশেষ জাতের একটি ঘোড়া দিয়ে পাহাড়ে পাঠিয়ে দাও। তারপর কয়েক লাখ মানুষও যদি তাকে ঘেরাও করে ফেলো, দেখবে কোন্ ফাঁকে তিনি সবার মাথার উপর দিয়ে ঘেরাও অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছেন। একজন মানুষও তার এই পলায়ন দেখতে পাবে না।

ইমাম শামিলের মনোরঞ্জনের জন্য মস্কোয় হরেক রকম খেল-তামাশা ও নাচ-গাচের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ইমাম ও তার সঙ্গীরা নাচ-গানের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলুক এবং নিজেদের অতীত ভুলে যাক। কিন্তু ইমাম শামিলের সেই বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অপরূপা সুন্দরী নারীর মন মাতানো নাচ-গান প্রভাব ফেলবে, সেই বয়স আর ইমাম শামিলের নেই। তাই জার আলেকজান্ডারের এসব বিনোদন প্রোগ্রামে ইমামের মন বসলো না। ইমামের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসার গাজী মোহাম্মদকে জিজ্ঞেস করে– ইমাম কী পছন্দ করেন? আমাদের উদ্দেশ্য তার মন ভোলানো। তিনি যা চাইবেন আমরা তারই ব্যবস্থা করে দেব। জবাবে গাজী মোহাম্মদ বললো– আব্বাজানের গোটা জীবন যুদ্ধের ময়দানে কেটেছে। শুধু যুদ্ধের আলোচনায়ই এখন তিনি মনে শান্তি পেতে পারেন।

কর্তব্যরত অফিসার জার-এর অনুমতি নিয়ে ইমাম শামিলের পুরাতন প্রতিপক্ষ সেনাপতি ইয়ারমালুভকে ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলার নির্দেশ দেয়। সেনাপতি ইয়ারমালুভ এখন অবসরপ্রাপ্ত। তিনি দীর্ঘ সময় ইমাম শামিলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি হোটেলে এসে ইমাম শামিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাকে পেয়ে ইমাম বেজায় উৎফুল্ল হন। দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। তারা ঘন্টার পর ঘন্টা নিজ নিজ যুদ্ধকৌশল নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন।

কয়েকদিন পর ইমাম শামিলকে হোটেল থেকে বিদায় দিয়ে গাড়িতে তুলে বসানো হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর গাড়িটি তাঁকে সেন্টপিটার্সবার্গ নিয়ে যায়। গানীব জয়ের সেদিন এক মাস পূর্ণ হলো।

ইমাম শামিল সেন্টপিটার্সবার্গ-এর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর নায়েবগণ কয়েক পা দূরে সশস্ত্র দন্ডায়মান। তাদের পরনে কালো চোগা। প্লাটফর্মের বাইরে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত মানুষ আর মানুষ। বৃষ্টির কারণে কাদা জমে গেছে। জনতার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত কাদামাখা। তবু ইমাম শামিলকে দেখার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা এভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

ইমাম শামিল ও তাঁর সঙ্গীদেরকে রাজকীয় এক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পথের দু'ধারে হাজার হাজার উৎসুক মানুষ অপলক নেত্রে ইমামের গাড়ির প্রতি তাকিয়ে আছে। জার আলেকজান্ডার ক্যাপ্টেন রনুভচকিকে ইমাম শামিলের দোভাষী নিযুক্ত করেন। রনুভচকি কাফকাজের বেশ ক'টি ভাষায় পারদর্শী। কাবায়েলী রীতি-নীতিও তার জানা আছে। দাগেস্তানীদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কেও বেশ ওয়াকিফহাল।

ক্যাপ্টেন রনুভচকি বেলা দশটায় হোটেলে পৌঁছে হোটেল ম্যানেজারকে ইমাম শামিলের আগমনের সুসংবাদ দেয়। ইমাম হোটেলের সম্মুখে এসে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পান। হোটেলের সম্মুখস্থ বিশাল চত্বরে উৎসুক মানুষের এতো ভিড় যে, কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ত্রিতল হোটেলটির উপর তলায় ইমামের কক্ষ। সেই কক্ষ পর্যন্ত যাওয়ার সিঁড়িও মানুষে ঠাসা। মাটিতে ঠাঁই না পেয়ে অনেক মানুষ বানরের ন্যায় গাছের ডালে ঝুলে রয়েছে। ভীষণ বেকায়দায় পড়ে যান হোটেল ম্যানেজার। কী থেকে কী হয়ে যায় ভেবে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

ক্যাপ্টেন রনুভচকিকে খুঁজে বের করে ম্যানেজার বললেন, কিছু একটা বিহিত করুন জনাব! আমি ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেলাম।

পার্শ্ব থেকে কর্নেল যুগোস্লোভস্কি বললেন, আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মানুষ এভাবে আসতেই থাকবে। জনতার এই জোয়ার ঠেকাবার সাধ্য আমাদের নেই।

ম্যানেজার বললেন, এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে একদিকে যেমন শাহী মেহমানের আরামে ব্যাঘাত ঘটবে, অন্যদিকে আমার ব্যবসাও লাটে ওঠবে। ক্যাপ্টেন রনুভচকি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর ক্যাপ্টেন একটি চবুতরায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন- 'ভাইসব! আপনারা যে মহান ব্যক্তিত্বকে দেখার জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন, তিনি এখন হোটেলে নেই। অস্ত্র তৈরির কারখানা দেখার জন্য তিনি কর্নেল যুগোস্লাভস্কির সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন। সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না।'

পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য সত্যিই যুগোস্লাভস্কি ইমামকে নিয়ে পেছনের

গোপন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

বিকাল সাড়ে চারটা। হঠাৎ হোটেলগামী সড়কে শোরগোল শোনা যায়। একজন সিপাহী জনতাকে এদিক-ওদিক সরিয়ে পথ তৈরি করছে। এই ভিড়ের মধ্যে ঘোড়াগাড়িতে সওয়ার শশ্রুমণ্ডিত দাগেস্তানী মুজাহিদকে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। আকাশে-বাতাসে ইমাম শামিল, ইমাম শামিল শব্দ গুঞ্জরিত হচ্ছে। ক্যাপ্টেন রনুভচকি রাতে তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন–

'বিকাল সাড়ে চারটার সময় আমি ইমাম শামিলের কক্ষে প্রবেশ করলাম এবং তাকে সামরিক কায়দায় সালাম করে আমার পরিচয় দিলাম। ইমাম তখন সোফায় বসা ছিলেন। গাজী মোহাম্মদ ও নায়েবগণ মেঝেতে বিছানো চাদরের উপর বসা। ইমাম শামিল তখন এতোই গম্ভীর ও সপ্রতিভ ছিলেন যে, আমি তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে ভয় পেলাম। এক পর্যায়ে যখন সাহস সঞ্চয় করে বললাম, আমি কয়েক বছর পর্যন্ত কাফকাজে ছিলাম এবং তুর্কী ও তাতারী ভাষা জানি, তখন ইমামকে খানিকটা হাস্যোজ্জ্বল মনে হতে লাগলো এবং তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি আমাকে আগে থেকেই চিনো। আমি বললাম, জনাব! আপনার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব কার অজানা। আমার সৌভাগ্য যে, আমি আপনার সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। ইমাম হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ, আপনাদের জনগণও আমি কয়েদিটাকে দেখে বেশ খুশি হয়েছে। আমি বললাম, না, জনাব! তারা কয়েদিকে দেখে নয়– শুধু আপনাকে দেখেই বেজায় উৎফুল্ল। এখানকার রাস্তা দিয়ে প্রতি দিনই কোনো না কোনো কয়েদি যাতায়াত করে থাকে। কিন্তু তাদেরকে দেখার জন্য কেউ ভিড় জমায় না। এখন তারা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় কোনো কয়েদিকে নয়– দেখতে আসছে সেই ব্যক্তিত্বটাকে, যাঁর বীরত্বের কাহিনী তারা ত্রিশ বছর যাবৎ শুনে আসছে। তারা আপনাকে অসাধারণ ও অস্বভাবিক মানুষ মনে করে।

তারপর ইমাম শামিল দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম, ইমাম শামিল প্রত্যেক রুশ কমান্ডারের রণকৌশল ও অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ সবই জানেন। তিনি আমাদের কমাণ্ডারের ব্যর্থতার যেসব কারণ বিবৃত করলেন, তা একশ ভাগ সঠিক ছিলো।

ক্যাপ্টেন পরদিন তার ডায়েরীতে লিখেছেন–

'আজ সকালে শাহী ফটোগ্রাফার ইমাম শামিলের ছবি নেয়ার জন্য আসে। আমার ধারণা ছিলো, ইমাম ফটোগ্রাফী সম্পর্কে জানেন না। কিন্তু না, আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। দেখলাম, ফটোগ্রাফী সম্পর্কেও তিনি অবহিত। তার রুশ বিরোধী অভিযানের শুরুর দিকে একদিন কতিপয় বিদেশি পর্যটক তাঁর ছবি নিতে গিয়েছিল। তখন তিনি একজন মহিলা ফটোগ্রাফারের পীড়াপীড়িতে স্ত্রী ফাতেমার ছবি আঁকতে দিয়েছিলেন।'

❁ ❁ ❁

ফটোগ্রাফার যখন ইমামের ছবি অংকনে ব্যস্ত, তখন উর্ধ্বতন এক রুশ অফিসারের ঘরে কাফকাজের সেই খানরা অবস্থান করছিলো, যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাশিয়ার সমর্থক ও অনুগত বলে পরিচিত। তারা এই মর্মে ক্ষোভ প্রকাশ করছে যে, জার আমাদের সব সেবা ও আনুগত্য ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং শামিলকে অত্যাধিক মর্যাদা দিলেন। তাদের একজন বললো, এর অর্থ তো এই যে, শামিল পরাজিত হয়েও হিরো আর সারাজীবন রাশিয়ার তাবেদারী করা সত্ত্বেও আমরা না আছি তিনে, না আছি তেরোয়।

আরেকজন বলল, যা বুঝতে পারছি তাহলো, শামিলের বংশ এখনো সম্মানিতই থাকবে। আর আমাদের থাকতে হবে অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে।

কুচক্রী মস্তিষ্ক ও জবানগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইমাম শামিলের মোকাবেলায় পরাজয়বরণ করা সেনাপতিদেরকে উস্কে দেয়ার চক্রান্ত শুরু হয়। যাদের মতে রাজদরবারে ইমাম শামিলের এই সম্মান-মর্যাদা অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর, এই চিন্তায় তাদের দৌড়-ঝাপ শুরু হয়ে যায়। দরবারের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জারকে এমনও বুঝ দেয়ার চেষ্টা করা হয় যে, ইমাম শামিল ও তার সফর সঙ্গীদের রুশ সাম্রাজ্যের বাইরে যেতে দেয়াও ঝুঁকিমুক্ত নয়। রাশিয়ার শত্রু শক্তিগুলো পৃষ্ঠপোষকতা করে ইমামকে পুনরায় জারের মোকাবেলায় দাঁড় করাতে পারে। জার আলেকজাণ্ডার নিজেও এ ব্যাপারে শংকিত। তিনি ইমাম শামিলকে প্রদত্ত রাশিয়ার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার ওয়াদা থেকে সরে আসার বাহানা খুঁজতে শুরু করেন। তবে ইমাম শামিলকে এতো মর্যাদা না দেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রথমে পথের দুর্গমতা এবং আবহাওয়াজনিত সমস্যার বাহানা দেখিয়ে ইমাম শামিলকে মক্কা সফর থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি জারের নায়েব হিসেবে ইমামকে কাফকাজের ভাইসরয়-এর পদ গ্রহণেরও প্রস্তাব করা হয়। সাথে সাথে ইমামের জবাবের অপেক্ষা না করে তাকে 'চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার' বাহানায় কালুগা পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আবহাওয়ার দিক থেকে কালুগা রাশিয়ার একটি নিকৃষ্ট এলাকা। এখানকার পানি ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে ইমাম শামিলের রক্ষীদের নিকট এই নির্দেশও এসে যায় যে, তারা ইমাম ও তার পরিবার-পরিজনের খাদেমদেরকে বুঝাবে, কালুগার আবহাওয়া অত্যন্ত ভালো এবং রাজবংশের লোকেরা বিনোদনের জন্য ওখানে ভ্রমণ করে থাকে।

কালুগা সফরের প্রস্তুতি চলছে। ঠিক এই সময় এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হল, যার ফলে ইমাম শামিলের মেজাজ বিগড়ে যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপ–

ইমাম শামিলের সাক্ষাৎ প্রার্থীদের আনাগোনা ও ভিড় লেগেই আছে। একদিন এক ব্যক্তি একটি চিত্র নিয়ে ইমামের নিকট এসে উপস্থিত হয়। চিত্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক পার্বত্য এলাকার প্রাচীর। প্রাচীরের বাইরে একজন মানুষের লাশ। মৃত লোকটির সমস্ত শরীর উলঙ্গ এবং মাথাটা কাটা। শরীরের বিভিন্ন স্থানে গভীর ক্ষত। আগন্তুক বললো, এটি দাগেস্তানের প্রথম ইমাম কাজী মোল্লার প্রতিকৃতি। আর এই বসতিটি হল গমরী।

লোকটির ধারণা ছিলো, ইমাম শামিল ছবি দেখে অভিভূত হবেন। কিন্তু তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন, তা তার ধারণার বিপরীত। ইমাম শামিল গভীর মনোযোগ সহকারে চিত্রটি দেখে বললেন, কক্ষনো নয়, এটি আমাদের গাজী মোহাম্মদের প্রতিকৃতি নয়, তুমি এক্ষুনি এখান থেকে সরে যাও।

লোকটি বারবার দাবি করতে থাকে যে, না এটি আপনাদের কাজী মোল্লারই প্রতিকৃতি। ইমাম শামিল বিরক্ত হয়ে ওঠেন। রাগে-ক্ষোভে তাঁর চেহারা লাল হয়ে যায়। মুরীদরাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ক্যাপ্টেন রনুভচকি বাহুতে ধরে লোকটিকে বাইরে বের করে দেন।

ক্যাপ্টেন রনুভচকি তার ডায়রীতে লিখেছেন–

'আমার জানা ছিলো, ইমাম শামিল তখন আমাদের একজন বন্দি আর আমি বিজয়ী জার-এর একজন ক্ষমতাবান অফিসার। কিন্তু সে সময়ে ইমাম শামিলের চেহারায় এতোই প্রভাব বিরাজ করছিলো যে, দেখে আমি থর থর করে কাঁপতে শুরু করি। আমার অন্তর বললো, শামিল সত্যিই সিংহ। তারপর আমি ভাবতে শুরু করি, এই সিংহ যখন মুক্ত ছিলো, তখন তার প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিমাণ কী ছিলো। পরে তদন্তে প্রমাণিত হলো– প্রতিকৃতিটি আসলেই গাজী মোহাম্মদের ছিলো না। ক্যাপ্টেন রনুভচকি ইমামকে জানালেন, লোকটি আসলেই মিথ্যুক ছিলো। ছবিটি অন্য কারো ছিলো।

ইমাম শামিল জবাবে বললেন, তদন্তের প্রয়োজন ছিলো না; গাজী মোহাম্মদকে আমি ভালো চিনি, নাকি আপনারা ভালো চেনেন?

কালুগা মস্কোর দক্ষিণে মূল রুশ প্রদেশগুলোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর। এটি প্রাদেশিক রাজধানী। নগরীর অধিকাংশ বাড়ি-ঘর কাঠের তৈরি। শীতকালে জমাটবাঁধা বরফের স্তর সেখানকার গৃহসমূহের জানালা পর্যন্ত উঁচু হয়ে যায়। এ শহরে পঁয়ত্রিশটি গীর্জা আছে, আছে বেশ ক'টি সেনানিবাস ও অস্ত্রগুদাম। জনসংখ্যা পঞ্চান্ন থেকে ষাট হাজার।

এ শহরের বাসিন্দারা ইমাম শামিলকে অভূতপূর্ব গণসংবর্ধনা জানায়। ইমামের সম্মানে স্থানীয় প্রশাসন ও সুধী মহল নিমন্ত্রণের আয়োজন করে। আশপাশের এলাকার লোকজনও ইমামকে এক নজর দেখার জন্য ছুটে আসে।

কিছুদিন পর জারের পক্ষ থেকে ইমাম শামিলকে একটি উন্নত ঘোড়াগাড়ি ও কয়েকটি ঘোড়া প্রদান করা হয়। ঘোড়া পেয়ে ইমাম শামিল আনন্দিত হন এবং ক্যাপ্টেন রনুভচকিকে বললেন, আপনি আমার পক্ষ থেকে জার-এর নিকট কৃতজ্ঞতাপত্র প্রেরণ করুন।

ক্যাপ্টেন রনুভচকির প্রতি সপ্তাহে দু'টি রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। একটি জারের জন্য একটি কমান্ডার ইন চীফ বেরিয়া তানস্কীর জন্য। ক্যাপ্টেনের প্রতি নির্দেশ ছিলো, যেনো তিনি ইমাম শামিল ও তাঁর সঙ্গীদের তৎপরতার বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন।

কালুগা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের গরীব-অসহায় লোকেরা শুনতে পায়, ইমাম শামিল অত্যন্ত দানশীল মানুষ। তারা ইমামের বাসস্থানের সম্মুখে এসে ভিড় জমাতে শুরু করে। ইমাম শামিল ঘর থেকে বের হলেই তারা ইমামের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং ইমাম পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা পাচ্ছেন, অকাতরে দান করে যাচ্ছেন।

একদিনের ঘটনা। ইমাম শামিলের কাছে বিশ রোবল ছিলো। একজন ভিক্ষুক হাত বাড়ালে তিনি সবক'টি মুদ্রা তার হাতে তুলে দেন। ক্যাপ্টেন রনুভচকি এ ঘটনা দেখে বললেন, জনাব হয়ত জানেন না যে, এই ভিখারী আপনার বদান্যতা থেকে অন্যায় স্বার্থ উদ্ধার করছে। এই ভিখারী সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্পূর্ণ টাকা মদ-গাজা খেয়ে উড়িয়ে দেবে। জবাবে ইমাম বললেন, আমার কাজ দান করা– তার ব্যবহারের তত্ত্বাবধান করা নয়। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে দান-সদকা করার তালীম দিয়েছে। তোমাদের ইঞ্জীলেও দানের বিধান আছে।

একথা শুনে ক্যাপ্টেন রনুভচকি বললেন, ঠিক আছে, আপনার যা মর্জি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, ভিক্ষার জন্য যারা হাত পাতে, তাদের সকলেই ভিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত নয়। আপনি আপনার সমুদয় অর্থ ভিক্ষুকদেরই দিয়ে দিচ্ছেন, নিজের জন্য মোটেও ব্যয় করছেন না।

কিন্তু তারপরও ইমাম শামিলের পক্ষ থেকে দান-খয়রাতের এই ধারা অব্যাহত থাকে। দেখাদেখি গাজী মোহাম্মদ এবং নায়েবগণও ইমামের নামে দান করতে শুরু করেন।

ক্যাপ্টেন রনুভচকি ইমাম শামিলকে সন্তুষ্ট রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বটে; কিন্তু মাঝে-মধ্যে ছোট-খাট কিছু বিষয় ইমামের পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ইমামের এই অনুভূতি তীব্র আকার ধারণ করে যে, তিনি এখন 'ইমাম' শামিল নন– 'বন্দি' শামিল।

জার আলেকজাণ্ডার ইমাম শামিলকে যে ঘোড়াটি দিয়েছিলেন, এক রাতে কয়েকজন চোর সেটি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। চোরদের জানা ছিল

না, তারা যার ঘরে চুরি করতে ঢুকেছে, তিনি কোন ধাতের তৈরি। গভীর রাতে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনে গাজী মোহাম্মদের সন্দেহ হয়। তিনি বিছানা থেকে উঠে কক্ষের বাইরে বেরিয়ে আসেন। দেখেন, তিনজন মানুষ ইমামের ঘোড়া টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। চোররা টের পেয়ে যায়, মালিক জেগে গেছেন। ঘোড়াটা ফেলে তারা পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু নায়েবগণ মুহূর্ত মধ্যে দৌড়ে গিয়ে দু'জনকে ঝাপটে ধরেন। তৃতীয়জন সিঁড়ি বেয়ে বহিঃফটক লাফিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করে। গাজী মোহাম্মদ এক লাফে দেয়াল অতিক্রম করে পলায়নরত অবস্থায় তাকেও ধরে ফেলে। এতোক্ষণে ক্যাপ্টেন রনুভচকিও এসে পৌছেন। নায়েবগণ খঞ্জরের আঘাতে ধৃত চোরদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দিলেন বলে, কিন্তু ক্যাপ্টেন রনুভচকি বড় কষ্টে তাদেরকে নিবৃত্ত করেন এবং চোরদেরকে গ্রেফতার করে ফেলেন। ততোক্ষণে ইমাম শামিলও নীচে নেমে আসেন। তিনি ক্যাপ্টেন রনুভচকিকে বললেন, অপরাধীদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন? ক্যাপ্টেন রনুভচকি বললেন, এদেরকে উপযুক্ত শাস্তিই দেয়া হবে। আমাদের রীতি অনুযায়ী এদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। আপনি কিংবা আপনার পক্ষ থেকে আমি সাক্ষ্য প্রদান করবো। তারপর শাস্তি হবে।

ক্যাপ্টেনের জবাব শোনামাত্র ইমাম শামিল হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে ওঠেন এবং বললেন, ধুত্তুরি আমি বারবার ভুলে যাই যে, এখানে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অচল।

ক্যাপ্টেন রনুভচকি চোরদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বলে দেন, তোমরা তোমাদের সতীর্থদের নিকট সংবাদ পাঠাও, যেনো তাদের কেউ এ-মুখো না হয়। আমার এসে পৌঁছুতে আর দু' মিনিট দেরি হলে তোমরা মার্ডারই হয়ে গিয়েছিলে। কার ঘরে চুরি করতে এসেছো, তার খবর তোমাদের নেই।'

চোররা যখন বুঝতে পারে, তারা ইমাম শামিলের ঘোড়া চুরি করতে গিয়েছিলো, তখন তাদের চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যায়। তারা ক্যাপ্টেনকে বলে, জনাব! আদালত আমাদেরকে শাস্তি দেবে জানি, তার আগে আমাদেরকে ইমাম শামিলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি দিন। অনুমতি পেয়ে তারা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ইমাম শামিলের নিকট আকুতি-মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

ইমাম শামিল খুশিমনে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মন তাঁর বিষণ্ন।

পরদিন ক্যাপ্টেন রনুভচকি স্থানীয় সেনা কমান্ডারকে বলে এক ভোজসভার আয়োজন করান। আহার পর্ব শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ক্যাপ্টেন রনুভচকি স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বললেন, আজ আমরা একজন মহান বীর পুরুষের মেহমানদারী করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। আমার যখন সবেমাত্র বুঝ হয়েছে, সে সময় থেকেই আমার অন্তরে এই মহান ব্যক্তিত্বকে চোখে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিলো। আমার আরো আনন্দের বিষয় যে, বর্তমানে সেই মহান ব্যক্তিত্ব এখন

আমাদের মাঝে আমাদের বন্ধু হিসেবে বিরাজমান।

রনুভচকির এই ভাষণের পর ইমাম শামিলের মুখে ক্ষীণ আনন্দের ঝলক ফুটে ওঠে।

এই ভোজসভার পর আকর্ষণীয় আরো দু'টি ঘটনা সংঘটিত হয়, যার প্রথমটি নিম্নরূপ-

ক্যাপ্টেন রনুভচকি সংবাদ পেলেন, মস্কোয় এক ফরাসী ম্যাজিক দলের আগমন ঘটেছে। তিনি তাদেরকে কালুগায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। আমন্ত্রণ পেয়ে ম্যাজিক দল কালুগায় এসে পৌঁছে। ক্যাপ্টেন ইমাম শামিলকে ম্যাজিক দেখার আমন্ত্রণ জানান। ইমাম এই শর্তে সম্মতি প্রদান করেন যে, যারা ম্যাজিক দেখাবে, তাদের মধ্যে কোনো মহিলা থাকতে পারবে না। ক্যাপ্টেন রনুভচকি ইমামের এই শর্ত মেনে নেন এবং পরিকল্পনা নেন, একদিন পুরুষ দল ম্যাজিক দেখাবে আর একদিন দেখাবে মহিলা দল।

ম্যাজিক প্রদর্শনের সময় নির্ধারণ করা হলো। ম্যাজিক দল যথাসময়ে সুবিস্তৃত শামিয়ানার নীচে এসে উপস্থিত হয়। মঞ্চে উঠে তারা ম্যাজিক প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় ইমাম শামিল দাগেস্তানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে সভাস্থলে এসে উপস্থিত হন। হঠাৎ হাজার হাজার দর্শনার্থী 'ইমাম শামিল-ইমাম শামিল' বলে ওঠে দাঁড়িয়ে যায়। ম্যাজিক দল ইমাম শামিলের নাম শুনে হঠাৎ চমকে ওঠে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে পালাতে শুরু করে। ইমাম শামিল যখন তাঁর আসনে উপবেশন করেন এবং জনতা নিজ নিজ স্থানে বসে পড়ে, মঞ্চ তখন শূন্য। ক্যাপ্টেন রনুভচকি ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পলায়নপর ম্যাজিক দলের পেছনে সিপাহী পাঠিয়ে দেন। সিপাহীরা অনেক কষ্টে তাদেরকে ধরে ফিরিয়ে আনে। বাধ্য হয়ে তারা মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়। দলনেতা ম্যাজিক দেখান শুরু করার আগে কম্পিত কণ্ঠে নিজ ভাষায় জনতার উদ্দেশে বলে-

'আমার ম্যাজিক দল বছর কয়েক আগে রুশ কমান্ডার ইন চীফের আমন্ত্রণে ম্যাজিক প্রদর্শনের জন্য কাফকাজ গিয়েছিলো। এক রাতে আমরা ম্যাজিক দেখাচ্ছিলাম। এমন সময় ইমাম শামিলের একদল সৈন্য ক্যাম্পের উপর হামলা করে। তাতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। আমি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যাই। তখন আমার মনে এমনভাবে ইমাম শামিলের ভয় ঢুকে যায় যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আমি জানি না, কী কারণে আমাকে অবহিত করা হলো না যে, আজ আমাকে কোন্ ব্যক্তিত্বের সামনে ম্যাজিক দেখাতে হবে! তাই হঠাৎ 'শামিল' নাম শুনে আমি ভয় পেয়ে যাই এবং সঙ্গীদের নিয়ে পালাতে চেষ্টা করি। যা হোক, এখন ঘটনা বুঝতে পারলাম এবং আমি এ জন্য আনন্দিত যে, আমাদের দর্শকদের মাঝে ইমাম শামিলের মতো ব্যক্তিত্বও আছেন। তিনি তো নিজ চোখেই দেখলেন যে, আমরা তাকে কতো ভয় করি। আমাদের ম্যাজিক যদি তার পছন্দ না হয়,

তাহলে যেনো তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন।'

ম্যাজিক দল প্রধানের এ বক্তব্য শুনে ইমাম শামিল হাসেন এবং দলের সবাইকে কাছে ডেকে নিয়ে সাহস দেন। তারপর তারা ম্যাজিক দেখাতে শুরু করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এর চেয়েও অধিক চিত্তাকর্ষক। ক্যাপ্টেন রনুভচকির এক কিশোর পুত্র 'শেরে দাগেস্তান'কে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু ক্যাপ্টেন এই ভেবে পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন না যে, পাছে অবুঝ ছেলের কোনো আচরণ ইমামের জন্য বিরক্তিকর হয়। ছেলেটির সহপাঠী ও সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবরাও তার কাছে আবদার জানাতে থাকে, তোমার আব্বুকে বলো, তিনি যেনো আমাদেরকে শেরে দাগেস্তানের কাছে নিয়ে যান। সহপাঠী-বন্ধুবান্ধবদের পীড়াপীড়ির জবাবে ছেলে বলে, আব্বু তো আমাদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হচ্ছেন না; চল আমরা নিজেরা গিয়েই দাগেস্তানের সিংহটাকে দেখে আসি। সবাই বললো, ঠিক আছে, তাই করো।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছেলেরা একদিন ভয়ে ভয়ে ইমাম শামিলের বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং পা টিপে টিপে ইমামের কক্ষের কাছে গিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করে। ঘটনাক্রমে ইমাম শামিল তখন বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। কতোগুলো বালককে দেখে তিনি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কাকে খুঁজছো? বালকরা বললো, আমরা সিংহ দেখতে এসেছি– ঐ সিংহটি, যে দাগেস্তান থেকে এসেছে। ইমাম বালকদের কথা শুনে হাসতে শুরু করেন এবং বললেন, সিংহ দেখে তোমরা ভয় পাবে না তো? ছেলেরা বললো, আমরা দূর থেকে দেখবো– কাছে যাবো না। ইমাম ছেলেগুলোকে ইশারা দিয়ে কক্ষে নিয়ে যান এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। এমন সময় ক্যাপ্টেন রনুভচকি এসে উপস্থিত হন। তিনি নিজের পুত্রসহ অনেকগুলো বালককে ইমামের সাথে উপবিষ্ট দেখে বলে ওঠলেন, আচ্ছা, তোমাদের এতো সাহস, তোমরা নিজেরাই সিংহের কাছে চলে এসেছো! বালকরা সাদা মনে জবাব দিলো, ইনি তো বড় ভালো মানুষ! ইনি আমাদেরকে সিংহ দেখাবেন। ইমাম শামিল ছেলেদের কথা শুনে হাসতে শুরু করেন। ক্যাপ্টেন রনুভচকি বড় কষ্টে তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, এখানে সত্যিকারের কোনো সিংহ নেই। বাহাদুর মানুষকেও সিংহ বলা হয় এবং ইমাম শামিলেরই আরেক নাম 'শেরে দাগেস্তান'। পরবর্তীতে এই বালকরা তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে গর্ব করে বলতে শুরু করে, 'দাগেস্তানের সিংহ আমাদেরকে আদর করেছেন'।

দরবারে ক্যাপ্টেন রনুভচকির রিপোর্টসমূহ নিয়মিত পৌছাচ্ছিলো। রিপোর্ট থেকে বুঝা যাচ্ছিলো, ইমাম শামিল নিশ্চিন্তে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত আছেন। কিছুদিন পর সেন্টপিটার্সবার্গ-এর একটি ভবনে গোপন এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

কাফকাজের বিভিন্ন অঞ্চলের খান ও কতিপয় রুশ সেনা অফিসার তাতে অংশগ্রহণ করে। বৈঠকে নিম্নরূপ আলাপ-আলোচনা হয়–

সেনা অফিসার ঃ ক্যাপ্টেন রনুভচকি যতোদিন পর্যন্ত ওখানে আছে, ততোদিন আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে না। কারণ, সে শামিলের এমনভাবে সেবা করছে, যেনো লোকটা তার বাবা হয়।

জনৈক খান ঃ তিনি লোকটার জান-প্রাণ দিয়ে সেবা-চিকিৎসা করছেন এবং আবহাওয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখছেন।

দ্বিতীয় খান ঃ তাকে বদলী করতে হবে।

সকলে (সমস্বরে) ঃ এ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

সেনা অফিসার ঃ আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তার বদলীর জন্য তদবীর চালিয়ে যেতে হবে।

অন্য অফিসার ঃ তথাপি তাতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে। আমি দিন কয়েকের মধ্যেই মস্কো যাচ্ছি। কালুগায় গিয়ে আমি ইমাম শামিলের ব্রেনওয়াশ করবো।

এক খান ঃ কিন্তু জার যদি টের পেয়ে যান?

সেনা অফিসার ঃ আমি নির্বোধ নই। আমি তার সঙ্গে মিনিট কয়েক কথা বলবো শুধু। আপনি রনুভচকির বদলীর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

আনুমানিক বারদিন পর এই সেনা অফিসার কালুগা পৌঁছে যায়। তখন যায়েরীন নামক একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রুশ অফিসার ও ইমাম শামিলের সাথে সাক্ষাতের বিবরণ এভাবে বিবৃত করেছেন।

আমি দায়িত্বরত কমান্ডারকে বললাম, আমি ইমাম শামিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। সে বললো, আপনার জন্য তো কোনো বাধা নেই; কিন্তু এ বদমেজাজ অফিসারটা আমাকে অস্থির করে তুলছেন। তিনি বলছেন, শামিল কিনা তার কাছে এসে সাক্ষাৎ দেবেন। অথচ এটা অকল্পনীয় ব্যাপার। প্রথমত এটা জারের নির্দেশের লংঘন। দ্বিতীয়ত মহামান্য ইমাম তাতে সম্মত হবেন না। আমি অফিসারকে বললাম, আপনি যদি ইমাম শামিলকে এখানে ডেকে আনতে বাধ্য করেন, তাহলে তার পরিণতির দায়ভার আপনাকেই বহন করতে হবে।

এবার অফিসার নিজেই ইমামের কাছে যেতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু আমার মনে আশংকা জাগে, লোকটা ইমামের কাছে গিয়ে উল্টা-পাল্টা কিছু বলে ফেলে কিনা।

ক্যাপ্টেন রনুভচকির অভিমত ছিলো, লোকটাকে ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি না দেয়াই উচিত। কিন্তু জারের নির্দেশ, যে কোনো সেনা অফিসার এ এলাকায় আসবে, অবশ্যই যেনো সে ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তথাপি রনুভচকি আমাকে বললেন, আমার পরামর্শ হলো, তুমি আগে শামিলের নিকট

যাও, অফিসার পরে যাবে, যাতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটলেও তুমি তা সামাল দিতে পারো। আমি তার মতে সম্মত হই।

আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করি, ইমাম শামিল তখন তার খাস কামরায় অবস্থান করছেন। আমি অভ্যর্থনা কক্ষে অপেক্ষা করি। এমন সময়ে সেই অফিসারও এসে পৌঁছে। ক্যাপ্টেন রনুভচকি সম্ভবত আগেই ইমামকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছিলেন। বিশ মিনিট পর ইমাম শামিল অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করেন। আমি তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাই; কিন্তু অফিসার দাঁড়ালো না। ইমাম তাকে উদ্দেশ করে বললেন–

'তোমার ন্যায় অন্তত আধা ডজন সেনাপতি আমার কয়েদ খেটেছে। তুমি এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

একথা বলেই ইমাম তাঁর আসনে বসে পড়েন। আমার চোখ যায় দরজার দিকে। দেখি, ইমামের চারজন সশস্ত্র নায়েব প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দৃষ্টি ইমামের প্রতি নিবদ্ধ, যেনো তারা ইমামের নির্দেশের অপেক্ষা করছে। আগন্তুক সেনাপতিও নায়েবদের দেখে ফেলেছে। আমি অনুভব করলাম, লোকটি বেশ ভয় পেয়ে গেছে। এবার অফিসার বসা থেকে উঠে নতমুখে বেরিয়ে যায়।

আমিও উঠে তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে আসি। দরজা থেকে বের হয়েই আমি বললাম, সেনাপতি! এরা এখানে কয়েদি বটে; কিন্তু মানুষ এদেরকে সিংহ বলে জানে। এরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। সেনাপতি আমার কথার কোনো জবাব দিলো না।

এমন সময়ে এক নায়েব দৌড়ে আসে এবং বলে, যায়েরীন! ইমাম আপনাকে স্মরণ করছেন। আমি ফিরে গেলাম। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন রনুভচকি ইমামের রাগ ঠাণ্ডা করে ফেলেছেন। ইমাম শামিল আমাকে দেখে বললেন, কর্নেল, তুমি আগামীকাল সকালে আসবে; তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আমি তো তোমাকে যেতে বলিনি। ঠিক আছে, কালই এসো।

আমি ইমামকে সালাম করে ফিরে আসি।

সেদিন সন্ধ্যায় আরো ছয়-সাতজন রুশ সেনা অফিসার কালুগা এসে পৌঁছে। তাদেরও উদ্দেশ্য ইমাম শামিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। আমি সিদ্ধান্ত নেই, সকালে তাদের নিয়ে একত্রেই ইমামের কাছে যাবো। কারণ, আলাদা আলাদা গেলে ইমামের বেশি সময় ব্যয় হবে।

পরদিন সকালবেলা আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে ইমামের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হই। ক্যাপ্টেন রনুভচকি আমাদেরকে কক্ষে বসালেন এবং পরামর্শ দিলেন, ইমাম যখন প্রশ্ন করবেন, তখন যেনো সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট জবাব দেই এবং লৌকিকতা পরিহার করে চলি।

এমন সময়ে আমরা কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সাথে সাথে কক্ষের দরজা খুলে গেলো। দীর্ঘকায় ইমাম শামিল কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমরা দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করলাম। ইমামের মুখে ঘন লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। মুখাবয়ব থেকে দীপ্ত প্রতিভা ঠিকরে পড়ছে । পরনের কালো চোগা ইমামের ব্যক্তিত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

ইমাম শামিল আমাদেরকে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন এবং আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। হঠাৎ আমার কক্ষের দরজার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। দেখলাম, ইমামের নায়েবগণ সশস্ত্র অবস্থায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ইমাম শামিল এক এক করে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললেন। আমার পালা আসলে আমি বললাম, মহামান্য ইমাম! আপনাকে কাছে থেকে এক নজর দেখবো বলে আমার প্রবল আগ্রহ ছিলো। আপনার অনুগ্রহে আজ আমার সেই আশা পূরণ হলো।

একথা শুনে ইমাম শামিল মুচকি হাসলেন। তারপর লেফটেন্যান্ট অরসুভকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি 'সেন্ট জর্জ ক্রুশ' পুরস্কারটা কেনো পেয়েছিলে?

লেফটেন্যান্ট অরসুভ ঃ আমি দাগেস্তানের কাতুরী এলাকা অবরোধ করে আপনার নায়েব মোহাম্মদকে জীবিত গ্রেফতার করেছিলাম।

একথা শোনামাত্র ইমাম শামিল আসন ছেড়ে হঠাৎ এমনভাবে উঠে দাঁড়ালেন, যেমন সুইচ টিপলে মেশিন চালু হয়ে যায়। তখন তাকে ক্ষ্যাপা সিংহ বলে মনে হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন রনুভচকির মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ইমাম শামিল নিজ ভাষায় কী যেনো বললেন, যাতে 'মোহাম্মদ' নামটি দু'বার উচ্চারিত হয়েছে। দোভাষী ইমামের কথাটা তরজমা করে বুঝিয়ে দেয় যে, ইমাম বলেছেন- 'আমার নায়েব মোহাম্মদ জীবিত গ্রেফতার হয়নি। তোমরা মোহাম্মদ-এর লাশ পেয়েছিলে মাত্র। তোমরা ভুল বলছো। আমার কোনো নায়েবই তোমাদের হাতে জীবিত গ্রেফতার হয়নি।'

তারপর ইমাম বললেন- 'আচ্ছা, এবার সাক্ষাৎপর্ব সমাপ্ত'।

আমরা বিদায় নিয়ে ফিরে আসি। তার বেশ ক'দিন পর সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে স্বীকার করা হয়, ইমাম শামিলের নায়েব মোহাম্মদ আসলেই জীবিত গ্রেফতার হননি। একটি বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নীচে তার লাশ পাওয়া গিয়েছিল, যে বাড়িটি নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো রুশ বাহিনীর তোপের আঘাতে।

✿ ✿ ✿

সেন্টপিটার্সবার্গে ইমাম শামিল-বিরোধী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। হিংসাকাতর খান ও প্রতিশোধপরায়ণ দরবারী অফিসারগণ ধীরে ধীরে তাদের

মিশন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন রনুভচকি বাতাসে ষড়যন্ত্রের ঘ্রাণ পেতে শুরু করেছেন। তিনি অনুভব করছেন, কুচক্রীরা তাকে সরিয়ে তদস্থলে এমন একজনকে বসাতে চায়, যে মহামান্য ইমাম শামিলকে মানসিকভাবে কষ্ট দেবে এবং অস্থির করে রাখবে। রনুভচকি চাচ্ছিলেন, তিনি পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে জারকে রিপোর্ট করবেন, ইমাম শামিল ও তাঁর বংশের কোনো সদস্য থেকে ভবিষ্যতে আর কোনো আশংকা নেই। তবে শর্ত হলো, চেতনার উপর কোনো প্রকার আঘাত করে তাদেরকে ক্ষিপ্ত করা যাবে না। কিন্তু এই রিপোর্ট আদৌ করবেন কিনা, রনুভচকি আরো নিশ্চিত হতে চাইছেন। একদিন তিনি ইমাম শামিলকে বললেন–

'অনুমতি হলে এবং আপনি অপছন্দ না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

ঃ বলুন।

ঃ আমি অনুভব করছি, আপনি পরিস্থিতিকে স্বাচ্ছন্দে বরণ করে নিয়েছেন এবং গানীব-এর যুদ্ধের পর আজ পর্যন্ত আপনার মুখ থেকে কোন অভিযোগ বের হয়নি।

ঃ বোধ হয় তুমি বুঝতে ভুল করেছো। আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মহান আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত। যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো আমি জিহাদ করি, ততোক্ষণ আমি জিহাদ চালিয়ে গেছি। আর তারপর আল্লাহর ইচ্ছা বোধ হয় এই ছিলো যে, আমি নির্বাসিত হয়ে বন্দিত্বের জীবন অতিবাহিত করি। আর এটা তারই অনুগ্রহ যে, এই অবস্থায়ও তিনি আমাকে মর্যাদা দিয়েছেন। আমার মতে সময় ও যুগের শেকায়েত করা আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে বিদ্রোহ করার সমান। পরিস্থিতির শেকায়েত করা আমার মতে পাপের কাজ। আমি নিশ্চিন্ত এই জন্য নই যে, তোমার শাহেনশাহ আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছেন। আমি বরং এজন্যে নিশ্চিন্ত যে, আমার আল্লাহর ইচ্ছাই এমন।

ঃ আপনার নিশ্চয় কাফকাজের কথা মনে পড়ে।

ঃ কাফকাজ দ্বারা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, তাহলে তাকে স্মরণ করা অর্থহীন। কিন্তু যদি কাফকাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হয় স্বাধীনতা, ঈমানী চেতনা ও বেঁচে থাকার লড়াই, তাহলে বলবো, ওসব এখন ওখানে নেই। ওর সবই এখানে– কালুগায়– সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। কাফকাজের জীবন বলতে যে তৎপরতা ও সংগ্রামকে বুঝা হতো, তা এখন নির্জীব। এই নির্জীব-নিষ্প্রাণ কাফকাজের কথা স্মরণ করে কোনো লাভ নেই। শোনো রনুভচকি! কাফকাজ বৃদ্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার বছর যৌবনের

পর এখন সম্ভবত তার আত্মায় আর উষ্ণতা অবশিষ্ট নেই।

ঃ আমাকে ক্ষমা করবেন। হয়তো আমার কথায় আপনার জখমে ব্যথা বেড়েছে।

ঃ না, রনুভচকি! ব্যাপার তা নয়। কাফকাজের ভাগ্যের লিখন এই ছিলো। যদি কাফকাজ আমার কথা শুনতো, ঐক্যবদ্ধ হতো, তাহলে দাসত্ব আর আকাশস্পর্শী পর্বতমালা ভেদ করেও তাকে কেউ শৃংখলাবদ্ধ করতে পারতো না। কাফকাজকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে যে, সে এমন মানুষও জন্ম দিয়েছে, যারা গাদ্দার, মুনাফিক ও বিশৃংখল। রনুভচকি! তুমি কি আমাকে এখন সেই কাফকাজের কথা স্মরণ করতে বলছো, যার স্বাধীনতার প্রাণ আজীবনের জন্য বিদায় নিয়ে গেছে? শোনো ক্যাপ্টেন! আমি জানি, তুমি কথাটা আমাকে কেনো জিজ্ঞেস করেছো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, জার যদি আমাকে মুক্ত করে দেন, তবুও আমি আর কাফকাজ যাবো না।

কিছু লোক ইমাম শামিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে গাদ্দার ও কুচক্রী রুশ অফিসারদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু জারকে জানানো হয়েছে, যেসব কোহেস্তানী ইমাম শামিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়, তারা তার নিকট থেকে যুদ্ধ বিষয়ক নির্দেশনা গ্রহণ করে থাকে। তাই জার ইমাম শামিলকে কাফকাজের খবরা-খবর থেকে সম্পূর্ণ অনবহিত রাখার এবং অ-রুশীদের সাক্ষাতের উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

বত্রিশ.

যেদিন ইমাম শামিল তাঁর তরবারী কোষবদ্ধ করে সেন্টপিটার্সবার্গ অভিমুখে সফর শুরু করেন, সেদিনই কমান্ডার বেরিয়া তানস্কী চেচনিয়া, দাগেস্তান ও অন্যান্য প্রদেশের সেই খানদের তলব করেন, যারা যুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গ দিয়েছিলো। ডাক পেয়ে অনুগত খানরা রুশ কমান্ডার-এর ফিল্ড হেডকোয়ার্টার তমিরখানশুরা পৌঁছে যায়। বেরিয়া তানস্কী তাদের সামনে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজসভার আয়োজন করেন। শেষে প্রত্যেক খানকে যার যার মর্যাদা অনুপাতে স্বর্ণ-মুদ্রা ও নানা রকম উপহার প্রদান করেন। খানরা বেরিয়া তানস্কীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কমান্ডার তাদের উদ্দেশে বললেন—

'বীর খানগণ! আপনারা রুশ শাহেনশাহর সৈন্যদের সমর্থন-সহযোগিতা দিয়ে শাহেনশাহকে আজীবনের জন্য আপনাদের আপন বানিয়ে নিয়েছেন। আমি সংবাদ পেয়েছি, শামিলের কিছু সৈন্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাটির তলায় গিয়ে আত্মগোপন করেছে এবং তাদের হাতে আপনাদের জীবনের হুমকি রয়েছে। এর প্রতিকারের জন্য আমি দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। প্রথমত আমি সকল

কোহেস্তানীর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেবো। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক খানের নিরাপত্তার জন্য নিজ নিজ এলাকায় রুশ সৈন্য মোতায়েন করব।'

খানগণ (সমস্বরে) ঃ আপনার উভয় সিদ্ধান্তই ভুল। আমাদের এলাকায় আপনার সৈন্যদের অবস্থান আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল। আর কোহেস্তানীদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার অর্থ তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানা।

বেরিয়া তানস্কী ঃ শাহেনশাহ আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয় আমার এই উভয় সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করেছেন। আপনাদের ন্যায় অফাদার খানদের শাহেনশাহ'র সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন তোলা উচিত নয়।

এক খান ঃ আমরা যখন শাহেনশাহ'র অফাদার, তখন আমাদের লোকদেরকে নিরস্ত্র করার অর্থ আমাদেরকেই নিরস্ত্র করা।

বেরিয়া তানস্কী ঃ আপনাদের থেকে কয়েকজন সম্মানিত খান এক সময় শামিলের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। আমাদের শাহেনশাহ'র অনুকম্পাই বলতে হয় যে; তিনি আপনাদের পূর্বের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। অবশিষ্ট খানদের অফাদারী সত্ত্বেও তাদের এলাকার জনগণ তলে তলে শামিলকেই সহযোগিতা প্রদান করে। আমি আপনাদেরকে শাহেনশাহ'র সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিয়েছি। আপনারা নিজ নিজ এলাকার জনগণকে বলুন, তারা যেনো অস্ত্র-শস্ত্র আমাদের কাছে জমা দিয়ে দেয়।

সকল খানই ক্ষুব্ধ-ক্ষিপ্ত। কিন্তু এখন আর তাদের করবার কিছু নেই। রুশ সৈন্যরা সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। খানরা দাঁতে আঙুল কাটতে কাটতে ক্ষুব্ধ মনে ফিরে যায়। তাদের চলে যাওয়া মাত্র কমান্ডার বেরিয়া তানস্কী এক মেজরকে নির্দেশ দেন, দু' প্লাটুন সৈন্য নিয়ে এক্ষুনি এরাগল চলে যাও এবং সেখানে বে-দীনদের (মুসলমানদের) যে ক'জন পাদ্রী আছে, সকলকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসো।

রুশ মেজর সৈন্য নিয়ে দ্রুত এরাগল পৌছে যায় এবং সমগ্র এলাকা ঘেরাও করে ফেলে। তল্লাশী চালানো হয়। কিন্তু এরাগলের খানকা বিরান–জনমানবশূন্য। মসজিদের বারান্দায় কিতাবের পুরাতন ছেঁড়া পাতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। এলাকার মানুষ জানায়, মোল্লা আহমদ তার শিষ্যদের নিয়ে আজই এখান থেকে চলে গেছেন। কিন্তু কোথায় গেছেন, কেউ তা বলতে পারে না।

রুশ মেজর ফিরে গিয়ে কমান্ডার ইনচীফ বেরিয়া তানস্কীকে সংবাদ জানায়। বেরিয়া তানস্কী মোল্লা আহমদকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। রুশ সিপাহী ও স্থানীয় গুপ্তচররা মোল্লা আহমদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। তারা দরবন্দ নামক স্থানে পৌছে সংবাদ পায়, একজন দরবেশ– যার মাথায় কিতাবের বোঝা ছিলো– একদিন আগে কাফকাজের সীমান্ত পেরিয়ে গেছেন।

সর্বপ্রথম দাগেস্তানে ঘোষণা করে দেয়া হয়, এলাকার সকল মানুষের সর্বপ্রকার অস্ত্র রুশ সেনাচৌকিতে জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে শুধু খঞ্জর আর কাটার সঙ্গে রাখার অনুমতি থাকবে। তার পাশাপাশি কোহেস্তানীদের বিদ্রোহী মানসিকতা দমন করার লক্ষ্যে তাদের দিয়ে ক্ষেতে-খামারে ফসল উৎপাদনের কাজ করানোর পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। এ দু'টি বিষয়ই কোহেস্তানীদের স্বভাব ও মেজাজের পরিপন্থী। দাগেস্তানের কোহেস্তানীরা অস্ত্রকে তাদের অলংকার বলে মনে করে। নিরস্ত্র হওয়া অপেক্ষা তাদের কাছে মৃত্যুই অধিক প্রিয়। কোহেস্তানীদেরকে চাষাবাদের কাজে বাধ্য করার অর্থ সিংহকে খাঁচায় বন্দি করা। যেসব কোহেস্তানীর রুশ অফিসারদের এসব পদক্ষেপের বিরোধিতা করার সাহস ছিল, তারা তো করেছে। তারা নিজ নিজ সাধ্য অনুপাতে রুশীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছে। অবশেষে শহীদ হয়েছে। আর যাদের মোকাবেলা করার শক্তি ছিলো না, তারা হিজরত করে তুরস্ক চলে গেছে। রুশ শাসকরাও এটাই কামনা করছিলো যে, কাফকাজের কাবায়েলীরা, বিশেষত দাগেস্তানী ও চেচেনরা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাক, যাতে সে জায়গায় রুশ কিংবা আধা রুশরা বসতি স্থাপন করতে পারে এবং কাফকাজে বিদ্রোহের ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

রুশ শাসকরা তাদের কতিপয় গোমস্তাকে লোক দেখানো 'আযাদীপ্রিয়' হিসেবে দাঁড় করায়। তারা দাগেস্তানে 'হিজরত আন্দোলন' এর আবহ ছড়াতে শুরু করে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সুবোধ দাগেস্তানীদের দিয়ে 'স্বাধীনতা'র নামে অনেক কিছুই করানো সম্ভব ছিলো। তারা মানুষের মধ্যে জোরে-শোরে এই স্লোগান ছড়িয়ে দিতে শুরু করে যে, 'রুশীদের গোলামীতে কঠিন জীবন কাটানোর অপেক্ষা হিজরত করা ভালো।' তাদের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে অল্প ক' দিনের মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ দাগেস্তানী তুরস্কের সীমান্তবর্তী এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। তুর্কীরা তাদের বাস্তুহারা মুসলিম ভাইদেরকে সাদরে বরণ করে নেয়।

দাগেস্তানীদের হিজরত থেকে ইমাম শামিলের শত্রুরা দ্বিমুখী স্বার্থ উদ্ধার করে। তারা জারকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, হিজরত আন্দোলনে ইমাম শামিলের বেশ কিছু খান-নায়েবেরও হাত আছে। তারা তুরস্ক গিয়ে নতুন করে সংগঠিত হয়ে কাফকাজ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

ইমাম শামিল এখান থেকে চলে গেলেই তারা হামলা করে বসবে এবং ওসমানী সুলতান তাদের সাহায্য প্রদান করবে।

❖ ❖ ❖

ইমাম শামিল রুশ অফিসারদের গতিবিধি থেকে বুঝে ফেলেছেন, জার

তার ওয়াদা থেকে সরে গেছেন। তাই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ইবাদত-রিয়াজতে আত্মনিয়োগ করেন।

কালুগার প্রতিকূল আবহাওয়া, দূষিত পানি ও বরফশীতল বায়ু দ্রুত ক্রিয়া করতে শুরু করেছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইমাম শামিলের বংশের ছত্রিশজন সদস্য কালুগা এসেছিলো। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তাদের সতেরজন আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। বসন্তকালে গাছের পাতা যেমন একের পর এক ঝরতে থাকে, তেমনি ইমাম শামিলের বংশের জনসংখ্যাও একের পর এক দুনিয়ার বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু ইমামের মুখে কোনো অভিযোগ নেই। আহ! শব্দটিও উচ্চারিত হচ্ছে না তাঁর মুখ থেকে। কোনো ছেলে-মেয়ে কিংবা নাতী-নাতনীর মৃত্যুর সংবাদ কানে আসলে তিনি দু'হাত তুলে শুধু বলছেন- 'ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে রহম করো। আমাকে তাওফীক দাও, যাতে আমি তোমার সন্তুষ্টিতে খুশি থাকতে পারি।'

যখন তিনি কোন আত্মীয়-আপনজনের মৃত্যু সংবাদ পেতেন, সঙ্গে সঙ্গে ইন্নালিল্লাহি... বলে উঠে দাঁড়াতেন এবং তার কাফন-দাফনে আত্মনিয়োগ করতেন।

পরিস্থিতি বদলে গেছে অন্য দিকেও। গাদ্দাররা ভেবেছিলো, ইমাম শামিল জনসম্মুখ থেকে সরে গেলে তারা নিজ নিজ এলাকার শাসক হয়ে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করবে। কিন্তু দাগেস্তানীদের হিজরত প্রমাণ করলো, তারা গাদ্দারদের ঘৃণা করে। কাজেই রুশীদের আর গাদ্দারদের তোয়াজ করার প্রয়োজন রইলো না। তাছাড়া জনতার ব্যাপকহারে হিজরত করা সত্ত্বেও ছোট ছোট বিদ্রোহের ধারাও অব্যাহ থাকে।

জার নানাভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন, কোহেস্তানীরা কেবল ইমাম শামিল কিংবা তাঁর কোনো পুত্রেরই নেতৃত্বে রাশিয়ার অফাদাব ও সহযোগী হতে পারে- অন্য কোনো পন্থায় নয়। তারা পূর্বেকার গাদ্দারদেরকে শাসক হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ফলে আরেকবারের মতো জারের মনে ইমামের ভালোবাসা উথলে ওঠে। কিন্তু ততোক্ষণে সময় ফুরিয়ে গেছে অনেক। ইমাম এখন দুনিয়ার সংশ্রব থেকে অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করছেন। জার পুনরায় ইমাম শামিলকে কাফকাজের 'ভাইসরয়' হওয়ার প্রস্তাব পেশ করেন। ইমাম শামিল জার-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। জার ইমামের পুত্র গাজী মোহাম্মদকেও একই প্রস্তাব করেন। গাজী মোহাম্মদও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। জার ইমাম শামিলের ছোট পুত্র মোহাম্মদ শফীকে দাগেস্তানের গভর্নর হওয়ার প্রস্তাব দেন। মোহাম্মদ শফীও তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অবশেষে জার ইমাম শামিলকে বললেন-

'আমার কোন প্রস্তাবই যখন আপনার মঞ্জুর নয়, তাহলে আপনি নিজেই কোন প্রস্তাব করুন, মনের আকাঙ্খা পেশ করুন।'

ইমাম শামিল জবাব দেন–

'শাহেনশাহে রুশ-এর আমার আরজু-আকাঙ্ক্ষার কথা জানা আছে। আমি গানীব রণাঙ্গনে যে সময় তরবারী কোষবদ্ধ করেছিলাম, তখন আমাকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিলো, আমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারবো। আমি তখনো আমার দীনি কর্তব্য পালনার্থে পবিত্র মক্কা-মদীনা গমন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম। এখনো আমার ইচ্ছা তা-ই।

কিন্তু আমি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কারো কাছে ব্যক্ত করা থেকে এজন্য বিরত রয়েছি যে, আমি এখন আর স্বাধীন নই। যদিও আমাকে বলা হয়েছিলো, শাহেনশাহ আমাকে বন্ধু হিসেবে দেখবেন এবং আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করে যেখানে খুশি চলে যেতে পারবো। কিন্তু পরবর্তীতে সেই ওয়াদা আর পূরণ করা হলো না।

জার আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয় তার উপদেষ্টাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিনাশর্তে ইমাম শামিলকে হজের সফরের অনুমতি দিয়ে দেন। ইমাম শামিল গাজী মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদ শফীকেও সঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। জার পুনরায় পরামর্শে বসেন। হিংসুক-কুচক্রীরা জারকে একথা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, ইমামের ছেলেরা রাশিয়ার বাইরে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাই ইমামকে বলা হলো, আপনি মহিলা ও শিশুদেরকে নিয়ে যেতে পারেন। গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফী যেতে পারবে না।

ইমাম শামিল দু'পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

ইমাম বললেন, যদিও আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি অতি শীঘ্র মক্কা চলে যাই, কিন্তু আমি এটা চাই না যে, তোমাদেরকে 'পণ' হিসেবে রুশীদের দয়ার উপর এখানে রেখে যাই।

গাজী মোহাম্মদ বললো, আব্বাজান! আপনি সময় নষ্ট না করে চলে যান। আমরা যে কোন সময় রাশিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।

ইমাম বললেন, আমার জীবনের শেষ মঞ্জিল আর বেশি দূরে নয়। দাগেস্তানে তোমাদেরকে কখনো প্রয়োজন হতে পারে। তাই আমি এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চাই না, যা আত্মহত্যা বলে গণ্য হবে। রুশ সীমান্ত এখান থেকে বহু দূরে। আর এখান থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে যাওয়াও সহজ নয়।

মোহাম্মদ শফী বললো, আমরা সিংহশাবক। আপনি যদি বারণ না করেন, তাহলে আমরা যে কোনো সময় এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো।

ইমাম শামিল বললেন, আমি খুশি হবো যদি তোমরা তুরস্ক চলে যাও।

তেত্রিশ.

ইমাম শামিল তাঁর দু' স্ত্রী গাওহার বেগম ও যাহেদা, কন্যা ফাতেমা ও নাফীসা এবং অন্যান্য প্রজা ও খাদেমদের নিয়ে তুরস্ক অভিমুখে রওনা হন।

ইমামের রওনা হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জার-এর পক্ষ থেকে গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফীর নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়, তোমরা জার-এর ভাইসরয় হিসেবে দাগেস্তানের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখো।

গাজী মোহাম্মদ তার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে জার-এর দূতকে বললো– 'আমি আমার লোক দ্বারা দাগেস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির খবরা-খবর নেবো। আমার নায়েব মোহাম্মদ কামেল ও হাজী হায়রতিও রমযান মাসে দাগেস্তান গিয়ে সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতির খবরা-খবর নিয়ে আসবে। আমরা দু' ভাই রমযান মাসে ইতেকাফে বসতে চাই। রমযানের পরপরই আমরা আপনাদেরকে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারব।'

এ ব্যাপারে জার-এর পক্ষ থেকে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। মোহাম্মদ শফী ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে। সে জানতে চায়, আমাদের এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ভালো হবে, নাকি দাগেস্তানে জার-এর নায়েব হয়ে ক্ষমতা হাতে নেয়ার পদক্ষেপ নেয়া ভালো হবে?

জবাবে গাজী মোহাম্মদ বললো, শোনো ভাই! আমরা এখানে কার্যত জার-এর বন্দি। যুদ্ধবন্দিদের পলায়ন করা অন্যায় নয়। কিন্তু জার-এর নায়েব হয়ে ক্ষমতা হাতে নেয়ার মধ্যে কয়েকটি ক্ষতি আছে।

প্রথমত আমাদেরকে জার-এর অফাদারীর শপথ নিতে হবে, যা পরে ভঙ্গ করা ঠিক হবে না।

দ্বিতীয়ত দায়িত্ব হাতে নিয়ে যদি আমরা তুরস্ক চলে যাই, তাহলে একে আমাদের কাপুরুষতা বলে গণ্য করা হবে। কোহেস্তানী কাবায়েলীরাও আমাদেরকে তিরস্কার করবে।

তৃতীয়ত আমরা স্বদেশে অবস্থান করেই যদি ভিন্ন কিছু করি, তাহলে তা বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে। আর তুমি এ কথাটিও ভুলো না যে, আমরা হবো পুতুল সরকার। আমাদের কাজ করতে হবে সম্পূর্ণরূপে তাদের নিয়ন্ত্রণে, রাখা হবে চোখে চোখে। বাহ্যত ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকলেও কার্যত সবকিছু থাকবে রুশীদের হাতে। এ জন্য ভালো হবে, আমরা এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করি।

গাজী মোহাম্মদ-এর যুক্তিতে মোহাম্মদ শফী আশ্বস্ত হয়।

১লা রমযান। কালুগায় গেষ্ট হাউজের ফটকের সামনে ঘোষণা দেয়া হয়,

গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফী রমযানের এক মাসে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ দেবেন না। তারা এক মাস দিন-রাত ইবাদতে মশগুল থাকবেন। কারো কোনো জরুরী কথা থাকলে সে যেনো নায়েব মোহাম্মদ ইউনুস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

পরদিন দু'জন অশ্বারোহী কালুগা থেকে রওনা হয়। কালুগার অধিবাসীরা জানে, মোহাম্মদ কামেল ও হাজী হারতিও দাগেস্তান যাচ্ছেন। কিন্তু আরোহী দু'জন আসলে গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফী। তারা এমন নৈপুণ্যের সাথে মোহাম্মদ কামেল ও হাজী হারতিওর রূপ ধারণ করেন যে, সর্বক্ষণ কাছে থাকা রুশ অফিসারও বিষয়টি বুঝতে পারলেন না।

ইমাম শামিলের দু'পুত্র নিরাপদে দাগেস্তান পৌঁছে রহস্যময়রূপে উধাও হয়ে যায়। রুশ অফিসারগণ বিষয়টি টের পান তখন, যখন ঈদের আগের দিন দেখা গেলো, জার-এর শাহী মেহমানখানা ফাঁকা। রাশিয়ার পুলিশ ও সেনাবাহিনী সারাদেশ তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায়। পরিকল্পনা মোতাবেক নায়েব মোহাম্মদ ইউনুস আত্মপ্রকাশ করে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের পিছু নেন এবং অবশেষে শহীদ হয়ে যান। তার কোরবানী বৃথা যায়নি। হাজী হারতিও গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফীর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রুশ সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

দাগেস্তান ও কাফকাজের বিভিন্ন এলাকায় যে লাখ লাখ মানুষ হিজরত করে তুরস্ক গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো, তারা ইমাম শামিলের তুরস্ক আগমনের সংবাদ পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা ইমামকে স্বাগত জানানোর ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে। সুলতান আবদুল আজীজও ইমাম শামিলের রাজকীয় সংবর্ধনার নির্দেশ জারি করেন।

তুরস্ক পৌঁছামাত্র সর্বত্র লাখ লাখ মানুষ ইমামকে স্বাগত জানায়। কনস্টান্টিনোপলের সামান্য দূরে গাজী মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদ শফীও ইমামের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। সেখানে ইমাম শামিলকে রাজপ্রাসাদে থাকতে দেয়া হয়। সাদর আপ্যায়নের পর ইমাম ও সুলতান আবদুল আজীজের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়।

ইমাম শামিল বললেন, আমি আমার মুজাহিদদের নিয়ে দীর্ঘ ত্রিশটি বছর পর্যন্ত বিশাল শক্তিধর রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কিন্তু সালতানাতে ওসমানিয়ার তাতে আমাকে এতটুকু সাহায্য করার তাওফীক হলো না কেনো?

সুলতান আবদুল আজীজ বললেন, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমরা এতোটুকুই জানতাম, আপনি একজন সাধারণ কাফকাজী নেতা এবং আপনার প্রতিরোধ আন্দোলন সুসংগঠিত নয়। আমরা প্রকৃত অবস্থা যখন জানতে পারি,

ততোক্ষণে সময় হাতছাড়া হয়ে গেছে।

ঃ এখানে এরূপ খবরা-খবর কোন মাধ্যমে আসতো? আমি তো একাধিকবার দূতও প্রেরণ করেছিলাম।

ঃ খবরা-খবর বেশি আসত বিদেশি মাধ্যমে। আর আপনার প্রেরিত বার্তাগুলোও বোধ হয় অবিকৃতরূপে আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। আপনার দূতদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে আমরা যেসব বার্তা পেয়েছি, তাতে গভীর চিন্তা-গবেষণার পর উপদেষ্টাগণ আমাকে এ পরামর্শই প্রদান করে যে, এ বিষয়টিতে আমাদের নাক গলানো ঠিক হবে না। আমাদের অবস্থাও তো শোচনীয়। দুশমন সর্বত্রই গাদ্দার তৈরি করে রেখেছে।

ঃ সালতানাতে ওসমানিয়াও আমার কাছে হুমকির সম্মুখীন মনে হচ্ছে। আপনার যে পরিমাণ সহায়-সম্বল, উপায়-উপকরণ আছে, সে পরিমাণও যদি আমার থাকতো, তাহলে আমি শুধু রাশিয়ার জারদেরই নয়– এরূপ আরো দশ-বিশটা সম্রাটের দেমাগ ঠাণ্ডা করে ফেলতে পারতাম।

ঃ একটি জাতির জন্য সেই সময়টি সবচে' বেশি কঠিন বলে বিবেচিত হয়, যখন তার ঘরের লোকদের কিছু মানুষ শত্রুকে আপন ভাবতে শুরু করে এবং অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়। আমাদের অবস্থা তো হলো– এক বিদ্রোহ দমন করি তো আরো তিন বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মুসলিম দেশগুলো বিজাতীয়দের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমার অনুরোধ, আপনি মিসর গিয়ে আমাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন করার উদ্যোগ নিন।

ঃ আমার আগে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো। তথাপি জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে আমি আগে মিসর যেতে প্রস্তুত আছি। সেখান থেকে কনস্টান্টিনোপল না এসে সোজা মক্কা চলে যাবো।

ঃ আমার আরো একটি কাজে আপনার সম্মতি প্রয়োজন। আপনি নিশ্চয়ই রাজি হবেন যে, শেরে দাগেস্তানের পুত্ররা জিহাদে অংশ নিক। আমি গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফীকে রেজিমেন্ট কমাণ্ডার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আপনি 'হ্যাঁ' বললেই আমি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে দিতে পারি।

ঃ আমার আপত্তি নেই যদি তারা আপনার সিদ্ধান্ত পছন্দ করে আর আপনি হিংসুকদের প্রতি নজর রাখতে পারেন। আমার পুত্র ও মুরীদগণ একজন সাধারণ সৈনিকের মর্যাদা নিয়ে জিহাদ করতে পারলেও তাকে সৌভাগ্য মনে করবে।

ঃ 'হিংসুক' বলতে আপনি কাদের বুঝাতে চেয়েছেন?

ঃ গাজী মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শফী আমার পুত্র। আমার বিশ্বাস, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা এখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হবে। যুদ্ধের ময়দানে আপনি

তাদের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখতে পাবেন। তাতে আপনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলে অন্য অফিসাররা অবশ্যই তাদেরকে হিংসা করতে শুরু করবে।

ঃ আমার জীবদ্দশায় অমনটি ঘটা সম্ভব নয়। পরের কথা আমি বলতে পারবো না।

ঃ আল্লাহ আমার দুয়া কবুল করেছেন। আমার এতো শ্রম-সাধনা বৃথা যায়নি। আমি আশা করি, দাগেস্তান ও চেচনিয়ার মুজাহিদরা ওসমানী বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করবে এবং সালতানাতকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার কাজে মদদ দেবে। আমি দাগেস্তান ও চেচনিয়াকে আযাদ রাখতে পারিনি। কিন্তু আমি ওসমানী সালতানাতকেও আমারই সালতানাত মনে করি। বস্তুত প্রতিটি ইসলামী দেশই আমার দেশ। আমার পুত্র ও মুরীদরা তার হেফাজতের জন্য জীবনবাজি রেখে লড়াই করবে।

ইমাম শামিল সেখান থেকে রওনা হয়ে মিসর গমন করেন এবং তুরস্ক ও মিসরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ কারণে আবার তুরস্ক ফিরে আসেন।

✿ ✿ ✿

পবিত্র মক্কা সালতানাতে ওসমানিয়ারই অন্তর্ভুক্ত। খলীফাতুল মুসলিমীন সুলতান আবদুল আজীজ ইমাম শামিলের আপত্তি সত্ত্বেও তাকে সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীসহ মক্কা অভিমুখে রওনা করিয়ে দেন। ইমাম যিলকদ মাসের প্রথম দিকে মক্কা গিয়ে পৌছেন। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং হজ সম্পাদনের আগে রওজায়ে নববীর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে রওনা হন। মক্কা ত্যাগ করে কিছুদূর যাওয়ার পর স্ত্রী যাহেদা ইন্তেকাল করেন। তার দাফন-কাফন শেষ করে ইমাম আবার যাত্রা শুরু করেন। মদীনা পৌছে প্রিয়নবীর রওজা মোবারক যিয়ারত করেন। তারপর তিনি মসজিদে নববীতে ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়েন।

কিছুদিন পর হজ পালনের উদ্দেশ্যে ইমাম শামিল মক্কা যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ইমামের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। মেজবান শেখ আহমদ রেফায়ী তাঁর একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে গদি বিছিয়ে দিয়ে আরামদায়ক সফরের ব্যবস্থা করেন। ইমাম রওনা হন। এখনো তিনি মদীনার সীমানা অতিক্রম করেননি। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে তাঁর উষ্ট্রী মাটিতে পড়ে যায়। ইমাম উষ্ট্রীর পিঠ থেকে গদীসহ পড়ে যান। ইমাম আঘাত তেমন পাননি বটে, তবে তিনি ভয় পেয়ে যান। ইমামের দৃষ্টি মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজের উপর নিবদ্ধ হয়। মুহূর্ত পর তিনি সঙ্গীদের বললেন– 'ইঙ্গিতটা হয়তো আপনারা বুঝে ফেলেছেন। আল্লাহর ইচ্ছে নয় আমি মদীনা ত্যাগ করি। যার দীনের হেফাজতের জন্য

আমি গোটা জীবন জিহাদ করেছি। তিনি এই অধমকে তার নৈকট্যদানে ধন্য করেছেন। চলো, আমরা ফিরে যাই।'

ইমাম শামিলের ক্ষুদ্র কাফেলাটি মদীনা ফিরে যায়।

জাতির আযাদী ও স্বাধীকার চিন্তায় অস্থির বেকারার যে জীবনটি সিকি শতাব্দীরও অধিক সময় পর্যন্ত কাফকাজে আযাদীর দীপশিখা হয়ে প্রজ্বলিত ছিলো, যে মশালটি দাগেস্তান, চেচনিয়া, কবারদা ও আওয়ার-এর নির্যাতিত স্বাধীনতাহারা মানুষের আযাদী অর্জনের লক্ষ্যে জ্বল জ্বল করেছে, সেই মহান ব্যক্তিত্বের জীবন প্রদীপ ২৫ জিলকদ ১২৪৭ হিজরী, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ সালে সূর্যাস্তের পূর্বে চিরদিনের জন্য নিভে যায়। কাফকাজের স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ শেরে দাগেস্তান আল্লাহর পথের মুজাহিদ ইমাম শামিল ওসমানী খেলাফতকে নতুন করে জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করে চিরদিনের জন্য জান্নাতুল বাকীতে শায়িত হন। ইন্না লিল্লাহি...।

ইমামের অসিয়ত মোতাবেক তার পরিবারের সদস্যরা কনস্টান্টিনোপল চলে যায়। স্ত্রী শাওহার বেগম এতই ভেঙ্গে পড়েন যে, ইমাম শামিলের ওফাতের পর তাকে কেউ একবারও হাসতে দেখেনি। ১৮৭৯ সালে তিনিও পরপারে স্বামীর সাথে গিয়ে মিলিত হন।

চৌত্রিশ.

দাগেস্তানের বীরত্বের দেয়াল খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুশ বাহিনী অপ্রতিরোধ্য স্রোতের রূপ ধারণ করে। এই স্রোত ১৮৬৫ সালে কোকন্দ গিয়ে আছড়ে পড়ে। কোকন্দের গভর্নর তার মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হন। রুশ বাহিনীর হাতে তার পতন ঘটে। ১৮৬৮ সালে বোখারা ও তার গভর্নর মুজাফফর উদ্দীনেরও একই পরিণতি ঘটে। ১৮৭৫ সালে খেওয়ার গভর্নর সাইয়েদ মোহাম্মদ রহীম খান তার মসনদসহ বিলীন হয়ে যান। রুশ সাম্রাজ্যবাদ এসব মুসলিম প্রদেশগুলোকে সম্পূর্ণরূপে হজম করে 'আরো আছে কি' শ্লোগান তুলে অবশিষ্ট অঞ্চলগুলোর প্রতিও হাত বাড়ায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু তুর্কমেনিয়া ও মারাদ। ১৮৭৯ সালে তুর্কমেনিয়া এবং ১৮৮৪ সালে মারাদও রাশিয়ার দখলে চলে যায়। এসব প্রদেশের গভর্নর ও আমীরগণ দুশমনের মোকাবেলা করেন এবং এক একজন করে সবাই মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম শামিল কয়েকটি গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রবল প্রতাপান্বিত রুশ বাহিনীর আক্রমণ সিকি শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিহত করেছিলেন এবং লাখ লাখ রুশ সৈন্যকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোকন্দ, বোখারা, খেওয়া, তুর্কমেনিয়া ও মারাদ-এর আমীর, গভর্নরগণ সুসংগঠিত সামরিক শক্তি ও সেনাবাহিনীর অধিকারী

হওয়া সত্ত্বেও কয়েক মাসও রুশীদের মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারেননি।

১৮৭৬ সালে তুরস্কের সুলতান আবদুল আজীজ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ক্ষমতাচ্যুতির অল্প ক'দিন পরই মারা যান। তার ভাতিজা সুলতান মুরাদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু মানসিক অসুস্থতার কারণে তিনিও ক'দিনের মধ্যেই ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সুলতান মুরাদের ছোট ভাই দ্বিতীয় আবদুল আজীজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতার এই লাগাতার হাত বদলের প্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যেও পদচ্যুতি ও বদলীর ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও হীনমন্যতা ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক সুলতানের পরিবর্তন এটাও প্রমাণ করেছিলো যে, সালতানাতে ওসমানিয়ার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ক্রটি দেখা দিয়েছে। রাশিয়া তুরস্কের এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৮৭৭ সালে তুরস্কের উপর আক্রমণ করে ।

ওসমানী বাহিনী ও সেনা অধিনায়কগণ কনস্টান্টিনোপলের পরিস্থিতিতে মনোবহলহারা। ফলে এবারের মত তারা রাশিয়ার আক্রমণের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয় এবং আক্রমণকারী রুশ বাহিনী কনস্টান্টিনোপল পদানত করে। কিন্তু অল্প ক'দিনের মধ্যেই আল্লাহর সৈনিকরা পুনর্গঠিত হয়ে রুশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

ওসমানী বাহিনী রুশ জেনারেলদের পরিকল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে আক্রমণকারী রুশ বাহিনীকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়। ওসমানী বাহিনীর দু'টি ইউনিট রুশ বাহিনীর জন্য রীতিমত গজবের রূপ ধারণ করে। তার একদল সতর্ক বাজের ন্যায় রুশীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তো অপর দল রুশ সেনাদের সারির মধ্যে ঢুকে গিয়ে এমন তাণ্ডব সৃষ্টি করছে, যেমন তাণ্ডব সৃষ্টি হয় ছাগল পালের অভ্যন্তরে ব্যাঘ্র ঢুকে পড়লে। রুশ সেনা অধিনায়ক যে কৌশলই অবলম্বন করছে, তা-ই ব্যর্থ হচ্ছে। রুশ অফিসারগণ জানতে পারে, এ দু'টি দলের একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন মোহাম্মদ পাশা আর অপরটির মোহাম্মদ ফাজেল। আর উভয় কমাণ্ডারই অভিযান পরিচালনা করার সময় বাহিনীর সম্মুখে থাকছেন।

তিনদিন পর রুশ গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে আসে, তুর্ক বাহিনীতে দাগেস্তানী বিভিন্ন রেজিমেন্ট কাজ করছে। এক রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইমাম শামিলের পুত্র গাজী মোহাম্মদ, যাকে তুরস্কের সুলতান 'মোহাম্মদ পাশা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আরেক রেজিমেন্টের নেতৃত্বে আছেন গাজী মোহাম্মদ-এর ভগ্নিপতি মোহাম্মদ ফাজেল দাগেস্তানী, যিনি উপাধি পেয়েছেন 'বে'। ইমাম শামিলের আরেক পুত্র মোহাম্মদ শফী অন্য এক রণাঙ্গনে লড়াই করছেন।

এ সংবাদ শুনে রুশ জেনারেলদের মুখ কালি হয়ে যায়। কমাণ্ডার তৎক্ষণাৎ শাহেনশাহকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। কমাণ্ডার জারকে লিখেছেন–

'দাগেস্তান থেকে আসা দু' গোত্রের দুটি রেজিমেন্টও আমাদের মোকাবেলা করছে। শামিলের পুত্র গাজী মোহাম্মদ ও জামাতা মোহাম্মদ ফাজেল তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এখন তাদের কাছে তোপও আছে। দাগেস্তানীদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই দেখে তুর্কী বাহিনীও উজ্জীবিত হয়ে সমান বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে।'

একদিকে রুশ কমাণ্ডার শাহেনশাহকে এ সংবাদ প্রেরণ করছেন, অপরদিকে গাজী মোহাম্মদ দশম অভিযানের জন্য তার বাহিনীকে প্রস্তুত করার সময় তাদের উদ্দেশে বলছেন–

'মুজাহিদগণ! আল্লাহর সৈনিকগণ! দাগেস্তান আমাদের প্রথম বাসভূমি ছিলো। তুরস্ক আমাদের দ্বিতীয় আবাস। এ যুদ্ধেও যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে আমাদের আর কোন আশ্রয় থাকবে না। তোমরা রুশীদের বুঝিয়ে দাও, গানীবের রণাঙ্গন শেষ যুদ্ধস্থল ছিলো না। এখন আমাদের পূর্বের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার উপযুক্ত সময়। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ তরবারী আর খঞ্জর দ্বারা তাদের তোপের মোকাবেলা করেছিলাম। আজ আমাদের হাতে তোপও আছে। কাজেই ফলাফল পূর্বের বিপরীত হওয়া চাই। এখন রাশিয়ার তোপের মোকাবেলা করবে আমাদের তোপ। তোমরা প্রমাণিত করো, একশ রুশ সঙ্গীনও দাগেস্তানী মুজাহিদদের একটি কঞ্জলের মোকাবেলা করতে অক্ষম। আজ একজন হানাদারও যদি জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়, তাহলে আমাদের মায়েরা দুধের দাবি ক্ষমা করবেন না। আর যদি আমাদের একজন মুজাহিদও পিঠে আঘাত পায়, তাহলে মনে রাখবে, ইমাম শামিলের আত্মা তাতে কষ্ট পাবে।'

রুশ কমাণ্ডারের চোখে দূরবীন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন ওসমানী ফৌজের দাগেস্তানী মুজাহিদরা কিরূপ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে। তারা এখন সুসংগঠিত। তাদের হাতে রাইফেল। দেহ সজ্জিত কঞ্জল ও দাশ্না দ্বারা। রুশ বাহিনী যখন ওসমানী বাহিনীর কোনো অংশের উপর চাপ বৃদ্ধি করছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদ্গতিতে ছুটে এসে রুশ বাহিনীকে গাজর-মুলার ন্যায় টুকরো টুকরো করে ফেলছে। রুশ কমাণ্ডার তার অধীন অফিসারকে বললেন–

'অফিসার! ব্যাপার এখন উল্টো। অনেক ব্যতিক্রম। সেই বীরত্ব, সেই উচ্ছ্বাস, সেই আবেগ, সেই মানুষ। কিন্তু ওদের পেছনে আছে তোপ আর বিস্তৃত ভূমি। এবার সত্যিকার অর্থেই মোকাবেলা হচ্ছে।'

রুশ বাহিনী লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এবার শুধু তাদের পরাজয়ের গ্লানিই মাথা পেতে বরণ করতে হচ্ছে না, ঝাঁকে ঝাঁকে মৃত্যুমুখেও পতিত হতে হচ্ছে।

তারপরও তুরস্কের উপর বিভিন্ন দিক থেকে একাধিকবার আক্রমণ হয়। তুর্কীরা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে নিজেদের চরম বিপন্ন অবস্থার মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদী দৈত্যের বিষদাঁত ভেঙে দেয় এবং স্বাধীনতা অটুট রাখে। মোস্তফা কামালের যে বাহিনী হানাদারদের মোকাবেলায় সীমাহীন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলো, ইমাম শামিলের এক পৌত্রও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

আল্লাহর পথের মহান মুজাহিদ দাগেস্তানের সিংহ ও ইতিহাসের বীর সেনানায়ক ইমাম শামিল পবিত্র মদীনার জান্নাতুল বাকীতে চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন। কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মনোজগতে শামিল চির ভাস্বর-জীবন্ত এক নাম। মুসলমান শামিল নামে আজো উজ্জীবিত হয়, প্রতিটি মুমিন-হৃদয় ঈমানী চেতনায় জাগ্রত হয়– দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত। লেনিন গ্রাড (প্রাক্তন সেন্টপিটার্সবার্গ) ও গমরীর জাদুঘরে 'শামিলের স্মৃতিসমূহ' রক্ষিত আছে আজো।

তুরস্কের বসফরাস নদীর কূলে প্রাচীন স্থাপত্যের একটি প্রাসাদ বিদ্যমান। প্রাসাদটি রহস্যময় অথচ চিত্তাকর্ষক এক দৃশ্য উপহার দেয় লাখো মানুষকে। বসফরাসের উর্মিমালা ভবনটির পা ছুঁয়ে সশ্রদ্ধ সালাম জানায় প্রতি মুহূর্ত। সেই ভবনের একটি কক্ষে রুশ সরকার তৈরি করেছে আল্লাহর সৈনিক ইমাম শামিলের প্রতিকৃতি। প্রতিদিন সকালে তাজা ফুলের মালা পরানো হয় ছবিটিতে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় জমে থাকে সেখানে। তারা রং-বেরঙের সুরভিত ফুল উপহার দিয়ে যায়। ফুলে ফুলে ভরে থাকে কক্ষটি। ফুলের মৌ মৌ গন্ধে সুরভিত থাকে সবসময় সেখানকার পরিবেশ। আজলা ভরে ভরে ফুলের সৌরভ নিয়ে যায় চিরস্বাধীন সামুদ্রিক বায়ু। সেই সৌরভ ছড়িয়ে দেয় দূর-দূরান্ত পর্যন্ত।

[সমাপ্ত]

স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের জন্য এক নিঃসীম প্রেরণার আধার, এক অবিনাশী শক্তি ইমাম শামিল। তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি, ক্ষমতা-লোলুপ আগ্রাসী রুশ জারের আধুনিক সমরায়োজনের মোকাবেলায় প্রায় অর্ধশত বছরব্যাপি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন তিনি। দীর্ঘ সময়ের এই শত শত যুদ্ধের একটিতেও জয়ী হতে পারেননি ক্ষমতাদর্পী রুশ জার। কিন্তু শেষ যুদ্ধে স্বাধীনতা হারায় কাফকাজ। কেনো? কিসের অভাব ছিলো ইমাম শামিলের? ইমাম শামিলের পক্ষে জারের পতন ঘটানো সম্ভব ছিলো। কিন্তু ফলাফল উল্টো হলো। কেনো? সেই রক্তাক্ত ইতিহাস জানার জন্য রচিত হলো অনবদ্য উপন্যাস 'আল্লাহর সৈনিক'। বইটির কোথাও কল্পনার আশ্রয় নেই। নেই অঙ্গ-ঔজ্জ্বল্যে শব্দ-প্রসাধনীর রঙের বাহার। এতে আছে উনিশ শতকের ষোল সাল থেকে উনষাট সাল পর্যন্ত ককেশাশের প্রান্তরে-কন্দরে, পাহাড়ের শীর্ষে-পাদদেশে, ঘন জঙ্গলের আড়ালে, পর্বতমালার বাঁকে-বাঁকে এক আপোসহীন লড়াকু বীর যোদ্ধার সুউচ্চ হিম্মতের স্বর্ণালী ইতিহাস। যে ইতিহাস পাঠে আজো শিহরিত হয় মুমিনের তনুমন, উথলে ওঠে ঈমানের জোশ। আছে উপন্যাসের স্বাদ, ইতিহাসের উপাদান ও উজ্জীবিত মুমিনের জেগে ওঠার আহ্বান।

ISBN. 984-8754-03-2